কালকূট
কালকূট
রচনা
রচনা
সমগ্র
সমগ্র

কালকূট রচনা সমগ্র

[চতুর্থ খণ্ড]

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশকাল : ১৩৬৪

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শান্তিনাথ দাস
মা শীতলা ওয়ার্কস
৭০ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
গৌতম রায়

সূচীপত্র

মনে ভ্রম, তাই কি ভ্রমি, না কি, ভ্রমি, ভ্রমের ঘোরে। সেই যে আপন ঘোরে, ক্ষ্যাপা গেয়ে ফেরে, 'মন চল যাই ভ্রমণে .....' এ কি আমার সেই ঘোর। ঘরছাড়া দূরে ফেরা, বিবাগী বৈরাগী যে না, মন জানে তা। অনেক টান, ঘরে, ঘরের মানুষে, তার চার পাশকে ঘিরে। ঘরছাড়া, হতচ্ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, কোনোটা হতে চাই না। কে বা চায়। তথাপি, কে না বাঁশি বায়ে বড়ায়ি, কালিনী নই কূলে। ঘরকন্নার দমচাপা ছুটোছুটির মধ্যে, কার বাঁশি বেজে ওঠে। বাঁশি কালিন্দীর কূলে বাজে, না কি ঘরছাড়ার হাতছানি, আপন মনে বাঁশি বাজায়, বুকের খাঁচায়।

কোঁচড় ভরে তো সোনা তুলতে চেয়েছি, ওহে আমি লক্ষ্মীমন্ত হব। সংসারের ফরমায়েশে, উদয়াস্ত খেটে, ঝকঝকিয়ে তুলব নিজের ঘেরা। বঞ্চিত করে রাখতে যদি চায় কোনো ব্যবস্থা, তবে লড়ি, লড়ব। লাঞ্ছনাকে নেব গলায়, সাপ জড়ানো মালার মতো। মনে মনে এমন অঙ্গীকার। এখানে থাকা, একালষেঁড়ে স্বার্থপরটি না। সংসারে সবাই যাতে রত, তাতে আমিও আবরত। এ তো উচিত কথা, ন্যায্য কথা। তা না হলে ফাঁকি। মিলজুলে থাকো, মিলে মিশে খাও, সুখ দুঃখে ভাগাভাগি করো, হাত ধরে চলো। তাতে কোঁচড়ে সোনা আসবে, আসবে। কানাকড়ি হলে বা ক্ষতি কী। যা দানা জোটে, খুদ্‌পিপাসা মিটুক তাতেই।

সংসার ছাড়া তুমি না। সমাজে কোটির একটি কণা, দেখা যাক বা না যাক। তারই আবর্তে তুমি নিরন্তর। মানো বা না মানো, দাবী মানতে হবে। আমি সংসার, আমার দাবী মানতে হবে। আমি কর্ম, আমার দাবী মানতে হবে। আমি সমাজ, নীতি, আমি বহুর কণ্ঠস্বর, আমার দাবী মানতে হবে। মানতে হবে। না হলে কবুল করতে হবে, পলাতক পলাতক।

মানি মানি মানি। এত রোল গোল করো না, ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ছাড়তে চাইলেই কি, ছাড়া যায়। নিজের মন বলে কোনো

কথা নেই? সংসার কি আমাকেও একটা মন দেয়নি? আসলে নিজেই যে জড়াজড়ি লেপটে থাকতে চেয়েছি।

তথাপি, বুকের বাতাসে, হাড়ে বাজে শিস। সেই কালিন্দী -ই কূলের কথা। কেউ সেখানে বসে বাজায় কি বাজায় না, জানি না। বাঁশি শুনি নিজের বুকে। বাঁশি সুরে কথা কয়, মন চলো যাই ভ্রমণে…

তা-ই জিজ্ঞাসাবাদ, মনে ভ্রম, তাই কি ভ্রমি, নাকি, ভ্রমি, ভ্রমের ঘোরে। পিছনে ফাঁকি রাখতে মন নেই। দাবী ষোলকলা পূরণ, প্রয়োজনের তৃণকুটোটি তুলে দিয়ে, তারপরে সময়। ডাকাডাকি হাতছানিতে, সারাদিনে অনেক চমক লেগেছে। দিশাহারা হয়ে, থমকে, চোখ ফেরাতে গিয়ে, দিশায় ফিরেছি। তারপরে কোঁচড় ঝেড়ে দিয়ে, ঝাড়া হাত পা খালাস। এবার ত্বরায় চলো হে, ত্বরায় চলো। এ চলা যদি লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া হবে, তবে, ডানার পাখায় কেন ঝাঁপতাল বাজে। শূন্যে ডিগবাজি খাওয়া পাখিটার শিস দয়ে ওঠা, মিঠে ঝংকার কেন শোনা যায়। এতদিনে কেন মনে হলো, পাখার ভাঁজে ভাঁজে যত ধুলা ময়লা পোকা, সব সাফ সুরত হালকা ঝরঝরে। কেন খুশিতে মন নাচে, অথচ চোখের জল গলতে চায়। মনের আশমান জুড়ে, এ কি রৌদ্র মেঘের খেলা, হেসেও যায়, কেঁদেও যায়।

এমন যদি হয়, তবে না হয়, লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া হওয়া গেল।

কিন্তু মন এমন করে, এ কিসের ভ্রমণ? কেমন ভ্রমণ? এ ভ্রমণের স্বরূপ কী? কেমন যেন ধন্দ লাগে, লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া, কোনোটাই না, ঘরছাড়ার বিরাগ। ঘরে থেকেও সে বিবাগী। যেন, ঘরেতে যাকে সেবা করেছে, প্রেমে আর স্নেহে, বাইরে তাকেই নতুন করে খুঁজতে যাওয়া। ঘরের চার দেওয়ালের মাঝখানে, যে ছিল বিগ্রহের বেশে, বাইরে তার অন্য রূপের হাতছানি।

তীর্থভ্রমণ নাকি।

এমন কথা ভিতর থেকেও কোনোদিন কবুল করিনি। কবুল করার দায় কোথায়। তীর্থে যাদের গমন, ধর্মে তাদের মন অবিরত। স্থান-মাহাত্ম্যে অচলা ভক্তি। ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিটি বিষয়ে, মন মরে খুঁতখুঁতিয়ে। আচার-আচরণে সদা শশব্যস্ত। কোথায় না জানি কতটুকু অনাচার হয়ে গেল। বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ শংকা, দেবতা কখন কতখানি রুষ্ট হলেন। সব কিছু বাঁচিয়ে, সর্ব উপাচারে দেবতার পূজা শেষ হলে, তবে সার্থক তীর্থভ্রমণ।

সে যার বিশ্বাস, তার বিশ্বাস। এমন তীর্থের হাতছানি আমি কোনোদিন দেখিনি। ডাক শুনিনি। তাই তীর্থভ্রমণের কবুল আমার নেই। তবু যে

বিগ্রহের কথা এলো, তাকে কবুল না করে উপায় নেই। যদি সংসারকে মন্দির বলি, তবে সংসারের মানুষরাই আমার বিগ্রহ। নিত্য নিরন্তর যারা আমার পায়ে পায়ে ফেরে, কাজে কর্মে থাকে, তারা আমার বিগ্রহ। এই বিগ্রহকেই কি আমি অন্য রূপে, অন্য কোনোখানে খুঁজতে যাই? চেনা অচেনার মাঝে যে বহু আর বিচিত্র। অপরূপ থেকে অরূপে যে বিরাজ করে, সেই বিগ্রহের মন্দির আকাশের নীচে। দেওয়াল গেঁথে, মাথা ঢেকে, সে বিগ্রহকে রাখা যায় না। সে অবস্থান করে পাহাড়ে সমতলে, অরণ্যে সমুদ্রে, নগরে বন্দরে। চিনি চিনি করে তাকে চেনা হয়ে ওঠে না। অচেনার ঝাপসায় সে মিটিমিটি হেসে যায়, নানা বেশে। যেন সে আমাকে এক রহস্যের গোলকধাঁধায় টেনে নিয়ে যায়।

এমন যদি হয়, তবে চলো; সেই বিগ্রহের সন্ধানে যাই। সেই তীর্থ সারা করি।

কিন্তু ধাঁধা দেখি নিজের মধ্যে। নিজের মধ্যে মিটিমিটি হাসি দেখে, নিজের দিকে ফিরে তাকাই। এত হাসির ঘটা কিসের?

দেখছি, মিথ্যাবাদীটা এতক্ষণে ধরা দিয়েছে। সাত কাহন করে শিবের গীত গেয়ে, এখন বলে, ধান ভানিতে যাই। একে শঠ বলে, না প্রতারক? বিরাগ বিবাগ রূপ অরূপ ধর্ম তীর্থ বিগ্রহ, সব বয়ানের পরে, এখন কবুল করে, সব ঝুটা হায়। চলেছি মহাপ্রাণীকে ঠাণ্ডা করবার ধান্দায়। অর্থাৎ কী না, রোজগারের ফিকিরে, যাকে বলে পেটের ধান্দায়।

ছি ছি ছি। সোজা কথা সহজ করে বলতে শিখলাম না কোনোদিন। কেবল কথার বুড়বুড়ি। তার চেয়ে বলি না কেন, যে-পসরা আপন হাতে গড়ে ফেরী করে বেড়াই, তারই ডাক এসেছে। আসলে আমি ফেরীওয়ালা। কাগজে কলমে আঁকিবুকি কাটি, হিজিবিজি দাগি। যা গড়ি, তা একলা গড়ি, একলা ঘরে বসে। তারপরে, ঘরের বাইরে এসে হেঁকে বেড়াই, 'কে নেবে গো আমার হিজিবিজি কথার কাটাকুটি।' কেউ নেয়, কেউ নেয় না। কেউ ভ্রূকুটি করে ঠোঁট ওলটায়। কেউ খুশির রঙে ঝলকায়। তবে মোদ্দা কথা, গালি আর কালি, কলঙ্ককে করেছি অঙ্গের ভূষণ। তার মধ্যেই, যেটুকু স্নেহ ভালোবাসা জোটে, তাকে নিই অনেকখানি করে, অনেক বড় করে। নইলে চলি কোন্ জোরে।

এমনি এক পসরার ডাক এসেছে, তাই চলেছি। তার জন্য, এত বুড়বুড়ি কাটবার দরকার ছিল না। অভ্যাস খারাপ কী না, তা-ই। তথাপি, একটা কথা না বললে চলে না। কেবল কি মাল বয়েই খালাস? কলা বেচাই কি

আর? রথ দেখাটা কি নেই? আসলে রথ দেখব, সেই খুশিতেই এত কথা। শুধু কলা বেচার ডাক হলে, সব শূন্য, শূন্য থেকে যেত। জীবনে রথ দেখাটা আছে বলে, কলা বেচাটা চালিয়ে যাওয়া যায়।

সময় যায়, পসরার ডালি কাঁধে নিয়ে এবার চলো। ডাক এসেছে, আরব সাগরের কূল থেকে। আরব সাগরের কূলে যাই, বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে। কেবল একটি কথা বলব না। আরব সাগরের কূলে, কোন্ রকমের হাটে চলেছি পসরার ডালি নিয়ে, কী বা সে হাটের নাম। গেলে পরে জানা যাবে, দেখা যাবে, সে হাটের রঙ কেমন, রকম কেমন। সে হাটের অনেক নাম, অনেক গরব। তা যদি বলি, তবে এ কথাও বলতে হয়, শুনেছি, সে হাট বড় গরমও বটে। এ ফেরিওয়ালার তা সইলে হয়। কিন্তু এখন থেকে, সে হাটের নাম বলে দিলে, তোমাদের চোখ জ্বলজ্বলিয়ে উঠবে। মন ঝনঝনিয়ে উঠবে, কৌতূহলের ঝলকে। রাশি খানেক জিজ্ঞাসা ছুড়ে মারবে আমার মুখের 'পরে। তোমাদের চিনি তো।

কিন্তু আমি জবাব দেব কেমন করে। আগে যাই, দেখি, তারপরে জবাব।

বোঝো এখন অবস্থা। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে, হাওয়াগাড়ির দরজায় ঠেক। ঢোকবার উপায় নেই, বেজায় ভিড়। এদিকে ঘণ্টা যদি বাজিয়ে দেয়, তবে রইলাম পড়ে। তাই কখনো থাকতে পারি? সকলের সঙ্গে গায়ে পায়ে চলতে হবে।

কিন্তু কার গায়ে পায়ে চলব। দরজা জুড়ে যিনি দাঁড়িয়ে, তিনি দরজা থেকে মহৎ, আয়তনের ক্ষেত্রে। তাঁর ঘাড় কামানো কাঁচা-পাকা চুলের গোছ। পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে, বড় করে কাঁধ কাটা ফুল লতা পাতা লাগানো জামা, তাঁর বিশাল পৃষ্ঠ আর নিতম্ব ছাড়িয়ে, হাঁটুর একটু ওপরে থেমেছে। পায়ের গোছা আর গুলি দেখে বলতে ইচ্ছে করে, মায়ের গতরটি শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, বেশ ভয় দেখাবার মতো।

এমন মানুষ ঠেলে ঢুকব, সে সাধ্য আমার নেই। তার ওপরে, এঁদের আমরা মেমসাহেব বলে জানি। যদি একবার চোখ পাকিয়ে তাকান, তাহলেই ভিরমি যাব। ধমক দিলে তো কথাই নেই।

কিন্তু হাওড়া ইষ্টিশন বলে কথা। আমি ঠেক খেলে তো আর আমার পিছন ঠেক খাবে না। এক গণেশদাদা, পেটটি নাদা, মারলেন এসে ধাক্কা।

'আরে ভাই যানে দো।' তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে, আগে গণেশদাদার রাস্তা করে দিলাম। দেখি, এবার আমার ঢোকা কে ঠেকায়। আমি গণেশদাদার পিছু পিছু, গায়ে গায়ে।

সত্যি, বঙ্গ সন্তানেরা কোনো কর্মের না। শোনোতো কেমন হাঁক, 'আরে এ মেমসাব, দরজাসে হটিয়ে না। ঘুসনে দিজীয়ে।'

মেমসাহেবের শরীর যেন একটু নড়লো। একবার পিছন ফিরে তাকালেন। মায়ের মুখে অনেক ভাঁজ পড়েছে। চোখের কোলে মাংস ঝুলন্ত। তা হোক, রঙের পালিশ মোটা। ঠোঁটের রঙ চড়া। একটু কড়া ভবিয়তে বললেন, 'ঠায়রো না বাবা, গার্ডকো টিকেট দেখাতা।'

তার চেয়ে চড়াসুরে শোনা গেল, 'আরে টিকেট দেখানো হ্যায় তো অন্দর যাও বাবা। মুঝে ভি তো চড়না হায়।'

তারপরে দেখো, কেবল কথায় না, একেবারে গায়ে গায়ে ঠ্যালা। ঠ্যালাতেই ঠ্যালা বোঝা যায়। মেমসাহেব ভিতরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গণেশদাদা। ঢুকতে ঢুকতেই গণেশদাদা পিছন ফিরে হাঁক দিলেন, আ যাও।'

আমাকে নাকি? তেমন তো কোনো কথা ছিল না। পিছন ফিরে তাকালাম। তা-ই বলো। কলাবউটি যে আমার পিছনেই। গণেশদাদার পিছনটি আমি বে-আইনী দখল নিয়েছি। নিয়ে যখন ফেলেছি, উপায় নেই। ভিতরে ঢুকে যেতেই হলো। অন্যথায় কলাবউটির ঢোকবার রাস্তা বন্ধ। তবে, কলাবউ তো, কলাবউই। চোখের নজর যতো সাফই থাকুক, মুখ দেখতে পাবে না। চৌদ্দ হাত শাড়ি দিয়ে মাথা মুখ ঢাকা। নিতান্ত ভাগ্য করেছ, তাই গাদা খানেক কাঁচের চুড়ি পরা, দু খানি গোরা রঙের হাত, কনুই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছো। কাঁচের চুড়ির বহর দেখে, এইটুকু মাত্র বোঝা গেল, গণেশদাদা শেঠজী লোক না। তাহলে গিন্নীর গায়ে কয়েক কেজি সোনা চাপানো থাকত।

ভিতরে ঢুকে, একটু সরে গিয়ে, কলাবউয়ের রাস্তা করে দিলাম। মনে হলো যেন, হাঁসের খোঁয়াড়ে ঢুকেছি। এপাশ ওপাশ নড়বার উপায় নেই। মালের বহর তেমন নেই বটে। মানুষেই ছয়লাপ। তার ওপরে নড়াচড়ার জায়গা দখল করেছে, তিনতলা ব্যবস্থা। এর নাম থ্রি টায়ার স্লিপার। গরীবদের শুয়ে যাবার স্বপ্নটা এইরকমই হয়। কামরার যে খবরদারি করবার

পাহারাদার—থুড়ি, গার্ড, এ্যাটেনডেন্ট গার্ড যার নাম, সে টিকিটের নম্বর দেখে, জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে। পোর্টারের সাহায্য নিয়ে, মালের খাঁচায় মাল ভরে দিচ্ছে।

তেমন মালের বহর আমার নেই। চামড়ার পেটিকাটি তাদের হাতে দিয়ে টিকিটের নম্বর দেখে, জায়গা খুজে নেবার দায়টুকু নিজেই নিলাম। নম্বর অনুযায়ী, দুই বেঞ্চির মাঝখানে ঢুকতে গিয়ে, আবার সেই ঠেক। সেই মেমসাহেব। তিনি এখন দুই বেঞ্চির মাঝখানে, গলির মোড় আগলে দাঁড়িয়ে। যতদূর জানি, ঘুমোতে যাবার আগে, নীচের বেঞ্চিতে বসবার ঠাঁই। সে হিসাবে তো এখন সন্ধ্যা রাত্রি। তা ছাড়া এক বিষয়ে আমার পরম সৌভাগ্য, যাকে বলে দোতলা, আমার শোবার ঠাঁই জুটেছে সেখানেই। টিকেটে সেই রকম ব্যবস্থা। একতলার ভিড়ের থেকে, দোতলা ভালো। বসে থাকা যাত্রীরা শুতে না গেলে, নিজের শোবার উপায় নেই। তেতলাটা আবার একটু বেশি উঁচুতে। খাঁচা খাঁচা ভাবটা বড় বেশি। সোজা হয়ে বসতে গেলে, মাথা ঠেকতে চায়।

কিন্তু মেমসাহেব মা ঠাকরুণ কি আদপেই আমাকে এগিয়ে গিয়ে বসতে দেবেন। কোনোরকমে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে, ভিতরের অবস্থা দেখে, মনটা যেন কেমন ছ্যাঁৎছ্যাঁৎ করে উঠলো। আরো তিন মেমসাহেব ভিতরে মুখোমুখি দুই বেঞ্চিতে ছড়িয়ে বসে আছেন। সঙ্গে একটি সাহেবও আছে। তবে তার বয়স বারোর ঊর্ধ্বে না। বাকী মেমসাহেবরা যদি ঠাকরুণের কন্যা হয় সেটা আশ্চর্যের না। বয়স বোধ করি, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে সবাই আছেন। মনটা ছ্যাঁৎছ্যাঁতিয়ে যাবার কারণটা সেখানে। আমার কপালে কেন এত মেমসাহেবের ভিড়। ভিতরটা যে এখন থেকেই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এর পরে, বোবা হয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না। দুটো রাত তো কাটাতে হবে। একটু মাতৃভাষায় যে কথাবার্তা হবে, সে উপায় নেই। এক আধজন দাদা, ভায়া না থাকলে, মাতৃভাষাতেও বাজতে অসুবিধা। দিদি বউদিরাই বা কবে, পরপুরুষের সঙ্গে, হঠাৎ মাতৃ-ভাষায় বেজে ওঠেন।

তবে ওই একটু যা, কথাবার্তা চলা-ফেরায় একটু দিশী আওয়াজ আর গন্ধ পাওয়া যেতে পারতো। সে গুড়েও বালি। তবে বোবা হয়ে থাকবার মতো দাওয়াই অনেক ঝোলা ভরে নিয়ে এসেছি। চোখ আর মন সেদিকে রাখলেই হবে। পাতার পরে, পাতা উল্টে যাওয়া নিয়ে কথা। তা ছাড়া হাওয়ার গাড়ির সঙ্গে, আমার চোখ কি দৌড়বে না? নানা দেশের নানা রূপ চোখের সীমা ছাড়িয়ে, ভিতরের বোবাটাকে, নিঃশব্দে অনেক কথা বলিয়ে ছাড়বে।

অতএব ছাড়ো মনের ছ্যাৎছ্যাতানি। তুমি আপনার, আমি আপনার। কারণ কথাতে, কার কী আসে যায়।

যে ভাষায় বললে, মেমসাহেব বুঝতে পারবেন, সেই ভাষাতেই বলি, 'দয়া করে আমাকে একটু এগিয়ে যেতে দেবেন ?'

মেমসাহেব তখন তাঁর সঙ্গের মানুষদের পরিচালনায় ব্যস্ত। কে কোথায় শোবে, বসবে, কোন জিনিস কোথায় থাকবে। কথা শুনে, আমার দিকে ফিরে তাকালেন। নজর দেখলেই বোঝা যায়, তাঁকে আমি কোনো মতেই খুশি করতে পারিনি। মুখের ভাবে বিরক্তি। এমন কি একটু সন্দেহও। পরিষ্কারই তাঁর নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার টিকিট কি এখানে নাকি ?'

বিনীতভাবে যা জবাব দিলাম, তার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুণ, টিকিটটা সেইরকম।'

বাকীদের নজরও তখন আমার দিকে। নজর ধরা মোহনরূপ নিয়ে, সংসারে জন্মাতে পারিনি, তবে নজর খোঁচানো চেহারা বটে। সকলেই নজর দিয়ে খোঁচা দিলেন। যেন খুঁচিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন, এমন সুখের ঘরে, এই মূর্তিমান অ-সুখটি কেমন। এমন কি বছর বারো বয়সের সাহেবটির পর্যন্ত, আমাকে পছন্দ না। মেমসাহেবরা সবাই একবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলেন। ঠাকরুণ নিতান্ত অ-নিচ্ছায় একটু পাশ দিলেন। নিরুপায়, মাতৃবক্ষ ঘেঁষেই আমাকে, দুই বেঞ্চির গলিতে ঢুকতে হলো।

এর পরে, একটু বসবার ব্যবস্থা। নতুন আর অচেনার ওপরে, মানুষ বড় নির্দয়। সহজে তাকে কেউ জায়গা ছাড়তে নারাজ। আমার প্রথম লক্ষ্য, বারো বছরের সাহেবের ওপরে। সে জানালা ঘেঁষে বসে আছে। তার পাশে যিনি বসে আছেন, তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। সম্ভবতঃ সাহেবের মা। মহিলাটির চোখে, খুশির ছায়া মোটেই নেই। তবে, চোখের দৃষ্টি, প্রবেশ নিষেধের তির্যক ভঙ্গিতে হানা নয়। একটু লম্বাটে মুখ, ডাগর চোখ আর টিকলো নাক, ছিপ-ছিপে নম্র শরীরটিকে জড়িয়ে, হালকা নীল জামায়, তাঁকে কেমন যেন একটু দয়ালু আর শ্রীময়ী দেখাচ্ছে। তাঁর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে, জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম, 'আমি কি এখানে বসতে পারি ?'

তিনি কোনো জবাব না দিয়ে, বেঞ্চির একেবারে একটা ধারে সরে গেলেন। এক পাশে খোকাসাহেব, আর এক পাশে তিনি। মাঝখানটা পেয়েও, আমি একটু সাহেবের পাশ ঘেঁষে বসলাম। কাঁধের ঝোলাটা এবার একটু নামাবার অবকাশ পাওয়া গেল। সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখতে গিয়ে, নিটোল দুজোড়া

গোরা রঙের পা দেখতে পেলাম। হাঁটুর কাছ থেকে দেখতে পেলাম। হাঁটুর কাছ থেকে দেখতে পেলাম বললে, মিথ্যা কথা বলা হয়। তার থেকে আরও কিছু ওপরে। দিশী চোখে সব কিছু সয় না। তাই বলি, চোখের মাথা খা, নজর ফেরা। সব কিছু সইতে হবে, এমন হলপ তোমাকে কেউ করতে বলেনি। সায়া শাড়িতে পায়ের কড়ুই অবধি ঢাকা থাকলেই, সকলের সব কিছু ঠিক হয়ে যায় না। হয়তো মেমসাহেবদের, হালের চাল বজায় রাখতে গিয়ে, জামা একটু বেশি ছাঁটাই হয়েছে। যাদের যেমন চলে। ভারতবর্ষের এমন অনেক জায়গায় দেখেছি, পুরুষের কোমরের কাছে এক চিল্‌তে কানি। যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে, একটি অঙ্গই কোনো রকমে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। পীনপয়োধরাকে দেখেছি, বুকের কাপড়ে বালাই। হাট করে খুলে কোদাল চালাচ্ছে, নয় তো চাঁদের মুখে গুঁজে দিয়েছে। এতে আর দেশী বিদেশী চোখের কি আছে। যাদের যে রকম চলে। তোমার না সইলে, চোখ ফিরিয়ে নাও।

ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, চোখ তুলে তাকালাম। একজন বাইশ তেইশ, আর একজন পঁচিশ ছাব্বিশ। অনুমান এই রকম বলে। যদিও সেই কথাটা মানতে হয়, নানী আর পানীর বিষয়ে হক করে কিছু বলতে যেও না। তবে নানীদের বয়সের বিষয়েও না। নানীর মন, আর আশমানের পানীর মর্জি নাকি জবর ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপার। তেইশ যদি একহারা, পঁচিশ দোহারা। একহারা অর্থে রোগা না। ছিপছিপে ভাবের মধ্যে, স্বাস্থ্যের ঝলকে টলটলানো চোখদুটি ডাগর বলা যাবে না, তবে টানা ভাবের। একেবারে শান্ত না, যদিও নজরের ভাব-সাবে খুবই সহবত। কিন্তু মেঘের মতো কালো তারায়, কেমন যেন একটু চিকুর হানার উদ্যোগ হয়ে আছে সব সময়েই। এমন চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। কখন যে হেসে বেজে, খিলখিলিয়ে উঠবে, বা ঠোঁট যাবে বেঁকে, কিছুই বলা যায় না। নাকটি একটু বোঁচাই, তবে ল্যাপচা বুঁচি না। মুখখানি মিঠেই বলতে হবে, মেমসাহেবি ঝাঁঝ তেমন দেখি না। সে সব বরং পুরোপুরি পঁচিশেই ঝলকানো। দোহারা বলতে যা বোঝায়, তুলনায় তার থেকে, মাংসপেশির একটু যেন বাড়াবাড়ি। মোটা না হলে, নাক-চোখের ভাব-ভঙ্গি যথেষ্ট ধারালো হতো। চোখের তারা আশমানী নীল বলা যায় না, এছটু মার্জারির ভাব আছে। যাকে বলে, চন্‌মনে ভাব, সারা চোখে-মুখে, সেই ভাবটি বেশি। অঙ্গের ভাব-ভঙ্গিকেও যদি চন্‌মনে আখ্যা দেওয়া যায়, তবে তাই। রাঙানো ঠোঁটের কোণে কিঞ্চিৎ উপেক্ষার হাসি। নিশ্চয়

এই অ-সুখ অধমটির জন্যই। বেশ বুঝতে পারছি, বেঞ্চির এপারে ওপারে ঠোঁট টেপাটিপির খেলা চলেছে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকরুণ, এখনো আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। বোঝা গেল, বাকীদের এত চোখাচোখি, ঠোঁট টেপাটিপি সেই জন্যই। চুপ করে থাকা গেল না। সেই যে ভেবেছিলাম, আমি আপনার, তুমি আপনার, অতএব চুপচাপ, তা হবার নয়। নিরীহ বিনীত স্বরে বললাম, 'আমি আপনাদের মাঝখানে এসে পড়ে, নিশ্চয়ই অসুবিধে করে ফেললাম।'

ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে, অসন্তুষ্ট স্বরে বেজে উঠলেন, 'তা, তোমার যখন এখানেই টিকিটের নম্বর পড়েছে, অসুবিধে হলেই বা কী করা যাবে।'

'যখন এখানেই টিকিট' মানে কী? ঠাকরুণের কি ধারণা, মিথ্যা বলেছি? নিশ্চয়ই টিকিট দেখিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করতে হবে না। বলতে বলতে ঠাকরুণ বসলেন। দোহারা পঁচিশকে পাশাপাশি দেখে মনে হলো, এক রকম চেহারা। মা মেয়ে না হয়ে যায় না। ওদিকে আবার চোখাচোখি, ঠোঁট টেপাটিপি। কী অস্বস্তি বলো দিকিনি। একজন চেনাশোনা সঙ্গী থাকলেও, অস্বস্তি একটু কম হতো। যেন এখানে আমার জায়গা হয়ে, কী চোর দায়ে ধরা পড়েছি।

ঠাকরুণ ফটাস করে তাঁর হাতের ব্যাগ খুললেন। চটপট সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে, ঠোঁটে চেপে সিগারেট ধরালেন। নাক মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে, আমার দিকেই আবার তাকালেন। গালে একটা থাপ্পড় খেয়েছি, এমন ভাব আমার হয়নি। তবে নজর যে একটু খতিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতে গেলাম। সেই মুহূর্তেই ভারিক্কি গলায় প্রশ্ন, 'তুমি যাবে কোথায়?'

বললাম, 'গাড়ি যেখানে শেষ থামবে?'

'বম্বে?'

'বোম্বাই।'

কথাটা শুনে যেন ঠাকরুণের নতুন করে ধন্দ লাগলো আমাকে দেখে। ভ্রূকুটি করে তিনি আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপরে আমার ঝোলার দিকে, মার্জারি তারায় ইঙ্গিত হেনে বললেন, 'এত দূরের যাত্রায় এইটুকু তোমার ঝোলা?'

গলায় রীতিমত সন্দেহ। অবাক ছায়াটা এবার বাকীদের চোখেও, সেই সঙ্গে একটা রুদ্ধ হাসির ঝিলিক যেন চিকচিকিয়ে উঠছে। বললাম, 'একটা স্যুটকেস আছে, খাঁচায় চলে গেছে।'

ঠাকরুণ প্রায়, পুরনো রাজভাষায় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আরে স্যুটকেসে কী হবে? তুমি শোবে কিসে, তোমার বিছানাপত্তর কোথায়?'

তা বটে। তাঁদের বিছানাপত্রের যে রকম ছড়াছড়ি, বালিশে তোশকে চাদরে, সেই হিসেবে আমি তো রাস্তার ভিখিরি। বললাম, 'ঝোলার মধ্যে একটা চাদর আছে।'

'একটা চাদর!'

যেন এমন কথা ঠাকরুণ আর কোনোদিন শোনেননি। তিনি ধূমপান করতেও ভুলে যাচ্ছেন। আর আমার মনে হলো, পঁচিশের দোহারা শরীরে কেমন যেন একটু কাঁপন ধরেছে। সোনালী চেনের ঘড়ি বাঁধা হাতে, মুখে রুমাল চাপা। ঝকঝকে নীল তারা তিরিশের দিকে নিবদ্ধ। তেইশের মুখ, জানালা দিয়ে, প্রায় বাইরের দিকে। তবে রঙ পালিশ নখওয়ালা পাঁচটা আঙুল, তার ঠোঁটেও চেপে বসেছে।

এক তো, এখানে কেন রেল কোম্পানি আমাকে জায়গা দিয়েছে, সেটাই এক ঝকমারি। এখন বিছানা না থাকার কৈফিয়তও দিতে হবে। কী জ্বালা বলো দিকিনি। বলতে বাধ্য হলাম, 'ব্যাগটাই মাথায় দিয়ে শোব।'

'দু' রাত্তির?'

ঠাকরুণের কথা শেষ হবার আগেই কোন্‌দিকে যেন, সরু গলায় খিক্ করে একটু বেজে উঠলো। ঠাকরুণ তার পাশের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাণ্ডখানা দেখো।'

কাণ্ডখানা দেখবার জন্যই বোধ হয়, দুজনে চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপরে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে, একেবারে খিলখিলিয়ে বেজে উঠলো। হাসিটা ঠিক আমার মধ্যে সংক্রামিত হলো না।

অস্বস্তিতেই একটু আড়ষ্ট হাসি হাসতে হলো। আর মনে মনে কেমন যেন অবাক লাগছিল, কালা মানুষকে নিয়ে, ধলা মহিলারা আবার এত হাসাহাসি করে নাকি! মান যায় না! অবিশ্যি, ধলা মহিলাদের কোনো পরিচয়ই জানা নেই। দেখে এদের মেমসাহেব বলেই বুঝতে পারছি।

এবার আমার বেঞ্চি থেকে, শ্রীময়ী শান্ত তিরিশ, ঠাকরুণকে বললেন, 'ওর যখন কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, তখন আর বলার কী আছে।'

ঠাকরুণ এতক্ষণে আবার সিগারেটে টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। রুমাল দিয়ে, বিশাল ঘাড়-গর্দানের ঘাম মুছলেন। সেই সঙ্গে অনেকখানি

প্রসাধনও। বললেন, 'না, বলার আর কী থাকতে পারে। তবে এমন তাজ্জব ব্যাপার আমি কখনো দেখিনি। একটা লোক কলকাতা থেকে বম্বে যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটা চাদর ছাড়া আর কোনো বিছানা নেই। একটা ভিখিরিও এর থেকে বেশি বিছানা নিয়ে চলে।'

বুড়ি মোটেই বুড়ি না। তার ওপরে যাকে বলে মন্দ, প্রায় তাই। মুখে ক্যাটকেটে কথা। পুরুষ হলে বোধ হয়, এক মাত্র এই একটি অপরাধেই, আমাকে জোর করে নামিয়ে দিত। কিন্তু মহাশয়ার এত কথা বলবারই বা কী আছে। এ অধম ভিখিরি কিংবা রাজা আছে, তা নিয়ে ওঁর এত সমালোচনা কেন? গ্রীষ্মের দেশের মানুষ। ঘাস পেলে, ঘাসে গা এলিয়ে দিয়ে শুই। ঠাণ্ডা মেঝে পেলে, গা পেতে দিয়ে শুই। রেলগাড়ির এই গরমে, তোশক-বালিশের গরম যদি আমার ভালো না লাগে, তাতে ওঁর এত রোখা আওয়াজের দরকার কী? আমার দরকার নেই তাই, এ দেশের মানুষ তো, রাস্তার শানে শুয়েও আরামে চোখ বোজে। জঙ্গলের শুকনো পাতার ওপর শুয়ে, অঘোরে ঘুমোয়। মাঠের মানুষ, ঘরে ফিরে, লেপামোছা কাঁচা দাওয়ায় সুখে নিদ্রা যায়।

তিরিশের কী একটু দয়া হলো, জবাব দিলেন, 'তা বলে কি ওর আর বিছানা নেই মনে করছ! নিয়ে আসেনি।'

আমি প্রায় কৃতজ্ঞ হয়ে তিরিশের দিকে একবার তাকালাম। ঠাকরুণ দেখছি দমবার পাত্রী না। নিজের ভাষায় বললেন, 'সেটা আমি বিশ্বাস করছি, ওর বাড়িতে নিশ্চয় বিছানাপত্র আছে। কিন্তু তা বলে, এ ভাবে কেউ ট্রেনে চলে না।'

আমি আবার একটু না বলে পারলাম না, 'ভীষণ গরম তো, তায় আবার ট্রেনের কামরা। দরকার পড়বে না বলেই নিয়ে আসিনি।'

তারপরে তিনি যা বললেন, তাতে, আমার চেয়ে, আমার শ্রবণই অবাক বেশি। প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি থামো তো হে ছোকরা, মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত করো না। ছেলেদের এ রকম বাউণ্ডুলেবৃত্তি, আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

কথাগুলো বিদেশী ভিন্ ভাষায় নাহলে, মনে হতো, বাঙালী জাঁদরেল মহিলার ধমক। এবার তেইশ খানিকটা বিরক্ত আর অনুরোধের সুরে ডাক দিয়ে উঠল, 'মা।'

মা গলগলিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। আর ঠিক এ সময়েই, ঘণ্টা বাজলো, গার্ডসাহেবের বাঁশি বাজলো। গাড়ি দুলে উঠে, চলা শুরু

করলো। ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে, ঘাড়ের দু'দিকে আর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। সিগারেট খাওয়া, রাঙানো ঠোঁট জোড়াও যেন একটু নড়লো। আমি যেন শুনতে পেলাম, 'দুর্গা দুর্গা !'...

ভাষাটাই আলাদা। মনে বোধ হয়, সবাই এক। আমার মা যদি পাশে থাকতো, তাহলে নিশ্চয় কপালে হাত ঠেকিয়ে, দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করতো। ঠাকরুণের এও এক রকমের খৃষ্টানী দুর্গা দুর্গা। তারপরে দেখলাম, বুকের জামার মধ্যে হাত গলিয়ে দিলেন! আবার বের করে নিয়ে এলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর ঈশ্বরের প্রতীক-চিহ্ন স্পর্শ করলেন। রক্ষা এই, বিছানা-প্রসঙ্গটা বোধ হয় গেল। কিন্তু তাঁর কথার ঝাঁজে যেন তেমন মেমসাহেবি বাজলো না, বরং বিপরীত। ভদ্রতার রীতিনীতি মাপকাঠির ওপরে, একটু যেন গায়ে পড়া শাসন ধমকের সুর। যে-মুখ দেখে, এতক্ষণ জাঁদরেল সাহেবের ভিন্‌দেশী রোখপাকের ভয় লাগছিল, এখন আর তা মনে হচ্ছে না। হঠাৎ মনে হলো, বেশ-বাস রূপ আর আচার-আচরণ ভাষা বাদ দিলে, এ ঠাকরুণ একেবারে অচেনা না। এ মুখ, কোনো সংসারেই বিরল না। কেবল ওপরের ছাপটাতেই যা ধন্দ।

অবিশ্যি, মনের সঙ্গে, এত মিটমাট করে ফেলাও ভালো না। অন্ততঃ দুটো রাত্রি দুটো দিন, যতোক্ষণ না ভালোয় ভালোয় কাটে।

যাত্রীদের কথাবার্তায়, গোটা বগী কলকলাচ্ছে। এতক্ষণে একটু অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ পাওয়া গেল। তবে তাকাবার জায়গাই বা কোথায়। এ-গাড়ির ঘরের ছক আলাদা। একদিক দিয়ে যাওয়া-আসার সরু রাস্তা। বাকী সব খুপরি কাটা। মুখোমুখি তিন ধাপ তিন ধাপ, ছয় ধাপ শোবার জায়গা। এদিকের মানুষ ওদিকে দেখতে পায় না, ওদিকের মানুষ এদিকে না। একমাত্র যাওয়া-আসার সময় ছাড়া।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, স্বয়ং গণেশদাদা, যাওয়া-আসার রাস্তার ধারে, আমাদের সামনের জানালাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তার বেশি না নিঃসন্দেহে। মুখে যৌবনের কাঁচা ছাপ। গোঁফজোড়া যতো বড়ই হোক, তেমন শক্ত মোটা বাজখাঁই করে তোলা যায়নি। কিন্তু একটি কথা মানতে হবে। দাদার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মতোই প্রাগৈতিহাসিক। বয়সের গাছ-পাথর নেই। কারণ, গণেশদাদা এখন কেবল খালি গায়ে না। গরমের

জ্বালায়, ধুতিটিও হাঁটুর ওপরে উঠেছে। নিশ্চয় মেমসাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য না। তাদের ওটা ছাঁটকাটের পোশাক। আর গণেশদাদার পোশাকটা এখন পোশাকি চাল ছেড়ে বিকারগ্রস্ত। ঘামও কম বজ্জাতি করেনি। হাওয়ায় শুকোবার মুখে, এখন চুলবুলিয়ে উঠেছে। তাই গণেশদাদা ভুঁড়ি মুড়ি সব, দশ আঙুলে খসখসিয়ে চলেছে।

আমি একটু ভয়ে ভয়ে, ঠাকরুণের দিকে তাকালাম। যা ভেবেছিলাম, তাই। তার ভ্রূ-চক্ষে বিরক্তি আর ধরছে না। রাগে নাকের পাশ কুঁচকে উঠেছে। কটকটিয়ে দেখছেন গণেশদাদাকে। তারপরে তিরিশের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখেছো?'

সবাই একযোগে দেখলো, আর একযোগেই খিলখিলিয়ে বেজে উঠলো। ভেবেছিলাম, হাসির শব্দে, গণেশদাদা বুঝি একবার ফিরে তাকাবে। কিন্তু সময় নাহি রে, সময় নাহি রে। তাপ আর স্বেদ যে-জ্বালা দিয়েছে, এখন বাতাসের আরামে আর চুলকোবার সুখে, জগতের শ্রেষ্ঠ রূপসীদের মুক্তোঝরা হাসি বাজলেও, শোনবার সময় নেই। হাসিটা এবার আমার মধ্যেও সংক্রামিত হতে চাইলো। কিন্তু একেবারে বেজে উঠতে লজ্জা পেলাম। ঠোঁটের টিপুনিটা ঠেকানো গেল না।

তবে ঠাকরুণ যে ভাবে, তাকিয়ে আছেন গণেশদাদার দিকে, একটা কিছু বলে বসবেন বোধ হয়। কিংবা নাকি, লোকটার না ফিরে চাওয়াতেই, ঠাকরুণের রাগটা আরো বেশি ঝলকাচ্ছে। খিলখিলিয়ে বাজা হাসিটা এখন থামবার মুখে। ঠাকরুণ একবার সকলের দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন। ভাবখানা, গণেশদাদার মতো একটি জীবকে কি বলা যায়। তারপরে গণেশদাদার দিকে ফিরে, তিনি শুধু একটি তীব্র স্বরে মন্তব্য করলেন। যার মানে, 'একটা যাচ্ছেতাই!'

ঠিক এ সময়েই গণেশদাদা ফিরে তাকালো। প্রশ্নহীন নিরীহ চোখ-মুখ, কোন বিকার নেই। সকলের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখলো। হাত কিন্তু থামেনি। সে তার কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠে, তেইশের গায়ে ঢলে পড়লো, আমি তো চমকেই উঠেছিলাম। তারপরে অবাক হয়ে দেখি, স্বয়ং ঠাকরুণের বিশাল বপু খরথরিয়ে কাঁপছে। তাঁর শ্লেষ্মা জড়ানো গলায়, হাসি বাজছে খলখলিয়ে।

গণেশদাদার বোধ হয়, এবার একটা কিছু মনে হলো। তার নিরীহ চোখে, এবার একটু অবাক ভাব দেখা গেল। একটু বা জিজ্ঞাসা। হাসিটা চলেছে

সমান তালে। গণেশদাদার বোধ হয় আর আমাদের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হলো। কাপড়টা তেমনি গুটিয়ে ধরে, সে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলে গেল। যাঁহাতক যাওয়া, হাসিটা আরো উচ্চ রোলে ধ্বনি তুললো। সেই সঙ্গে, চোখে-মুখে রক্তের ছটা। কেবল ভাবতে পারিনি, ঠাকরুণের এই শরীরে আর এমন খাণ্ডার মুখের আড়ালে, এত রসের ধারা আছে। যেন বন্যার ঢেউয়ে বাজছেন। কোনো রকমে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'রোজা, ঈশ্বরের দোহাই, একটু থাম্। আমি আর হাসতে পারছি না।'

রোজা, অর্থাৎ পঁচিশ রুদ্ধশ্বাস হাসির মধ্যেই বললো, 'আমি কী করবো। ভাবলেই আমার হাসি পাচ্ছে। ওকে যদি আবার আমি ও ভাবে দেখি, তাহলে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

রোজার কথাতেই, হাসিটা আর একবার উচ্চ রোলে বাজলো। তেইশ বলে উঠলো, 'কিন্তু রোজা, তুই হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠেছিস, আমারই ফিক ব্যথা লেগে গেছে বুকের কাছে।'

রোজা বললো, 'কী করব বল্ লিজা। আমি নিজেকে সামলাবার জন্য' মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলাম। কিন্তু লোকটার মুখ দেখে, আমি আর কিছুতেই থাকতে পারলাম না।'

হাসির তোড়টা চলল সমানে। দমকটা আমার মধ্যেও প্রচণ্ড। কেবল শব্দটাকে গলার কাছে, আটকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। এখন চেষ্টা সার্থক হলে বাঁচি। এ রোগ বড় সংক্রামক। গণেশদাদার মুখটিই আমার বারে বারে মনে পড়ছে। ভাবতে ইচ্ছা করছে, এদিকে তাকিয়ে গণেশদাদা কী ভেবে চলে গেল।

কামরার অনেক মানুষের, অনেক কথার মধ্যে, মনে হচ্ছে যেন রাষ্ট্রভাষার ঝংকার বেশী। বাংলা পাঞ্জাবী কিছু কিছু। সেদিকে কান দিয়ে, নিজেকে একটু অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করলাম। চোখ তুলে, ওপরের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ছোট একটি চামড়ার স্যুটকেস। তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, মিসেস এম, গোমেজ। গোমেজ যদি পদবী হয়, তাহলে শব্দটা একেবারে অচেনা না। আগেও শুনেছি, অথবা কেতাবে পড়েছি। যতদূর জানি, এ পদবী ইংরেজের না। সঠিক করে জানি না, ডাচ না ওলন্দাজ না পর্তুগীজ। ভারতবর্ষে কেউ-ই এরা নয়া মানুষ না। অনেক কালের পুরনো। এরা নিজেদের ভারতীয় মনে করে কী না, কে জানে। কিন্তু ভারত ওদের কোনোদিক থেকেই রেহাই দেয়নি, রক্তে-মাংসে ঢুকে গিয়েছে। জন্ম মৃত্যু এই মাটিতে। ভারতবর্ষের বাইরে, কোথাও এদের পা রাখবার মাটি নেই।

যে-বেশে, যে-ইচ্ছা নিয়েই ওরা একদা এদেশে এসে থাকুক, ধন-রত্ন যা কিছুই নিয়ে গিয়ে থাকুক, নিজেদের ওরা সর্বাংশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। ওরা আমাদের রক্তে মিশেছে। আমরা ওদের রক্তে মিশেছি। একদা ওদের যতো নির্দয় রূপই থাক, মহাকালের প্রহারটা ওদের ওপর দিয়েও কম যায়নি। প্রকৃতি নিজের হাতে অনেক প্রতিশোধ নিয়েছে। ভারতবর্ষের ধুলায় ওরা কেবল নামে ভিন্ন হয়ে আছে, কিন্তু মিশিয়ে গেছে রেণু রেণু হয়ে।

গোমেজরা যদি পর্তুগীজ হয়, তাহলে ইংরেজের থেকে তারা আমাদের পুরোনো দিনের চেনা। ফিরিঙ্গি কাকে বলে, জানি না। ফিরিঙ্গি বললে, পাশ্চাত্ত্যের মানুষকে হেয় করা হয় কী না, তাও জানি না। কিন্তু অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নাম বাঙালীর কাছে, কবির নাম। কবিয়ালের নাম। নামেই একমাত্র ভিন্ন, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বাঙালী কবির নাম। খৃষ্টান বলে বিদ্রূপ করলে, কবির জবাব ছিল 'কৃষ্টে আর খৃষ্টে কিছু তফাৎ নাই রে ভাই/শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।'

রূপে রঙে যা-ই হোক, গোমেজরা আমাদের মতোই ভারতীয়।

পর্তুগালের সঙ্গে তদের কোনো পরিচয় নেই। জীবনে সে দেশের চেহারাও দেখেনি। সেই হিসাবে, ভারতের মতো এমন রূপের খেলা আর কোথায় বা আছে। এমন বর্ণবাহার কে কবে কোথায় দেখেছে। আমার দেশের সেই তো গৌরব।

আজকের ভারতবর্ষ, আগের তুলনায়, আমার কাছে দীন বলে মনে হয়। একদা তার ওপরে বিদেশীরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দখল করেছে, লুট করেছে, তারপরে যা নিয়ে গিয়েছে, দিয়েও গিয়েছে, কম না। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল, শেষ দখলদারের অনেক চাতুর্য ছিল। কিন্তু আজকের মতো ভয়াবহ খেলা, ভারতবর্ষকে নিয়ে, আর কখনো হয়নি।

দেওয়া-নেওয়া মিল-মিশের যে ভারতবর্ষ, সেখানে আজ কোনো দখলদারকে চোখে পড়ে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে যে সবাই দখল করে আছে, তলে তলে খাচ্ছে, তা নিষ্ঠুরতা'র থেকেও ভয়ংকর। সেই সব দখলদারের লুটের ধারা আলাদা। যুদ্ধের কানুন ভিন্ন তারা ভারতবর্ষের চরিত্রের ওপরে থাবা বসিয়েছে। দাঁত বসিয়েছে ধ্যান-ধারণায়। লোভে আর ইতরতায়, তারা সব থেকে বেশী সার্থক হয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে তারা ভারতকেই লেলিয়ে দিতে পেরেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে অসুস্থ ভারতের দিকে তাকিয়ে, ওদের মুখের নোংরা হাসিকে আড়াল করে রেখেছে।

তথাপি, দায় তো আমাদেরই। এখন আত্মীয়-বিরোধের সময়। জ্ঞাতি-বিরোধের কাল। এর শেষ চেহারাটা কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, কে জানে। পেরিয়ে যাবার, একটা নয়া পরিণতির পথে যাবার দায় আমাদেরই।...

'ওহে শুনছ?'

ঠাকরুণের গলা শুনে, ফিরে তাকালাম। আমাকেই ডাকছেন নাকি? ইতিমধ্যে হাসির তোড়টা থেমেছে। দেখলাম গোমেজ ঠাকরুণ আমার দিকেই ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে আছেন। দুই আঙুলের ফাঁকে, আর একটি সিগারেট জলছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলছেন?'

জবাবে বললেন, 'তুমি কি কালা নাকি? তিন চারচার করে ডাকছি।'

ধমকের স্বরটা ঠিক আছে। কিন্তু মানুষ বুঝতে বুঝি আর অসুবিধা নেই। তিন চারবার ডেকে সাড়া পাননি, দেড় হাত ফারাকে। লজ্জা পাবার মতো ব্যাপার। বললাম 'আমি একটু—'

আমার কথা শেষ হবার আগে তিনিই বেজে উঠলেন, 'বাড়ির কথা ভাবছিলে? অনেক দিনের জন্য যাচ্ছো বুঝি। ওখানে কি চাকরি করো? নাকি বেড়াতে যাচ্ছো?'

একে বলে পুছ করা। কত জবাব দেবে দাও। কথা কোন্ দিক থেকে আসছে, আন্দাজ পাচ্ছি না। বললাম, 'একটু বেড়াতেই যাচ্ছি।'

তারপরেই নতুন জিজ্ঞাসা এক পায়ে খাড়া, 'তুমি কি বাঙালী?'

মনে মনে বলি, গোটা চেহারা জুড়েই তো নামাবলী জড়ানো। এর পরেও আর জিজ্ঞাসা থাকে নাকি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'সে তো আমি আগেই বুঝেছি।'

তথাপি জিজ্ঞাসা। নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই বোধ হয়, যদিও কারণ কী, কে জানে। রোজা লিজা আর আমার পাশের তিরিশ এবং খোকাসাহেব সকলেই ঠাকরুণের কথা শুনছে, আর বাঙালীকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। রোজার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় লাগছে। লিজার দিকে চেয়েও বটে। ঠাকরুণের কথা শুনতে শুনতে, আমাকে দেখতে দেখতে, নিজেদের মধ্যে ওরা চোখাচোখি করছে। ওদের ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায়, একটা ঝর্ণাধারা যেন থমকে আছে। হঠাৎ ঝরঝরিয়ে যেতে পারে। গেলে, সেই তোড়ে, আমাকে যে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না।

লিজা বলে উঠলো 'মা এত বকবক করতে পারে।'

মা বলে উঠলেন, 'বকবক আবার কী। ও যখন আমাদের মাঝখানেই রয়েছে, তখন কথা বলতে দোষ কী।'

বলে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, আমার কথায় তুমি বিরক্ত হচ্ছ ?'

এর পরে জবাব দিতেই হয়, 'না তো।'

রোজা লিজা তিরিশের দিকে তাকালো। সকলের ঠোঁটেই হাসি। ঠাকরুণ বললেন, 'আমিও তো তাই বলি, বিরক্ত হবার কী আছে। আমি বাপু অত ভদ্রতা করে, চুপচাপ থাকতে পারি না। দুটো কথা বৈ তো না।'

ঠাকরুণ রাঙানো ঠোঁটের ফাঁকে, বাঁধানো দাঁতে হাসলেন। মেমসাহেব নিয়ে যে একটা দূরত্বের ভয় ছিল, সান্নিধ্যের অস্বস্তি ছিল, সেটা আমার কেটেছে। আর সত্যিই তো, দুটো কথা বৈ তো না। কথা তোমার দৌলত নেবে না, গায়ে পায়ে কষ্ট দেবে না। তবু কথাকেও যে বড় ভয়! দুটো কথা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে। কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়। পাগল করেও ছাড়তে পারে, কথার এমন গুণও আছে। কে জানে ঠাকরুণের কথার দৌড় কতখানি।

লিজা বললো, 'তবে চালিয়ে যাও।'

কথা শেষ হতে পেল না। একটু ছোটর ওপর দিয়ে, তিনজনেই খিলখিলিয়ে বাজলো।

ঠাকরুণ বললেন, 'মেয়েরা আমার বড্ড পেছনে লাগে, বুঝলে ?'

লাগে কী না জানি না। সম্মতির রূপ দিয়ে, একটু হাসতেই হয়। কিন্তু এত সব দেখবার অবকাশ ঠাকরুণের নেই। মেমসাহেব বলে যদি ভেবে থাকো, দিশী গিন্নীর ধরণ-ধারন বাদ, তাহলে ভুল। রোজা-লিজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এ দুটি আমার মেয়ে। রোজা আর লিজা। আর এটি আমার ছেলের বৌ মেরী। ওটি আমার নাতী বিল্।'

একে বলে পরিচয় পাড়া। যেমন তেমন ব্যাপার তো নয়। এর রীতিনীতি আছে। হাসতে গিয়েও, হাসিকে ঠেক দিয়ে, সকলেই আমার দিকে চেয়ে, মাথা ঝাঁকালো। মায়, বিল্ পর্যন্ত। সেই সঙ্গে, আমার মাথাকেও অনড় রাখা গেল না। হেসে ঝেঁকে, এবার আমাকেও প্রথানুযায়ী নিজের নামটি ঘোষণা করতে হল। ওদিক থেকে রোজা বলে উঠলো, 'আর ইনি আমাদের মা, শ্রীমতী মোনালিসা গোমেজ।'

গোমেজ ঠাকরুণ বেশ বড় করে হাসলেন। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, লিওনার্দোর আঁকা, মোনালিসার মুখ। মিল খোঁজার দরকার কী। একটা নাম তো মাত্র। গোমেজ ঠাকরুণ যে যৌবনে দেখতে নেহাত খারাপ ছিলেন না, তা রোজাকে দেখলেই বোঝা যায়। মায়ের সঙ্গে ওর মিলটা প্রায়, ভাগের অঙ্কে পঁচানব্বুই। আমাকে আবার একটু সহবতে বাজতে হলো, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে খুশি হলাম।'

গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'আমরাও। আর তোমাকে দেখে, ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে।'

রোজা ফিক করে হেসে ফেললো। বাকীরা নিঃশব্দে। আমার কিছু বলার নেই। ঠাকরুণ বললেন, 'না না, হাসির কথা না। এক একটা ছোকরাকে দেখলেই যেমন বাজে বলে মনে হয়, তোমাকে সে-রকম লাগছে না। এতখানি রাস্তা একসঙ্গে যাব। বাজে ছোকরা হলে, জ্বালাতন করে মারবে। আবার বোকো চুপচাপ হলেও খারাপ। তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। বোকা আর পাজী, কোনোটাই আমার ভালো লাগে না।'

যাক, অন্ততঃ ওই দুটি বিশেষণ ঠাকরুণ আমাকে দিতে চান না। একে বলে সার্টিফিকেট। যদিও বোকামি করে ফেলাটা আমার হাতে নেই। পেজোমিটা কাদের কাছে কী করলে হয়, তাতেও বিস্তর মতভেদ। কিন্তু এটুকু পরিচয়েই সব শেষ না। ঠাকরুণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সিগারেট খাও?'

এতক্ষণে সেই অবকাশই মেলেনি। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে বললাম, 'খাই।'

তিনি নিজের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমারটা নাও না।'

ততক্ষণে আমার প্যাকেট হাতে উঠে এসেছে। সেদিকে দেখে, ঠাকরুণ বললেন, 'তোমারটা অবিশ্যি অনেক দামী সিগারেট। তাহলেও, এখন আমার একটাই খাও।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

আমাকে দিয়ে, ঠাকরুণ পুত্রবধূ মেরীর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। মেরী জবাব দিল, 'ভালো লাগছে না।'

'আবার কি মাথা ঘুরছে নাকি?'

মেরী যেন একটু লজ্জা পেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না।'

ঠাকরুণ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার যে কত রকমের জ্বালা, সে তুমি না শুনলে বুঝতে পারবে না।'

লিজা বলে উঠলো, 'মা, সেজন্য ওঁকে জ্বালাতন করে লাভ কী ?'

আমি লিজার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না না, জ্বালাতনের কী আছে।'

লিজা মেরী আর রোজার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, মুখ ঘুরিয়ে নিল জানালার দিকে। বাতাসে ওর কালো চুলের গোছা, মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ঠাকরুণের দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি তখন শুরু করেছেন, 'আমার স্বামী থাকেন গোয়ায়। সেইখানেই আমাদের বাড় ঘর দোর। বেচারী বুড়ো মানুষকে একলা থাকতে হয় সেখানে। আমার তো থাকবার উপায় নেই। এক ছেলে থাকে বম্বেতে, আর এক ছেলে কলকাতায়। বোঝ তাহলে ব্যাপারটা। বছরে আমাকে অন্ততঃ একবার গোয়া বোম্বে কলকাতা করতে হয়। চারটিখানি কথা তো নয়।'

ঘাড় নেড়ে আমাকে সায় দিতে হয়, 'তা তো বটেই।'

ঠাকরুণের কথা থেকে শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তাঁর বড় ছেলে থাকে কলকাতায়। ছোট ছেলে বম্বেতে। দুজনেই চাকরি করে। রোজাকে নিয়ে, ঠাকরুণ ছোট ছেলের কাছে বম্বেতেই বেশি সময় থাকেন। লিজা প্রায় ছেলেবেলা থেকেই কলকাতাতে, দাদার কাছে থেকেছে। কলকাতাতেই লেখাপড়া করেছে। তবে কলকাতায়, এত চেষ্টা করেও, লিজার একটা চাকরি যোগাড় হলো না। বম্বেতে চলেছে চাকরির জন্য। রোজা সেখানেই চাকরি করে। মেরী যাচ্ছে বম্বেতে কয়েকদিন বেড়াতে।

যাদের যেমন। আমাদের মেয়েরা ডাগর হলে, বিয়ের ভাবনা। ওদের চাকরি। অবিশ্যি পালের বাতাসও এখন সেদিকেই বাঁক ধরেছে। তাই, সময়ের নাম দিশারী। কাল তার নিয়মে চলে। বেগটা তার অন্ধের মতো বটে। পরিবর্তনটা তার অমোঘ নিয়মে বাঁধা। কিন্তু ঠাকরুণের কথাটা সেইখানেই শেষ না। তারপরে, প্রায় একটা নালিশের স্বরে বেজে উঠলেন, 'কিন্তু আমার লিজাটা কলকাতায় থেকে, একেবারে বাঙালী বনে গেছে।'

লিজা মুখ না ফিরিয়েই, একটা অস্বস্তিকর আওয়াজ দিল, 'উহ্।'

এবার মেরীও ঠাকরুণের সঙ্গে যোগ দিল, 'সত্যি। লিজাটা যতো বাঙালী হয়েছে, আমি কোনোদিন ততোটা হতে পারিনি।'

লিজা এবার মুখ ফেরালো। চোখের কোণ দিয়ে, একবার আমার দিকে দেখে, মেরীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'সেটা খুবই স্বাভাবিক। বাঙালী পাড়ায় থেকেছি, বাঙালীদের সঙ্গে মিশেছি, আমার বেশির ভাগ বন্ধুই বাঙালী ছেলেমেয়ে।'

কথার শেষ লিজা আর একবার আমার দিকে দেখলো।

মেরী বললো, 'সে কথাই তো বলছি। তুমি অনায়াসে বাংলা বলতে পারো, ওদের খাবারও খেতে ভালোবাসো।'

বলে মেরী আমার দিকে তাকালো। লিজা যেন বিরক্তিতেই একটু হেসে ফেললো। আবার একবার আমার দিকে চাইলো। চোখাচোখি হতে, একটু যেন লজ্জা পেল। বাইরের দিকে মুখ ফেরালো। চোখ ফেরাতে একটু সময় লাগলো আমার। লিজার দিকে তাকিয়ে, আমার নজর যেন একটু নতুন চেনার খোঁজে উৎসুক হলো। নিশ্চয়ই বাঙালীদের সঙ্গে, বাংলায় কথা কয়ে আর খেয়ে, ওর চোখের তারা, চুলের গোছা কালো হয়নি? ওর শরীরের রঙেও যেন গোরা রঙের সেই ঝলক নেই। বাকিদের যেমন আছে। জানি না, এই দেখাটা, নিজের নজরকে খুশি করে, বানিয়ে দেখা কী না। ওর গোরা বর্ণে, কোথায় যেন একটা স্নিগ্ধ ছায়া আছে। ওর ছিপছিপে শরীরে যৌবন উদ্বেল না, উদ্ধত না। রোজার যেমন আছে। আগেই দেখেছি, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে লিজা যেন টলটলানো। মেমসাহেব-কন্যা হলেই, আমাদের মন একটু আন্ ভাবে। কিন্তু লিজার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওর ওই টলটলানো শরীরের মধ্যে কোথায় একটা গভীরতা যেন আছে। মনের গভীরতা। যদি বা ওর টানা চোখের কালো তারায় একটা ঝিলিক প্রায় লেগেই আছে। কালো মেঘ কখন চিকুর হেনে যাবে, বলা যায় না যেন। তথাপি, গভীরতার ছায়াটা হারিয়ে যায় না।

এ সব বাঙালীদের সঙ্গে মিশে হয়েছে, এমন কথা ভাবা একটা পাগলামি। ওর বাঙালীপনার কথাটা আমাকেই বিশেষ করে শোনাবার জন্য বলা হয়েছে কী না, জানি না। তবে মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। কথাটা জেনে যে আমার একটা খুশির ঝলক লেগেছে, তার কী উপায়। মনে তো আর ইচ্ছে করে ঝলক লাগানো যায় না। এখন আমার নতুন করে চোখে পড়ছে, ওর আশমানি রঙের জামার সঙ্গে মিলিয়ে, আশমানি পাথরের মালা রয়েছে গলায়। হাতে ঘড়ি নেই। দু'হাতেই আশমানি রঙের বালা। কানে একই রঙের দুটো গোল পাথর। টকটকে লাল রঙের মোটা দাগে দাগানো ওর ঠোঁট না। অন্যদের যেমন আছে। অনেকটা স্বাভাবিক রঙের প্রলেপ দেওয়া। চোখের কাজলটাও ঘন।

কিন্তু চোখের মাথা না হয় খেয়েছি। মনের মাথাও কি খেয়েছি। এতক্ষণ ধরে চোখ ফেরাতে ভুলেছি, হঠাৎ লিজা আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

ভুরু গিয়েছে একটু লতিয়ে, চাউনিতে বিস্ময়। লজ্জা পাবার কথা আমারই। চোখাচোখি হতে, লজ্জার রঙটা ওর মুখেই আগে ফুটলো। ঝটিতি আবার মুখ ফেরালো। ইতিমধ্যে লজ্জাটা আমার মস্তিষ্কেও বিঁধে যায়। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, ঠাকরুণের কথায় কান দিই।

ঠাকরুণ তখন বলে চলেছেন, 'মেয়ের সে কি কান্নাকাটি আসবার সময়। যতো পাড়ার মেয়েরা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, ও ততো কাঁদে।'

লিজা যেন এবার একটু রুষ্ট হয়েই মুখ ফেরালো। বললো, 'মা, প্রসঙ্গটা বদলালে হত না?'

ঠাকরুণ তখন নিজের কথার তোড়ে। লিজার কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'তবে আমি বলে দিয়েছি, কোনো বাঙালী ছেলে-টেলেকে যেন বিয়ে করতে যেও না। সে আমার ভালো লাগবে না।'

লিজা সরোষে আবার বাইরের দিকে মুখ ঘোরালো। শোনা গেল, 'অসম্ভব!'

রোজা ওর নীল চোখে ঝিলিক দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে হাসলো। হাসিতে যেন একটু ঠাট্টার খোঁচা আছে। মেরী মাথা নামিয়ে হাসছে। কিন্তু গোমেজ ঠাকরুণের বাঙালীর প্রতি এমন অকরুণ মনোভাব কেন? সংস্কার নাকি? সেই একই কথা। মন গুণেই ধন। কথাটা একটু লাগলো বৈ কি।

সবাইকে চুপচাপ থাকতে দেখে, গোমেজ ঠাকরুণের বোধ হয় হঠাৎ কিছু মনে হলো। বললেন, 'তুমি আবার কিছু মনে করলে না তো?'

হেসে বললাম, 'না।'

ঠাকরুণ বললেন, 'বাঙালী মানে তো হিন্দু। ঝোঁকের বশে যদি একটা কিছু করে বসে, তারপরে হয়তো দেখা যাবে, বনিবনা হলো না, বুঝলে না?'

তা বুঝেছি, কিন্তু না বলে পারি না, 'বাঙালী কেবল হিন্দুই হয় না। খৃষ্টান মুসলমান সবই আছে।'

ঠাকরুণ একটু ঢোঁক গিললেন। বললেন, 'তা হয়তো আছে। তাহলেও, তাদের জীবনের ধরণ-ধারণ তো আলাদা, সেই জন্যই বলছি।'

প্রসঙ্গটা বদলানোই ভালো। বিল্ এ সময়ে ঘোষণা করল, তার খিদে পেয়েছে। মেরী ছেলেকে খেতে দিতে উঠল। বিল্ উঠে এলো মেরীর কাছে। আমি গেলাম বিলের জায়গায়। ঝোলাটা টেনে নিয়ে খুলে, পত্র-পত্রিকাগুলো বের করে নিলাম। বইগুলো বের করে একবার দেখে নিলাম, ঠিক মতো আনা

হয়েছে কী না। তার মধ্যেই ঠাকরুণের কথা শুনতে পেলাম, 'আমরাও সবাই খেয়ে নিই, আর রাত করার কী দরকার।'

রোজার গলায় সম্মতি পাওয়া গেল, 'হ্যাঁ খেয়ে নেওয়া যাক।'

চোখ তুলতে গিয়ে, চোখ পড়লো লিজার দিকে। দেখি, আমার পত্র-পত্রিকা বইগুলোর ওপরেই ওর চোখ বাঁধা পড়ে গিয়েছে। আমি তাকিয়েছি, এটা বুঝতে পেরেই যেন একবার চোখের পাতা তুলে, আমার দিকে দেখলো। আবার চোখ নামিয়ে বইয়ের দিকে তাকালো। ঝোলার একেবারে নীচে থেকে টেনে বের করলাম চাদর। এই সময়ে নাকে গন্ধটা যেতে, ত্বরায় একবার না তাকিয়ে পারলাম না। আলু মেশানো শুকনো মাংস বড় টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে। বর্ণে গন্ধে তো কোথাও সাহেবী ব্যাপার ধরা পড়ছে না। তার ওপরে কী না, পাঁউরুটির সঙ্গে, একেবারে বেলুন-চাকিতে গড়া রুটি!

এ-সময়টা বসে থাকা দায়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি খাবার আনোনি?'

বললাম, 'না, ও-পাট মিটিয়েই এসেছি।'

মেমসাহেবের চেহারা আর ভাষাটা ছাড়া, কেবল যে দিশী সুরে বাজেন, তা না। একেবারে মা-মাসীর বয়ানে বাজেন, 'সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে একটু খাও না!'

এমন মায়ের মেয়ে যে একটু বাঙালী ঘেঁষা হবে না, তা আশা করা যায় কেমন করে। বললাম, 'আমার একেবারেই ক্ষিদে পায় নি। অপনারা খান, আমি আসছি।'

কথা ষোল ধারায় বয়। কোনদিক দিয়ে আবার বইবে, কে জানে। বইতে না দিয়ে, তাড়াতাড়ি সরে যাই। কামরার অনেক জায়গাতেই খাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রুটি লুচি পুরি, রকমারি খাদ্যের গন্ধে বাতাস ভরা। যদিও এই রেলগাড়ির সঙ্গে, খাবার ঘর জোড়া লাগানো আছে। সেখানেও এতক্ষণে ভিড় লেগেছে নিশ্চয়ই। ভিড় বাড়াতে, কাল সকালে আমিও যাব।

গণেশদাদা তখনও খালি গায়ে। কাপড় হাঁটু ছাড়িয়ে, আরো বেশি ওপরে উঠেছে। গোছা খানেক পুরি তার সামনের রুপোলি থালায়। থালার এক পাশে কী জাতীয় তরকারী, বুঝতে পারলাম না। গণেশদাদা জোড়াসন করে বসেছে। মুখোমুখি কলাবউ। ঘোমটা দিয়ে মুখ তেমনি ঢাকা। তবে স্বামীকে খেতে দিচ্ছে, ভঙ্গিতে সেটা স্পষ্ট।

কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে, দরজা খুলে দাঁড়ালাম। ধুলার ঝাপটায় চোখ মেলে থাকা ভার। তবু বাতাস ছেড়ে সরে আসতে ইচ্ছা করলো না। কালো আকাশ তারায় ভরা। অন্ধকারে, কোনো কিছুই ভালো করে চোখে পড়ে না। তবু বোঝা যায়, চোখের ওপর দিয়ে মাঠ জঙ্গল চলে যাচ্ছে। কখনো বা হঠাৎ চকচকিয়ে উঠছে জলাশয়। চকচকিয়ে ওঠে কেন? অন্ধকারে কি জলের কোনো আলো থাকে। আসলে জল যেন আয়না। আয়না অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গ্রাম দেখা যায়। কে যেন আলো নিয়ে চলে দূর অন্ধকারে। শুধু আলোর কণাটাই চলে যায়। আর এখন যারা এইসব গ্রামে ঘুমায়, এই গাড়ির শব্দ কি তাদের কানে বাজে। তাদের কি ঘুম ভাঙায়?

নিজের জিজ্ঞাসায়, নিজেরই হাসি পায়। এই গাড়িটার মতো, মানুষ অবিরত, নানান বেগে আছে। সে কি কেবল এখন ঘুমায়? কেউ হয়তো এখন হিসাব নিয়ে বসেছে। রোগে শোকে দুঃখে ভুগছে কেউ। ক্রুদ্ধ ঘৃণায় ফুঁসছে কেউ। কেউ ক্ষতির ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। কেউ সুখে আত্মহারা, হয়তো বুকে নিয়ে তাকে সোহাগে ভাসছে। আর এই গাড়িতে আমরা চলেছি। মানুষ অবিরত, নিরন্তর।

চলেছি, এই শব্দে যেন নতুন করে আমার মাথায় ঝাপটা লাগল। পশরা নিয়ে চলেছি বিকোবার ডাকে। একে বলে কাজ। তথাপি মনের কোণে সেই কথাটা, যেন একটা ছোট কণার মতো পড়ে আছে। আর সবটাই ছলছলিয়ে তরতরিয়ে উঠছে চলার খুশিতে। নতুন দেশ নতুন মানুষের কাছে। যেন মনে হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে অনেক অজানা বিস্ময়। অনেক অচেনার মুখে চেনা হাসি। বহু বিচিত্র রূপের ঝোলা, এখনিই যেন আমার কানে বাজছে।

সেই গাজীর কথা আমার মনে পড়ছে। ঝোলা কাঁধে নিয়ে সে মুরশেদের নাম নিয়ে ফিরছে। নামেই সব। মুরশেদের নামের মজুর সে। নামেতেই তার ঝোলা ভরে, মনও ভরে। মুরশেদের নামের সে রঙিলা মজদুর। মুরশেদের সঙ্গেই তার যতো হাসি কথা বার্ত পুছ। সেই অনেকটা রথ দেখা কলা বেচার মতোই। দর্শনও হচ্ছে, ঝোলাও ভরছে। নামও হচ্ছে, মহাপ্রাণীও ঠাণ্ডা থাকছে।

আমিও কি তেমনি মুরশেদের নাম নিয়ে ফিরছি? এতবড় কথাটা বলতে

সহসা হয় না। নাম নিয়ে ফেরার মজুরি করবার মুরোদ আমার নেই। তবু যে-মন ঘরের বাইরে দেশান্তরি হয়ে ফেরে, নতুনের খোঁজে যায়, তাতেই তার ঝোলাতে, মজুরিও জুটে যায়। তবু যদি মুরশেদের মতো হতো, একের সঙ্গে আর এক বাধা, তাহলে না জানি কেমন হতো। নামে আর মজুরিতে ফারাক করা যায় না। রঙে রঙে মেশানো, আলাদা করে চেনা যায় না।

চলার নামেই মাতাল। কেন বুঝতে পারি না। মনে হয়, যুগ-যুগান্ত চলেছি। কার ডাকে, তাকে দেখতে পাইনি, চিনতেও পারিনি। সে কি বাইরে থেকে ডাকে, না আমার ভিতরে বসেই বাইরের ডাক দিচ্ছে, তা বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি, সেই ডাকের সঙ্গে, আমি আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। সন্ন্যাস নিইনি, আমি বৈরাগী না, বিবাগীও না, ঝোলার মধ্যে মজুরি ভরতে চেয়েছি। তথাপি জানি, মজুরির ঝোলায় যদি ফাঁক থেকে যায়, মনের ঝুলিটাকে শূন্য করে নিয়ে ফিরতে পারব না। চলার হিসাবের অঙ্কে, সুখের ভাগ কতোখানি, তার হিসাব করিনি। দুঃখের ভাগও না। কিন্তু সুখ দুঃখ মান অপমান, অনেক আলোয় কালোয় সেই হিসাবে ভার। যতো চলা, ততো দেখা। সবই নতুন করে দেখা, নতুন আবিষ্কারের মতো। সেই আমার মুরশেদের নাম। আমার নামে কামে এক হোক।···

ভাবতেই বড় একটা নিঃশ্বাস পড়ে। কেন বুঝি না। কেন দুঃখকে টের পাই না। তথাপি চলন্ত গাড়িতে, দাঁড়িয়ে, বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে, কী একটা টানা সুরের রাগিণী যেন বেজে ওঠে। আমার চিন্তার মধ্যে কি সেই সুর বাজে? জানি না। সেই সুর শুনেই যেন নিঃশ্বাস পড়ে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। এতক্ষণে নিশ্চয় গোমেজ পরিবারের খাওয়া সাঙ্গ হয়েছে। বাথরুমে যাওয়া-আসার ঘন ঘন সাড়া-শব্দে মনে হচ্ছে, অনেক পরিবারেই ভোজনের পাট চুকেছে। এবার শয়নের পালা। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে ফিরে যাই।

খুপরির কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। কেবল দাঁড়ানো না, একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরতে হলো। সকলেরই রাতের পোশাক বদলাবার পালা চলেছে। গোমেজ গিন্নীর বিপুল শরীরের ঊর্ধ্বাংশে একেবারে কিছু নেই। কিছু পরতে ব্যস্ত, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সেই হিসাবে, আমাদের গণেশদাদাই ভালো। বদলাবদলির মধ্যে নেই। কাপড়টা না হয়, টেনে, আর একটু তুলে নেবে। দেখলাম, সে বসে বসে বিড়ি খাওয়াতে ব্যস্ত। কলাবউ উলটো দিকে ফিরে খাচ্ছে, বোঝা যায়। উলটো দিকে এক সর্দারজী, আর সম্ভবত তার

গৃহিণী। বাকীরা ইতিমধ্যেই, তিনতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ খুপরির চেহারাই প্রায় এক রকম। কেবল দাঁড়িয়ে থাকা আর ঘোরা আমার আর এ্যাটেনডেন্ট গার্ডের।

আমি আবার গিয়ে দাঁড়ালাম শেষ প্রান্তের দরজার কাছে। কিন্তু দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, পিছন থেকে সরু গলায়, আমার পদবী ধরে ডাকতে শুনলাম। ফিরে দেখি বিল্ সাহেব। বললো, 'ঠাকুমা আপনাকে যেতে বললেন।'

বললাম, 'চল যাচ্ছি।'

দেখলাম, বিল্ চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'তুমি যাও, আমি দু' মিনিট বাদেই যাচ্ছি।'

বিল্ যেন একটু লজ্জা পেল। বলল, 'আমার এখানে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে।'

আমি হাত ধরে, বিল্‌কে কাছে টেনে নিলাম, যাতে ও বাইরের দিকে দেখতে পারে। বিল্ বেশি কথার ছেলে না, শান্ত চুপচাপ ছেলে। ওর বাবার ধারা জানা নেই। বোধ হয় ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হলো, ও কোন্ ইস্কুলে কোন্ শ্রেণীতে পড়ে। আর ওর কাছ থেকেই জানা গেল, ওর বাবা একজন বড় বিলাতি অফিসের কর্মচারী।

আমাদের কথার মাঝখানেই, রোজার আবির্ভাব হলো। বিলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ডাকতে এসে গল্প জুড়ে দিয়েছ?'

একটু যেন রুষ্ট স্বর রোজার। দায় নিয়ে বললাম, 'ওকে আমিই আটকে রেখেছি। এখুনি যাচ্ছি।'

রোজা আমার চোখের দিকে এক পলক তাকালো। ঠোঁটের কোণে একটু হাসলো। বললো, 'ওর মা ওকে ডাকছে।'

বিল্ পিসীর দিকে তাকালো। ওর নজরে যেন কেমন একটা ধন্দ আর সন্দ। বিল্ চুপচাপ শান্ত বটে। কিন্তু এবার ওর মাথা ঝাঁকানির মধ্যে একটা অন্য ভাব দেখা গেল। বলল, 'জানি, তুমি আমাকে ভাগাতে চাইছ।'

আমি অবাক হয়ে, ভাইপো আর পিসীর দিকে তাকালাম। রোজা বিল্‌কে ভাগাতে চাইছে কেন? রোজা চকিতে একবার আমার দিকে দেখে, বিল্‌কে বললো, 'মোটেই না। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে, তুমি এখন গিয়ে শোবে, যাও।'

বিল্ আবাধ্যতা করলো না। আমার হাত ছাড়িয়ে, পিসীর দিকে একবার দেখে, চলে যেতে উদ্যত হলো। রোজা বলে উঠলো, 'ওখানে গিয়ে কোনো বাজে কথা বলো না যেন।'

বিল্‌ কোনো জবাব না দিয়ে, বাঁক নিয়ে আড়ালে চলে গেল। এদিকে যতো ধন্দ, তখন আমার মনে আর চোখে। কী একটা ব্যাপার যেন রয়েছে। একেবারে নিরীহ ভাবে শুতে যাবার নির্দেশ নয় যেন।

রোজা আমার অবাকমুখের দিকে ফিরে তাকালো। একটু লজ্জিত হাসলো। বললো, 'কিছু মনে না করলে, আমাকে একটা সিগারেট দিন তো। মা আমার সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না, তাই আমার প্যাকেটটা নিয়ে আসা হলো না।'

তবু ভালো। তবে এমন ব্যাপার জীবনে দেখা ছিল না, জানাও ছিল না। ছেলে না, যুবতী মেয়ে, মাকে লুকিয়ে সিগারেট খায়, অভিজ্ঞতার বাইরে। আমি হেসে বললাম, 'এতে আর মনে করার কী আছে।'

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দিলাম। রোজা সিগারেট ধরিয়ে ওর মায়ের মতোই, নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। টানগুলোও বেশ বড় বড়, এবং তৃপ্তির। বেচারি! বোঝা গেল, এতক্ষণ বড় কষ্ট পেয়েছে। নেশার ব্যাপার। আমি আর ঠাকরুণ এতক্ষণ ধরে সিগারেট খেয়েছি। আর রোজা ছটফটিয়ে মরেছে।

আমি ওর সিগারেট খাওয়াই দেখছিলাম। শোবার পোশাক পরে এসেছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে, ফিক করে হাসলো। বললে, 'আপনার বোধ হয় পছন্দ হচ্ছে না?'

মনের দরজায় ছকে ছকে দরজা রেখে, কুলুপ এঁটে না রাখলে, অপছন্দের কী আছে। নিষেধ বলে তো কিছু নেই। চোখের দেখায়? তাতেই বা বাধছে কোথায়? এও একটা রূপ তো। একটা নতুন রূপে দেখা। বিশেষ, রোজার ধূমপানের মধ্যে, কোনো লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই। একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। নিজে ধূমপায়ী। ওর খাওয়া দেখেই বুঝতে পারি, তৃপ্তিতে ওর মহাপ্রাণীটি তর তর করছে। বললাম, 'অপছন্দ করব কেন। তাছাড়া এটা তো পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার না, নেশার ব্যাপার।'

তাও বলি, আমরা আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালীরা, এই সংস্কারটাই বা পেলাম কোথা থেকে, মেয়েদের ধূমপান নিষেধ? আমার তো ধারণা, যবে থেকে ভারতবর্ষে ধূমপান, তবে থেকে মহিলারাও তার সঙ্গে আছে। কেবল পুরুষ না। নেশার বস্তু, সকলের সয় না। সকলের মন টানে না। যাকে টানে, যার সয়, সে-ই খায়। তবে ঘর-গেরস্থালির ফাঁকে, গিন্নীর পক্ষে হুঁকা নিয়ে ঘোরা সম্ভব ছিল না। যার সম্ভব হয়েছে, সে হুঁকা নিয়ে বসেছে।

যার হয়নি, সে তামাক-পাতার রূপ ফিরিয়ে, রকম ঘুরিয়ে, মুখে দিয়ে চিবিয়েছে। দাঁত ঘষে লাগিয়ে রেখেছে। জর্দার দোক্তার তামাকে ধোঁয়া বেরোয় না বটে। নেশায় সবাই সবার জুড়ি! আমাদের মনের ছাপে, দেখতে সহবত।

আমার চোখের সামনে ভাসছে তিন কর্তা-গিন্নীর চেহারা। গ্রামীণ হিন্দু সম্পন্ন পরিবারের, কর্তার দুই গিন্নী। দুপুরের খাওয়ার শেষে, তিনটিতে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছেন। মিয়া-বিবির তো কথাই নেই। ঘরে ঘরে দেখেছি। মুশকিলটা আসলে অন্যখানে। মধ্যবিত্ত ভারতবাসী, নিজেদের পিছনটাকে চেয়ে দেখে না। পরের রুচি ধার করে ভাবে, এটাই ঠিক। তাই রোজাদের বেলাতেই বা দোষ কী? দুই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে খাওয়া, দেখতে চোখে লাগে। হুঁকার দিন যখন গিয়েছে, তখন আর এক রকম হবে। সেই তো কথা, সময় বড় মহাশয়, তার নাম দিশারী।

রোজা বললো, 'মা খুব রেগে যান। অথচ মায়ের সিগারেট চুরি করে খেয়ে খেয়েই আমি নেশা করতে শিখেছি।'

ওর হাসির সঙ্গে, আমিও বাজলাম। গত্ তো বাঁধা। কথা তো সেই একই। রোজা মায়ের ব্যাগ মেরে শিখেছে। আমরা বাবার পকেট মেরে।

রোজা আবার বললো, 'আমার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না, যান আমি আসছি।'

ঠিক এ সময়েই দেখা গেল, আড়াল থেকে বিলের হাসিমুখ উঁকি মারছে। পিসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, পিসী একটু ধমক দিল, 'এখনো যাওনি?'

সঙ্গে সঙ্গে বিলের মুখ সরে গেল। আমি হাসতে হাসতে, বিলের পিছু নিলাম। খুপরির কাছে আসতেই, ঠাকরুণ থর থর করে বেজে উঠলেন, 'অমন করে চলে যাবার কী দরকার ছিল? তুমি তো আমার ছেলের মতোই।'

শোনো কথা! এর পরেও, শ্রীমতী মোনালিসা গোমেজকে কে মেমসাহেব বলে ভাবতে বলবে। রূপে পোশাকে কথাতেই যা ভিন্। তা নইলে তো, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের এক বুড়ি! কিন্তু এতটা আবার আমার সইত না। না চলে গিয়ে কী উপায় ছিল। বললাম, 'ঠিক আছে।'

আমার জায়গায় বসতে বসতে দেখলাম, সকলেরই শোবার পোশাক পরা হয়ে গিয়েছে। মেরী এখন সিগারেট খাচ্ছে। আমি জায়গায় গিয়ে বসতেই, লিজা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে, একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন আমার পাশে রেখে দিল। আমি ওর দিকে তাকালাম। লজ্জার ছটা ওর মুখে। নীচু স্বরে বললো, 'একটু দেখছিলাম।'

আমি বইটা নিয়ে, বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'দেখুন না। আমার তো আরো আছে।'

লিজা আমার দিকে একবার দেখে, বইটা নিল। বললো, 'ধন্যবাদ।' মনে মনে বলি, তার দরকার নেই। কিন্তু লিজা আবার ফিরে তাকালো আমার দিকে। বললো, 'সব ম্যাগাজিন আর বইগুলো আমি দেখে নিয়েছি।'

এই সুযোগে ধন্যবাদটা ফিরিয়ে দেব কী না ভাবলাম। কিন্তু জবাব দিলাম, 'বেশ করেছেন।'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয়, আমার মনোভাবটা বুঝতে চাইলো। তারপর ম্যাগাজিনের পাতা ওল্‌টাতে গিয়ে, আবার আমার দিকে ফিরে তাকালো। কিছু যেন বলতে চাইছে আরও, বলতে পারছে না। ওদিকে বিল্‌ তখন একটা দোতলার টায়ারে উঠে পড়েছে শোবার জন্য। মেরী আর ঠাকরুণে কী একটা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

লিজা বললো, 'আমি অল্প-সল্প বাংলা পড়তে পারি।'

ওর চোখে লজ্জায় মেশানো খুশির ঝিলিক। বললাম, 'তাই নাকি? আমার কাছে বাংলা বই থাকলে আপনাকে পড়তে দিতাম।'

লিজা একটু অবাক চোখে তাকাল। তারপরে ওর চোখ পড়লো আমার বইগুলোর ওপর। একটু যেন দ্বিধার সঙ্গে বললো, 'একটা যেন দেখলাম।'

বিস্মরণের দায়ে, এবার আমারই অবাক হবার পালা। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ও, হ্যাঁ, একটা বই আছে বটে। ওটা যে এনেছি, একেবারে মনে নেই।'

লিজা হাসলো, বললো, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। লেখকের নামটা যেন কী আমি কখনো শুনিনি।'

এবার জবাব দিতে গিয়ে, আমারই গলার কাছে ঠেক। একটু কেসে নিয়ে বললাম, 'কালকূট'।

লিজা বললো, 'হ্যাঁ, কালকূট। কখনো নাম শুনিনি তো।'

হেসে বললাম, 'সেটা কালকূটের দুর্ভাগ্য। তবে এটাই লেখকের প্রথম বই।'

লিজার মুখে একটু সংকোচের ছাপ। বললো, 'আমি আর বাংলা বইয়ের কতটুকু জানি। পড়াশোনা তো সব ইংলিশ মিডিয়ামেই হয়েছে। বন্ধুদের কাছে বাংলা শিখেছি। কালকূট মানে কী?'

আবার আমার গলায় ঠেক। ঠেক না কাঁটা। বললাম, 'তীব্র বিষ।'

'তীব্র বিষ।' লিজার কাজল লেপা টানা চোখের কালো তারায়, অবাক ঝিলিকের সঙ্গে, ভয়ের ছায়া। জিজ্ঞেস করল, 'ভূতুড়ে বই নাকি?'

হায় কালকূট, কী তোমার নাম-মাহাত্ম্য। নাম শুনে গোয়ানীজ মেয়েটির ওই রকম ধারণা। এমন যার নাম, সে ভূতুড়ে বা ভয়ংকর কিছু ছাড়া লিখতে পারে না। বললাম, 'যতোদূর জানি, সে রকম কিছু না।'

লিজা একটু অবাক রুষ্ট স্বরে বললো, 'এমন ছদ্মনাম আবার কেউ নেয় নাকি? বিচ্ছিরি!'

তা বটে! কালকূট আবার সুশ্রী কবে। কালকূট বলেই তো তার অমৃতের সন্ধানে যাওয়া। সে কথা এই গোয়ানীজ কন্যাকে বোঝানো যায় কেমন করে।

লিজা আবার বললো, 'আপনার আপত্তি না থাকলে, বইটা আমি আজ রাত্রে পড়ব।'

আমি বইটা নিয়ে ওকে দিলাম। এ সময়েই, ঠাকরুণের গলা শোনা গেল, 'ও হে শুনছ, একটা কথা।'

ফিরে তাকালাম। চমৎকার দেখাচ্ছে এখন গোমেজ ঠাকরুণকে। রাত্রের পোশাক হিসেবে উনি পরেছেন, ঢলঢলে লম্বা একটা শেমিজ জাতীয় পোশাক। পোশাকের রঙটা গেরুয়া। কাঁধ-কাটা না হলে, তাঁকে গেরুয়া আলখাল্লাওয়ালী বিশালবপু সন্ন্যাসিনী বলা যেত। বললাম, 'বলুন।'

বললেন, 'তোমার তো দেখছি, দোতলার টায়ারে শোবার জায়গা। কিন্তু তোমাকে তেতলায় উঠতে হবে বাপু।'

লিজা বলে উঠলো, 'কেন মা, ওঁকে কষ্ট দেবে। আমি আর রোজা তেতলায় শুতে পারব।'

এবার আমাকেই যেচে বাত্ দিতে হলো, 'না, আমি তেতলাতেই যাব, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

ঠাকরুণ কথার খেই ধরে নিলেন, 'ওই তো দেখ না, এ সব মেয়েদের ঘটে কোনো বুদ্ধি থাকলে তো।'

লিজার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হয়। এতে এমন বুদ্ধির কী থাকতে পারে, সেটাই বোধ হয় ওর জিজ্ঞাসা। তারপরে ঘাড়ে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে, বইয়ের পাতা ওল্টালো। এতক্ষণে আমার নিজেরই মনে হলো, গোমেজ ঠাকরুণ যে আমাকে প্রথমে দেখে রুষ্ট হয়েছিলেন, তার মধ্যে অনেক যুক্তি আর ভাবনা ছিল। একটি বালক আর চারজন মহিলা, তাদের মাঝখানে একজন অচেনা পুরুষ যাত্রী, অস্বস্তি আর বিরক্তি হবারই কথা। মেমসাহেব হলেও, তারা মেয়ে। একজন অচেনা পুরুষের সামনে কতো রকমের অসুবিধা

থাকতে পারে। এইটুকুনি ফাঁকের মধ্যে শয়ন উপবেশন। যে-কোনো মহিলা যাত্রিদের পক্ষেই, এটা একটা অস্বস্তির ব্যাপার।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই। কোম্পানি তার নিজের কাজ করছে। লোক দেখে বেছে, কাউকে কোথাও জায়গা দেওয়া হয়নি। গোমেজ ঠাকরুণের, যে ভাবেই হোক, আমাকে একটু নিরীহ বাঙালী ছেলে মনে হয়েছে। এখন আমাকে তাঁর 'ছেলের মতো' বলতেও আটকাচ্ছে না। সেইটুকুনই যা রক্ষে। অনেকখানি সহজ হওয়া গিয়েছে। কৃতিত্ব নিশ্চিত গোমেজ ঠাকরুণের। তিনি যেচে হেঁকে ডেকে কথা না বললে হতো না। তেতলাতেই তো আমাকে যেতে হবে। আরো উঁচু জায়গা থাকলে, সেখানেই যেতাম। যাতে গোমেজ পরিবার, নিজেদের মধ্যে থাকতে পারতো। তথাপি, মেয়েরা সবাই যাতে, একতলা দোতলায় থাকতে পারে, সেই ভেবে বললাম, 'বিল্‌কে তেতলায় দিন না।'

ঠাকরুণ বললেন, 'না, ছেলেমানুষ, এতটা উঁচুতে ওঠা-নামা করতে অসুবিধে হবে। রোজা না হয় লিজা, কেউ তেতলায় উঠবে।'

ঠাকরুণের যা মর্জি। শোবার পোশাক বদলানো দরকার। লিজাকে দেখছি, পোশাকি পোশাকের থেকে ওর শোবার পোশাকের বহর বড়। ডোরাকাটা ঢলঢলে পাজামার ওপরে, ডোরাকাটা ঢলঢলে লম্বা জামা। চুল টেনে আঁচড়ে নিয়েছে। এখন ঘাড়ের কাছে, গোছা করে রবার দিয়ে বেঁধে রেখেছে। গলায় আশমানি মালাটা নেই। বোধ হয় শোবার অসুবিধের জন্য।

রোজা এসে ইতিমধ্যে ঢুকেছে। মেরী মগ্ন হয়ে, কী একটা ছবির বই দেখছে। মনে হয়, বিদেশী কোনো অপরাধ-পত্রিকা। আমি বাথরুম থেকে ধুতি বদলে পায়জামা পরে এলাম। রাতের পোশাক এ-পর্যন্তই। মহিলারা না থাকলে, পাঞ্জাবীটাও খোলা যেত। মনের সায় নেই। ব্যাগটা তেতলায় তুলতে গিয়ে ঠেক খেলাম। আমার চাদরটা সেখানে বিছানো। এক দিকে একটা বালিশ। অন্যান্য তলায় তাকিয়ে দেখছি, সবখানেই বালিশ। তাহলে ভুল করে বা এমনি রাখা না। ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ। কিন্তু এখন আমার অস্বস্তি। আগেই ঘোষণা করেছি, ব্যাগ মাথায় দিয়ে শোব। ঘোষণার মধ্যে সত্যিও ছিল।

মেরীর গলা শোনা গেল, 'কী হলো?'

মেরীর দিকে ফিরে বললাম, 'বালিশটা কি আমাকে দেওয়া হয়েছে?'

মেরী তাকালো লিজার দিকে। লিজা মেরীর দিকে। গোমেজ ঠাকরুণ চোখ বুজে, বুকে হাত রেখে, চুপ করে ছিলেন। জবাব পাওয়া গেল তাঁর মুখেই, 'হ্যাঁ। আমার ডবল বালিশ থেকে, তোমাকে একটা দিয়েছি।'

তার মানে, উনি ডবল বালিশ ছাড়া শুতে পারেন না বলেই, বয়ে নিয়ে এসেছেন। এতে কেন আমি ভাগ বসাতে যাই। নিজের ব্যবস্থা তো নিজেই করে এসেছি। বললাম, 'কিন্তু আমার বালিশের সত্যি দরকার নেই। আপনি মিছিমিছি কষ্ট করবেন না, এটা আপনি নিন।'

গোমেজ ঠাকরুণ চোখ খুললেন। দৃষ্টিতে ঈষৎ বিরক্তি মেশানো। এবার প্রায় হুকুমে বাজলেন, 'শুয়ে পড়োগে যাও। আমার কষ্ট, আমি বুঝব।' —

আমি বাকী তিনজনের দিকে একবার দেখলাম। রোজা হেসে বললো, 'উঠে পড়ুন।'

গতিক সেই রকমই। বলাবলিতে আর কিছু হবে না। কিন্তু ওঠবার আর একটু বাকী আছে। চলার বেগটা এমনিই, একটা জলের পাত্র পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি। অবিশ্যি, কবেই বা তা নিয়ে বেরিয়েছি। কোনো রকমে চালিয়ে নেওয়া। একটু জল তো। সময়ে অশেষ মূল্যবান। কিন্তু চাইলে পাওয়া যায়। অন্যদিকে বোঝা যতো, ঝকি ততো। আমি মেরীর দিকে ফিরে বললাম, 'আমি একটু জল খাব।'

মেরী বললো, 'নিশ্চয়।'

সে বই ছেড়ে ওঠবার আগেই, লিজা বললো, 'জলটা আমার এখানে, আমি দিচ্ছি।'

ঠিক এ সময়েই ঠাকরুণের চোখ বোজা ঘোরটা কেটে গেল। উনি ঠিক ঘুমের ঘোরে ছিলেন না। মনে হয়, জপের ঘোরে ছিলেন। প্রায় হুমকি দিয়ে উঠলেন, 'ছোকরার দেখছি কোনো চালচুলো নেই। এত দূরের যাত্রা, একটা জলের পাত্র পর্যন্ত নিয়ে বেরোয়নি।'

বলবার কিছু না থাকলেও, আওয়াজ করলাম, 'না—মানে—'

'তোমার ও সব মানে রাখো। এ সব আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

প্রায় ধমক দিয়েই থামিয়ে দিলেন। লিজা আমার সামনে জলের গেলাস ধরলো। কিন্তু ওদিকে আবার ঠাকরুণ, কোন ধারাতে বহেন শোনো, 'তুমি কর কী বল তো? চাকরি-বাকরি করো, না ব্যবসা করো?'

জলের গেলাস তখন আমার হাতে। জল চলকে গেল একবার। তবেই তো বিপদ। কী করি, সে কথা গোমেজ ঠাকরুণকে কী করে বলব। সংসারে নানান কাজের মধ্যে, কাজের মানুষদের মধ্যে, নিজের কাজের কথাটা আমার বলতে ইচ্ছা করে না। সেটা সংকোচ না আর কিছু, নিজেও বুঝি না! সংসারে অনেকতরো কাজের মধ্যে, আমি যেন একটা মূর্তিমান অকাজ। সংসারে লোকে যাকে কাজ বলে জেনেছে, আমার কাজটা তাদের কাছে এমন বেখাপ্পা, অকাজের ছায়াটা তখন তাদেরই চোখে। বললাম, 'বলবার মতো কিছু না।'

বলে গেলাসে চুমুক দিলাম। ওদিকে চোখা জিজ্ঞাসা ঠাকরুণের গলায়, 'না বলবার মতোটাই শুনি। অবিশ্যি এ সব জিজ্ঞেস করতে নেই, জানি।'

জানেন, তবুও। কারণটাও নিজের মুখেই কবুল করেন, 'তা বলে তোমাকে জিজ্ঞেস করা যায়।'

লিজা বলে উঠলো, 'না-ই বা জানলে মা। উনি যখন—'

লিজার দিকে আমার চোখ পড়লো। একটু যেন বিরাগের ছায়া। সেটা ওর মায়ের ওপর না আমার ওপর, বুঝতে পারলাম না। আমি এবার মরিয়া হয়েই বলে উঠলাম, 'মানে, সত্যি কিছু করি না।'

গোমেজ ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে ঝামটা দিলেন, 'ও, বাপের ঘাড়ে আছ এখনো? আর বাপের পয়সায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, বেশি দামের সিগারেট ফুঁকছো?'

মিথ্যে কথার এই বদলা। নাও কতো শুনবে শোন। মেরী আর রোজা মিটিমিটি হাসছিল। কিন্তু লিজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে অবিশ্বাস। চোখে চোখ পড়তে, ও আমার হাত থেকে গেলাসটা নিল। আমি একটু চমকালাম। বললাম, 'তা না, মাঝে মধ্যে, খবরের কাগজে একটু আধটু লিখি।'

ঠাকরুণের তাতে তৃপ্তি নেই। বললেন 'তাতে আর কী হয়?'

প্রায় অপরাধীর মতো বললাম, 'ওই আর কি, কোনো রকমে—'

ঠাকরুণের আবার ঝটিতি ঝাপটা, 'বুঝেছি বুঝেছি, ফাঁকিবাজ ছোকরা। আমার ছেলে হলে, এ্যাদ্দিনে তোমাকে চাকরির জোয়ালে জুড়ে তবে ছাড়তাম। তারপরে খবরের কাগজে আর্টিকেলই লেখ, আর যা খুশি তাই করোগে।'

ঠাকরুণের মুখ বেশ গম্ভীর। আমার কথা বাড়াতে ভয়। তেতলায় ওঠবার উদ্যোগ করতে গিয়ে, আবার লিজার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। ওর চোখে

সেই অবিশ্বাসের ছায়া। অবিশ্বাসের সঙ্গে, একটা অনুযোগও যেন ফুটে রয়েছে। সম্ভবতঃ ওর ধারণা, ঠাকরুণকে আমি ইচ্ছা করেই মিথ্যে কথা বলছি। ও চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে বাংলা বইটা টেনে নিল।

ঠাকরুণের গলা আবার শোনা গেল, 'তবে ছেলেটা তুমি খারাপ নও মনে হচ্ছে। বাজে হাব ভাব বা বাজে বাজে কথা—'

লিজা হঠাৎ নীচু তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো, 'তোমার ভাবনাটা একটু কমাও মা। আমার আর এ সব ভালো লাগছে না।'

লিজার স্বরে এবং ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, যাতে ঠাকরুণকে বলতে হলো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে বাপু।'

তিনি বালিশ টেনে নিয়ে শোবার উদ্যোগ করলেন। রোজা আর মেরীও লিজার দিকে চেয়ে একটু গম্ভীর হলো। লিজা বই থেকে মুখ তুললো না। কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ স্বরটা, আমাকেই যেন কোথায় বিঁধিয়ে রাখলো। অথচ, না বলতে চাওয়ার অধিকার আমার আছে। সে কথাটা লিজাকে বোঝানো যাবে না। হয়তো, মায়ের খোলাখুলি কথা আর ব্যবহার ওকে সত্যি বিরক্ত করেছে। তথাপি আমি আমার মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না।

তবে, ওহে চল্‌চলিয়া মানুষ, মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি আদায় না করে তোমার উপায় কি? উচ্চ নীচ নানা সুরে বাজে বলেই, তাতে মীড় গমকের মূর্ছনা। নানা রঙে ঝলকায় বলেই, প্রকৃতির রূপ অরূপ হয়ে ওঠে। এক মনের সঙ্গে, আর এক মনের সুরে না বাজলেই তা অ-সুর হয়ে যায় না। সুরের সেও একটা ছন্দ। অতএব, তেতলায় চলো। ডানার ঝাপটায় দূরের ডাক, নতুনের হাতছানি। গাড়ির এ খুপরি, এই মানুষেরা পট বদলের আড়ালে চলে যাবে। তখন নতুন পটে আঁকা তুমি। জীবনের এইটুকু দান।

আমি তেতলায় উঠে গেলাম বইপত্র নিয়ে। নীচেও শোবার উদ্যোগ শুরু হলো। গোটা কামরায় অন্তত দুজনের নাক-ডাকাডাকির রেষারেষি চলেছে, সন্দেহ নেই। গ্রীষ্মকাল না হয়ে, শীতের দিন হলে, জানালাগুলো বন্ধ থাকতো। নাক ডাকার এই গর্জনে, গোটা কামরা কাঁপতো।

নীচে রোজা লিজা মেরীতে কী যেন কথাবার্তা হচ্ছে। বিল্ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকরুণ নিঃশব্দ। তেতলায় উঠে এলো লিজা। রোজা ওকে কোমরে হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছিল। লিজা বললো, 'আহ্, কী হচ্ছে, ঠেলতে হবে না।'

রোজা বলল, 'পড়ে যাস যদি।'

লিজা হেসে বললো, 'আমি তোর মতো ধুমসি না।'

রোজার গলা শোনা গেল, 'আমাকে তো তুই ওখানে উঠতে দিলি না, দেখতিস ধুমসি হয়ে তোর থেকে ভালোভাবে উঠতাম।'

মেরীর গলায় একটু হাসির শব্দ বাজলো। লিজা কোনো জবাব না দিয়ে, চোখের কোণে একবার আমার দিকে দেখে নিল। তারপরে চুলটাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে, চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। নীচে বসে, যতোটা কাছাকাছি মনে হয়নি, এখন হঠাৎ মনে হলো, যেন পাশাপাশি রয়েছি। আলাদা হয়ে গিয়েছি বাকী সকলের কাছ থেকে।

হঠাৎ আমার গায়ের কাছে একটা হাত উঠে এল। শোনা গেল, 'গুডনাইট।'

উঁকি দিয়ে দেখলাম, দোতলা থেকে রোজা হাত বাড়িয়েছে। আমি প্রত্যুত্তর করলাম। মেরী একটু হেসে শুভরাত্রি জানালো। আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরালাম। একেবারে নিঝুম না হলেও, বেশি রাত্রের চেহারাটা যেন জেগে উঠতে লাগলো। কথাবার্তা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। গাড়ির শব্দ, নাক ডাকার গর্জন ছাড়া, কোনো শব্দ নেই।

আমি ডুবে যাই আমার বইয়ের মধ্যে। রাত্রের ট্রেনে, কোনোদিনই প্রায় ভালো করে ঘুমোতে পারি না। বই আমার পরম সঙ্গী। যদি তেমন স্বজন পাই, তবেই পড়া চলে। আলো যে আবার সকলের সহ্য হয় না।

হঠাৎ এক সময়ে, কাছেই নাক ডেকে উঠলো। ডাকটা নীচে বাজছে। তাকাবার দরকার হলো না। শব্দটাই যেন বলে দিল, স্বয়ং গোমেজ ঠাকরুণের নাসিকানাদ। কিন্তু তার জন্য যে কারোর বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে, তা মনে হলো না। কারোর কোন সাড়া-শব্দ নেই। টের পেয়েছি, লিজা কয়েকবারই এপাশ ওপাশ করেছে। বইটা ওর হাত থেকে নামেনি।

এক সময়ে মনে হলো লিজারও আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে, ওর দিকে ফিরে তাকালাম। একেবারে চোখে চোখে দেখা। পাশ ফিরে শুয়ে ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বইটা বুকের কাছে ধরা, যেন শরীরকে আড়াল করার প্রয়াসে। ঘুম আসছে বোধ হয় ওর চোখে। আমি মুখ ফেরাতে গেলাম। আর গোমেজ পরিবারের সঙ্গে যতোক্ষণ আছি, তার মধ্যে এই প্রথম বাংলা কথা নীচু স্বরে শুনতে পেলাম, 'ঘুম করবেন না?'

একে বলে ভিন্‌ভাষীর বাংলা। না হলে, 'ঘুমোবেন না' শোনা যেত। দেখলাম, ওর পাশ ফেরানো মুখের একদিকে ছায়া, আর একদিকে আলো।

ঠোঁটে হাসি। ঘুম যে ওর টানা চোখের পাতায় ভর করেছে, টের পাওয়া যায়। বললাম, 'এখনো পায়নি। ট্রেনে ঘুমোতে পারি না। আলো নিভিয়ে দেব?'

'কেন?'

'আপনার ঘুমের অসুবিধে হবে, চোখে আলো লাগছে।'

'অসুবিধে হবে না। হলে ওপাশ ফিরে শোব।'

কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। একটু কষ্ট করেও যদি লিজা, কিছু রাত্রি অবধি পড়ার সুযোগ দেয়, বেঁচে যাই। শেষ রাত্রি অবধি জাগতে চাই না। নীচের মানুষদের চোখে তেমন আলো যাচ্ছে না। আমি এবার আর ধন্যবাদ দেবার সুযোগটা ছাড়লাম না। বাংলাতেই বললাম, 'ধন্যবাদ।'

বলে, বইয়ের দিকে মুখ ফেরাতে যাব, লিজা আবার ইংরেজিতে বললো, 'রাগ করছেন?'

প্রথমে অবাক হলাম। পরমুহূর্তেই ওর ঝাঁঝিয়ে ওঠার কথা মনে পড়ে গেল। লিজা নিজেও সেই কথাটা মনে রেখেছে। কিন্তু একবার যখন ধরতাই পেয়েছি, লিজার সঙ্গে সহজে আর ইংরেজি বলছি না। জবাব দিলাম, 'না তো।'

লিজা হঠাৎ কিছু বললো না। যেমন করে তাকিয়ে ছিল, তেমনি ভাবেই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার এতটুকু জবাবে, নিজেই যেন খুশি হতে পারলাম না। আবার বললাম, 'শুধু শুধু রাগ করতে যাব কেন? তেমন কিছু তো ঘটেনি।'

লিজা ইংরেজীতেই বললো, 'সেটা আপনার মনের উদারতা।'

আমি কথা বাড়াতে চাইলাম না। তাই চুপ করে থাকি। কিন্তু তাতেই কথা থেমে যায় না। লিজা বললো, 'কেউ যদি তার পেশা বা জীবিকার কথা বলতে না চায়, তার জন্য জোর করার কোনো মানে হয় না। মা কতো কী যা তা বলছিলেন। আপনার যথেষ্ট সহ্য।'

আমি লিজার মুখের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো শুনছিলাম। কিন্তু লিজা কথাগুলো বললো, অন্যদিকে চোখ রেখে। লিজা মেমসাহেব। এই বেশবাস ভাষা, আমাদের কাছে, চিরদিনই তা-ই। বিদেশী মহিলাদের সঙ্গে যে কখনো বাত করতে হয়নি, তা না। লিজা ভারতের মেমসাহেব। কথাগুলো এখন ইংরেজীতেই বললো। তবু মনে হলো, কথাগুলো যেন তেমন মেমসাহেবোচিত হলো না। ওর মা কী বলেছেন, আমার কতোখানি সহ্য, সেটা কি ওর

মাথায় বিঁধে আছে? আমি যেন ওর গলার স্বরে ভিন্ সুর শুনি। একে কি অভিমানের সুর বলে? বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে মেশার গুণ নাকি? কিন্তু বাঙালী মেয়েরাই কি আজকাল, এত সহজে, সহজ হয়? তাছাড়া, আমার কাজের কথায়, লিজার অবিশ্বাসটা, এত নিশ্চিন্ত কেন?

কথার শেষে লিজা আবার ওর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এলো আমার দিকে। বললাম, 'আমি আপনার মাকে প্রায় ঠিক কথাই বলেছি।'

'খবরের কাগজে আর্টিকেল লেখেন?'

আবার বাংলায় বললো লিজা। আমি জবাব দিলাম, 'নানান রকম লিখি।'

লিজা কোনো জবাব দিল না। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে, বইটা বুকের ওপর থেকে অসংকোচে তুলে নিল। তুলে নিয়ে বালিশের তলায় রাখলো। শুধু একটুখানি আড়াল সরে গেল বলেই যেন, ওর সমস্ত অবয়ব একটি নতুন রূপে জেগে উঠলো। ওর শরীরের স্নিগ্ধ নম্রতার মধ্যে, কোথায় একটা শক্তিও যেন জেগে আছে। নম্রতা আর শক্তি, এই দুয়ে মিলে, ও যেন সবাইকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে। দেখলাম, বইটা রাখতে গিয়েই, ওর কপালে চুলের গোছা এসে পড়লো। চোখে ছায়া পড়লো। ও উচ্চারণ করলো, 'লেখক।'

এটাই ও বুঝে নিল, কিংবা জিজ্ঞেস করলো, বুঝতে পারলাম না। তাই কোনো জবাব দিলাম না।

লিজার গলার স্বর আরো নীচু শোনালো, 'এ লেখক কি কোনো ছদ্মনামে লেখেন?'

আমার পরিষ্কার জবাব, 'না।'

আবার জিজ্ঞাসা, 'লেখক কি নিজের নামে লেখেন? সেই নামটা কি আমরা শুনেছি?'

আমার আবার পরিষ্কার জবাব, 'হ্যাঁ।'

নিরুপায় আমি। কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখবার দায়ে, এইটুকু মিথ্যার আশ্রয় আমার। লিজা একটু চুপ করে রইলো। তাকিয়ে রইলো। আমি মুখ ফেরালাম। একটু পরে আবার শুনতে পেলাম, 'মানুষের মুখ দেখে কি কিছু বোঝা যায়?'

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমি কোনো জবাব দেবার আগেই শেষ কথাটা ও বাংলাতেই বললো, 'শুভরাত্রি।'

শুভরাত্রি জানিয়েও, লিজা চোখ মেলে রইলো। তাকিয়ে রইলো অন্যদিকে। আমার আর কিছু বলার রইলো না। একটু পরে অন্যদিকে পাশ ফিরে শুলো। আমি আবার চোখের সামনে বইটা মেলে ধরলাম। কিন্তু মনের কাছে ফাঁকি

নেই। এই মুহূর্তে, বইয়েতে আর আমার মন নেই। লিজার মুখটা সেখানে দেখতে পাচ্ছি। আর সেই কথাটা, যে-কথাটা জিজ্ঞাসার স্বরে বাজলেও জবাব পাবার কোনো আশাই যেন ওর ছিল না।

কেন এমন করে বললো লিজা? ও কি আমার মিথ্যা বলার মধ্যে, অন্য কোনো বাজে সন্দেহ কিছু করছে? ও কি আমাকে নিতান্ত একজন মিথ্যুক বা শঠ ভেবে নিল? কী বলতে চাইলো ও?

সেই তো আবার এক কথা হে। কথা ফুল, ফোটে ঝরে। বাগানের মধ্য দিয়ে তুমি হেঁটে চলে যাও। মুগ্ধ হও, অবাক লাগে। তারপরেও অনেক ফুল, অনেক ঝরা। এক নিয়ে তোমার বসে থাকবার কী আছে। অস্পষ্ট অনামী অধরা ফুলও ঝরবে। তুমি চলে যাবে আপনার বেগে। সব কথার জবাব নেই। সব কথা সংসারে বোঝা যায় না।

আমি আবার বইয়ের দিকে চোখ ফেরাতে গেলাম। কিন্তু লিজার দিকে একবার তাকালাম। ও-পাশ ফেরা শিথিল শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। পাখার বাতাসে ওর চুল উড়ছে। রক্তিম পা দুটো জড়াজড়ি করে আছে।

ঘুম না পেলেও, এই মুহূর্তে আলো আর আমার ভালো লাগলো না। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম। গাড়ি এবারে সত্যি নিঝুম। নাসিকাধ্বনিও নেই। রাতের গাড়ি চলেছে সবেগে, সগর্জনে। সে কি কারোর তাড়ায় ছুটেছে কিংবা ছোটার বেগের ঘোরে, বুঝতে পারি না। গাড়িটাকে দেখলে একটা যান্ত্রিক শকট বলে যেন এই সময়ে ভাবতে পারছি না। এ যেন এক ভিন্ন সত্তা, অন্ধকারে বুক চিরে, ছুটে চলেছে। চলেছে, আরব সাগরের কূলে।

অন্ধকারেও জেগে ছিলাম অনেকক্ষণ। কতক্ষণ জানি না। দু' চারজনের জেগে ওঠা টের পেয়েছিলাম। বোধ হয়, একেবারে শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি। জেগে দেখলাম, স্বয়ং গোমেজগিন্নী, মেরী আর বিল্-এর পোশাক বদলানো হয়ে গিয়েছে। লিজা আর রোজা চা খাচ্ছে, মাটির ভাঁড়ে করে। ওদের দু'জনের পোশাক তখনো বদলানো হয়নি। হাতের কব্জি ঘুরিয়ে দেখি, সাতটা বেজে গিয়েছে। জেগে থাকার কিছুটা শোধ নেওয়া গিয়েছে। অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছি।

সবটাই ভালো। কিন্তু চলন্ত গাড়িতে, মাটির ভাঁড়ে গরম চা দেখে, আমার

রক্ত চনমনিয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই, একটু আগেই কোনো ইষ্টিশন ছেড়ে এলো গাড়ি। তখনই আমাকে দয়া করে ডেকে দিলে হতো। হতভাগ্যের কপালেও একটু চা জুটে যেত।

রোজাই প্রথমে সুপ্রভাত জানালো। সুপ্রভাতের পাট মেটবার পরে, গোমেজ ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাবে নাকি?'

কাল থেকে ঠাকরুণ অনেক সুরে বেজেছেন। কিন্তু এমন সরস সুরে আর বেজেছেন বলে মনে হলো না। আমার ভিতরটা যেন তলতলিয়ে উঠলো। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'আছে নাকি?'

ঠাকরুণ বললেন, 'এ কি তোমার বাউণ্ডুলে ব্যাপার? দেখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কী না, দাও তো মেরী।'

আমি সন্তর্পণে নেমে এলাম। মেরী আমাকে প্লাস্টিকের গেলাসে চা দিল। যথেষ্ট গরম, এখনো ধূমায়িত। না থাকবার কোনো কারণ নেই, ফ্লাস্কেই রাখা ছিল।

ঠাকরুণ বললেন, 'দেখি, আমি আর একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। ভুঁড়িওয়ালা ষাঁড়টাকে আমার কুচিয়ে কাটতে ইচ্ছা করছে।'

বলেই তিনি চলে গেলেন। বাকীরা সবাই হাসলো। মেরী আমার দিকে চেয়ে বললো, 'কালকের সেই লোকটা, যে এই জানালার কাছে খালি গায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।'

গণেশদাদার কথা নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করেছে সে?'

তিনজনেই হাসতে লাগলো। তারপরে রোজা বললো, 'লোকটা বাথরুমের দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারছিল, মা তখন ভিতরে।'

আমার চোখে অবাক জিজ্ঞাসা দেখে, রোজার মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। অস্বস্তিভরে বললো, 'মানে বুঝতে পারলেন না? লোকটার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল।'

মেরী আর লিজা একসঙ্গেই খিলখিলিয়ে উঠলো। ব্যাপার বোঝা গেল। গণেশদাদার সেই দুর্দশাগ্রস্ত চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কী দুর্গতি! ঠাকরুণের অবস্থাও অনুমেয়। ভুঁড়ি ফাঁসাবার ইচ্ছা তারপরে জাগতে পারে। বললাম, 'আরো তো বাথরুম ছিল।'

রোজা বললো, 'সবগুলোই যে বন্ধ। লোকটা তো পাগলের মতো দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে।'

হায় গণেশদাদা, পেটটি নাদা! গোপালভাঁড়ের গল্প আমার মনে পড়ে গেল।

কথায় বলে, এই একটি ব্যাপারে, বাঘের ভয় থাকে না। কিন্তু এদিকে দেখ, যা কাজ সে করে যাচ্ছে। আমার তিনতলার বিছানায় হাত বাড়িয়ে, রোজা অনায়াসে সিগারেটের প্যাকেট পেড়ে নিল। খুলে ধরালো। লিজা বলে উঠলো, 'এ কি রোজা, ওঁর সিগারেট খাচ্ছিস কেন?'

রোজা আমার দিকে তাকিয়ে, চোখের পাতা নাচিয়ে হাসলো। বললো, 'কাল রাত্রি থেকেই খাচ্ছি। খাব না?'

আমার দিকে চেয়েই জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

বিল্ বলে উঠলো, 'ঠাকুমা আসছে।'

রোজা চমকে উঠে, মুখ হাঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে দিল। মেরী হেসে উঠে বললো, 'কী দুষ্টু ছেলে, কোথায় ঠাকুমা আসছে?'

বিল্ কিন্তু হাসছে না। গম্ভীর নির্বিকার মুখে বাইরে তাকিয়ে আছে। লিজা হেসে উঠলো। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্, বিল্, তুমি রসিকতা জানো বটে। একটুও না হেসে, বিলের চুপ করে থাকাটাই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। লিজা বলে উঠলো, 'বেশ হয়েছে।'

রোজা বললো, 'বিল্টা সত্যি বড় দুষ্টু হয়েছে মেরী। ওকে এবার আমি ঠ্যাঙাব।'

মেরী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, ছেলের দিকে স্নিগ্ধ হেসে তাকালো।

বিল্ বললো, 'তুমি আমার পাওনা জিনিস এখনো দাওনি। কলকাতায় কী বলেছিলে?'

রোজা সিগারেট টানতে টানতেই, ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলো। পাওনার কথাটা বোধ হয় মনে করতে পারছে না। আর আমি দেখছি, বিল্ যতোটা চুপচাপ আর শান্ত, ওর ভিতরটা ততো টগবগিয়ে ফুটছে। শান্ত গম্ভীর মুখেই বললো, 'মনে করে দেখ।'

রোজা চমকে বলে উঠলো, 'ওহ্, সেই দূরবীন সিনেমা? কিন্তু পরশু তো তুমি কিছু বলনি?'

বিল্ বললো, 'আমি তো তোমাদের সঙ্গে বাজার করতে যাইনি।'

রোজা বললো, 'ঠিক আছে, বম্বেতে গিয়ে কিনে দেব।'

বিল্ কোনো জবাব দিল না। তবে বোঝা গেল, আপাততঃ এই চুক্তিটা সে মেনে নিল। সম্ভবতঃ আর রোজাপিসীর পিছনে লাগবে না।

রোজার সিগারেটও শেষ, ঠাকরুণও এলেন। এসেই তিনি নির্দেশ দিলেন, 'রোজা লিজা, তোমরা এবার সেরে নাও। পরের স্টেশনে, মেরী আর বিলুকে নিয়ে ডাইনিং কারে যাব ব্রেকফাস্ট করতে। তোমরা যাবে পরের স্টেশনে।'

বলেই তিনি বসবার জায়গা থেকে আয়না তুলে নিয়ে ঠোঁট-রঞ্জনী দিয়ে, হাঁ করে ঠোঁটে ঘষতে লাগলেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে সরে গেলাম। গতকাল রাত্রের অভিজ্ঞতা আছে। রোজা আর লিজার বাথরুম যাওয়া, পোশাক ছাড়া শুরু হবে এবার। নিশ্চয় কিছু সাজগোজও আছে। আমি ব্যাগটা হাতে করেই নিয়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত আমারই তাড়া লেগে গেল। দুই বোনের প্রস্তুতি-পর্ব সারতে সারতে, আমার বেলা চলে গেল। এদিকে পরের স্টেশন এসে যাচ্ছে। আমার একটু উপবাস-ভঙ্গের ব্যাপার আছে। এমন কি, জামা-কাপড় গুছিয়ে পরে, আমারও একটু ভদ্রস্থ হবার কথা। সব কাজগুলো ত্বরিতেই সারতে হলো। মাথাটা কোনো রকমে আঁচড়ে, ব্যাগ থেকে চোখের কালো ঠুলিটা বের করতেই, রোজা সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। দেখাদেখির ব্যাপার না। একেবারে চোখে আঁটাআঁটি। তারপরেই জিজ্ঞাসা, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

আমি বললাম, 'চমৎকার।'

অতএব, রোজা বললো, 'তাহলে আমিই পরি।'

লিজা ইতিমধ্যে আমার বইটা খুলে বসে ছিল। প্রায় গতকাল রাত্রের মতোই ওদের সাজগোজ। রঙেও 'এক'। কেবল লিজার কাজলটা কম। গলায় আবার মালাটা উঠেছে। লিজা বলে উঠলো, 'ও কি রোজা, ওঁরটা তুই পরবি কি? দিয়ে দে।'

রোজা বলে উঠলো, 'তুই যে কাল রাত্রে ওঁর সঙ্গে অতক্ষণ গল্প করলি, আমি কিছু বলেছি?'

লিজা হঠাৎ জবাব দিতে পারলো না। ওর মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। তারপরেই ভুরু কুঁচকে বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললো, 'গল্প আবার করলাম কোথায়। আমি তো দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

রোজা বললো, 'ওই হলো। ওটাকে গল্প করা বলে।'

লিজা একটু ঝাঁঝের ভান করে বললো, 'যা খুশি বলো গে।'

রোজা ওর চোখ থেকে, কালো ঠুলিটা খুলে বললো, 'পরবো না?'

আমি বললাম, 'কোনো আপত্তি নেই।'

তা হলেই হলো। রোজা চোখের পাতা নাচিয়ে আবার হাসলো। চোখে

টুলি পরে নিয়ে, জানালায় ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকালো। বুদ্ধির দিক থেকে কতখানি জানি না, বয়সের তুলনায়, ওর ব্যবহার লিজার থেকেও ছেলেমানুষিতে ভরা। ওর মনে কোনো দ্বিধা নেই, আমি কিছু মনে করতে পারি কী না। মনে করিনি, বরং রোজার এই ছেলেমানুষি চঞ্চলতায় খুশিই হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়, দুই বোনের জীবনকে দেখাটা দু-রকমের।

রোজা চঞ্চল, বোধ হয় একটু শিথিলও। লিজার মধ্যে যে গভীরতা আছে, ওর মধ্যে বোধ হয় তা কম। তাই রোজা সব কিছুতেই কম সতর্কও। এমন কি কথাবার্তাতেও। রোজা বোধ হয় খুঁটিয়ে দেখার চেয়ে, লহমার দেখাতেই সিদ্ধান্ত নেয়।

গাড়ির গতি আরো মন্থর হয়ে এলো। আমি লিজার কাছ থেকে একটু দূরে বসেছি। শুনতে পেলাম, ও বললো, 'আপনার নিশ্চয় এ সব ভালো লাগছে না?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ সব?'

'এই সব আর কি, মানে বাড়াবাড়ি যাকে বলে, সানগ্লাস নিয়ে টানাটানি—'

এবার আমি লিজাকে কথা শেষ করতে দিলাম না, 'আপনার বোঝাটা সব সময়ে ঠিক নয়, মিস্ গোমেজ।'

লিজা অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকালো। জানি না, আমার গলায় ঝাঁঝ ছিল কী না। আপত্তির সুর ছিল, সন্দেহ নেই। আমি আবার বললাম, 'প্রাণ খোলা মনকে বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। প্রীতি বন্ধুত্ব কে না ভালোবাসে।'

লিজার টানা চোখ দুটো, পলকের জন্য যেন একবার বড় হয়ে উঠলো। কোনো কথা না বলে, ও আমার দিকে চেয়ে রইলো। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। গাড়িটা দাঁড়ালো। রোজা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে বললো, 'দেখি, মা আসছে নাকি।'

ইস্টিশনের যাত্রী আর নানান ফেরীওয়ালাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আমাদের এ কামরার মধ্যে ওঠা-নামার ব্যস্ততা চলেছে। লিজা চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে। কোলের ওপর বইটা খোলা।

গোমেজ ঠাকরুণ ঢুকলেন। এসেই তাড়া, 'যাও যাও, তোমরা চলে যাও। রোজা চলে গেছে। দেখ গিয়ে আবার জায়গা পাও কী না।'

তাঁর পিছনে পিছনে মেরী আর বিলুও এল। লিজা উঠে, আমার দিকে একবার দেখে, এগিয়ে গেল। বইটা ওর হাতেই।

ঠাকরুণ মিথ্যা কথা বলেননি। খাবার বগীতে বেজায় ভিড়। উপবাস-ভঙ্গের জন্য, সবাই ব্যস্ত। একটুখানি না অপেক্ষা করলে, কোনো উপায় নেই। কিন্তু রোজা কোথায় গেল? লিজা আমার কাছাকাছি একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মতো আরো কয়েকজন অপেক্ষমান, আমাদের আশেপাশেই দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে, রোজা কোথাও নেই। আমি একটু অবাক হয়ে লিজার দিকে তাকালাম। লিজা আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'রোজাকে খুঁজছেন?'

বললাম, 'সে তো আমাদের আগে আগেই এলো।'

লিজা ঘাড় নেড়ে একদিকে ইশারা করে দেখালো, 'ওই তো।'

তাকিয়ে দেখি, বাঁদিকের তিনটে টেবিল পেরিয়ে, তিনজন যুবক সর্দারের সঙ্গে ও বসে গিয়েছে। এই দু-এক মিনিটের মধ্যেই, তাদের সঙ্গে ওর কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে। চোখের কালো ঠুলিটা ও খোলেনি।

এই বোধ হয় রোজা। ও অনায়াসে সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সুযোগের সদ্ব্যবহারের দায়ে, কারোর জন্যে অপেক্ষা করাও ওর ধাতে নেই। এক কথায় এটাকে আমি মন্দ বলতে পারি না। কেবল যে ক্ষিদের তাড়না, তা-ই না। সময় এবং জায়গার কথাটাও ভাবতে হবে।

এই সময়েই, আমার কানের কাছে বেজে উঠলো, 'ধুর শ্লা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেরে দিলেই তো হয়।'

এবার শোনো, বাত্‌ কাকে বলে। সোজাসুজি না তাকিয়ে, একটু সন্তর্পণে বাতওয়ালাকে দেখবার চেষ্টা করি। তার আগেই, আর একজনের জবাব শুনতে পাই, 'গাড়ির ঝাঁকুনিতে দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না। কিন্তু ওই অ্যাংলো ছুঁড়িটা তিন মেড়েলের সঙ্গে ভিড়ে গেল কী করে? ওকে তো আমি গাড়ি থেকে নামতে দেখেছি। বলতে গেলে আমাদের পরে ঢুকেছে।'

আপনা থেকেই আমার চোখ পড়লো লিজার দিকে। লিজা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ভেবেছিলাম ও রেগে উঠবে, অথবা গম্ভীর হয়ে যাবে। বাংলা কথা ও ভালোই বুঝতে পারে। কিন্তু দেখলাম, লিজার ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখেও ঝিলিকি। এবার আমি কথকদের দিকে ফিরে তাকাই। একেবারে নিখুঁত, যেমনটি ভাবা যায়। ছুরিমুখো জুতো থেকে, মুহুরিনালী পাতলুন, সব ঠিক আছে। কেবল, মাথার চুলটাকে কেমন করে কপালের কাছে, থুপি থুপি ভাবে সাজিয়ে রেখেছে, বুঝতে পারি না। আগে শুনতাম, সিঙাড়া পাকানো চুল। এ ঠিক সিঙাড়া না। এ যেন অনেকটা ঝোপঝাড় পাকানো।

সে না হয় হলো। সাজগোজের এটা একটা রকম। আমার ভয়, এদের বঙ্গভাষা, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে। আর একজনের জবাব শোনা গেল, 'ও তো আমাদের ঠেকে এগিয়ে গেল। দেড়েল ছোঁড়া তিনটে ওকে ডেকে নিয়েছে।'

অন্যজনের মন্তব্য, 'না না, আগে থেকেই প্ল্যান ছিল। দেড়েলরা এসে জায়গা রেখেছে।'

মনের মতো করে কথা বসাতে পারলে, মন খুশি। আমি ভাবি, এ কি ক্ষিদের জ্বালায়, না আর কিছু।

ইতিমধ্যেই আর একজনের কথা শোনা যায়, 'বেশ আছে মাইরি। একটু মোটা হলেও, জিনিস খাসা, না?'

কানে যেন ছুঁচের খোঁচা লাগে। ভাষার এমনি গুণ। কেবল কইতে জানলেই হয়। হয়তো এমন করে এতটা ছুঁচের মতো বিধত না। লিজা পাশে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য, খোঁচাটা বড় বেশি জ্বালা আর লজ্জা ধরানো। বিশেষ করে, ভাষাটা লিজার পুরোপুরি আয়ত্তে। আমার চোখ আবার লিজার ওপরে গিয়ে পড়লো। এখন লিজা আমার দিকে তাকিয়ে নেই। কিন্তু কোথাও ছায়া নামেনি ওর মুখে। চোখে তেমনি ঝিলিক। বরং হাসিটা চাপবার জন্য ওর ঝকঝকে দাঁত দিয়ে, নীচের ঠোঁট চেপে ধরেছে। দিশী ভায়ারা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, তাই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ততঃ লিজাকে দেখতে পেলে, তাদের মন্তব্য থামত কী না জানি না।

প্রশ্নের পরে, অন্যজনের জবাবটা আর পুনরোচ্চারণ সম্ভব হলো না। কোনো রকমে একবার চোখের কোণ দিয়ে, আমি লিজাকে আবার দেখে নিলাম। এবার লিজার মুখেও হঠাৎ রঙ লেগে গিয়েছে। একটি মেয়েলি গোপন লজ্জার তীব্রতায়, ওর চিবুকটা বুকের কাছে নেমে গেল। আসলে, আমার চোখ থেকে ও মুখটা লুকোতে চাইলো। কিন্তু আমি এখন রীতিমত আতঙ্কিত। রোজাকে নিয়ে দুজনের মন্তব্য অনেক দূর পৌঁছেছে। আর কতদূর যেতে পারে, কে জানে। একমাত্র উপায় হিসাবে, আমি হঠাৎ একটু গলা তুলে, বাংলায় লিজার সঙ্গে কথা বলে উঠলাম, 'মিস গোমেজ, আপনি বইটাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

ফল প্রায় হাতে হাতেই। দুজনেই দুজনের গলায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন পাশ ফিরে, আমার দিকে তাকালো। তারপর লিজার দিকে। লিজা এক মুহূর্তের জন্য অবাক হলেও, ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি করলো না।

জবাবটা ও বাংলাতেই দিল, 'হ্যাঁ, ডাইনিংকারের টেবিলে চা খেতে খেতে পড়ব বলে নিয়ে এসেছি।'

এবার দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। কী ভাবলো জানি না। দুজনে চোখাচোখি করলো, আরো ঘন হলো। একজন আর একজনকে কী যেন বললো, শোনা গেল না। যাক, অন্ততঃ ওদের গলার স্বরকে, না শুনতে পাওয়ার পর্দায় নামানো গিয়েছে। একজন আবার আমাদের দিকে ফিরে তকালো। তারপর দুজনেই একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। এবার ওদের কথা চললো প্রায় কানে কানে। লিজা আমর দিকে একবার তাকালো। ঠোঁট টিপে হাসলো। কোনো কথা বললো না।

ইতিমধ্যে, এক দলের উপোস-ভঙ্গ শেষ হলো। নতুন করে খাবার পরিবেশিত হতে লাগলো। আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি, তাদের জন্য সব টেবিলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সবাই উঠে দাঁড়াতে, ভিড়টা যেন বেড়ে গেল। গাড়ি এখন বেশ বেগে চলন্ত। কারোর নামবার উপায় নেই।

জায়গা খালি করে যারা দাঁড়ালো, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের জায়গায় বসলাম। আমাকে আর লিজাকে দেখে, রোজা হাতছান দিল। তিন সর্দার যুবক উঠে দাঁড়ালো। রোজা তাদের বললো, 'আপনারা যে আপনাদের টেবিলে আমাকে জায়গা দিয়েছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।'

তিন সর্দারই, ডগমগিয়ে, কলবলিয়ে উঠলো। ধন্যবাদের কোনো কথাই নেই মিস যে তাদের সঙ্গে বসেছিল, তাতে তারা খুবই খুশি ইত্যাদি। তারপরে সকলেই একবার লিজার দিকে উৎসুক সপ্রংস চোখে তাকিয়ে দেখলো। কেবল ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বাংলা মার্কা লোকটার দিকে চেয়ে, তারা বুঝতে পারলো না, এ-জীবটি এমন দুটি ললনার সঙ্গে কেন। সর্দার যুবকদের বীরত্ব ব্যঞ্জক চোখ, আর যোদ্ধা-মুখের-ভাবটা সেই রকম।

তারা সরে যেতে, রোজা আমাকে ওর পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, 'এখানে বসুন।'

নারীর সাধে বাদ সাধতে নেই। আমি রোজার পাশে গিয়ে বসলাম। লিজা জানালা ঘেঁষে, আমাদের মুখামুখি বসলো। রোজা প্রথমেই বললো, 'দিন, একটা সিগারেট দিন, গাড়ি থামবার আগে খেয়ে নিই।'

আমি ওকে সিগারেট দিলাম। লিজা একবার এদিকে ওদিকে দেখে, হেসে বাংলায় বললো, 'আপনি অনেক কায়দা জানেন।'

'কায়দা?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব সামলে দিয়েছেন।'

'ও।'

আমি হেসে, একবার রোজার দিকে তাকালাম। লিজাও রোজার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। বললাম, 'এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

রোজা আমাদের দুজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে দেখছিল। বাংলা বুঝতে পারছিল না। অথচ আমাদের তাকানো থেকে, একটা সন্দেহ ওর চোখে ফুটে উঠছিল। বললো, 'লিজা, নিশ্চয়ই তোরা আমাকে নিয়ে কোনো কথা বলছিস।'

লিজা আবার ইংরেজিতে ফিরে গেল। বললো, 'হ্যাঁ, তোর কথাই হচ্ছে।'

রোজা বলে উঠলো, 'আর তা নিশ্চয়ই আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে?'

এ আবার আমার দায়। আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'মোটেই নয়।'

লিজা বললো, 'দুটো বঙালী ছেলে, দূর থেকে তোকে খুব প্রশংসা করছিল, আমরা শুনছিলাম।'

রোজা একটু অবাক সন্দেহে, একবার আমাকে দেখে নিয়ে, লিজাকে বললো, 'আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে?'

লিজা বললো, 'সত্যি।'

রোজা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি?'

লিজার মতো এত সহজে, কথাটা আমি কেমন করে বলি। আমি একবার লিজার দিকে দেখলাম। লিজা-ই আবার বললো, 'আমি বলছি, সত্যি। ওটা প্রশংসাই। সকলের প্রশংসার ভাষা এক রকম হয় না।'

বলে লিজা আমার দিকে তাকালো। লিজার কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো না। সকলের প্রশংসার ভাষা এক না। পরিবেশ মন আর রুচি, কথা তৈরি করে। কথার সুরও তৈরি করে। রোজাকে নিয়ে যারা কথা বলছিল, আসলে তারা রোজার প্রশংসাই করছিল। তারা জানত না, তাদের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে। তাদের প্রশংসার ভাষাগুলো খোলা কথা না, গোপন কথা। দুই জোয়ানে বলবে, তাও একটি মেয়েকে, সে কথা একটু অন্য রকম শোনাবে বৈকি। তবে ওই, বাংলা কী না, কানে কেমন খোঁচায়।

রোজা জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় তারা?'

লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় করবি নাকি?'

রোজা বললো, 'একটু দেখে তো রাখি।'

লিজা না তাকিয়ে বললো, 'ডানদিকে তৃতীয় টেবিল।'

রোজা মুখ তুলে সেদিকে তাকালো। বললো, 'ওরা তো আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সিনেমা আর্টিস্টের মতো সেজেছে ওরা। হাঁ করে আমার সিগারেট খাওয়া দেখছে।'

বলে, রোজা যেন লজ্জা পেয়েই হেসে উঠলো। এদিকে খাওয়ার পালা শুরু। ছুরি চামচ থালায় থালায়, ঠং ঠাং ঠক ঠক ঝণাৎকার। একটি গোটা বঙালী পরিবার দুই টেবিল জুড়ে। বোধ হয়, পিতা মাতা, তিন কন্যা দুই পুত্র। রকমারি মানুষের ভিড়। কালো পুরুষের ধলা বিবি পর্যন্ত।

খাওয়াও একটা আসর। একটা মেলার মতো। মেজাজ মন যদি মানে, তবে চলন্ত গাড়িতে, এও এক রূপ। মানুষ প্রকৃতি দেখতে, জীব তাড়নার নিবৃত্তি। ইতিমধ্যেই, বাইরের রৌদ্রে বেশ ঝলক দিচ্ছে। গতকাল রাত্রের সেই প্রকৃতি আর নেই। এখন কেবল মাঠের পরে মাঠ, কিন্তু সবুজের ছায়া খুব কম। গাড়ি উত্তরপ্রদেশ দিয়ে চলেছে। মধ্যপ্রদেশের দিকে তার লক্ষ্য। মাঠ এখন ধুলা ঢ্যালায় ভরা। কোথাও কোথাও স্বল্প চাষের চিহ্ন। জলাশয় কম। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে, নজর চমকে দিয়ে চলে যায়। তারই মধ্যে কোথা থেকে সহসা জেগে ওঠে, সবুজ মাঠ, আমবাগানের নিবিড় ছায়া। ছেলেরা খেলা করে। মাহষের পালের কাছে দাঁড়িয়ে, রাখাল ছেলেটা, রোজকার মতো, আজও অবাক হয়ে রেলগাড়ি দেখে। গাড়িটা চলে যায় বাগানের পাশ দিয়ে। ইঁদারা ঘিরে বস্তির ঝি বহুড়িয়া, জল তোলা ভুলে গিয়ে গাড়ির দিকে চোখ ফেরায়। পাখি ডাকে কি ডাকে না, কে জানে। কানে যেন বাজতে থাকে। পলকেই আবার তা হারিয়ে যায়, মাঠ জেগে ওঠে। ঘুরতে ঘুরতে, আমাদের সঙ্গেই যেন পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে।

এক সময়ে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এলো। রোজা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'লিজা, আমি যাই, তোরা খেয়ে আয়।'

লিজা বললো, 'ব্রেকফাস্ট শেষ হলেও আমি এখন উঠছি না।'

বলে ও আমার দিকে একবার তাকালো। গাড়ি দাঁড়ালো। উপবাস-ভঙ্গের আমরাই শেষ দল। গাড়িটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি হাত চালালো, যাতে এই স্টপেজেই কামরায় ফিরে যেতে পারে। লিজা আমার পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে বললো, 'কামরায় ফিরে যাবার তাড়া নেই তো?'

বললাম, 'তাড়া আর কী।'

গাড়ি ছাড়বার আগে, অধিকাংশ লোকই খাবার পাট চুকিয়ে নেমে গেল।

কেবল দুটি টেবিলে, দুজন একলা বসে রইলো। গাড়ি ছাড়বার মুখেই, লিজা বাংলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার মন ভালো আছে ?'

বললাম, 'মন খারাপ তো কখনো হয়নি।'

লিজা একটু হাসলো। বললো, 'তখন রোজার কথা বলতে, আপনি বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েছিলেন ?'

বললাম, 'বিরক্ত হইনি, আপনার কথায় আপত্তি করেছিলাম।'

লিজা এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে, হাতের রুমাল দিয়ে, আল্তো করে ঠোঁটে চাপলো। ঠোঁটের রঙ যেন ধুয়ে না যায়। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আর কোনো কারণে বিরক্ত হননি তো ?'

আমি জানি, লিজা কেন বারেবারে বিরক্তির কথা জিজ্ঞেস করছে। গতকাল রাত্রে, শুভরাত্রি জানাবার আগের কথাটা ও ভুলতে পরেছে না। মুখ দেখে মানুষের মন বোঝা যায় কী না, সে প্রসঙ্গে আমি যেতে চাই না। গতকাল রাত্রে, কথাটা বলেই, হঠাৎ শুভরাত্রি জানিয়ে, আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। নিজের সেই আচরণটা ওকে এখনো বিঁধছে। কিন্তু আমাকে তো কোথাও বিঁধে নেই। লিজার সেই কথাকে অমি ফেলে এসেছি, কাল রাত্রের সীমায়। বললাম, 'না।'

লিজা চা খেতে খেতে, তেমনি করেই ঠোঁটে রুমাল চাপলো। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপর বাইরের দিকে চোখ ফেরালো। জানালা খোলা। বাতাসের ঝাপটায়, ওর চুল উড়ছে। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, মুখের ভাব দেখে মনে হয়, দৃষ্টি বা মন, কোনোটাই বাইরে নেই। বাতাসের ঝাপটায়, ওর জামাটাও উতলা। যেন ওর সমস্ত শরীরে দুরন্ত ঢেউ লেগেছে।

আমি মুখ ফেরাবার আগেই, ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। বললো, 'কথাটা না বলে পারছি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কথা ?'

'কাল রাত্রের কথাটা।'

আমারও সেটাই অনুমান। আমি না চাইলেও, লিজার-না চেয়ে উপায় নেই। সেই হিসাবে, লিজাকে আমার মনে হয়, ওর কোনো কথাটাই হঠাৎ জন্ম নেয় না। ছিটকে আসে না। বলার পরমুহূর্তেই, তার সবটুকু শেষ হয়ে যায় না। আমি কিছু না বলে, ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

লিজা একবার ঠোঁট টিপলো, টেপা হাসির ভঙ্গিতে। বললো, 'রাত হয়ে

যাচ্ছিল, তাই কথা বাড়াবার ভয়ে আমি আর কিছু বলতে চাইনি। সে জন্য যেন আমাকে ভুল বুঝবেন না। তবে—'

লিজা থামলো। অকারণেই একবার মাথা নীচু করে, হাঁটুর কাছে জামাটা একটু টানাটানি করলো। আবার মুখ তুলে তাকালো। বললো, 'তবে কথাটা আপনাকে কোনো রকম আঘাত করবার জন্য বলিনি।'

এর পরে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, তবে কিসের জন্য ? কিন্তু আমি কিছু না বলে, ওর মুখ থেকেই শুনে যেতে চাই। যে-কথার কোনো দায়ই আমার নেই, সে-কথায় কথা মেশাতেই চাই না। লিজা ওর নিজের দায়ে বলুক।

কিন্তু লিজা হঠাৎ বললো, 'কথা বলছেন না যে ?'

বললাম, 'আমার তো বলার কিছু নেই। আপনার কথা শুনছি।'

লিজাকে এক মুহূর্তের জন্য গম্ভীর আর সন্দিগ্ধ মনে হলো। বললো, 'তবে, কথাটা আমার দিক থেকে আমি মিথ্যা বলিনি।'

এবার আমার ভুরুতে বাঁক, চোখে জিজ্ঞাসা। লিজা থামলো না, আমার প্রশ্নের জন্যও অপেক্ষা করলো না। বললো, 'কেন আমার এ রকম মনে হচ্ছে জানি না, কিন্তু নিজের সম্পর্কে আপনি সব সত্যি কথা বলেননি, এটা আমার ধারণা।'

লিজার গলার স্বরে এমন একটা আত্মবিশ্বাস, যেটা ওর মুখেও ছায়া ফেলেছে। তথাপি ও একটু হাসবার চেষ্টা করলো যেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো, 'আপনাকে তার জন্য কিছু বলতে হবে না! সত্যি বা মিথ্যে, কিছুই না। আমার ধারণা তাতে বাদলাবে না।'

আমি ওর দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

লিজা ওর বাতাসে ঝাপটা খাওয়া মাথাটা নেড়ে বললো, 'জানি না।'

বলে, ও মাথা নীচু করে রইলো। রঙ-মাখানো নখ দিয়ে, টেবিলে আঁকি-বুকি কাটতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে, ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। পুরোপুরি একটি মেমসাহেবকে আমার সামনে বসে থাকতে দেখেও তাকে আমার চিরদিনের চেনা মেমসাহেব বলে মানতে পারলাম না। তাছাড়া, এখন ও বাংলায় কথা বলছে। কিন্তু এমন দৃঢ় ধারণা কেমন করে এলো লিজার মনে ? লিজা আমাকে আগে কোনোদিন দেখেনি। আমার কোনো পরিচয়ই ওর জানা নেই। পরিচয় আমি গোপন রাখতে চেয়েছি। নিতান্তই নিজের মনের স্বস্তির জন্য।

লিজা মুখ তুললো আবার। এখন ওর মুখে সহজ হাসি। সম্ভবতঃ ওর ভিতরে

একটা মানসিক উত্তেজনা চলছিল। উত্তেজনাটা আর কিছুই না। ওর বিশ্বাসের কথাটা আমার মুখের ওপর কোনো রকমে বলে ফেলার উত্তেজনা। সেটা ও কাটিয়ে উঠেছে. ওর মুখের স্বচ্ছন্দ হাসি দেখলেই বোঝা যায়। হেসেই বললো, 'কিন্তু এ কথাটা থাক, আর নয়। নিশ্চয়ই আপনার কোনো অসুবিধে আছে বলেই, বলতে পারেননি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মিস গোমেজ—'

লিজা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'আপনি আমাকে লিজা বলে ডাকুন। আমার কোনো বাঙালী ছেলে বা মেয়ে বন্ধুই আমাকে মিস গোমেজ বলে ডাকত না।'

আমি বাঙালী বটে, লিজার বন্ধু এখনো হয়েছি বলে, মনে করতে পারি না। সে কথায় এখন আর যেতে চাই না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আপনার এমন অটুট ধারণাই বা হলো কেন।'

লিজা বললো, 'বলেছি তো, জানি না, কেন।'

বলে এক পলক আমার চোখের ওপরে চোখ রেখে, ঠোঁটের কোণে হাসলো। বইটা টেবিলের ওপর থেকে. সামনে টেনে নিল। আর আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, লিজা নিশ্চয়ই ঈশ্বরী বা অন্তর্যামী না। হয়তো যে ভাবেই হোক, আমার পরিচয়টা ওর জানা আছে। তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি কোনো অপরাধ করবার জন্য মিথ্যা বলিনি। তথাপি, মনের মধ্যে কোথায় একটা অস্বস্তি খচ্ খচ্ করতে থাকে। এলোমেলো কৌতূহল, নিজেকেই বিব্রত করে তোলে। বিশেষতঃ লিজা যেন কেমন রহস্যময়ী হয়ে উঠলো আমার কাছে। ওর ঠোঁটের কোণের হাসিটা যেন অক্ষয় হয়ে রইলো। বইয়ের খোলা পাতায় ওর চোখ। কিন্তু ও যে বই পড়ছে, তা আমার মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আর কোনো চোখ দিয়ে. ও আমাকেই দেখছে। দেখছে আর মনে মনে হাসছে।

লিজা হঠাৎ চোখ তুললো, বললো, 'আপনাকে আর একটু চা করে দেব?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

লিজার এই আচরণটাও যেন রহস্য দিয়েই ঢাকা। বেয়ারা এলো এ সময়ে দুটো আলাদা বিল নিয়ে। আমি দুটোই তার হাত থেকে নিলাম। লিজা তাড়াতাড়ি ওর ব্যাগ খুলতে গেল। আমি হাত তুলে ওকে নিরস্ত করে, বেয়ারার হাতে টাকা দিলাম। বললাম,'সবটাই নিজের হাতে নেবেন না,কিছু ছেড়ে দিন।'

লিজা হেসে উঠলো। কেমন একটা খুশির ঝলক ওর হাসিতে। বললো, 'নিজের হাতে সব আবার কী নিতে গেলাম। আমি তো কিছু বলছি না। ছেলেরা ছেলেদের মতো ব্যবহার করলে আমার ভালো লাগে।'

কথাটা নিশ্চয় টাকা দেবার প্রসঙ্গেই। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।'

লিজা আবার বললো, 'আসলে, আমি একেবারে বাঙালী মেয়ে।'

বলতে বলতেই, ওর মুখে যেন একটা চকিত মেঘের ছায়া নেমে এলো। এক মুহূর্তের জন্য ওকে কেমন অন্যমনস্ক দেখালো। পরমুহূর্তেই আবার হাসলো, যদিও হাসিটা তেমন খোলতাই না। বললো, 'মা শুনলে খেয়েই ফেলবে।'

কথাটা বলে ও শব্দ করে হাসলো। এবার আমি একটু কৌতূহল প্রকাশ করলাম, 'আপনি কতদিন বাংলাদেশে আছেন?'

লিজার হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললো, 'অনেকদিন। আট বছর বয়সে এসেছিলাম, পঁচিশ বছরে পড়লাম।'

বয়সের হিসাবে, লিজাকে আমি তেইশ ভেবেছিলাম। কম দিন না। সতেরো বছর বাংলাদেশে থাকলে, সকলেই বাঙালী হয়ে যায় না। বিশেষ একজন গোয়ানী খৃষ্টান কন্যার পক্ষে। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত যাকে দেখলে মেমসাহেব ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু বাঙালী হতে যাদের ইচ্ছা করে, সতেরো বছর তাদের কাছে অনেকখানি। যাকে বলে ভেতো বাঙালী, সেটা হবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু লিজার এমন বাঙালী হবার সাধ হয়েছিল কেন? বাঙালী জীবনের ধারায় আর কোনো অমৃত আছে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা বলতে বলতে, লিজা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। এখনো তাকিয়ে আছে। ও এখন সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। ও এখন রেলের কামরায় নেই, ছুটন্ত তেপান্তরের বুকেও নেই। ও আছে ওর নিজের মধ্যে; একান্ত ওর সতেরো বছরের জীবনের কোথাও। একটু পরে, সেদিকে মুখ রেখেই, আমাকে শুনিয়ে বললো, 'আর জীবনে কখনো এ দেশে আসা হবে কী না, কে জানে। একটা চাকরি যদি পেয়ে যেতাম।'

আবার একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে, ও আস্তে আস্তে কামরার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এলো। আমার দিকে চেয়ে, একটু হেসে, আবহাওয়াটা প্রসন্ন করতে চাইলো। আমি হেসে একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললাম, 'কিন্তু বাংলা দেশে চাকরি পাওয়াটাই তো জীবনের সব নয়।'

লিজা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি তেমনিভাবেই বললাম, 'নিশ্চয় একজন বাঙালীকে বিয়ে করে এখানে ঘর বেঁধে বসতেন না, তাহলে আপনার—'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না, হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ বেজে উঠলো ওর গলায়। মুখটা একবার আগুনের ছটায় ঝলকে উঠে, ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে

গেল। রুমাল ধরা হাতটা ওর মুঠি পাকিয়ে গেল, আর পাকানো মুঠিটা ওর ঠোঁটের ওপর জোরে চেপে বসলো। আমি অবাক হয়ে ডেকে উঠলাম, 'লিজা!'

লিজা কোনো কথা বললো না। বলতে পারলো না। ঠোঁটে চাপা মুঠির ওপরে আর একটা হাত চাপা দিল। যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে গলার ভিতরের কোনো শব্দকে, ঠোঁটের দরজায় আটকে রাখতে চাইছে। মুখ অনেকখানি টেবিলের কাছে নেমে গিয়েছে। ভালো করে আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওর গলা আর কাঁধের কাছে, পেশি আর শিরা কাঁপতে দেখে বুঝতে পারছি, ও যেন একটা তীব্র কান্নাকে চাপতে চাইছে, আর্তনাদকে দমন করতে চাইছে।

নিজেকে আমার কেমন অসহায় আর অপরাধী মনে হতে লাগলো। আমার কথার মধ্যে, ওকে আমি কোনোরকম আঘাত বা অপমান করতে চাইনি। তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আমি আবার ডাকলাম, 'লিজা, শুনুন। আমি ঠিক কী বলেছি—'

লিজার মাথাটা নড়ে উঠলো। কাঁধ এবং গলার শিরা আর পেশি স্থির হলো। ও এমন ভাবে বাইরের দিকে মুখটা টেনে নিয়ে গেল, ওর মুখের প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। কেবল ওর নীচু ভেজা স্বর শুনতে পেলাম, 'এক মিনিট', তারপরেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, লিজা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। বিস্ময় আর কৌতূহল, মেঘের মতো জমাট হয়ে উঠলো আমার মনে। কিন্তু আমি ওর সামনে থেকে উঠে পড়লাম। তাতে হয়তো ও অনেকটা স্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু আবার ওর গলা আমি শুনতে পেলাম, 'যাবার দরকার নেই, ঠিক হয়ে গেছে।'

বলতে বলতেই, ও আমার দিকে ফিরল। চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেও, সদ্য-কান্নার চিহ্ন দূর করা যায় নি। জলের গেলাসটা টেনে নিয়ে, একটু জল খেল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে, লজ্জা জড়ানো হাসি হাসলো, বললো, 'বিচ্ছিরি, কিছু মনে করবেন না।'

মনে করবার কি আছে না আছে, তাই তো বুঝতে পারছি না। সহসা বাঁধ ভেঙে, এই চকিত গলনের কারণ কী, তাই বুঝতে পারলাম না।

লিজা কিন্তু হাসিটা থামালো না, আর কথাগুলোও কেমন এলোমেলো শোনাতে লাগলো, 'মানে, কোনো অর্থই হয় না, পাগলামি। আপনি কী ভাববেন কে জানে?'

আমি জবাব দিলাম, 'কী ভাবব, আমি তাই বুঝতে পারছি না।'

আমার মুখ দেখে আর কথা শুনে, লিজার হাসিটা প্রায় খিলখিলিয়ে বেজে উঠলো। বললো, 'সত্যিই তো, কী আর ভাববেন। পাগলামি আর ছেলে-মানুষির জন্য, ভাববার কী আছে। যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই, আমি একটা যাচ্ছেতাই।'

যাচ্ছেতাই! লিজা একটা যাচ্ছেতাই! কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই ব্যাপার আমি কোনোদিন দেখিনি। একটি মেয়ের সহসা বাঁধ ভাঙলো, চোখ গললো। যেন তার বুকের থেকে শিকড় ছিঁড়ে কিছু উপড়ে আসতে চাইল। তারপরে সে লজ্জায় হাসলো, খিলখিল করে হাসলো, বললো, 'আমি একটা যাচ্ছেতাই!'

কিন্তু সেই তো কথা, মন গুণে ধন। শুধু এইটুকু শুনেই, এইটুকু দেখেই, আমার মনের সমস্ত কৌতূহলকে কি নিবৃত্ত করতে হবে? বুঝতে পারছি, লিজার মূলে কোথাও হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লেগে গিয়েছে। এখনো যে ও হাসছে, এটাকে আমি স্বাভাবিক হাসি বলে মেনে নিতে পারছি না। ওর চোখের রক্তিমতা এখনো যায়নি। যদিও, লজ্জা এখনো ওর মুখে চেপে আছে। সন্দেহ নেই, একটা কঠিন ব্যাপারকে, লিজা অত্যন্ত দ্রুত সামলে নিয়েছে। কিন্তু সেই কঠিন ব্যাপারটা কী?

লিজা আমার দিকে তাকিয়ে, নতুন করে যেন লজ্জা পেল। বললো, 'উঁহু, অমন করে তাকাবেন না, চোখ ফিরিয়ে নিন।'

আমি সত্যি সত্যি মুখ ফেরাতে গেলাম। ও আবার হেসে বেজে উঠলো, 'বা রে, সত্যিই আপনাকে তাকাতে বারণ করেছি নাকি!'

বললাম, 'তা জানি, সত্যি বারণ করেননি।'

লিজা বললো, 'চোখ থেকে সব মুছে ফেলুন। সব জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল।'

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। বললাম, 'বেশ।'

লিজা বললো, 'ইস, এমন করে বলছেন, যেন আপনি খুব শান্ত শিষ্ট ল্যাজ বিশিষ্ট, একটুও অবাধ্য নন, সব কিছু সহজেই মেনে নেন।'

বললাম, 'আমি তো তা-ই।'

'মিথ্যে কথা।'

লিজা কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললো। আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিলাম না। কয়েক পলক আমরা চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম। লিজা হেসে উঠলো। বললো, 'আপনি আমাকে একটা বোকা গোয়ানিজ মেমসাহেব মেয়ে ভেবেছেন, না?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গোয়ানিজ মেমসাহেবরা বোকা মেয়ে হয় নাকি?'

লিজা বললো, 'আপনি নিশ্চয় তাই ভেবেছেন, তা না হলে ওভাবে বলতেন না, আপনি তো তা-ই। আপনাকে আমি খুব চিনি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'খুব চেনেন?'

লিজা খুব সহজেই বললো, 'চিনি বৈ কি।'

বলে ঠোঁট টিপে, ওর টানা চোখের কালো তারায় ঝিলিক হেনে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। এ যে সেই নানী পানীর হাল হলো। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। আশমানের পানীর মর্জি আর নানীর মন বোঝা দায়। গোয়ানি গোরা মেয়েটা কী খেলা খেলছে। এখন আবার চেনাচেনির কথা বলছে। সত্যি চেনে নাকি! তাই কি তখন অত জোর দিয়ে বলেছিল, নিজের পরিচয়ের ব্যাপারে আমি সত্যি কথা বলিনি!

চকিতে লিজার দাঁত দেখা গেল, একবার ও নীচের ঠোঁটে আলতো দংশন করলো। তারপর ঘাড় দুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী মোশাই, কী ভাবছেন?'

এতক্ষণে চোখের জলের আতুর আবেশটা কাটিয়ে, লিজা সত্যি সত্যি ঝক-ঝকিয়ে উঠেছে। ওকে এই মুহূর্তে, খুশি আর ছলছলানো দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি সহজে মুখ খুলতে রাজী না। লিজাই বলুক, চেনাচিনিটা কেমন। ও নতুন করে আমার কাছে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। বললাম, 'ভাবছি না কিছুই। আপনার কথা শুনছি।'

লিজা বলে উঠলো, 'তবে শুনুন, আপনাকে আমি খুব ভালোই চিনি।'

'তাই নাকি? শুনে খুশি হচ্ছি।'

'তা জানি না, খুশি হচ্ছেন কী না, পরেও হবেন কী না। তবে জেনে রাখুন, কাল থেকে আজ এ পর্যন্ত আপনাকে যতটুকু দেখেছি, তাতেই আপনাকে আমি চিনে নিয়েছি।'

যাক, অন্ততঃ একটা কথা জানা গেল, চেনাচিনিটা কাল থেকে আজ এ সময় পর্যন্ত। আমি নিরীহ ভাবেই হেসে বললাম, 'না চেনার কী আছে বলুন? আমি তো মুখে মুখোশ এঁটে নেই।'

'আপনি মুখে মুখোশ এঁটে নেই?'

লিজার গলায় বিস্ময় আর কৌতুকের ঝলক বেজে উঠলো। চোখের কালো কালো তারা দুটি ঝিলিক হানলো। বললো, 'আপনি মুখোশ এঁটে নেই তো, পৃথিবীতে কে মুখোশ এঁটে আছে, হেই মোশাই?'

শেষের সম্বোধনটা ঘাড় কাত করে, এমন ভাবে ছুঁড়ে দিল, মনে হলো, লিজা ছাড়া আর কারোর পক্ষে বোধ হয় সম্ভব না। এই ভঙ্গি আর উচ্চারণের মধ্যে,

ও যেন একেবারে অন্য রকম একটা বিশিষ্ট সত্তায় জেগে উঠল। গলার স্বরে ওর একটু বিদ্রূপও মেশানো আছে। আমার হাসিও পেল, অবাকও হলাম। এমন অভিযোগ তো কেউ করেনি। সংসারে বা সংসারের বাইরে দশজনের সঙ্গে চলতে গিয়ে, দশজনের তালে তাল দিয়ে ফিরতে চেয়েছি। তার মধ্যে মুখোশ আঁটব কেন? বললাম, 'আপনার যা মনে হয় বলুন।'

লিজা হাত দিয়ে কপাল আর গালের কাছ থেকে চুল সরিয়ে বললো, 'আপনি শান্তশিষ্ট নিরীহ অমায়িক আর—আর কী যেন বলে—অসহায়। কিন্তু আমি বলছি, আপনি কোনোটাই নন।'

আমার মুখে হাসিটা লেগে রইলো, চোখে জিজ্ঞাসা। কোনো কথা বললাম না। লিজা টেবিলের ওপার থেকে, ওর মুখটা এগিয়ে নিয়ে এলো। তারপর গোপন কথা বলার মতো নীচু স্বরে বললো, 'গালাগালির অর্থে নেবেন না যেন। আপনি ধূর্ত নিষ্ঠুর দুরন্ত। আরো বলব?'

'বলুন।'

'তাহলে একটা কথা দিন।'

'কী?'

'আমাকে বন্ধু হিসাবে নিতে পারবেন?'

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। লিজাও তাকালো। লিজার চোখের কালো তারায় একটি নিবীড় ঔৎসুক্য আর জিজ্ঞাসা। তার ওপারে, আরো গভীরে কি আমি আরো কিছু দেখতে পাচ্ছি লিজার চোখে? লিজার কালো দুটি নিশ্চল তারা। সহসা যেন সেই চোখের তারায় আরো দুটি তারা দেখতে পেলাম। যে-তারাদুটিতে রুদ্ধ কান্না থমকে আছে। গভীর একটা ব্যথায় ভরে আছে। তীব্র যন্ত্রণায় অনেক খোঁচাখুঁচির দাগ লেগে আছে। কাজল টানা চোখের তারায় তা ধরা পড়ে না। এই চোখের ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে যেন সামনের এই রূপে, এই বেশ-বাসে চেনা যায় না। চলতে ফিরতে, কথায় হাসির ঝিলিকে, তার কোনো পরিচয়-ই ধরা পড়ে না। কারণ, সে যে কথা বলতে পারে না। গলার কাছে রুদ্ধ স্বর নিয়ে, সে সকলের অগোচরে, অন্যখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কথা বলতে পারলাম না। সহসা বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। স্নেহে এবং ব্যথায়, আমার ভিতরটা যেন উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইলো। মাথায় হাত দিয়ে লিজাকে, আমার একটু স্পর্শ করতে ইচ্ছা করলো।

হঠাৎ লিজার চুপি চুপি স্বর শুনতে পেলাম, 'চিরকৃতজ্ঞ আমি।'

চেয়ে দেখি, ওর চোখের কোলে জল এসে পড়েছে। ঠোঁটে হাসি চিকচিক করছে। আমি ডাকলাম। 'লিজা।'

লিজা খুব তাড়াতাড়ি রুমাল চেপে, ওর চোখ মুছে নিল। কিন্তু ওর মুখে কোন রকম লজ্জার ছাপ নেই। ও হেসে আমার দিকে তাকালো। আমিও তাকালাম। একটু সময় আমরা দুজনেই কথা বলতে পারলাম না। তারপরে বললাম, 'আপনার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।'

লিজা বলল, 'তার আগে বলুন তো, আমি কী রকম পাজী?'

আমি বললাম, 'সেটা আমার আগে থেকেই সন্দেহ হয়েছিল।'

লিজা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তারপরে বললো, 'কিন্তু আপনাকে যা যা বলেছি, বলুন সব সত্যি কি না?'

'সত্যি মিথ্যে তো সব আপনার কাছে। আপনার বিশ্বাস কি কেউ টলাতে পারে?'

লিজা ঘাড় নেড়ে বললো, 'না, তা পারে না। আমার দশটা বিশ্বাস নেই। যা বলি তা একটা বিশ্বাস থেকেই। আপনি যখন অধিকার দিয়েছেন, তখন বলছি, আপনি আসলে অশিষ্ট দুষ্টু অবাধ্য।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে জানা গেল।'

লিজার সহজ জবাব, 'একটা মন দিয়ে।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলো, সেই মনের স্বরূপ কী? দ্বিধা হলো, জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বললাম, 'এতগুলো দোষ নিয়ে বেড়াচ্ছি, কোনোদিন বুঝতে পারিনি তো।'

লিজা বললো, 'বুঝবেন কেমন করে? আপনার মজা তো সেখানেই।'

'কী রকম?'

'আপনার দোষের সব বোঝা যে অন্যে ঘাড়ে বয়ে বেড়াচ্ছে।'

আমি লিজার চোখের দিকে তাকালাম। লিজাও। লিজা কী অর্থে কথাটা বললো, আমি বুঝতে পারছি। ও আমাকে আঘাত বা অপমান করার জন্য কথাটা বলেনি। ও যে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাই মনে মনে ভাবি, জীবনে সবাইকে সুখী করতে পেরেছি, তা কখনো দাবী করতে পারি না। জেনে বা না জেনে, দুঃখও দিয়েছি অনেককে। আসলে এই কথাটাই লিজা বলতে চাইছে। আমি আমার নিজের মতো করে, আপনার মনে, জীবনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছি। সেই যাওয়ার সঙ্গে আরো যারা রয়েছে, তাদের অনেককে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু আমি কি কেবল দুঃখই দিয়েছি?

লিজার দোষের বোঝাটা দুঃখের বোঝাকেই বোঝাতে চেয়েছে। আমার দেওয়া দুঃখের বোঝা অন্যে বয়ে বেড়াচ্ছে। আমি কেবল সুখের বোঝার বাহক?

কিন্তু এই অল্প পরিচয়ের মধ্যে, লিজা আমার সম্পর্কে, এমন করে ভাবতে আরম্ভ করলো কেমন করে? আজকের রাত্রি, আর কাল দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। তারপরে আমাদের এ যাত্রা শেষ। আমাদের দেখা শেষ, পরিচয়ও হয়তো শেষ হয়ে যাবে। কোনো কারণেই, আমাদের কারোর সঙ্গে কারোর আর দেখা হবে না। তারপরে মন, তোমার বা লিজার বা লিজাদের, নদীর পাড়ে যেমন পলি পড়ে, তেমনি কাল তোমার পাড়েও পলি ফেলবে। মনের সেই পলির নীচে সবাই চাপা পড়ে থাকবে, কেউ কোনোদিন ঘেঁটে দেখবে না।

হয়তো আমাদের মধ্যে একটু চেনাচেনি হয়েছে। যে-চেনাচিনিটা বাইরের না। এই চেনাচিনির মাঝখানে যে একটি স্নিগ্ধ বন্ধুত্ব প্রীতির জন্ম হয়েছে, সে তো বড়জোর এই রেলের কামরা থেকে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের দরজা পর্যন্ত যাবে। কিন্তু লিজার ভাবনার মধ্যে, তার সূত্রটাকে যেন এখন থেকেই, অনেক দূরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি জানি, এ সবই দুঃখের কারসাজি। সে যখন খেলায়, তখন কিছুই বুঝতে দেয় না। তারপরে সে ধরে বাঁধে, কষে মারে। তার কৌশলটাই এ রকম।

আমি কথা শেষ করবার জন্য লিজাকে বললাম, 'কথাটা মনে রাখব।'

লিজা সঙ্গে সঙ্গেই বললো, 'এটাও আবার একটা মিথ্যা কথা। মনে রাখবার লোকও আপনি নন। কিন্তু অনেক বলেছি, আজ আর বলব না। তবে, আপনাকে যে আমি চিনেছি, সেটা মিথ্যা না, আর কেন যে চিনলাম, সেটা ভেবে আমার বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠছে।'

বলে আমার দিকে তাকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামালো। একটু রঙ লেগে গেল ওর মুখে। আমি ওর কথার কোনো জবাব দিলাম না। লিজা আবার চোখ তুললো, আবার নামালো। আবার চোখ তুলে, কিছু যেন বলতে চাইলো, পারলো না। হেসে ফেললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী লিজা?'

লিজা ঘাড় নেড়ে বললো, 'মানুষ তার নিজেকে কিছুই চেনে না।'

সে কথা নিজের জীবনে বহুবার বুঝেছি। এই মুহূর্তে লিজাকে দেখেও বুঝতে পারছি। মানুষ তার নিজেকে সবটুকু চেনে না শুধু না, কথাটা জেনেও সে অচেনাতেই ভেসে যায়, হারায়।

গাড়ির গতি আবার কমে এলো। বেলা ক্রমে বেড়ে উঠছে। এবার আমি

কামরায় ফিরে যেতে চাই। গোমেজ ঠাকরুণ কী ভাবছেন কে জানে। মনে মনে রুষ্ট হচ্ছেন হয়তো। বললাম, 'আপনি পড়ুন, আমি এবার কামরায় ফিরে যাই।'

লিজা বললো, 'হ্যাঁ, এবার আমি পড়ব।'

তারপরেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় বলে উঠলো, 'ও হো শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। কালকূট নামটা ভালো না তবে যতোটা পড়েছি, বেশ ভালো লাগছে।'

আমি উঠতে উঠতে বললাম, 'শেষ অবধি দেখুন।'

লিজা বললো, 'নিশ্চয়ই। তবে আপনি বলছিলেন, এটা এই লেখকের প্রথম বই। আমি অবিশ্যি খুব বেশি বাংলা বই পড়িনি। তবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ছাড়াও, আরো অনেকের বই পড়েছি। কিন্তু এই লেখকের এটা প্রথম লেখা বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'এই লেখকের আর কোনো বই এখনো বেরিয়েছে বলে আমি জানি না।'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। গাড়িটা থামছে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। লিজা আবার আমাকে ডাকলো, 'শুনুন, বইটা আমি কাল সকালের মধ্যে নিশ্চয়ই শেষ করে ফেলব। তারপরে আপনাকে একটা কথা বলব।'

আমি ঘাড় কাত করে, সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা চমক জেগে রইলো। কী বলবে লিজা? এটা, যেমন বোঝা গেল, মেয়ে হিসেবে একদিকে ও সহজ না, আবার সহজও, অল্প জলে ছলছলিয়ে পাকা সাঁতারুর মতোই ও গভীর অতলান্ত জলেও চলে যেতে পারে, এবং জীবনে কোথাও একটা বড় রকমের মার খেয়েছে, তার ব্যথা যন্ত্রণাটা ওর ভিতরে অনেক দূরে শিকড় ছড়িয়ে আছে, তেমনি ওর ভিতরে একটা রহস্যের আমেজও আছে। জানি না, বই পড়ার পরে ও কী বলবে।

কোনো রকমে ঢোকবার অপেক্ষা। গোমেজ ঠাকরুণ একেবারে হাঁকড়ে উঠলেন, 'এই যে, এসেছেন। সেটি কোথায়?'

আমি বললাম, 'লিজার কথা বলছেন?'

'আর কার কথা বলব?'

'উনি তো খাবার কামরাতেই বসে আছেন।'

'উনি কি সারাদিন শুধু খাবেনই?'

আমি একবার মেরী আর রোজার দিকে দেখে নিলাম। ওরা দুজনেই দুটো ম্যাগাজিন নিয়ে বসে ছিল। এখন মুখ টিপে টিপে হাসলো। আমি ঠাকরুণকে জবাব দিলাম, 'এখন তো খাচ্ছেন না, বসে বসে বই পড়ছেন।'

এতটুকুতে ঠাকরুণ ঠাণ্ডা হবার নন। বললেন, 'সেটাও তোমাকে বলতে হলো, লিজা এখন খাচ্ছে না।'

রোজার গলায় হাসির শব্দ বাজলো। ঠাকরুণ রোজাকেই সাক্ষী মানলেন, 'কী রকম ছেলে বল তো!'

মেরী সেই ফাঁকে, একটু সরে গিয়ে বললো, 'বসুন না।'

বসতে তো চাই, পারছি কোথায়। ঠাকরুণ যে রকম চটপটি বাজীর মতো ফাটছেন, ছিটকে যাচ্ছেন, তাতে বসাই দায়। ঠাকরুণ আবার বললেন, 'তা উনি কি এখানে এসে পড়তে পারেন না?'

মা জিজ্ঞেস করছেন মেয়ের কথা। জবাব দিতে হবে আমাকে। ভাগ্যিস্ কাল রাত্রে এঁদের সঙ্গে আমার ঠাঁই হয়েছিল। কী জবাব দেব, ভাববার আগেই, রোজা বাঁচাল। ও বললো, 'তোমাকে বললাম না, লিজা বলেছে, ওখানে বসে কিছুক্ষণ পড়বে।'

ঠাকরুণ কবাজ ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন, 'কিছুক্ষণ কাকে বলে রোজা? লিজা গেছে ন'টা বাজবারও আগে। এখন এগারোটা বেজে গিয়েছে।'

মেরী একটু হেসে বললো, 'আসলে বোধ হয় লিজা লাঞ্চের জন্য লাইন লাগিয়ে বসে আছে। একেবারে খেয়ে ফিরবে।'

রোজা হেসে উঠলো। এবার ঠাকরুণের মুখেও একটু যেন হাসি দেখা গেল। বললেন, 'তা যা বলেছ। যা ভিড়! কিন্তু গায়ে পায়ে একটু জল দিতে হবে তো। যা গরম, ঘাম ধুলা ধোঁয়া। অল্প চান না করলে হবে কেমন করে।'

রোজা বললো, 'সেটা লিজাও জানে, ও চলে আসবে সময় মতো।'

স্নানের কথাটা বলে, ঠাকরুণ আমাকে বাঁচালেন। আমি আর দেরি করতে চাইলাম না। এখনো ঘর খালি পাওয়া যেতে পারে। এর পরে, সবাই একসঙ্গে ছুটবে। কে জানে, জলই হয়তো থাকবে না। আমি স্নানে যাবার আয়োজনে লেগে গেলাম।

ব্যাগ থেকে তোয়ালে সাবান বের করতে দেখে, মেরী জিজ্ঞেস করল, 'বসবেন না?'

বললাম, 'না, চানটা করে আসি।'

'এখনই ?'

'হ্যাঁ, এর পরে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যাবে।'

ঠাকরুণ অন্তত: এই একটি ব্যাপারে, আমার ওপর খুশি হলেন, তারিফ করলেন, 'খুব ভালো। আমি মনে করি আমাদেরও তা-ই করা উচিত। আর একটুও দেরি না। বিল্, তুমি আগে যাও। মাথা ধোবে, গোটা গা-টা তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবে।'

বিল্ও তখন কমিকস্ নিয়ে বসে গিয়েছে। ও শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'আমি এখন যাব না, পরে যাব।'

ঠাকরুণ ধমক দিলেন, 'যাও বলছি।'

বিল্ তাকালো ঠাকরুণের দিকে। ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে, মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী সোনা আমার।'

বিল্ উঠে দাঁড়ালো ; নির্বিকার মুখে বললো, 'ওটা তো সত্যি না।'

ঠাকরুণ বললেন, 'খুবই সত্যি। আমার বিল্ সোনা মানিক।'

বিলের জবাব , 'কিন্তু কিছুটি না দিয়ে।'

ঠাকরুণ বললেন, 'বেশ, বলা রইল, বম্বেতে গিয়ে ডবল চকোলেট।'

মেরীকেও উঠতে হলো বিলের স্নানের জন্য। ঠিক এ সময়েই শোনা গেল, 'এ দাদা. ভইয়া শুনিয়ে।'

কাকে ? আমাকে ছাড়া, এখানে আর কাকে এ রকম সম্বোধন করা যেতে পারে ? আমি সামনে ফিরে তাকালাম। গণেশদাদা ! সেই রকম খালি গা। কাপড় হাঁটুর কাছে তোলা। বুক আর ভুঁড়ির মাঝখানে, বেশ কিছু ঘাম জমে আছে। ঘামে তেলতেলে মুখখানিতে হাসি হাসি ভাব। পান চিবনো হয়েছে, গোঁফের নীচে লাল দাঁতও দেখা যাচ্ছে। হাতে একটি নিভে যাওয়া বিড়ি।

মেরী, রোজা, বিল্ যদিও বা অবাক, ঠাকরুণ শুধু অবাক নন। বিরক্তি আর সন্দেহ তাঁর চোখে। কী ভেবে নিয়েছেন, কে জানে। একবার আমার দিকে দেখছেন, আর একবার গণেশদাদার দিকে। যদিও লোকটার নাম সত্যি কী, কে জানে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হম্ কো ?'

গণেশদাদার হাসিটা বিস্ফারিত হলো। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললো, 'আপকো, বাঙালী দাদালোগ উধার বোলাতা।'

বলে, একদিকে আঙুল দেখালো। আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, 'কেন ?'

ঠিক এ সময়েই, গণেশদাদা ধুতিটা অনেকখানি তুলে, বুক আর ভুঁড়ির

মাঝখানের ঘাম মুছলো। আমার চোখ ঠাকরুণের দিকে পড়লো। ঠাকরুণের গলা দিয়ে কেবল একটি অস্পষ্ট ক্রুদ্ধ হুংকারের মতো বাজলো 'হুম্‌ম্‌।'

গণেশদাদা সেদিকে লক্ষ্য না করে, তেমনি বিস্ফারিত হাসিতে ঘোষণা করলো, 'তাস খেলনে কে লিয়ে। হমলোগ তিন আদমি হ্যায়, ঔর এক আদমি চাহি।'

কোথায় খাপ খুলেছ দাদা। আমি কোনো কথা বলবার আগেই, ঠাকরুণ হাত ঝাপটা দিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'নেই নেই, ও তাস নেই খেলে গা, যাও।'

একেবারে 'যাও।' গণেশদাদা যেন একটু কেমন হয়ে গেল। ঘাবড়ে গেল কী না, ঠিক বোঝা গেল না। তবে সে খুবই অবাক হয়েছে। ভাবতে পারেনি, আমার ব্যাপারে এ বুড়ি মেমসাহেব তাকে ও রকম ধাতিয়ে উঠবে। হাসিটা তার মুখে থেকে গেল। একবার আমাকে আবার মেমসাহেবকে দেখলো।

আমি তাড়াতাড়ি আমার হাতের তোয়ালে আর সাবান দেখিয়ে, হিন্দীতেই বলবার চেষ্টা করলাম, 'এই দেখুন, আমি নাইতে যাচ্ছি এখন। তাছাড়া তাসের সব খেলা আমি জানি না। দু-একটা যাও জানি, তা-ও ভালো করে না।'

গণেশদাদা একটু বোধ হয় ধাতস্থ হলো। ঘাড় নেড়ে বললো, 'ও, আচ্ছা।'

ঠাকরুণ ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জানলেও কি তুমি এ লোকটার সঙ্গে খেলতে যেতে?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না।'

গণেশদাদা তখন মেমসাহেবের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঠাকরুণ আবার আমাকেই ধমক দিলেন, 'লোকটাকে যেতে বলো এখান থেকে।'

গণেশদাদা একবার সবাইকে দেখে চলে গেল। লোকটা পিছন ফিরেছে কী না সন্দেহ, রোজা একেবারে ফেটে পড়লো হাসিতে তার সঙ্গে মেরীও। ঠাকরুণের চোখ তখনো পাকানো। বললেন, 'একটা কী রকম বিদ্‌ঘুটে লোক বলো দিকিনি, লজ্জা ঘেন্না বলে কিছু নেই?'

মেরী আর রোজার হাসিটা তখন আমার মধ্যেও কলকলিয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু কলকলাতে সাহস পেলাম না। ঠাকরুণ হয়তো হুম্‌কে উঠবেন। বরং স্নানের ঘরে গিয়ে একলা একলা প্রাণভরে হাসা যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এগিয়ে যেতে গেলাম।

ঠাকরুণ পিছন থেকে ডাকলেন, 'শোন, ওহে।'

'ছোকরা' শব্দটা আর আমি যোগ করছি না। ইংরেজিতে ওঁর ডাকের ভাষাটা হলো, 'হেই, হিয়ার মী বয়।' আমি ফিরে তাকালাম। ঠাকরুণ সাবধানী

গলায় বললেন, 'দেখো, ওই বদখদ লোকটা ভাব করতে চাইলে, ভাব কর়ো না যেন।'

এর কোনো জবাব নেই। ভাব আর অ-ভাব, গণেশদাদার সঙ্গে আমার ব্যাপার কী। আমি রোজার দিকে একবার তাকিয়ে, এগিয়ে গেলাম। কয়েকটা খুপরি পেরিয়ে যাবার পরে, এক জায়গায় দেখলাম, কয়েকজন বসে আছেন, তার মধ্যে গণেশদাদা। নিজের থেকেই থেমে গেলাম আমি। গণেশদাদা ছাড়া, বাকীরা বাঙালীদাদা। কিন্তু সংখ্যায় তো দেখছি, পাঁচজনে বসে আছেন। তবে আবার আমাকে ডাকাডাকি কেন।

গণেশদাদাই প্রথমে ডাক দিলেন, 'আইয়ে দাদা, আইয়ে।'

এক বাঙালী দাদা হতাশ হয়ে বললেন, 'ভাবলাম দাদাকে পাব, তাহলে একটু খেলা যেত।'

বললাম, 'আপনাদের লোকের অভাব তো দেখছি না'।

জবাব পাওয়া গেল, 'সে তো মশাই গাড়ি-ভরতি লোক। যারা খেলা জানে না, জানে না। আর জেনেও খেলতে না চাইলে, কী করা যাবে। আমাদের মধ্যে দুজন খেলতে জানে না। দুবেজীকে নিয়ে তিন হয়েছিল।'

গণেশদাদার নাম তাহলে দুবেজী। আমি বললাম, 'আমাকে নিয়েও আপনাদের সুবিধে হত না। আমি যেটুকু খেলতে জানি, তাকে জানা বলে না। সেই খেলা আছে, ফিশ না কী, সেটা তো তিনজনেও খেলা যায়।'

দাদার মুখখানি এবার একটু শুকনো দেখালো। বললেন, 'ও খেলাটা আবার আমরা কেউ জানি না।'

মনে মনে বলি, তবে আর খেলা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। সময় কাটাবার অন্য রাস্তা বের করলেই হয়। আর এক বাঙালীদাদা বললেন, 'ঠিক আছে, গল্পগুজব করেই কাটানো যাক না।'

জবাবে আর একজন একটু বাঁকা সুরে বাজলেন, 'হ্যাঁ, আর তুমি গল্প-গুজবের নামে কাঁড়ি কাঁড়ি গুল্ চালিয়ে যাও।'

যাকে বলা হলো, তার রুষ্ট জিজ্ঞাসা, 'কেন, গুল্ দেব কেন?'

জবাব, 'সে তুমিই জানো বাবা, কেন। কিন্তু তোমার গুলের জ্বালায় অস্থির হতে চাই না।'

এ অবস্থায় বাইরের লোকের হাসতে মানা। সরে যাবার আগে শুনতে পাই, 'তুই নিজেও কি কম যাস নাকি। আজ সকালেই তো…'

যাক, সময়টা কাটুক দাদাদের। সময় কাটাবার এও তো একটা রকম। খানিকটা এগিয়েছি, পিছনে আবার ডাক, 'এ দাদা।'

আবার কে দাদা? পিছনে দেখি গণেশদাদা। কাছে এসে বললো, 'উ মেমসাব আপকো ক্যায়া লাগতা?'

অর্থাৎ কে হয়। বললাম, 'কুছ নহি জী।'

গণেশদাদার অভিযোগ, 'তব, আপকো বোলায়া তো উ হমকো কাঁহে ডাঁটতা রহা?'

অভিযোগ মিথ্যা না। আমি গণেশদাদাকে বললাম, 'আরে উসব মেম-সাবকো বাত ছোড়িয়ে না। উলোগকা দিমাক কা কুছ ঠিক হ্যায়।'

গণেশদাদা ভুঁড়ি চুলকে বললো, 'হমকো বহুত গোস্সা হোতা রহা।'

আমি মোলায়েম করে বললাম, 'হোনে কা বাত হ্যায়। ছোড় দিজীয়ে।'

বলে ফিরতে গেলাম। গণেশদাদা একটু ভ্রাতৃত্বের সুরে বললেন, 'আপকো যানা কহাঁ দাদা?'

'বোমবাই।'

'হমকো ভি।'

তা বুঝলাম, কিন্তু চোখের সামনে যে স্নানের ঘরে একজন ঢুকে গেল। আর একটা আগে থেকেই বন্ধ। ফিরে আবার উল্টো দিকের শেষে যাবো নাকি। গণেশদাদা বাত দিয়েই যেতে লাগলেন, 'হমরা ভাইকা কলকত্তা মে বেওসা হ্যায়। হমকো মুদীখানা হ্যায় বোমবাই মে। আপ দাদার জানতা?'

শিবরাম চক্রবর্তী মশাইয়ের অনুপ্রাশ ব্যবহার আমার মনে পড়ে গেল। দাদা দাদা করে, গণেশদাদা এখন আমাকে দাদারের কথা পুছ করছে। কী বিপদ বলো দিকিনি। দাদার জানব কী করে। অচিন দেশের নামে চলেছি, চোখে দেখিনি। মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

গণেশদাদা বললেন, 'দাদার মে হামারা দুকান হ্যায়। বহুত বাঙালী হমারা দুকানসে মাল খরিদতা।'

গণেশদাদা বলে যেতে লাগলেন। আমি চোখে মনে কামরা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। সব আসরই বেশ জমজমাটি। দুটি তাসের আড্ডা ভালোই জমতে দেখেছি। একটি কেবল পুরুষদের। আর একটি মহিলা-পুরুষ মিশিয়ে। গল্পের আসর, তর্কবিতর্কের আসর, সবই আছে। কে যেন আবার মাউথ অর্গানে আওয়াজ দিয়ে চলেছে।

একটি স্নানের ঘরের দরজা খুললো। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকতে গেলাম : গণেশদাদা তখনো বলে চলেছে, 'লেড়কাঠো দো মাহিনে আগে মর গয়া।'

আমি স্নানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসকা লেড়কা ?'

গণেশদাদা বিষণ্ণ হেসে বললো, 'হমারা। আপকো বাতায়া না ?'

এই মুহূর্তে হঠাৎ গণেশদাদা লোকটিকে আমার অন্য রকম মনে হলো। কেবল যে সময় কাটাবার জন্যই সে কথা বলে চলেছে, তা না। একটু মন হালকা করার ব্যাপারও ছিল। আমি হঠাৎ কিছু বলতে পারলাম না। গণেশ-দাদা বললো, 'যাইয়ে, নাহা লিজীয়ে।'

সে ফিরে গেল। আমি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম।

দুপুরের খাবার পরে, সকলেই প্রায় খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। একমাত্র লিজাকে দেখলাম, খাবার সময়টুকু ছাড়া, একবারের জন্যও হাত থেকে বইটা নামায়নি। চোখ থেকে সরায়নি।

দিনের বেলায় আমি আর তেতলায় উঠিনি। গোমেজ ঠাকরুণের পায়ের কাছে সামান্য একটু জায়গা ছিল। উনি শোবার আগেই বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করলে ওখানে বসতে পারি। ওদিকে মেরীর পায়ের কাছে লিজা। রোজা আর বিল্ দোতলায়। আমি মাঝে মাঝে উঠে, গাড়ির দরজায় দাঁড়াচ্ছিলাম। বাইরে প্রকৃতি বদলে গিয়েছে। গাড়ি এখন মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে চলেছে। মধ্যপ্রদেশ একটু বেশি সবুজ যেন। অরণ্যে ঘন। তথাপি, বস্তিগুলো আর অধিবাসীদের যখন দেখতে পাই, তখন মিলের ভাগটাই বেশি।

কিন্তু যতক্ষণ বসে থেকেছি, বই পড়েছি, থেকে থেকেই লিজা চোখ তুলে তাকিয়েছে। যেন বই পড়তে পড়তে, কিছু বলে উঠতে চেষ্টা করেছে। বলেনি। স্বীকার করি, আমিও থেকে থেকে লিজাকে দেখছিলাম। আমার মনে বোধ হয় একটা কৌতূহল ছিল, বইটা পড়তে পড়তে ওর মুখের চেহারায় কী ভাব খেলে। দেখেছি কখনো ভুরু কুঁচকে রয়েছে। কখনো ঠোঁটের কোণে হাসি। কখনো গম্ভীর। একবার শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'উঠে উঠে কোথায় যাচ্ছেন ?'

বলেছি, 'কোথাও না, দরজায় দাঁড়িয়ে একটু বাইরের দিকে দেখছি।'

তারপরে ঘুম থেকে উঠেও, গোমেজ ঠাকরুণ যখন দেখলেন, লিজা এক ভাবেই বইটা পড়ে যাচ্ছে, তখন যেন আর সইতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'সেই কাল রাত্রি থেকে একটা বাংলা বইয়ে মুখ দিয়ে পড়ে আছিস, ব্যাপারটা কী ?'

লিজা অবাক হলো না, রাগও করলো না। জবাব দিল, 'ব্যাপার কিছু না, বইটা পড়ছি। তোমরা যদি বাংলা জানতে, তবে তোমাদেরও পড়তে বলতাম।'

গোমেজ ঠাকরুণ ঘাড়ে এক ঝাপটা দিয়ে ঠোঁট বাঁকালেন। বললেন, 'আমার দরকার নেই।'

লিজা বললো, 'সে তো বাইবেল ছাড়া, তোমাদের কোনো বইয়েরই দরকার নেই।'

ঠাকরুণ বিরক্ত মুখে একটি সিগারেট ধরালেন। লিজা পড়তে লাগলো। আমি উঠে আবার দরজার দিকে এগোতে গেলাম। গাড়ির গতি কমছে। চা খেতে হবে। ঠাকরুণ আওয়াজ দিলেন, 'ওহে, কোথায় যাচ্ছ ?'

বললাম, 'কোথাও না।'

'গাড়িটা থামলে, একটু চা-ওয়ালাকে ডাকো তো। ডাইনিং কারে খেতে গেলে খরচ বেশি।'

হতে পারেন মেমসাহেব, কিন্তু কথা সাদা। গিন্নীবান্নি মানুষ, খরচের কথা ভাবতে হয়। আর পরের ছেলেকে হুকুম করা ? ওটা এখন অধিকারের কথা। পরের ছেলে আবার কী ? বলেই তো দিয়েছেন, আমি ওঁর ছেলের মতোই। বললাম, 'আচ্ছা।'

গাড়ি থামতে, চা-ওয়ালাকে ডেকে, চা দিতে বললাম। মেমসাহেবরা সবাই বেশ সোনামুখ করেই মাটির ভাঁড়ে চা খেল। পেটে চা গেল বলেই, ঠাকরুণের মাথাটাও একটু ঠাণ্ডা হলো যেন। আমাকে বললেন, 'তোমার সিগারেট একটা দাও তো খাই।'

আমি তাড়াতাড়ি সিগারেট বার করে দিলাম। কী ভাগ্যি, আমার সিগারেট খেতে ইচ্ছা হয়েছে। আমি মেরীকেও দিতে গেলাম। ও ধন্যবাদ জানিয়ে, খাবে না বললো। তারপরেই রোজার সঙ্গে আমার চোখাচোখি। ওর মুখে রঙ লেগে গেল। ঠোঁট টিপে হেসে তাড়াতাড়ি ঠাকরুণের চোখ থেকে মুখ আড়াল করলো। আমি সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট আর দেশলাইটা বেঞ্চের ওপরেই রাখলাম। এই সময়ে লিজার সঙ্গে আমার একবার চোখাচোখি হলো।

লিজা বেঞ্চের ওপর প্যাকেটের দিকে চেয়ে, রোজার দিকে দেখলো। রোজাও তাকালো। দুই বোনেই ঠোঁট টিপে হাসলো।

ঠাকরুণ তাঁর ডাইনে, জানলার দিকে তাকিয়ে ধূমপান উপভোগ করছেন। রোজা উঠলো, এক পা এগিয়ে এলো। মেরী সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট আর দেশলাই ওর হাতে গুঁজে দিল। রোজা নিরীহ মুখে, ঠাকরুণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এমন কি, বিল্‌ও দেখতে পেল না। ও তখন বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মেরী আর লিজার সঙ্গে দৃষ্টি আর হাসি বিনিময় হলো।

ঠাকরুণ আমার দিকে ফিরলেন। তারপরে শুরু হলো, বাড়ির খোঁজ-খবর নেওয়া। বোধ হয়, এতক্ষণ পরে, ঠাকরুণের মেমসাহেবি রীতিতে মনে হয়েছে, এখন ঘরের কথা জিজ্ঞেস করা যায়। আমারটা শোনবার পরে. তাঁর নিজের প্রসঙ্গ উঠলো। স্বামীর সঙ্গে, চাকরির জন্য ভারতবর্ষের কতো জায়গায় তিনি ঘুরেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা কে কোথায় হয়েছে। শ্রীযুক্ত গোমেজ, লিজার বাবা, কোনো এক সময়ে অত্যন্ত পানাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে জন্য তাঁকে কী রকম জ্বালাতন সহ্য করতে হয়েছে. সে-কথাও বললেন। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গের সময়ই, লিজা আর মেরী নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু বচন যাঁর মুখে, তিনি নিরস্ত নন। তারপরে তিনি যখন ঘোষণা করলেন, তাঁর বড় ছেলে হেনরি, মেরীর বর, তাঁর সতেরো বছর বয়সে, পুণাতে জন্মেছিল, তখন লিজা উঠে দাঁড়ালো। বইটি নিয়ে সোজা চলে গেল অন্যদিকে। বোধ হয় দরজার দিকে।

ঠাকরুণ গেয়েই চলেছেন। পুরনো দিনের কথা, আসল কথা। যা কোনো দিন ফিরবে না, হারিয়ে গিয়েছে, অথচ নিজেরই ভিতরে তা থরে থরে সাজানো রয়েছে, সেই সব দিনের কথা বলতে ভালো লাগে। বলতে বলতে সেইদিনে যেন ফিরে যাওয়া যায়। ছুঁয়ে আসা যায়। যদিও সেইদিনে অবিমিশ্র সুখ আর আনন্দ ছিল না। কিন্তু পিছনের দিনগুলোতে, তিনি ছিলেন মোনালিসা। তখন রক্তে যৌবন, জীবনে তীব্র বেগ। অতীতের দুঃখকেও বর্তমানে সুখের আলোয় দেখায়।

অনেক কথার শেষে বললেন, 'লিজার পরেও আমার একটি মেয়ে হয়েছিল। এগারো বছর বয়সে সে গোয়াতে মারা যায়। নাম ছিল এল্‌সা। আমার এই দুই মেয়ের থেকে. সে ছিল সব থেকে দেখতে ভালো। সেই জন্য বোধ হয় রইলো না।'

ঠাকরুণের হঠাৎ নিঃশ্বাস পড়লো। দুই কাঁধে আর কপালে হাত ছোঁয়ালেন।

কিন্তু আর কথা বললেন না। আর এখন তাঁর গল্প শোনাবার ইচ্ছা নেই, শোনবারও ইচ্ছা নেই। মা এখন ফিরে গিয়েছে, তাঁর কোল-পোঁছা মেয়েটির কাছে। ঠাকরুণের চোখ দেখলে বোঝা যায়, তিনি গাড়িতে নেই। আমাদের কারোর কাছেই নেই। হয়তো, গোয়ার কোনো ঘরে, কিংবা হাসপাতালের প্রসবের টেবিলে, দশ মাস গর্ভের, নাড়ি-ছেঁড়া টানের ব্যথাটা, এখন অন্য ভাবে বুকের কাছে অনুভব করছেন। এল্‌সার এগারো বছরের দিনগুলো হয়তো চোখের সামনে ভাসছে।

মেরী রোজা আর বিল্ চুপ করে আছে। কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। সকলেই নিজের নিজের মনে। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। মাঠ পেরিয়ে, দূরের বনের মাথায় আকাশ লাল। দিন শেষ হয়ে আসছে। গণেশ-দাদার কথাও আমার এই সময়ে মনে পড়ে গেল। দুটি সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ দু-রকম ভাবে শুনলাম। এক জনক আর এক জননীর কাছ থেকে।

যাদের হারিয়েছে, তাদের যেখানে বাজে, যেমন করে বাজে, আমার হয়তো তেমন করে বাজে না। কে এক গোয়ানিজ খৃষ্টান প্রৌঢ়া। কে এক দুবেজী, বোমবে শহরের দাদারের মুদী। তথাপি, প্রাণের লীলাটা এমনিতরো, তাদের হারানোর শোকটা, অন্য প্রাণেও কেমন করে যেন চুঁইয়ে ঢোকে।

এ সময়ে লিজা এলো। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে, সকলের দিকেই একবার তাকালো। ঠাকরুণ আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'মেরী তাস বের করো তো, একটু খেলা যাক। এভাবে বসে থাকতে ভালো লাগছে না।'

মেরী তাস বের করলো। ঠাকরুণ আমাকে ডাকলেন, 'এসো খেলবে এসো।'

আমি বিপদগ্রস্ত হলাম। বললাম, 'আমি যে খেলতে জানি না।'

'যা জানো, ওতেই হবে।'

আমি জানি, ওতে হবে না। কিন্তু গোমেজ ঠাকরুণ তো নন, একেবারে মোগল। অতএব বসতেই হবে। বকা ঝকা সমালোচনা বিরক্তি তো পরে। যখন আমার গুণ টের পাবেন। ওদিকে লিজাকে দেখ, নির্বিকার। যেন ঘোরে আছে।

রাত্রের খাবার কামরায় খেতে গিয়ে বোঝা গেল, যাত্রীর ভীড় কিছু কমে গিয়েছে। খাবার শেষে, আজ আর ভুল করলাম না। সবাইকে পোশাক ছেড়ে তৈরী হবার সময় দিলাম। একলা একলা খাবার কামরাতেই সময়টা কাটিয়ে

ফিরলাম। কামরায় যখন ফিরলাম তখন শোবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে গোটা কামরাতেই। আজ দেখছি, লিজা সকলের আগে ওর তেতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুমোতে না, বই পড়তে। আমি এসে ঢুকতে না ঢুকতেই, ঠাকরুণ ঝেঁজে বাজলেন, 'তুমিই যতো নষ্টের গোড়া।'

ঠাকরুণের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবি, গোস্তাকিটা কী? নিজেই তিনি জবাব দেন, 'কোত্থেকে একটা বাংলা বই নিয়ে এসেছ, সেটা ছাড়বার নাম নেই।'

রোজা বললো, 'এতক্ষণ লিজাকে বকলে, আবার একে নিয়ে পড়লে। তোমাকে তো বলা হলো, আর একটুখানি বাকী আছে, কাল সকালের মধ্যে শেষ করে ফেলবে।'

লিজা ওপর থেকে বললো, 'ঠিক আছে, বাংলা রেখে আমি ইংরেজি পড়ছি। তাহলে হবে তো?'

ঠাকরুণ হাঁকড়ে উঠলেন, 'কেন, এত বই পড়ার কী আছে? গল্প করা বা কথা বলা যায় না?'

লিজার গম্ভীর জবাব, 'না।'

ঠাকরুণ বিরক্ত মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। এতে আর আমার মত বাতাবার কিছু নেই। তবে একটা ব্যাপার ভাবি। একটু সেকেলে মানুষ হলেই ক বেশি বই পড়ার ওপরে বিরক্ত হয়? বিশেষ করে, মেয়েরা যদি পড়ে? এ যে দেখি, মেমসাহেব আর দিশী গিন্নীদের কোনো তফাত নেই।

সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে, আমি তেতলায় চলে গেলাম। শুয়ে চোখের সামনে বই খুলতেই, টের পেলাম, লিজা আমার দিকে দেখছে। আমিও ওর দিকে একবার দেখলাম, সেই সঙ্গে একটু হাসি। এই দেখাদেখি হাসাহাসিটার কোনো অর্থ নেই। এটা একটা রীতির মধ্যে পড়ে।

গতকালের মতোই নাসিকা-গর্জন শোনা যাচ্ছে। রাতের গাড়ি চলেছে বেগে। ইংরেজি ডাইজেস্টে আমি, প্রায় একটি ভয়াল ভয়ংকর কাহিনী পড়ছি। কতক্ষণ পড়েছি, খেয়াল নেই। একসময়ে লিজার গলা শোনা গেল, 'না, আজ আর পারছি না, চোখ টনটন করছে।'

আমি ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'আজ রাত্রের মতো ছেড়ে দিন প্রায় তো শেষ করে এনেছেন।'

বইয়ের শেষের কিছু পাতা দেখিয়ে বললো, 'কাল সকালে শেষ হয়ে যাবে না?'

বললাম 'খুব।'

'আপনি এখনো পড়ছেন কী করে? আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

হেসে বললাম, 'আমি তো আপনার মতো সারাদিন চোখকে এক জায়গায় বেঁধে রাখিনি, মুক্তই ছিল।'

ভাবলাম লিজা এবার শুভরাত্রি জানিয়ে, পাশ ফিরে শোবে। সে রকম কোনো লক্ষণ দেখলাম না। ও আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলাম; 'আলো নিভিয়ে দেব?'

ও বললো, 'না।'

আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরাতে গেলাম। লিজা বললো, 'কী পড়ছেন?'

বললাম, 'এক খুনী গায়কের গল্প।'

'খুনী গায়ক?'

'হ্যাঁ, খুনীর গলায় আছে সুরের মায়াজাল, সেই সঙ্গে কন্দর্পের মতো চেহারা। সংসারে এই দুটি জিনিস দিয়ে, সে সবাইকেই ভোলাতে পারে।'

লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত যার রূপ গুণ, সে খুন করে কেন?'

'টাকার জন্য।'

'টাকার জন্য? তার গুণ দিয়ে কি সে টাকা আয় করতে পারতো না? শুনেছি রূপ দেখিয়েও পুরুষেরা অনেক টাকা রোজগার করে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম?'

লিজা ভুরু কাঁপিয়ে বললো, 'কতো ফুলকুমার রূপকথা তো আছে রূপোলী পর্দায়। শুনেছি রূপকথার রাজকুমারদের মতোই তাদের টাকা।'

'তাদের শুধু রূপ না, গুণও আছে।'

'এই খুনী গায়কেরও তা আছে।'

'কিন্তু সে ভালো খুনও করতে পারে।'

লিজা কোনো কথা না বলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললো, 'আসলে লোকটা খুনী। খুনের প্রয়োজনেই সে সব কিছুকে কাজে লাগায়। টাকার জন্যই কি সে খুন করে?'

বললাম, 'এখানে তো তাই দেখতে পাচ্ছি। চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের জন্য, ইতিমধ্যেই সে অন্তত: একটি মেয়েকে খুন করেছে, যে-মেয়েটি তাকে—'

'ভালোবাসতো?'

'হ্যাঁ, একেবারে নিরপরাধ, মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়েই মুগ্ধ মেয়েটি সব কিছু তাকে তুলে দিয়েছে।'

'আর সে তাকে একটি গুলিতে –'

আমি একটু হেসে লিজাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না।'

লিজা একটু আবেগ-উৎসুক স্বরে বললো, 'আমাকে বলুন না, কেমন করে সে মেয়েটিকে মারলো ?'

আমি একমুহূর্ত লিজার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বিছানার একেবারে ধারে, ও মুখটা সরিয়ে নিয়ে এসেছে। মনে হয়, ও প্রায় পাশেই শুয়ে রয়েছে। আমি বললাম, 'সে তখন মেয়েটির বিছানাতে ছিল। মেয়েটি তখন গভীর আবেশে ডুবে আছে। কিন্তু লোকটির বিশ্বাস, চল্লিশ হাজার পাউণ্ড কোথায় আছে, মেয়েটি জানে। সেই অবস্থায় মেয়েটির কাছ থেকে সে জানতে চাইলো, টাকাটা কোথায় আছে। মেয়েটি অবাক। সে সত্যি জানতো না, টাকাটা কোথায় আছে। লোকটি ভাবলো, মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে। তার বুকে সুতোর সঙ্গে ঝোলানো ছিল একটি বড় ক্রস্। সেটা সে কখনো গলা থেকে খুলত না। ক্রসের মধ্যে আসলে লুকানো থাকতো একটা ধারালো গুপ্তি। সেটা সে টেনে বের করলো। তার সুন্দর মুখটা অবিকৃত রেখেই, গুপ্তির ডগা মেয়েটির গলার কাছে রেখে সে শেষবার জানতে চাইলো, টাকার কথাটা ও বলবে কি না। মেয়েটি তার একটু আগের আবেশ থেকে জেগে উঠতে চাইলো। তখনো তার শরীরে, লোকটির প্রেমের উত্তাপ ছড়ানো। সে বললো, সে জানে না। গুপ্তিটা মেয়েটির গলায় বিঁধে গেল, সে তখন নগ্ন…।'

আমি অস্ফুট একটা আর্তধ্বনি যেন শুনতে পেলাম। লিজার গলাতেই শব্দটা বেজেছে। দেখলাম, নিজের হাতে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরা। ওর মুখটা একটু ওপর দিকে উঠে গিয়েছে। গলার কাছে দু-একটা শির দেখা যাচ্ছে। ওর নিশ্বাস পড়ছে না। মুখটা যেন ভাবলেশহীন। দৃষ্টি গাড়ির ছাদে ঠেকে আছে।

আমি ওকে ডাকব কী না ভাবছি। চুলের মুঠিটা ওর আল্‌গা হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যেই লিজা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। কপালের কাছ থেকে চুল সরিয়ে দিল। ওর মুখে রঙ ফিরে এলো। আর আমার যেন মনে হলো, গল্পের নায়িকার মতোই, লিজা নিহত। ওকে সেই রকম দেখাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ভয় পেয়েছিলেন ?'

লিজার ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেল। বলল, 'না। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা আমাকেই মারছে। আপনি বলতে পারেন ভালো।'

বলে, লিজা শব্দ করে হাসলো। বললো, 'আসলে, এই খুন করা আর খুন হওয়া, একটা প্রতীকি ব্যাপার। মেয়েটা তো মরেই ছিল। গুপ্তির ডগাতে

শেষ না করে, হয়তো, সারা জীবন শিকারীটি খেলিয়ে খেলিয়ে মেয়েটিকে মারতো।'

আমি এক মুহূর্তের জন্য, অবাক হয়ে লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পঁচিশ বছরের লিজা। জেনেছি, জীবনে ওর কোথাও একটা বড় রকমের আঘাত আছে। কিন্তু এই খুনের ঘটনাকে যে ও প্রেমের প্রতীকে টেনে নিয়ে যাবে, বুঝতে পারিনি। লিজা দেখছি, মেমসাহেবের বেশে বৈষ্ণবী। না কি, কৃষ্ণ অনুরাগে মরমী রাধা। লিজা কি মরেছে? না মরলে, মরণের কথা এমন করে কেউ বলতে পারে না। এই মরণের কথা, যে-সে জানে না। এই মরণের কথা, পৃথিবীর সব দেশ জানে না। মরণ আর শ্যাম যেখানে মেশামেশি। আমি লিজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর টানা কালো চোখ দুটি যেন চিকচিক করছে। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি। বললো, 'এই মরা আর মারা তো অহো-রাত্রই চলেছে। এ মরার কথা আর থাক।'

আমি বললাম, 'সেই ভালো।'

লিজা আমার মতো করেই বলল, 'সেই ভালো।' যেন তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ছাড়তে পারলেই বাঁচা যায়। তারপর বললো, 'ভয় নেই, আমি জিজ্ঞেস করব না, আপনি কী রকম খুনী।'

'খুনী?'

আমি লিজার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। লিজা মুখে হাত চাপা দিয়ে, হাসির শব্দ আটকালো। কিন্তু ডোরা-কাটা শোবার পোশাকে ওর সমস্ত শরীর তরঙ্গায়িত হলো। একটু স্থির হয়ে বললো, 'হ্যাঁ মোশাই, খুনী। তবে আমি তো আগেই বলেছি, আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, জানি না। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। সে জন্যই কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

লিজার খুনীর চেহারা যে কী, তা আমি জানি। জানি না শুধু, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। লিজার শরীর যেন আবার একটু তরঙ্গায়িত হলো। বলে উঠলো, 'থাক, কিছু বলবেন না যেন। আমি জানি, কেউ কেউ আছে, যারা জানে না, তারা কী মারণাস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলছি। আপনাকে বলেছিলাম, এই বইয়ের লেখকের নামটা আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু বইটা যতো শেষ হয়ে আসছে, ততো মনে হচ্ছে, কালকূট নামটা লেখক ঠিকই বেছে নিয়েছেন। তীব্র বিষ, খুব ঠিক কথা।'

আমি লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই একটা রহস্যের আবেষ্টনী ওকে ঘিরে আছে। কোনো কথাটাই যেন ও অমনি

বলে না। তার মধ্যে সব সময়েই, অন্য একটা অর্থ আছে। চর্যাপদের সান্ধ্য ভাষার মতো। শোনায় একরকম। তার গভীরের অর্থ আর একরকম। আমি বললাম, 'লেখকের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হলে, আপনার কথা বলব।'

লিজার ঠোঁট দুটি যেন একটু কেঁপে উঠলো। বললো, 'আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লেখকের দেখা হলে জিজ্ঞেস করব, চরিত্রগুলো সবই তার চেনা নাকি ?'

আমি বললাম, 'একজন লেখক যখন ছদ্মনামের আশ্রয় নেয়, তখন সে কোনো কথা কাউকে জানাতে চায় না বলেই বোধ হয় নেয়। শখ করে কেউ ছদ্মনাম নেয় কী না জানি না।'

লিজা বললো, 'তা ঠিক, তবে আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে জানতে চাইব তার তো একটা বিচার আছে। লেখক আমাকে বলবেন।'

আমি লিজার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে, আমার বইয়ের দিকে তাকালাম। লিজার গলা শুনতে পেলাম, 'অনেক রাত হয়েছে।'

আমি আবার ওর দিকে তাকালাম। ও বললো, 'আর না, এবার ঘুমোন। আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি।'

লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ওর ইচ্ছা না, আমি আর জেগে থাকি। ও চুপ করে ঘুমোবে, আমি জেগে থাকব, সেটাই যেন আপত্তি। বললাম, 'আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি।'

'না, আমি নেভাব।'

বলে, ও সুইচে হাত দিল। আমি বই পাশে রেখে ওর দিকে তাকালাম। লিজা বাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে আমি ওর নীচু স্বর শুনতে পেলাম, 'শুভরাত্রী।'

আমিও বললাম, 'শুভরাত্রি।'

অন্ধকারে আমি চোখ চেয়ে রইলাম। রাত্রি বোধ হয় অনেক। গাড়ির মধ্যে প্রায় কোনো শব্দই নেই। এমন কি নাসিকাধ্বনিরও না। সম্ভবতঃ প্যাসেজে টিম্-টিম্ করে একটা আলো জলছে। আর নিয়তির অমোঘ কষাঘাতে যেন এ গাড়ি ছুটে চলেছে দুর্বার।

মনে হলো লিজার একটা নিঃশ্বাস পড়লো, পাশ ফিরে শুলো। আর লিজার মুখটা মনে করেই আমার মনে হলো, বিচিত্র তার আপন হাতে ছড়িয়ে রেখেছে কতো রঙের ছবি। সে যেমন প্রকৃতির গায়ে আপন তুলি টেনে চলেছে নিরন্তর, মানুষকেও সেখান থেকে বাদ দেয়নি। এই লিজা বিচিত্রের আপন হাতে রাঙানো মানবী।

বিচিত্রকে আমি চিনি না, কিন্তু তাকে নমস্কার। গড় করি হে তোমাকে। কাজের মানুষকে তোমার দান কতোখানি, কে জানে। অকাজের চোখ আর মনকে বাঁচিয়ে রেখেছো তুমি।

সকালবেলাটা বাঁধা-ছাঁদার পালা বটে। তবে তাড়াহুড়ো নেই। সকলেই দু' রাত্রি যাত্রার পরে, আলিস্যির সঙ্গে গোছগাছ করছে। কামরার ভিড় কমে গিয়েছে। উপবাস-ভঙ্গের ভিড়ও অনেক কম। আজ আর সারি দেবার দরকার হয়নি। এ যাত্রায়, খাবার কামরার দায়িত্ব এখানেই শেষ। দুপুরে আর খাবার দেওয়া হবে না। তার আগেই গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছবে।

আমার বাঁধা-ছাঁদার তেমন দরকার নেই। ব্যাগটা গুছিয়ে নেওয়া নিয়ে ব্যাপার। চামড়ার স্যুটকেসটা তো আছে খাঁচাতেই। কিন্তু উপবাস-ভঙ্গের আসরে বসে, গোমেজ ঠাকরুণ অন্য সুরে বাজতে আরম্ভ করলেন। আজ তিনি টেবিল ছেড়ে ওঠবার নাম করছেন না। মেরী রোজা বিল্ আগেই খেয়ে চলে গিয়েছে। লিজা আমাদের পাশের টেবিলে বসে আছে। চুপচাপ বসে, বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপরে বইটা মোড়া। দেখলেই মনে হয়, পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে। ওটার দিকে এখন ওর মন নেই।

গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'কী হে, আমাদের দেখাশোনাটা কি এখানেই শেষ হবে নাকি ?'

আমি বলি, 'তা কেন ?'

'যোগাযোগ রাখবে তো ? তোমাকে বাপু, সত্যিই বলছি, আমার একটু ভালোই লেগে গেছে।'

আমি বললাম, 'যোগাযোগ রাখব না কেন ?'

পাশের টেবিল থেকে লিজা ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো। ঠোঁট টিপে হেসে, আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'কলকাতায় হেনরির সঙ্গে তো যে-কোন সময়েই যোগাযোগ করতে পারো। মেরীর সঙ্গেও তোমার আলাপ হয়ে গেল। মেরী আমার খুব ভালো পুত্রবধূ।'

আমি বললাম, 'আপনার ছেলের ঠিকানাটা আমাকে দেবেন।'

ঠাকরুণ বললেন, 'চল, কামরায় গিয়ে দেব। বম্বেতে কতদিন থাকবে ?'

'ঠিক কিছু বলতে পারছি না। দিন পনেরো ধরতে পারেন।'

'খুব ভালো। তাহলে তুমি একদিন আমার ছোট ছেলে জোশেফের বাড়িতে এসো না। ও কোলাবায় থাকে। আসবে একদিন সময় করে?'

এমন করে বললে, না বলা যায় না। বললাম, 'যাব একদিন।'

লিজা আবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। এবার ওর ঠোঁটের কোণে হাসি নেই, একটু যেন গম্ভীর। আমার দিকে দেখে, আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'সব থেকে ভালো হবে, ছুটির দিনে এলে। জোশেফ বাড়িতে থাকবে। ও খুব ভালো গীটার বাজাতে পারে, তোমাকে শোনাবে।'

বলে তিনি লিজার দিকে ফিরে বললেন, 'লিজা, খাবার বিলের পিছনে, জোশেফের ফ্ল্যাটের আর ফোন নম্বরটা লিখে দে তো একে।'

লিজা ফিরে তাকালো। ওর ঠোঁটে হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। চোখেও একটু ঝিলিক। বললো, 'আপনি জোশেফের ফ্ল্যাটে আসছেন বুঝি? খুব খুশি হলাম শুনে।'

ওর ভঙ্গিতে অবিশ্বাস আর বিদ্রূপটা স্পষ্ট। এতটা অবিশ্বাসের কারণ কী, জানি না। যেতেও তো পারি। তবে, মনের কোণে জিজ্ঞাসাটা আছে। পথের দেখাকে আর দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে কী হবে। এই তো বেশ! কোথা থেকে কেমন করে, দুটো রাত্রি একত্রে কেটে গেল। কিছু জানাজানি হলো। এবার চলো, যে যার আপনা খেলায় ভাসি।

লিজা বেয়ারার কাছ থেকে পেন্সিল নিয়ে, বিলের পিছনে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিল। তারপর ওর মায়ের দিকে ফিরে বললো, 'মা, উনি বম্বেতে কোথায় থাকবেন, সেটাও জেনে নিলে হতো না?'

ঠাকরুণ বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাও জেনে নিলে হয়।'

আমি লিজার দিকে তাকালাম। লিজার ঠোঁটে তেমনি হাসি। জোশেফের ঠিকানা লেখা কাগজটা অর্ধেক ছিঁড়ে, পেন্সিল সহ, আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বললো, 'ফোন নম্বর থাকলে, সেটা শুদ্ধই দেবেন।'

বললাম, 'ফোন আছে কী না জানি না।'

'আচ্ছা, তাহলে নাম-ঠিকানাটাই লিখে দিন।'

নাম-ঠিকানাটা লিখে দিতেই, লিজা যেন চমকে উঠলো। বললো, 'কী আশ্চর্য, ইনি তো বম্বের বিখ্যাত লোক! ইনি আপনার কে হন?'

'বন্ধু।'

আমার দিকে চেয়ে থাকা লিজার চোখের পাতা একটু যেন কুঁকড়ে এলো। তারপরে নিজের মনেই দু'বার ঘাড় নাড়লো। এ সময়ে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে

এলো। গোমেজ ঠাকরুণ উঠলেন। বললেন, 'আমি এ স্টেশনেই নেমে যাই। আর তো বেশি দেরি নেই। জিনিসপত্র দেখে শুনে নিই গিয়ে।'

বলতে বলতে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি একবার লিজার দিকে তাকালাম। ও তখন আমার বন্ধুর ঠিকানাটাই দেখছে। দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি ওর ওঠবার ইচ্ছা নেই, আরো কিছুক্ষণ থাকবে। গাড়ি থামছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। লিজাকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন।' তার আগেই লিজা ডেকে উঠলো, 'শুনুন কালকূট।'

আমি প্রায় বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো লিজার দিকে ফিরে তাকালাম। লিজার চোখ আমার চোখের ওপরে। এক মুহূর্ত আমরা দুজনে কোনো কথা বললাম না। লিজার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু তা বিদ্রূপে বাঁকা না। চোখের ইশারায়, ওর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বললো, 'একটু বসুন না।'

একটা চমক আমার বুকে, প্রায় স্থির বিদ্যুতের মতো লেগে রইলো। জানি না মুখে, সেটা কতোখানি ছায়া ফেলল। কিন্তু লিজার কথাটা কী ভাবে নেব, বুঝতে পারছি না। সব জেনে-শুনে, এ কি কেবলই একটা রহস্যের খেলা?

যা-ই হোক আমি অন্ততঃ সেই খেলাটা ওর সঙ্গে আর খেলব না। লিজা সম্পর্কে, এটুকু আমি বুঝেছি, ওর কাছে গোপনীয়তাটাই এখন আমার অস্বস্তির কারণ। মেলে দেওয়াটাই স্বস্তি। আমি ওর পাশে বসলাম। তথাপি, আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা জেগে রইলো। পাশে বসে, আমি ওর দিকে তাকালাম।

লিজার টানা চোখের কালো তারা দুটি যেন বড় বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওর সমস্ত মুখটা যেন ঝকঝক করছে। টেবিলের ওপরে আমি হাত রেখে ছিলাম। ও হঠাৎ আমার হাতের ওপর ওর একটি হাত রাখলো। ওর চোখেও এখন একটা তীব্র উৎসুক জিজ্ঞাসা। আমি একটু হেসে, সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'জানতেন যখন, বলেননি কেন?'

লিজার গলার স্বর প্রায় চুপি চুপি শোনালো। ওর মনে এখন একটা উত্তেজনাও আছে। বললো, 'আগে থেকে কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমার মন বলে দিল, এই সেই।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মন বলে দিল?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার মন বলে দিয়েছে। আমার মন এ রকম এক এক সময় বলে দেয়। এক এক জনকে কেমন করে যেন চিনিয়ে দেয়।'

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। লিজা আমার চোখ থেকে, চোখ

নামালো। আমার হাতের ওপর, ওর রাঙানো নখ গোরা হাতটার দিকে তাকালো। আবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিল। কিন্তু মুখ নামিয়ে, আস্তে আস্তে বললো, 'জীবনে আপনাকে আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। কিন্তু কেমন এক রকম করে যেন আপনাকে চিনলাম। আমি বুঝি, আপনি নির্ঝঞ্ঝাটের মানুষ। আপনি সবাইকে চিনবেন, আপনাকে কেউ চিনবে না। চেনা ধরার বাইরে থাকতে চান।'

আমি ওর নত মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। ও মুখ তুলে, আমার দিকে তাকালো। বললো, 'তার জন্য আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু আমার কথাটা তো আমাকে জানাতে হবে। লেখকের নাম জানাটা বড় কথা না। বইটা পড়তে আরম্ভ করে, যেন আমার বাবে বারেই মনে হয়েছিল, এই তো সেই মানুষ, তীব্র বিষ, আমারই সামনে বসে। তার জন্য আপনাকে অনেক কথা বলেছিলাম, কত কী। কিন্তু যখন বন্ধুত্ব চাইলাম, আর এই চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে পেলাম, আমি যেন সবটুকু ধরা পড়ে গেছি, তখন আমারও সবটুকু চেনা হয়ে গেল। আমি মানুষটাকে চিনতে পারলাম।'

আমি জানি, লিজা মিথ্যা কথা বলেনি। গতকাল, এখানে সেই সময়ে ওর চোখে জল এসে পড়েছিল। এখন এই মুহূর্তেও, লিজার সেই মূর্তিটাই যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। চোখের কালো তারার ওপারে যে লিজা আছে। সুখ মানুষকে ছলনা করে। দুঃখ তাকে চিনতে শেখায়। দুঃখের ধনটা লিজার আছে, তা জানি। বেশে বাসে, যে আমার অচেনা ছিল, সে আমারও চেনা। লিজা যে আমাকে এমন করে চিনেছে, তার জন্য ওর কাছেও আমি শুধু কৃতজ্ঞ না। শপথ করতে ইচ্ছা করে, পথের দেখা এমন বন্ধুকে, জীবনে কখনো ভুলব না।

কিন্তু হায় মন, নিরন্তরের অকৃতজ্ঞ, এ শপথের কোনো মূল্য নেই। পথের দিশাটা এমনই, বাঁকে বাঁকে সে নানা রূপে সেজে বসে আছে। এই মুহূর্তের পথ চলাতে, যাকে চির পটে আঁকা বলে মনে হচ্ছে, বাঁকে ফিরে সে হারিয়ে যায়। তখন চির পটের ছলনায় আর কিছু আঁকা। গতকাল রাত্রে না সেই জন্যই বিচিত্রকে গড় করেছিলাম!

লিজা জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু বলবেন না ?'

আমি হেসে বললাম, 'কি বলব বলুন। এমন মেমসাহেব জীবনে দেখিনি।'

লিজা হাসতে গিয়েই যেন, একটা আর্তনাদ করে উঠল, 'উহ্। কত ছলনা জানেন।'

বললাম, 'ছলনা না। পথের দেখায়, এমন একজনের সঙ্গে চেনা হবে, ভাবিনি।'

'চেনা হয়েছে সত্যি?'

'সত্যি। সে আমাকে যত চিনেছে, হয়তো ততটা চিনিনি। কিন্তু বন্ধুকে চিনতে পেরেছি।'

লিজা বললো, 'তবু তো একবার হাত ধরে সে কথা বললেন না?'

'তার হাত ধরার থেকেও বেশি করে ধরেছি।'

লিজা হঠাৎ আমার হাতের কামিজ চেপে ধরলো। কথা বলতে যেন ওর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, এমনি ভাবে বললো, 'ওহ্, গতকাল একটা গালাগাল বুঝি দিইনি? আপনি মিথ্যুক, একটা প্রকাণ্ড বড় মিথ্যুক। এটাও আপনাকে আমার একটা চেনা। তবু সত্যি বলছি, শুনতে বড় ভালো লাগছে।'

আমি বললাম, 'আপনি যে এমন করে বলতে পারেন, তার কারণ, কষ্টই আপনাকে সহজ করেছে।'

লিজা বললো, 'শুনতে চাই না।'

'বেশ। তাহলে বলি, জীবনের জানাটা এমন হয়েছে, এখন আর অকপট হতে আপনার আটকায় না। শুনুন লিজা—'

'শুনব না। আমাকে কি এখন 'তুমি' বলা যায় না?'

'এখন না হলেও পরে বলা যাবে, সময় তার নিজের দান নিজে নেয়, নিজেই দেয়। কারোর ওপর কিছুই সে ছেড়ে দেয় না।'

লিজা আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। বললো, 'বেশ। কী বলছিলেন, বলুন।'

বললাম, 'বলছিলাম, আপনার এই চেনাটাকে চিরদিন মনে থাকবে।'

লিজা তখনো আমার কামিজ চেপে ধরে রেখেছিল। সেখানে আর একবার টান পড়লো। বললো, 'আবার, আবার আমি কি এ সব কথা শুনতে চেয়েছি নাকি? কথার কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। একটা কথা চাই।'

'কী কথা?'

'তার আগে, কয়েকটা কথা বলে নিই। জানি, যে আমার কাছে বসে, তাকে কিছু বোঝাবার নেই। তবু সে ভাবে, সংসারের কিছু নিয়মের ব্যাপারে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।'

বলে ও এক মুহূর্ত থেমে, আমাকে দেখে নিল। তারপরে বললো, 'জীবনে অনেকের সঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা হয়। সেটা এমন কিছু না। কলকাতার

গঙ্গায়, মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে, নৌকায় বেড়াতে গিয়েছি। এক একটা জায়গায় জলের টানা স্রোতের মধ্যে হঠাৎ থমকানো দেখেছি। সেখানে জলটা যেন একটা বড় থালার মতো স্থির। তার পাশ ঘেঁষেই আবার পাক খেয়ে, স্রোত চলে যাচ্ছে। মাঝি বলেছে, একে বলে ঘূর্ণী। মানুষ বা ছোটখাটো কিছু হলে, এখানে আটকা পড়ে যাবে।'

কথাগুলো একটানা বলতে যেন ও একটু হাঁপিয়ে পড়লো। থামলো, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে, কামিজটা ও চেপে চেপে কোঁচকানোটা সোজা করে দিতে লাগলো। তারপরে বললো, 'জীবনে, অনেকের সঙ্গে টানা স্রোতে যেতে যেতে, কখনো কখনো ঘূর্ণীতে পড়তে হয়। তখন আর নিজের ইচ্ছায় চলে যাওয়া যায় না। আমি জানি না, আপনি ঈশ্বর নিয়তি ভাগ্য, কিছু মানেন কী না। আমি মানি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার ভাগ্য, আমার নিয়তি।'

এই মুহূর্তে, আমি একটু অস্থির বোধ করলাম। আমার পথ চলার বেগে যেন, কোথায় একটা হঠাৎ ছায়ার বিস্তার। পথের রেখার অস্পষ্টতা। আমার পাখার ঝাপটায় ভার। আমার আনন্দ বিড়ম্বিত। বললাম, 'কিন্তু আমি তো এমন করে ভাবিনি।'

লিজা বললো, 'আপনি কেন ভাববেন। আপনি তো কারোর জন্য ভেবে, পাকে পাকে ঘুরে চলছেন না। তাই একটা কথা চেয়েছি। নিয়তিকে মেনেছি, আমার মাকে মিথ্যা বলেননি তো ? যোগাযোগ থাকবে তো ?'

কী বলব লিজাকে। আমি জানি, ওর মা নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে আমাকে কিছু বলেননি। তার মধ্যে আন্তরিকতাও ছিল। কিন্তু গোমেজ ঠাকরুণের আর লিজার কথার মূল আলাদা। চরিত্র আলাদা। যোগাযোগের কথা বলছে, সেটাকে বজায় রেখে, জীবনে যে আনন্দটাকে বজায় রাখা যাবে, তা আমার মনে হয় না। কিন্তু সে কথাটা এখন ওকে বোঝানো দায়। কারণ, সব কিছুর-দায় যে লিজা ওর নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছে।

লিজা বললো, 'ভয় নেই, দুঃখ বা অস্বস্তির কিছু ঘটবে না তাতে।'

বললাম, 'ভয় আমি পাই না।'

'তাও আমি জানি। কারণ সে এত চতুর নিষ্ঠুর, কোনো কিছুতেই তার ভয় নেই।'

বলতে বলতেই, লিজার একটা নিঃশ্বাস পড়লো। আমি বললাম, 'যতখানি সম্ভব, যোগাযোগ আমি রাখব।'

লিজা চুপ করে চেয়ে রইলো, খানিকক্ষণ কোনো কথা বললো না। বোধ হয়, ও বুঝতে চাইলো, আমার কথার মধ্যে, ফাঁকির আওয়াজ কতোখানি। তারপরে চোখ নামিয়ে নিল। ওকে যেন কেমন সহায়হীন, একলা একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে বলে মনে হলো। আমি ডাকলাম, 'লিজা।'

লিজা না তাকিয়েই বললো, 'বলুন।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনাকে তো বলেছি, ভাগ্য আর নিয়তিকে আমি মেনে নিয়েছি। আমি তো কোনো কষ্ট দেবার কথা ভাবি না। কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।'

'বললাম, 'আমি শুনব।'

লিজা চেয়ে রইলো, কিন্তু ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইলো। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। ক্রমেই প্রকৃতির চেহারা আবার বদলে যাচ্ছে। মানুষের চেহারাও। গ্রামীণ মানুষ ক্রমেই শহুরে হয়ে দেখা দিচ্ছে। বস্তিগুলোর বদলে পাকা বাড়ি, কল-কারখানার চিমনি। যাত্রা শেষ হয়ে এলো প্রায়। তারপরে আর এক নতুন যাত্রা।

'কী মোশাই?'

লিজা হাসির ঝলকে বাজল। দেখলাম, ওর চোখেও হাসির ঝিলিক। ও বললো, 'ভাবছেন, কী পাগলের পাল্লায় পড়লাম।'

হেসে বললাম, 'পাগল তো বটেই।'

'ইস্!'

'একে মেমসাহেব, তায় বাংলা বলে—'

'ডাঁটা-চচ্চড়ি আর টক খেতে ভালবাসে।'

'এর থেকে আর বড় পাগল আছে নাকি!'

লিজা খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর হঠাৎ থেমে বললো, 'হে ঈশ্বর, একটা কথা যে জিজ্ঞেস করা হয়নি। মেয়ে হয়ে, কথাটা ভুলে ছিলাম কেমন করে?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কথা?'

লিজা হঠাৎ আমার আর একটু কাছে এসে, প্রায় যেন চুপি চুপি গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'মেমসাহেবকে কেমন লাগল?'

সাতকাণ্ড রামায়ণের পরে, সীতা কার বাপ! এ যে সেই গোত্র হলো। লিজাকে কি কিছু বলার আর বাকী আছে? তবু, ও বলেছে, মেয়ে হয়ে এ কথাটা না জেনে পারবে না।

লিজা ভুরু কাঁপিয়ে বললো, 'কী ?'

একবার ভাবলাম, বলি, 'দুঃখিনী মেমসাহেবটিকে ভালোই লাগল।' কিন্তু সে কথাটা বলতে ইচ্ছা করলো না। কেবল বললাম, 'সুন্দর।'

লিজার রুদ্ধ হাসিটা খিলখিলিয়ে বেজে উঠলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ওর কালো তারার মেঘে, তখন ঢল নেমে এসেছে।

রেলের যাত্রা শেষ। গন্তব্য আরব সাগরের কূল। এবার ছুটোছুটি, নামানামি। ঠাকরুণ আগে নেমে, কুলিকে ডাকাডাকি। তারপর রোজাকে আর মেরীকে ভিতরে রেখে, নিজে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন, কুলিকে যাতে সামলাতে পারেন। কুলি এসে ওঁর সামনে মাল নামাতে লাগলো। আমার মালপত্র বেশি নেই। একটি ব্যাগ, একটি স্যুটকেস। লিজা আর বিল্ ঠাকরুণের কাছেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি সেটা দেখছিলাম না। আমি দেখছিলাম, গণেশদাদা, কলাবউ ঠাকরুণের হাতটি ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল গোমেজ ঠাকরুণের সামনে। গোমেজ ঠাকরুণ চোখ পাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু যার দিকে দেখলেন, তার ঘোমটার মধ্যেই সব। গণেশদাদা কুলি দিয়ে মাল পত্র নামাতে ব্যস্ত। এবং প্রথম কিস্তি মালপত্র এনেই, ফেললো একেবারে ঠাকরুণের পায়ের কাছে।

ঠাকরুণ যা বললেন, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'এ বদ লোকটা আমার পেছনে লেগেছে, না কী ?'

লিজা আমি চোখাচোখি করে হাসলাম। আমার এবার যাওয়া দরকার। কিন্তু ঠাকরুণের কাছ থেকে এ অবস্থায় বিদায় নেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, রোজা আর মেরী এখনো গাড়ির মধ্যে। ওদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, আর একটা বড় সাধ। রোজাকে একটা সিগারেট খাইয়ে যাই। আজ সকাল থেকে সে সুযোগ পাওয়া যায়নি। আর যাবে কী ?

আমি লিজার কাছেই দাঁড়িয়ে। আমার স্যুটকেস ব্যাগও আমার কাছেই। লিজা জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছেন ?'

বললাম, 'রোজাকে বোধ হয় আর সিগারেট খাওয়াবার সুযোগ পেলাম না।'

লিজা বললো, 'কোলাবায় তো আসবেন একদিন, সেদিন খাওয়াবেন।'

যে যার নিজের তালে বাজে। লিজা আবার বললো, 'রোজাকে এ কথা বলব, ও খুব খুশি হবে।'

দূর থেকে দেখলাম, রোজা আর মেরী নেমে আসছে। ঠিক এ সময়েই

আমার কাঁধের ওপর হাত পড়লো। ফিরে তাকিয়ে, অবাক হয়ে দেখলাম বম্বে-প্রবাসী বন্ধু। বিখ্যাত সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি সুরঞ্জন। ভারতবর্ষে একডাকে তাকে সবাই চেনে। ভাগ্যে না থাকলে, এমন বন্ধু সকলের হয় না। লিজা তখন কাগজে লেখা নামটা পড়ে তা-ই অমন করে বলে উঠেছিল। বললাম, 'তুমি নিজেই চলে এসেছো ?'

সুরঞ্জন গম্ভীর গলায় খুশির আমেজ মিশিয়ে বললো, 'তা না এসে কী করব। বম্বে শহর বলে কথা, তুমি যা হাঁদা, কোথায় যেতে কোথায় যাবে, কে জানে।'

লিজা ফিক করে বেজে উঠেই, থেমে গেল। কিন্তু শরীরের তরঙ্গকে সহসা থামাতে পারলো না। আমি আপত্তির সুরে বললাম, 'হাঁদা মানে, কলকাতা খাঁটা লোক আমি।'

সুরঞ্জনের পরিষ্কার জবাব, 'তোমার খাঁটাঘাটি রাখো। আসলে তো মফস্বলের লোক, দু'দিন কলকাতা দেখছ।'

'আর তুমি ? তুমি তো সেদিনও এঁদো পাড়াগাঁয়ে ছিলে।'

সুরঞ্জন ঘাড় নেড়ে হেসে বললো, 'ছিলাম, কিন্তু তুমি লোককে গিয়ে বলো, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

বলে ও বুকটান করে দাঁড়ালো। লিজা আবার আওয়াজ দিল। সুরঞ্জন একবার লিজার দিকে দেখলো। তারপরে আমার দিকে ফিরে বললো, 'চল এবার, তোমার জিনিষপত্র সব কোথায় ?'

'এখানেই আছে, কুলিও ধরা আছে।'

বলেই আমি গোমেজ ঠাকরুণকে দেখিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' বলে সকলের নামে নামে পরিচয় করিয়ে দিলাম।—'কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে এলাম, খুব আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। সকলেই খুব ভালো। আর এ আমার বন্ধু সুরঞ্জন।'

সুরঞ্জন সকলের দিকেই তাকিয়ে, ঘাড় নাড়লো। কিন্তু কেমন যেন শুকনো নির্বিকার ভাব। তারপর আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সকলেই একদিন কোলাবায় যাবার জন্য বারে বারে বললো, লিজা ছাড়া। কুলির হাতে মাল দিয়ে, আমি বন্ধুর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। লিজা একবারও আমার দিক থেকে চোখ ফেরালো না। রোজা আর মেরী একবার লিজা, আর একবার আমার দিকে দেখতে লাগলো। গোমেজ ঠাকরুণ তখন কুলির মাথায় মাল চাপাতে ব্যস্ত।

সুরঞ্জন আমার কাঁধে হাত দিয়ে, সামনের দিকে টেনে নিয়ে চললো। বললো, 'আলাপটা একটু বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বেশ ঘরোয়া ভাবেই।'

সুরঞ্জন বললো, 'সে তো দেখতেই পেলাম। দেখো, একেবারে ঘর পেতে বসো না যেন।' আমি ঠাট্টার সুরে হাসলাম। সুরঞ্জন বললো, 'তবে এরা ঘর বাঁধবারও লোক না। এদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী রকম ?'

সুরঞ্জন বললো, 'শুনি তো, এরা একটু দোহনের তালে থাকে। ফ্যামিলি লাইফ-টাইফ বলে কিছু নেই তো। তোমাকে কোনো রকম দোহন করেনি তো ?'

বললাম, 'সেই জন্যই তোমার কথাটা একেবারেই মেনে নিতে পারলাম না।'

সুরঞ্জন বললো, 'মানামানির কিছু নেই। একটু-আধটু যা দেখেছি আর শুনেছি, তাতেই বললাম। কোলাবা-টোলাবা যেন সত্যি যেও না।'

মনে হলো, এ সময়ে এ সব তর্ক নিরর্থক। বললাম, 'যাকগে ও সব কথা। এত দিন বাদে দেখা হলো, কেমন আছ বলো ?'

সুরঞ্জন বললো, 'চলছে। এক কথায় ভালো বলতে পারো।'

বলতে বলতে, আমরা ইষ্টিশনের বাইরে চলে এলাম। যেখানে গাড়িগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। সুরঞ্জন একটা বড় গাড়ির সামনে দাঁড়ালো। পিছনের ক্যারিয়ার চাবি দিয়ে খুলে দিল। কুলি তাতে মাল ওঠালো। আমি তাকে পয়সা দিলাম। সুরঞ্জন ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে, কাঁচ নামাতে আরম্ভ করেছে। আমাকে ডেকে বললো, 'এদিকে এস।'

আমি গিয়ে দরজা খুলে ওর পাশে বসতে, ও বললো, 'আমরা একেবারে শহরের বুকে থাকি না, একটু বাইরে থাকি।'

শোধ নিতে কসুর করলাম না, 'মফস্বলে থাকো তুমি ?'

সুরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো, 'আজ্ঞে না স্যার, রীতিমত অভিজাত নিরিবিলি পল্লীতে। আমি কি ব্যবসা করি, যে শহরের ওপরে থাকব ?'

আমি হাসলাম। সুরঞ্জনকে দেখছি, আর ভাবছি। চেহারাটা ওর আগের থেকে সুন্দর হয়েছে। দেখতে ও বরাবরই সুন্দর। তবে দারিদ্র্যের একটা ছাপ আছে তো। জীবন-ধারণেরও একটা ছাপ থাকে। আগের সেই ছাপটা উঠে গিয়ে, ও এখন ঝকঝকিয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যটা আগের থেকে ভালো হয়েছে। এখন বাড়ি-গাড়ির মালিক। বউটি অত্যন্ত সরল আর ভালো মেয়ে। কলকাতায় থাকতেই বিয়ে করেছিল।

এই সুরঞ্জন জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। সভা-সমিতিতে গান গেয়ে বেড়িয়েছে। নিজে গান বেঁধেছে। নিজে সুর দিয়েছে। পরখ করার দরকার হয়নি, সবাই তারিফ করেছে। স্নেহও যে করেনি, তা না। সেই স্নেহের মূল্যে, জীবন-ধারণটা ছিল মিটমিটে আলোর মতো। সব থেকে বড় কথা, মিটমিটে আলোটা ওকে দমাতে পারে নি। সৃষ্টিটাকে দমিয়ে রাখা যায়নি।

তারপর বম্বের নাম-করা চিত্র-পরিচালক জীবনকৃষ্ণ ওকে ডেকে নিয়ে এলেন। সুরঞ্জনকে ছবির সুরকার করলেন। প্রথম ছবিই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি পেয়েছিল। সুরঞ্জন এখন খ্যাতিমান সুরকার।

সহসা আমার বাঁদিকে, একটা দূর বিস্তৃতি যেন ঢেউ দিয়ে উঠলো। আমি দেখলাম, নীল জল, ফেনিলোচ্ছল, রূপোলী কণায় ছিটকে উঠছে। সুরঞ্জনের গলা শোনা গেল, 'আরব সাগর।'

আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ এক কূল থেকে এলাম আর এক কূলে। অচিন কূলে। নতুন কূলকে দেখব দু'চোখ ভরে। নতুন কূলের নানারূপের বিচিত্রকে। কেবল কি কূলকেই দেখব? কূলের কুলায় কুলায় যাব, নানান্ কুলায় কুলায়। আরব সাগরের কূল যেখানে, নানা বর্ণে বর্ণালী হয়ে আছে।

একটু পরেই সমুদ্রকে চোখের আড়াল করে, ইমারত দাঁড়িয়ে গেল। সুরঞ্জন গাড়ি চালাতে চালাতে বললো, 'জিজ্ঞেস করছিলে তখন, কেমন আছি। খারাপ আছি, বলা যাবে না। তবে তারে বাজছে না বুঝলে তো?'

সহসা কথাটার কী অর্থ ধরে নেব, বুঝলাম না। তবে কোথায় যেন একটু বেসুর বাজছে। সুরঞ্জন একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো, আবার বললো, 'কাজকর্ম নিয়ে, ব্যস্ত থাকতে পারলে ভালো। নীলা আর খোকাকে নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় কাটাই। তারপরে যেন সব কেমন খাঁ খাঁ করতে থাকে। এখানে নিজেকে যন্ত্রের মতো করে ফেলতে না পারলে রক্ষা নেই। এখানকার সঙ্গে কলকাতার এটাই তফাত।'

বুঝতে পারলাম, সুরঞ্জন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, ঝকমকে হয়েছে। কিন্তু কলকাতার সেই টলটলিয়ে ছলছলিয়ে বেগে বয়ে বেড়ানোটা নেই। জীবনের আসল ছন্দটাই ঠিক মতো বাজছে না। সেটা বেতালে আড়ি দিচ্ছে।

সুরঞ্জন আবার নিজেই বললো, 'এ সব কথাও পরে অনেক হতে পারবে। জীবনকৃষ্ণদার সঙ্গে তুমি তোমার কাজকর্মের কথাগুলো বলে নাও। তবে আমার বাড়িতে এক কাণ্ড হয়েছে। তোমার বন্ধু-পত্নী খুবই বিপদে পড়েছে, অবিশ্যি আমিও।'

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বিপদ?'

সুরঞ্জন হাতের ইশারা করে বলল, 'এত ভাববার কিছু নেই। এ রকম কাণ্ড কারখানা আমাদের হামেশাই দেখতে হয়, ঝঞ্ঝাটও পোহাতে হয়। গেলেই সব দেখতে পাবে। বিপদ বলে বলছি বটে, মজাও পেতে পারো।'

সুরঞ্জনও দেখছি, রহস্যের ছায়ায় ঘেরা। সুরঞ্জনের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝতে পারছি, উদ্বিগ্ন হবার মতো বিপজ্জনক কাণ্ড ঘটেনি। তবে একটা কিছু ঘটেছে।

প্রচণ্ড আর নিরেট শহরটা যেন ক্রমে একটু নিশ্বাস ফেলছে। একটু ফাঁকা, নতুন নতুন বাড়ি। কিছু গাছপালা, একটু বাগানের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। সব থেকে ভালো লাগছে, নারকেল গাছ দেখে। বাংলাদেশের ছেলে, এমন কাজল মাখানো নারকেল পাতার ঝিলিমিলি না দেখলে যেন নজরকে কেমন উপোসী মনে হয়। নোনা কূলের এইটুকু কেরামতি। সে নারকেলে আর তালে, সমান তাল দেয়। কিন্তু হাওড়া ইষ্টিশন থেকে, এক টানে তোমাকে, রাঢ়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিক। দেখবে, সমান তাল আর নেই। তালপাতার বাউরি ঝাপটায়, অন্য তাল শুনবে।

সুরঞ্জন আবার বললো, 'আমার বাড়িতে গিয়ে, তুমি তোমার চেনা দু'তিন-জনকে দেখতে পাবে।'

রূপোলী পর্দায়, মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকে, নানা কারিগর, এমন চেনা-পরিচিত বন্ধু এদেশে কিছু আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে কে?'

সুরঞ্জন বলল, 'কেশব, বিধান আর রণোকে দেখে এসেছি। তারাও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

আমি প্রথমেই বলে উঠলাম, 'রণোও এসেছে?'

'হ্যাঁ, শ্রীমান রণদেব। বলবার কিছু নেই, দিনে দিনে সবই দেখতে পাবে, কেশব-বিধানও তো তোমার পরিচিত।'

'পরিচিত। রণো বন্ধু।'

সুরঞ্জন বললো, 'তা বটে। তবে রণোর বম্বেতে থাকার কোনো মানে হচ্ছে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওর ভেতরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিছু টাকা পাচ্ছে বটে, হয়তো অঙ্কটাও একেবারে খারাপ না। কিন্তু শুনলে অবাক হবে, তার জন্য ওকে কিছু করতে হয় না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে আবার কী রকম? টাকা পাচ্ছে, অথচ কিছুই করতে হচ্ছে না?'

'কিছুটি না। যাকে বলে তৃণকুটোটি ভেঙে দু-টুকরো করতে হচ্ছে না।'

'তবে ও করে কী সারাদিন?'

'যদি নিজের মনে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে, ঘরের দরজা বন্ধ করে, সেইটুকু করে। তা না হলে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

একটু আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'যা-ই হোক, তবু দরজা বন্ধ করে নিজের কাজকর্ম কিছু করে।'

সুরঞ্জন বলল, 'বলে তো তা-ই, আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে, কেমন একটা অস্থির ভাব, আর সব সময়ই রেগে আছে। সবাইকে গালাগাল দিচ্ছে। আমাকে তো সবসময়ে গালাগাল দিচ্ছে, আমার বাড়িতে বসেই। নীলা এক একসময় একটু গম্ভীর হয়ে যায়। আমি বুঝিয়ে বলি। গিয়ে দেখবে, যেমন জামাকাপড়ের চেহারা, তেমনি চেহারাটা। দেখ, তোমাকেই বা কী বলে।'

সুরঞ্জন যেন রণোর পুরোপুরি চেহারা আর চরিত্রটা আমার চোখের সামনে এঁকে দিল। রণো বরাবরই একটু উচ্চ গলার মানুষ। মিহি বা মোলায়েম ভাষাটা কোনোদিনই ওর আসে না। লক্ষ্য ওর চিত্র-জগৎ, রূপোলী পর্দা। কিন্তু ওর চিন্তার মধ্যে কোথাও রূপোলী শব্দটা নেই। রণো হলো উজানের মানুষ। ছবির জগতে, ওর চিন্তাভাবনাটা আলাদা। ফলে, মেলে না প্রায় কারোর সঙ্গেই। অথচ, ওরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কেউ কেউ ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। যাদের ও অন্তর থেকে তারিফ করতে পারলো না। সেটা কতোখানি ওর নিজস্ব শিল্পী-ভাবনা থেকে, কতোটা অন্ধ বিদ্বেষে, জানি না। কেন না, এ রকম ক্ষেত্রে, বিদ্বেষটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার না। তার ওপরে, নিতান্ত জীবন-ধারণের জন্য, কলকাতা থেকে এখানে এসে, ওকে এই রকম একটা চাকরি করতে হচ্ছে। যে চাকরিটা আসলে ওকে করুণা করার জন্যই।

কিন্তু রণো আর যা-ই হোক, করুণা করবার পাত্র না। ও হয়তো এখনো ওর প্রতিভার পূর্ণ চেহারাটা দেখাতে পারেনি। কিন্তু ইতিমধ্যেই, নাটকে বা বা ছবির চিন্তায়, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই অনেকে ওর দিকে অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছে। ওর ওই রোগা লম্বা শক্ত হাড় রূঢ় চেহারার দিকে তাকিয়ে করুণা করবার সাহস অন্ততঃ কারোর হবে না। ও যখন বিড়ি কামড়ে ধরে, আজানুলম্বিত বাহু তুলে কথা বলে, তখন ও নিজের মর্যাদায় ঝকঝক করে।

একটা খোলা গেট দিয়ে, সুরঞ্জন গাড়ি ঢুকিয়ে দিল পাঁচিল ঘেরা ছোট

উঠোনে। দরজা খুলে, নামতে নামতে বললো, 'এস ওপরে যাই। চাকারটা এসে ক্যারিয়ার থেকে মালপত্র নিয়ে যাবে।'

ঝকঝকে বাড়ি, ছোটখাটো বাগান। বারান্দার পাশ দিয়ে, সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ওপরে। সুরঞ্জনের পিছে পিছে যাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, বারান্দার ডানদিকেই, সাজানো বসবার ঘর। রণোই আমাকে প্রথম ওর নিজের ভাষায় অভ্যর্থনা করল, 'এই যে শালা লেখক। এসো। এবার বম্বেতে বিকোতে এসেছ ?'

সুরঞ্জন বললো, 'বাবা, কিছু না হোক, দু-বছর বাদে তো দেখা! পাঁচ মিনিট একটু শ-কার ব-কার ছেড়ে, অন্য কিছু বল, তারপরে তো আছেই।'

রণোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠিক যেমনটি সুরঞ্জন বলেছিল। ও একটা বড় সোফায় গা এলিয়ে, কোঁচাটা মেঝেয় লুটিয়ে দিয়ে বসেছিল। তেমনি ভাবে বসেই আবার আমার দিকে চেয়ে বললো, 'এতখানি ট্রেন-জার্নি করে এলো, তবু শালাকে দেখো। যেন কেষ্ট ঠাকুরটির মতো চুক চুক করছে। বম্বের নামেতেই এই ?'

একে বলে রণোর ভাষা। আমার যেন, বুকের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশছে। এই না হলে অভ্যর্থনা! তাও আবার রণোর মতো বন্ধুর। আমি চকচকে চোখ নিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম

রণো আবার বললো, 'কী রে শালা, কথা বলছিস না-যে ?'

বললাম, 'তোকে দেখছি।'

রণো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললো, 'আমাকে দেখে লবডঙ্কা হবে।'

দেখলাম, কেশব আর বিধানও বসে রয়েছে। এক কোণের একটি সোফায়. কালো মতো একটি মেয়ে চুপচাপ বসা। ঘরে ঢোকার পর, মাত্র একবার তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছে। তারপরে সে আর মেঝে থেকে চোখ তোলেনি। কেশব আর বিধানের সঙ্গে দু' একটি কথা হলো। সুরঞ্জন বলে উঠলো আমাকে, 'ওরা সবাই থাকবে, তুমি এস দিকিনি। চান করে, আগে খেয়ে নাও, তারপরে যতো খুশি আড্ডা মেরো।'

যুক্তিযুক্ত কথা। আমি সুরঞ্জনের সঙ্গে, ভিতর-বাড়িতে গেলাম। সুরঞ্জন ডাকলো, 'কই, কোথায় গেলে ?'

নীলা এসে ঘরে ঢুকলো। আমার চেনা মেয়ে, অতএব পরিচয় করাবার কিছু নেই। নীলা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, 'খুব কষ্ট হয়েছে তো ?'

বললাম, 'কষ্ট মনে করলে। ভালোই তো এলাম।'

সুরঞ্জন বললো, 'আমি ওর স্যুটকেস ব্যাগ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওর স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা দেখ।'

সুরঞ্জন চলে যেতে উদ্যত হয়ে ফিরলো, 'হ্যাঁ, ওদিকে কতো দূর?'

নীলা রাগতঃ ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে বললো, 'কোন দূরেই না। সেই এক বুলি ধরে বসে আছে, আমি যাব না। এই বেলা তোমাকে বলে রাখছি, ভালোয় ভালোয় যদি বিদেয় না হয়, তাহলে ওকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।'

একে বলে মোক্ষম কথা। তবু তো বলেনি, খেংরে বিদায় করব। এ এমন জিনিস, বাঙালী মেয়ের হাতে উঠলে, অ্যাটমের থেকে বড় অস্ত্র। নীলার সুন্দর মুখখানি রাগে লাল হয়ে উঠেছে। সুরঞ্জন হাত তুলে, নীলাকে থামিয়ে বললো, 'আরে দাঁড়াও না, হচ্ছে। বিদেয় করা তো হবেই। এখন তুমি লেখককে খাওয়াও তো। তারপরে ওকেও কাজে লাগাতে হবে। দেখা যাক কিছু বের করা যায় কী না।'

বলে সুরঞ্জন বেরিয়ে গেল। অনুমান করলাম, পথে আসতে সুরঞ্জন যে-বিপদের কথা বলেছিল, তারই বিষয়ে কথা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী?'

নীলা বলল, 'দেখলেন না, বসবার ঘরে একটা মেয়ে বসে আছে?'

'দেখলাম তো।'

'রূপের কী ঘটা মায়ের আমার, তাও দেখেছেন। উনি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছেন, জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনের ছবিতে নামবেন। বাঁদরিটা নিজের চেহারাটা কোনোদিন আয়নায় দেখেনি?'

রূপসী নীলা সে কথা বলবার যোগ্য। ঘটনাও আক্কেল গুড়ুম হবার মতো বটে। রূপ না থাক, মেয়েটিকে সোমত্থ বলেই মনে হলো। আমি বললাম, 'এত বড় মেয়ে, কলকাতা থেকে পালিয়ে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই নীলা একটু ঝেঁঝে বেজে উঠলো, 'এদের আবার বড় ছোট! বাদ দিন। ও সব ভয়-ডর এরা খেয়ে বসে আছে। রোজই শুনবেন, এ রকম ছেলে-মেয়েরা পালিয়ে পালিয়ে আসছে। আর জীবন-কৃষ্ণদাও সেই রকম। যেই দেখলেন, কোনো মেয়ে পালিয়ে এসেছে ওঁর কাছে, উনি অমনি হয় আমাদের এখানে, না হয় কেশববাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। নাও, এখন তোমরা ভোগান্তি পোহাও।'

কল তো মন্দ নয়। জীবনকৃষ্ণবাবু ঘাড় পরিষ্কার করলেন। বোঝা আর একজনের ঘাড়ে। অবিশ্যি নিয়মই তাই। একজনের বোঝা, আর একজনকে

বইতেই হয়। একমাত্র ভাগ্যবান হলে, তার বোঝা ভগবানে বয়। সাত পাঁচ না ভেবে, আমি একটা সোজা কথা বললাম, 'তা বোঝা মনে করবার কারণ কী আছে? পথ দেখিয়ে দিলেই হয়।'

নীলা বলল, 'সেই তো হয়েছে মুশকিল, মেয়ে কী না! কোথায় কী করে বসবে, একটা কিছু ঘটিয়ে বসলেই হলো। কোথা থেকে হয়তো দেখা গেল, জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনের নাম করে বসলো। তখন এদের নিয়েও টানাটানি। এ রকম ঘটনাও ঘটে গেছে। তারপর ধরুন একটা বাঙালী মেয়ে, একেবারে ছেড়ে দিতেও খারাপ লাগে। যে ভাবেই হোক, বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে ঘরের মেয়ে ঘরে পাঠাতে পারলেই হয়। এখন সেই চেষ্টাই চলছে।'

এই সময়ে আমার ব্যাগ আর স্যুটকেস নিয়ে, বিশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে ঢুকলো। তাকে চাকর বলে ভাবতে, নজর আপত্তি দেয়। পাতলুন-জামার বহর একেবারে চোস্ত। তার ওপরে, চুলের বাহার, সেই যাকে বলে, কপালের কাছে ঝোপঝাড় করা। নীলা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'এই যে দেখছেন শ্রীমানকে। বাপ দুধ বেচে ছেলেকে মানুষ করবার চেষ্টা করছিল। ছেলে ফিল্মের হিরো হবার জন্য, বাপের বাকসো ভেঙে, বেলঘরিয়া থেকে একেবারে বম্বে!'

কৃষ্ণকালো বেঁটে সেঁটে ছেলেটি লজ্জিত। ঝকঝকে দাঁতে এক ঝলক হেসে বললো, 'বউদি, এখনই কেন বলছেন! দু' একদিন পুরনো হোক, তারপরে বলবেন।'

নীলা ভুরু তুলে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'কেন গুরুচরণবাবু, আপনার লজ্জা করছে?'

গুরুচরণ এক পলক আমাকে দেখে বললো 'একটু একটু।'

নীলা হাত তুলে বললো, 'মারবো এক থাপ্পড়।'

থাপ্পড় পড়বার আগেই, গুরুচরণ একদৌড়ে অন্য ঘরে। নীলার মুখে দেখি, স্নেহের হাসি। বললো, 'এই সব উন্মাদকে নিয়ে কী করবেন। এখন বলে, আর বাড়ি ফিরতে পারব না, বাবার কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারব না। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই, হাত পাততে থাকে। এমন কতজনকে আপনি বাড়িতে এনে রাখতে পারেন?'

রীতিমত সমস্যা। সমস্যা যদি মনে করা যায়। না মনে করলেও, শেষ অবধি, মনের দায় ঘোচে না। এ যে ব্যাধির তুল্য। এ রোগ সারানোর ওষুধ কী, কে জানে। এমনিতে না হয়, পোশাকে-আশাকে বেশবাসে, হাজার গণ্ডা ছেলেকে

রূপকুমার ফুলকুমার সেজে বেড়াতে দেখা যায়। কিন্তু তারা যদি রূপকুমার ফুলকুমার হবার বায়না ধরে, আর কলকাতা থেকে সিন্দুক ভেঙে এন্তার আরব সাগরের কূলে পাড়ি দিতে থাকে, তাহলে ব্যামো গুরুতর। তার সঙ্গে আবার মেয়েরাও। কী সর্বনাশ!

নীলা আমাকে তাড়া দিল, 'নিন, এখন আর ও সব ভাববেন না। অনেক কিছু দেখবেন শুনবেন। চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।'

নীলার সঙ্গে যেতে যেতে, আমি একটু ঘুরিয়ে বাত দিলাম, 'জীবনকৃষ্ণবাবুর বোঝা আমিও শেষটায় সুরঞ্জনের ঘাড়েই চাপলাম?'

নীলা ঘুরে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। বললো, 'ছি! আপনি হলেন আমাদের বন্ধু। জীবনকৃষ্ণদা অবিশ্যি তাঁর বাড়িতেই আপনাকে তুলতে চেয়েছিলেন, অথবা আপনার ইচ্ছে হলে, শহরের কোনো হোটেলে। আমরাই বলেছি, তা হয় না।'

এইটুকুই ভাগ্য, অন্ততঃ বন্ধু এবং একটি পরিবারের সাহচর্যে থাকা যাবে। নীলা ঠোঁটের কোণে হেসে, চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'অবিশ্যি, জীবনকৃষ্ণদার ওখানে আরো ভালো থাকতে পারতেন। সেখানে সবই বিরাট ব্যাপার, অনেক আরাম। আমরাই বাদ সেধেছি।'

আমি বললাম, 'সেজন্য সুরঞ্জন আর নীলা ঠাকরুণকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

নীলার মুখে খুশির হাসি ঝিলিক দিল। শ্রীমান গুরুচরণ আমার ঘরেই দাঁড়িয়ে ছিল। নীলা তাকে বললো, 'দাদাবাবুকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে। আমি গিয়ে খাবারটা গরম করি।'

নীলা চলে গেল। শ্রীমান গুরুচরণ আমার দিকে চেয়ে, একখানি হাসি দিল। উদ্দেশ্য, সবই তো শুনলেন আমার সম্পর্কে। একটু লজ্জা পাচ্ছি। তা বটে। কোথায় রূপোলী পর্দায় ঝলকাবে। গাড়ি চেপে ড্যাং-ড্যাং করে বেড়াবে। পকেটে ঝনঝনাবে লক্ষ টাকা। তার বদলে, সুরঞ্জনের বাড়ির ভৃত্য। কিন্তু তা যেন হলো, তথাপি, গুরুচরণ এই হাসিটি বজায় রেখেছে কেমন করে? তাকে দেখে তো আমার একটুও মনে হচ্ছে না, তার মনে কোনো ক্ষোভ বা আপসোস আছে। বেশ ঝলমলিয়ে আছে, মনে হচ্ছে।

হবে হয়তো, পকেটের টাকা যেদিন ফুরিয়ে গিয়েছিল, চোখের সামনে অসহায় ক্ষুধা আর খোলা আকাশের নীচে রাস্তা ছাড়া কিছু দেখতে পায়নি, সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনের, সুরঞ্জনের এই আশ্রয়টা হয়তো ওকে নতুন ঝলক দিয়েছে। সুরঞ্জনের আশ্রয়টা নিতান্ত বোধ হয়, ভৃত্যের আশ্রয় না। তার থেকে কিছু

বেশি। নীলার চোখে একটু স্নেহের আলোই সে কথা বলে দেয় হয়তো, সুরঞ্জনের মতো একজন বিখ্যাত লোকের স্নেহ ও আশ্রয়, ওকে অনেক বেশি খুশি ও গর্বিত করেছে।

তথাপি এই গুরুচরণদের জন্য মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কী এক অলীক কল্পনার পিছনে, জীবনের মূলটাকে উপড়ে তুলে, ছুট দিয়েছে। আলোর পিছনে বাদলা পোকার মতো। কোন্ গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছবে, কে জানে। বাড়িতে হয়তো মা বাবা ভাই বোনেরা আছে। আর যারই মনে না থাক, মায়ের তো দিনান্তে একবার মনে হবে, গুণতিতে তার একটি সন্তানের জায়গা, সংসারে সব সময়েই শূন্য।

যে-ঋণ শোধ করবার নয়, আমরা সন্তানেরা শুধু সেই ঋণটার কথাই জীবনে ভাবি না। মা গো, তাইতো তুমি মা। তুমি ঋণের কথা জানো না। তুমি দাত্রী, তুমিই ধাত্রী, তুমিই গর্ভধারিণী জননী। ঋণের কথা তোমার জানা নেই।

খেয়ে দেয়ে পোশাক বদলে ফিটফাট। শোবার উপায় নেই। সুরঞ্জনের সকাতর প্রার্থনা, ওরা সকলেই হার মেনেছে সেই মেয়েটির কাছে। এবার আমাকে কেরামতী দেখাতে হবে। কিন্তু আমি তো কেরামত মিঁয়া না, কেরামতী দেখাব কেমন করে। সুরঞ্জন যেখানে হার মেনেছে, এবং স্বয়ং রণো বাহাদুরও নাকি পর্যুদস্ত, সেখানে আমি কোন্ মাতব্বর।

সমস্যা কী? না, মেয়েটিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠানো। কোনো রকমে একবার হাওড়াগামী গাড়িতে, টিকিট কেটে তুলে দিতে পারলে হয়। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমি বাইরের ঘরে গেলাম। দেখি মা-লক্ষ্মীকে যদি একটু পায়ে ধরে বোঝাতে পারি।

রণো আবার হাঁক দিল, 'খ্যাটন হলো?'

কথায় কোথাও ত্রুটি পাবে না। বললাম, 'হলো। তারপর, খবর কী বল্?'

'খবর আর কী। আপাততঃ এই যে শ্রীমতী বসে আছেন। আমি বলছি বাবা, থানায় পুলিশের হাতে হ্যাণ্ডওভার করে দাও। সব ল্যাঠা চুকে যাক।'

মেয়েটির দিকে আমি দেখলাম। নীলা মিথ্যা বলেনি। রূপের একেবারে বালাই। কালো রঙের মেয়েও অনেক দেখেছি, যাদের কালো রূপসী বলা যায়। মেয়েটির চোখ মুখ নাকও খাঁদি পাঁচির দিকেই। বেঁটের ওপরে স্বাস্থ্যটা একটু যা হোক আছে। তাও, তার মধ্যে লাবণ্য বলে কিছু নেই। নাম কী?

না, রাণী। বোঝো এখন। এর নাম যদি রাণী হয়, বাকী মেয়েরা যায় কোথায় চাকরাণী বলতে আমার সংকোচ হয়।

বিধান বললো, 'আমি তো বলছি, তুমি বঙ্গের যেখানেই যাবে, যে-কোনো স্টুডিওতে, কোথাও কেউ তোমাকে নেবে না। শুধু শুধু কোথায় ঘুরবে? জীবনকৃষ্ণদা তোমার ভালোর জন্যই বলছেন, কলকাতার বাড়িতে চলে যাও।'

কী গেরো বলো দিকিনি! জীবনে কোনোদিন এমন ঘটনা দেখতে হবে, বা ঘটনায় থাকতে হবে, জানতাম না। মেয়েটির বিধানের কথায় কোনো জবাব ছিল না। সুরঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো। অর্থাৎ তুমি কিছু বাত ছাড়ো। কিন্তু কী বাত ছাড়ব এ মহারাণীকে, তা তো বুঝতে পারছি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম সুরঞ্জনকেই, 'এ কলকাতার কোথা থেকে আসছে?'

সুরঞ্জন বললো, 'বলছে তো, বাগবাজার থেকে আসছে।'

কেশব কম কথার লোক। কালো রঙ, ড্যাবডেবে দুটো চোখ, কোঁকড়ানো চুল, রোগা মানুষ। কলকাতায় একটি ছবি করেছিল। সুবিধে করতে পারেনি। তাই এখন আরব সাগরের কূলে। যদি এখানে রুপোলী মাছটাকে গাঁথা যায়। এখানে সে এখন জীবনকৃষ্ণদার কাছে কাজ করছে। সে বললো, 'বলছে বাগ-বাজার থেকে এসেছে। পরে হয়তো শোনা যাবে, বাগজোলা থেকে এসেছে।'

সকলের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সবাই বিরক্ত। বিরক্ত আমিও হচ্ছি। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না; এরা তবু ভাল ভাবে ওকে পাঠিয়ে দিতে চাইছে —অন্য কারোর কাছে গেলে, এটুকু করুণাও ওর ভাগ্যে জুটবে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাগবাজারের কোনো ঠিকানা আছে?'

সুরঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, একটা ঠিকানা আছে।'

রণো বলে উঠলো, 'ব্যস্, মিটে গেল। কলকাতা পুলিশকে ঠিকানাটা জানিয়ে দাও, এখানকার পুলিশের হাতে তুলে দাও, তারপরে যা করবার পুলিশেই করবে। কী, তাই করা হবে তো?'

রাণী রণোর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপরে মুখ নামিয়ে, ঘাড় কাত করে বললো, 'তাই দিন।'

ও বাবা, এ যে বাজে মন্দ না। বলে, তাই দিন। সুরঞ্জন বললো, 'পুলিশের হাতে যাবে, তবু ভদ্র-সভ্র ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে না?'

রাণী কোনো জবাব দিল না। কিন্তু বোঝা গেল, তাতেই সে রাজী। আমি সুরঞ্জনের পাশেই বসেছিলাম। সে আমাকে নীচু স্বরে বললো, 'বুঝতে পারছো তো, পুলিশে দিতে গেলে, কে দেবে? আমরা কেউ দিতে গেলে,

তাহলে ঘটনাটার মধ্যে আমাদের নাম থাকছে। কিংবা জীবনকৃষ্ণ প্রোডাক্‌-শনের নাম থাকছে। সেটা কেউ-ই চাইছে না।'

স্বাভাবিক, নাম নিয়ে কথা। একটা পালিয়ে-আসা-মেয়ের ব্যাপারে, কে পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে চায়? বিশেষ জীবনকৃষ্ণের এখানে যথেষ্ট নাম এবং সম্মান। আমি রাণীর দিকে তাকালাম। ও তেমনি মাথা নীচু করে বসে আছে। মেয়েটার রূপ না থাক, সমস্ত চেহারাটা জুড়ে কোথায় যেন একটা দুর্ভাগ্যের ছাপ ফুটে রয়েছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এটুকু বুদ্ধি কি সত্যিই ওর নেই, রূপোলী পর্দায় ও কোনো দিনই ঝলকাতে পারবে না? ওর নাক চোখ মুখ যতোই খারাপ হোক, ও যে বোকা না, সেটা ওব চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া যে-মেয়ে এমন করে ঘর ছেড়ে চলে আসে, মনে হয়, তার পিছনে দুর্ভাগ্যের তাড়নাটা গভীর। সে কখনো একটা সুস্থ ভালো পরিবার থেকে আসতে পারে না। একটা মেয়ে, বাণীর মতো একটা বাঙালী মেয়ে, সহজে ঘর ছাড়বার পাত্রী না। তবু একটা কথা আমাব মনে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। শ্রীমতী কোনো শ্রীমানের সঙ্গে পালিয়ে আসেনি তো? চলো, তুহুঁ দোহাঁ যাই। ঘর থেকে তুমোও কিছু নাও, আমুও কিছু নিই। তাবপর বম্বেতে একবার পৌঁছতে পারলে, নায়ক-নায়িকা ঠেকায় কে?

আমি সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতা থেকে কবে এসেছে ও?'

সুরঞ্জন বললো, 'বলছে তো পরশু এসেছে।'

আমি রাণীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি কি সত্যি পরশু এখানে এসেছ?'

রাণী আমার দিকে তাকালো। বললো, 'হ্যাঁ।'

'একলা এসেছ, না সঙ্গে আর কেউ এসেছে?'

আমার প্রশ্নটা শুনে, সবাই রাণীর দিকে তাকালো। রাণী মাথা নীচু রেখেই বললো, 'না, একলাই এসেছি।'

আমি বললাম, 'তুমি মুখ নীচু করে রাখছো কেন? মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলো না।'

রাণী মুখ তুলে তাকালো, কিন্তু আবার নামিয়ে নিল। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি বুঝি নির্লজ্জ বেহায়া। কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর মুখ নামানো দেখেই বুঝতে পারলাম, ওর লজ্জা আর সঙ্কোচ রয়েছে। তথাপি ও এত অনড় কেন? আমি বললাম, 'আমি এই জন্য বলছি, হয়তো তোমাকে কোনো ছেলে ভালো-বাসে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। সে হয়তো তোমাকে কোনো আশা দিয়ে নিয়ে এসেছিল। তারপরে বেগতিক দেখে, তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।'

বাণী ওর অতি সাধারণ, প্রায় ময়লা শাড়িটার আঁচল দিয়ে মুখে চাপা দিল। কোনো জবাব দিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছো?'

বাণী মুখ থেকে আঁচলটা সরালো। ওর মুখে হাসি, হাসিতে একটু লজ্জাও আছে। বললো, 'না, যা ভাবছেন, তা না। আমি একলাই এসেছি।'

বাণীর ভঙ্গিটাই বলে দিল, ও মিথ্যা বলছে না। বিশেষ করে ওর হাসিটা। রণো হেঁকে উঠলো, 'আবার হাসি হচ্ছে! কাল থেকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, আবার হাসি হচ্ছে!'

আমারও হাসতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু রণোর ভয়েই পারছি না। কেন না রণোর কথাতেই আমার হাসি পাচ্ছে। আমি হাত তুলে রণোকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাকে হে। মুনি দুর্বাসা সব সময়ে রুদ্র হয়েই আছেন। আমাকেই হুমকে উঠলো, 'হাত তুলে কী বোঝাতে চাইছিস আমাকে? তোর ওই ম্যানম্যানানিতে কিচ্ছু হবে না।'

আমি বললাম, 'না হতে পারে, রাণীর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখা যাক না।'

রণো দাঁতে একটা বিড়ি কামড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালো। হাত নাড়িয়ে বললো, 'তুমি শালা প্রেমিক মানুষ, দেখো এখন যদি প্রেম করে ভোলাতে পারো। তবে ভবী ভোলবার নয়, বলে দিলুম। আমি চললাম।'

কোঁচাটা লুটিয়ে, দরজার দিকে খানিকটা গিয়ে, ফিরে দাঁড়ালো। আমাকে বললো, 'আমার বাসায় যদি আসতে ইচ্ছে করে, আসিস। এদের কাছে ঠিকানা আছে।'

রণো সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কারোকে কিছু বললো না। এতে অবিশ্যি অবাক হবার কিছু নেই। ওকে যারা জানে, তারা অবাক হবে না। রাণীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর কালো খ্যাঁদা মুখে, শুধু কৌতুকের ছাপ না। একটু হাসিও লেগে আছে। নিশ্চয়ই রণোর ভাব-সাব দেখে।

বিধানও উঠলো। জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনের ও হলো এডিটর। ছবিকে ঠিক জায়গায় কেটে কেটে জোড়া যার কাজ। ইতিমধ্যেই, বিধানের যথেষ্ট নাম হয়েছে। বম্বের অন্যান্য প্রযোজকেরাও ওকে ডাকাডাকি করে। বললো, 'আমিও যাই, কাজ রয়েছে।'

সুরঞ্জন বললো, 'তাহলে তুমি ঠিক জায়গায় খবরটা দিয়ে দিও।'

কেশব বললো, 'আমি বা কী করব, কেটে পড়ি।'

সুরঞ্জন বললো, 'যাও। সব ঝক্কি তো এখন আমার।'

বিধান আমাকে দেখিয়ে বললো, 'কেন, আর একজন তো রইলো।'

পরে আবার দেখা হবে জানিয়ে, বিধান আর কেশব চলে গেল। আমি রাণীর দিকে ফিরে তাকালাম। রাণী দরজার দিকে তাকিয়েছিল। আমি বললাম, 'আমি কিন্তু তোমার কথা অবিশ্বাস করিনি রাণী। তবু আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজকাল তো এ সব ঘটনা আখচার ঘটছে। তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন ?'

রাণী এবার মুখ তুললো, কিন্তু আমার দিকে তাকালো না। ওকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। বললো, 'কাকা আর কাকিমা।'

আমি অবাক হয়ে বলালাম, 'ব্যস্, আর কেউ না ? বাবা মা ভাই বোন ?'

রাণী আবার মুখটা নীচু করলো, বললো, 'এক দাদা আছে। সে অনেক কাল থেকে আলাদা থাকে, আসামে চাকরি করে।'

'দাদা তোমার কোনো খোঁজখবর করে না ?'

'না।'

'দাদা বোনের কোনো খোঁজখবর করে না কেন ?'

রাণী কোনো জবাব দিল না। এই মুহূর্তে, রাণীর গোটা অবয়বটিকে যেন আমার কেমন করুণ আর অসহায় মনে হলো। দাদা খোঁজ করে না, কাকার কাছে থাকতো। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন জট-পাকানো। আমি বললাম, 'তা, তুমি যে চলে এলে, তোমাব কাকা জানেন ?'

রাণী প্রথমটা জবাব দিতে যেন, কেমন দ্বিধা করলো। একবার আমার দিকে দেখলো। তারপরে বললো, 'এক রকম জানেন্।'

'এক রকম জানেন ? জেনে শুনে, তিনি তোমাকে আসতে দিলেন ? এই দূর বম্বেতে ?'

রাণীর মাথাটা যেন আরো নত হয়ে গেল। এই সময়ে সুবঞ্জন উঠে, বাড়ির মধ্যে চলে গেল। আমি ডাকলাম, 'রাণী।'

রাণী কোনো জবাব দিল না। হঠাৎ দেখলাম, ও দুহাতে মুখ ঢাকলো। শরীরটা কাঁপছে থর থর করে। রাণী কাঁদছে। আমি উঠে ওর কাছে গেলাম। ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, 'কী হয়েছে রাণী, কাঁদছ কেন ? আমাকে তুমি সব কথা বলতে পারো।'

রাণীর কান্নাটা যেন আরো দুরন্ত হয়ে উঠলো। সম্ভবতঃ এই কান্নাটা ওর দরকার ছিল। বিদেশে এই রকম একটি অসহায় মেয়ে। ওর কান্নাটা আমারও কোথায় যেন টনটনিয়ে দিল। নানান্ দুর্ভাগ্যের আবর্তে, এই কুরূপা যুবতী রাণী, আমার বোন হতে পারতো। আমার প্রেমিকাও হতে পারতো। আমার যে-

কোনো রকমের আত্মীয়া হতে পারতো। প্রথমে যা-ই ভেবে থাকি, ওকে এ ভাবে কাঁদতে দেখে এ কথাই আমার মনে হচ্ছে। আমি অসংকোচে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে, রাণী একটু শান্ত হলো। আমি ওর পাশের চেয়ারে বসলাম। বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার মনে একটা কিছু আছে। তোমার কাকা কী করে সব জেনে-শুনে তোমাকে এখানে আসতে দিলেন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। বলতে তোমার আপত্তি আছে?'

রাণী ভেজা স্বরে বললো, 'বলতে লজ্জা করে।'

আমি ওর দিকে একটু ঝুঁকে বললাম, 'তবু বল রাণী। আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং আমি যদি পারি. তোমার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করব।'

রাণী মুখ তুলে মেঝের দিকে অপলক চোখে, কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপরে এক মর্মন্তুদ বৃত্তান্ত ও আমাকে শোনালো। প্রশ্ন করে করে জবাব নিয়ে নিয়ে, যে কথা শুনেছি, আমার জবানীতে সেই কথা বলি।

পদবীতে ওরা ভট্টাচার্য। ওরা দুই ভাই বোন। অল্পবয়সে বাবা-মা মারা যায়। কাকাই তখন ওদের অভিভাবক। কাকার বয়স তখন বেশি না। কলকাতায় কোন একটা প্রেসে চাকরি করে। কাকা দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। কিন্তু দাদা কোথায় যাবে? ও তখন ক্লাস টেনে পড়তো। কাকা ওর পড়ার খরচ দিতে রাজী হয়নি। ফলে ওর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপরে, রাণীর মাত্র তেরো বছর বয়সে, ওর কাকা একদিন ওকে বলাৎকার করে। সেই সঙ্গে শাসিয়ে রাখে, যদি রাণী সে কথা কারোকে প্রকাশ করে, তবে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে। বয়সের অনভিজ্ঞতা ভয়, অসহায়তা, সব মিলিয়ে, রাণী একটি ভীরু পশুর মতো বোবা হয়ে ছিল। দাদাকেও বলতে ভরসা পায়নি। দাদার বয়সও তখন এমন না। তাছাড়া নিজের কাকাকে চিরদিন দেখে এসেছে অন্য চোখে। জানতো, সংসারে কেউ না থাক, কাকা আছে। সেই কাকাই যখন রাণীর এমন সর্বনাশ করতে পারলো, তখন অন্য কারো কাছে মুখ খোলবার সাহস ওর হয়নি।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কদর্যতার এখানে শেষ না, শুরু। রাণীর তেরো বছর বয়সের একদিনের ব্যাপারটাকে, কাকা নিয়মিত দাঁড় করালে। কাকার পক্ষ থেকে সে সময় রাণীকে নানা ভাবে বোঝানো হয়েছে। আসলে বেঁচে থাকার, বাইরের চোখে ভদ্র ভাবে জীবন-যাপনের আর কোনো উপায় ছিল না। কাকা

সেই সুযোগ নিয়ে, রাণীকে প্রত্যহের শয্যা-সঙ্গিনী করে তুলেছিলো। রাণী আমার কাছে অস্বীকার করেনি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ও নিজে ক্রমাগত একটি অভ্যাসের দাসী হয়ে উঠেছিল। ওকে এ পর্যন্ত তিনবার নার্সিং-হোমে যেতে হয়েছে।

এই ঘটনার শুরু থেকেই, রাণীর দাদা সব কিছু টের পায়নি। ক্রমশঃ ব্যাপারটা তারও চোখে ঠেকতে আরম্ভ করে। দাদা প্রথমে নিজের চোখে কিছু দেখেনি, সন্দেহ করেছিল মাত্র। তারপরে সে একদিন নিজের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা চাক্ষুষ করলো। আর তার যতো রাগ আর ঘৃণা, সব এসে পড়লো রাণীর ওপরেই। কাকাকে সে কিছু বললো না, বোধ হয় সাহস পায়নি। একদিন কাকার অনুপস্থিতিতে, রাণীকে মারতে মারতে, মৃতপ্রায় করে রেখে, চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। লোকমুখে শোনা যায়, সে আসামে কোথাও চাকরি করছে।

এখন রাণীর তেইশ বছর বয়স। পাড়ায় সন্দেহ, লোকের চোখে ঘৃণা, সব সত্ত্বেও, রাণী এক রকম ভাবে, এই অসহায় জীবনকেই মেনে নিয়েছিল। কোনো ছেলে তার সঙ্গে প্রেম করতে আসেনি। তাকে মুক্ত করার কেউ ছিল না। যদি বা কেউ এসে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ইতিমধ্যে কাকার মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কাকা রাণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, এ ভাবে চলতে পারে না। রাণীর নাকি সে একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে।

এই দশ বছরের মধ্যে রাণী অনেক সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে। লোকে যেমন জানতো রাণীর রূপ নেই, রাণী তেমনি করে সে কথাটা জানতো না। এটা তো সংসারের নিয়ম। শুধু রাণীর বেলা কেন, আমরা যারা চোখ মেলে চলাফেরা করি, কতো খোঁড়াকেই তো সোজা হয়ে হাঁটবার শখ করতে দেখি। স্বাস্থ্যহীন কুরূপা যখন ঠোঁটে রঙ লেপে, বিচিত্র পোশাকে সেজে রাস্তায় বেরোয়, তখন সেই কথাই মনে হয়। তাকিয়ে দেখলে তো মনে হয়, এমন খোঁড়াদের সোজা হয়ে হাঁটবার মিছিল চলেছে চোখের ওপর দিয়ে। রাণীরও শখ হতো। কাকা ওকে এ বিষয়ে প্রথম প্রথম প্রশ্রয়ই দিত। রাণী সাজগোজ করত, চঙ-ঢাঙ করতো। অল্পবয়সের চপলতায় যা হয়। তা ছাড়া, অন্যদিকেও, মনের দিকটা ছিল ওর শূন্য।

কাকার পরিবর্তনের কারণটা জানতে দেরি হলো না। রাণীকে সে বিয়ে দিতে পারলো না। কিন্তু নিজে একটা বিয়ে করে বসলো। এই শেষ আঘাতের

সামনে, রাণী যখন দিশেহারা, সেই সময় ওর নব-বিবাহিতা কাকী বাড়িতে ঢুকেই ঘোষণা করলো, কালামুখী রাণী যদি এ বাড়ি ছেড়ে না যায়, তাহলে সে জলগ্রহণও করবে না।

রাণী এবং আরো দু' একটি মেয়ে-বন্ধু, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো, সুযোগ পেলে, ওরাও ছবিতে অভিনয় করতে পারে। কাকা সেই কথাটা জানতো। সেই সুযোগটাই সে নিল। রাণী যে আমাকে প্রথমে বলেছিল, 'কাকা এক রকম ভাবে জানে', সেটা সত্যি না। কাকাই আসলে ওকে টিকিট কেটে, সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে দিয়ে, হাওড়া থেকে তুলে দিয়েছে। যেমন করে গৃহস্থেরা, অনাহূত কুকুর-বেড়ালের বাচ্চাকে অচিন জায়গায় বিদায় করে দিয়ে আসে। কাকার মতলব বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে ভেবেছিল, রাণীর পক্ষে একবার বম্বে গেলে, আর কোনো দিনই ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

রাণী জানতো, জীবনকৃষ্ণ বাঙালী। বম্বের মস্তবড় প্রযোজক, পরিচালক। ইষ্টিশনে নেমে, তার নাম করে স্টুডিওতে চলে আসতে ওর অসুবিধা হয়নি।

সমস্ত ঘটনা শোনবার পরে, অনেকক্ষণ অবশ হয়ে বসে ছিলাম। রাণীর দিকে তাকাতে পারিনি। আগে থেকে অনুমান করেছিলাম, মেয়েটার জীবনে কোথাও একটা দুর্ভাগ্যের তাড়না আছে। কিন্তু তা যে এত নিষ্ঠুর, অপমান জনক, ভয়ঙ্কর, তা বুঝতে পারিনি। সমাজ সংসার মানুষ, সকলই নিরন্তর। চলছে ফিরছে হাসছে খেলছে। কখনো অট্টহাস্যে উত্তাল, কখনো সমালোচনায় মুখর, কখনো রাগে দ্বেষে মুহ্যমান। কিন্তু এই রূপের গভীরে গভীরে, বিবরের সাপের মতো, আদিমতাকে সে বহন করে নিয়ে চলেছে। সুযোগ পেলেই সে তার ফণা তুলে, ছোবল মারছে। তার বহু শিকার ছড়িয়ে রয়েছে। আমার সামনে, আর একটি নিষ্ঠুর শিকার।

সম্ভবতঃ এটা নিয়ে মানুষের সংগ্রাম করার কথা। এটা নিতান্তই ব্যক্তির সংগ্রাম। সমাজ তাকে শিক্ষা দিতে পারে। আয়ত্তে আনবার জন্য, শক্তির চর্চা মানুষের নিজের। কিন্তু সেটা অনেক দূরের কথা, এক ধরনের উন্মাদ আর শয়তানের ধারণা, তারা সেই সরীসৃপটিকে নিহত করে, আজকের এই সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। এদের উন্মাদ আর শয়তান বলতে ইচ্ছা করে, কারণ, একদল হয় না-জেনে বলে, আর একদল, নিতান্ত কার্যসিদ্ধির জন্য বলে। এই দ্বিতীয় দল, শান্ত, কৌশলী, বক্তৃতাবাজ, কথায় চালাক, এবং সমালোচনায় মুখর।

শিষ্যদের কাছে বক্তৃতায় বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মৃত্তিকার ওপরে যা দেখছো,

একমাত্র এই বাস্তব রূপের মতোই ব্রহ্মচর্য না। মনে রাখতে হবে, অলিগর্দি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ এই মৃত্তিকার নীচে রয়েছে। ব্রহ্মচর্য যে অবলম্বন করবে, তাকে সেই অলিগর্দিকে নিহত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে।

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে, বুঝতে পারি না, বৌদ্ধরা সেই অলি-গর্দিকে নিহত করতে পেরেছিল কী না। কিন্তু আমার ক্রোধ বা ক্ষোভ, কোনো কিছু দিয়েই রাণীর জীবনে কোনো উপকার হবে না। জীবনে এমন দুর্ভাগা অসহায় মেয়ে আমি আর কোনোদিন দেখিনি। যদি না দেখতাম, ভালো হতো। যদি না শুনতাম, ভালো হতো। সংসারে কতো কী নিরন্তর ঘটছে। চোখ ফিরিয়ে আছি বলেই, নিজের কাছে স্বস্তিতে আছি। কানে তুলো দিয়ে থাকি বলেই সকলের সঙ্গে বেশ সমাজ সামাজিকতা করে কেটে যায়।

কিন্তু শুনলেই, দায় আসে। দেখলেই, দর্শক ছেড়ে তখন অন্য ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার বন্ধুদের দায় শুধু, কেমন করে মেয়েটাকে এখান থেকে সরানো যায়। তারই দায় নিতে গিয়ে, এখন আর আমার মুখে কথা আসে না। এখান থেকে চলে যাওয়ার কথাটা বলা সব থেকে সহজ। কিন্তু রাণীর জীবনের এমন একটা রুদ্ধ দরজা কড়া নেড়ে খুলে ফেলেছি, যার পরে, সেই দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে আমি চলে যেতে পারি না।

অনেকক্ষণ হয়ে যাবার পরে, সুরঞ্জন আর নীলা ঘরে এলো। কোথায় প্রবাসের অনেক দিন পরে বন্ধু-বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দেখা, আলস্যে বিলাসে নানান গল্প করব, পুরনো দিনের জাবর কাটব। কোথা থেকে এক রাণী এসে, সেই সুখের মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করে দিল।

সুরঞ্জন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, কিছু বুঝতে চাইলো। তারপরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ওর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলবে?'

আমি বললাম, 'কী যে বলব, বুঝতে পারছি না। তবে কিছু বলতে হবে।'

সুরঞ্জন বললো, 'তাহলে আমি আর নীলা একটু ঘুরে আসছি।'

আমি বললাম 'এসো।'

নীলা বললো, 'গুরুচরণ খোকাকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছে! ফিরে এসে আপনাকে চা দেবে।'

আমি হেসে বললাম, 'তথাস্তু।'

ওরা বেরিয়ে যাবার পরেই আমি রাণীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি খেয়েছো ?'

রাণী বলল, 'খেয়েছি।'

যাক, কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। যদিও সুরঞ্জন নীলাকে সে রকম ভাবাই যায় না। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'তুমি যা বললে রাণী, এর পরে কী বলা যায়, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার সব কথা এরা জানে না, তোমার অবস্থাটাও এরা বুঝতে পারছে না। সেজন্য এদের আমি দোষ দিই না।'

একটু চুপ করে থেকে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। সমস্ত ঘটনা বলবার সময় রাণী অঝোরে কেঁদেছে। এখনো ওর চোখ আরক্ত, ভেজা ভেজা। মানুষের কোনো আশা না থাকলে, তার মুখ থেকে যেমন সব ভাব হারিয়ে যায়, রাণীকেও সেই রকম দেখাচ্ছে। কেবল দু'চোখ মেলে, ও মেঝের দিকে চেয়ে আছে।

আমি আবার বললাম, 'আমি জানি, তুমি এদের কেন বলেছো, তুমি এখান থেকে যেতে চাও না।'

রাণী আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি বললাম, 'খারাপ কিছু ভাবিনি। তোমার হয়েছে এখন, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কোথাও তোমার যাবার জায়গা নেই বলেই, তুমি এ কথা বলেছো, তাই না ?'

রাণী নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি তো জীবনে আমার থেকে কম দেখোনি। এরা তোমাকে আপদ মনে করছে। করবেই। সব দেখে শুনে, তুমি কি বিশ্বাস করো, তুমি ফিল্মে নামতে পারবে ?'

এই মুহূর্তে রাণী একটু চুপ করে রইলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বিশ্বাস করো ?'

রাণী জবাব দিল, 'আগে বুঝতে পারিনি।'

'সেটা আমি জানি। বুঝতে পারলে, তুমি অন্ততঃ এদের কাছে আসতে না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারো, এটা হলো রূপের হাট। গুণেরও অনেক প্রয়োজন। বড় বড় কথা যে যাই বলুক, সবাই জানে, এখানে রূপ না হলে চলে না।'

রাণী ঘাড় কাত করে অন্যদিকে তাকালো। আমার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠলো। ওকে কষ্ট দিলাম কি না, কে জানে। রূপের কথা বললাম বলেই বোধ হয়, মুখখানি ঘুরিয়ে নিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাগ করলে রাণী ?'

রাণী জবাব দিল, 'না।'

'আমি তোমাকে যা বললাম, তুমি কি তা মানতে পারছো ?'

'পারছি।'

'তাহলে, আমি বলছি, তুমি কলকাতায় ফিরে যাও।'

রাণী আমার দিকে ফিরে তাকালো। চোখে অন্ধকারের অসহায়তা। আমি ওর কাঁধের কাছে একটা হাত রেখে বললাম, 'না, আমি তোমাকে কলকাতায়, তোমার কাকার কাছে যেতে বলব না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, তাহলে, আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে, এক জায়গায় যাবে। তার আগে, আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই। তুমি কতোদূর লেখাপড়া করেছো ?'

রাণী বললো, 'কিছু না, প্রাইমারি পর্যন্ত।'

বললাম, 'আমি চাই, তুমি নিজে ভদ্র ভাবে রোজগার করো, নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকো।'

রাণী বললো, 'কী কাজ করব বলুন। আমি তো লেখাপড়া—'

হাত তুলে, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'সে সব ভেবেই আমি বলছি। আমার এক বন্ধু তার নিজের বাড়িতে, একদিকে হোসিয়ারি কারখানা চালায়, আর একদিকে নিজের সংসার নিয়ে থাকে। সেখানে শুধুমাত্র মেয়েরাই কাজ করে। প্রায় পঞ্চাশটি মেয়ে আছে। ঠিক মতো কাজ করলে, তোমার এখন চলে যাবার মতো হবে। পরে আরো মাইনে বাড়বে।'

রাণী এবার বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। আমিও ওকে ভাবতে বাধা দিলাম না। এক সময়ে ওর গলা শোনা গেল, 'কিন্তু কলকাতায় গিয়ে, আমি কোথায় উঠব ?'

একটু যেন স্বস্তি পেলাম। বললাম, 'সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার যে-বন্ধুর কারখানা, তাঁর স্ত্রী-ই তোমার থাকবার খাবার ব্যবস্থা করবেন। এখন আর তুমি টাকা কোথায় পাবে যে বাড়িভাড়া দিয়ে খেয়ে পরে থাকবে। সেটা আমি বুঝতে পারি। তা ছাড়া ওখানে আরো মেয়েরা কাজ করে। তাদের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেলে, তুমিই হয়তো তখন অন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।'

রাণী এবার আর সময় না নিয়েই বললো, 'তাহলে, আমাকে সেই ব্যবস্থাই করে দিন।'

রাণীর এই রাজী হওয়াতে যেন, আমার বুকটা আরো বেশি টন-টনিয়ে উঠলো। গলার কাছে কথা এসে ঠেকে রইল। তথাপি মনটা যেন হালকাও

হলো। কয়েক মুহূর্ত পরে, আমি হাত দিয়ে ওর কাঁধের ওপর চাপ দিয়ে বললাম, 'খুব খুশি হলাম রাণী। তুমি খালি এটুকু বিশ্বাস করো, জীবনে, এমন অনেক দিন গেছে, দিনে একবারও খাবার জোটেনি খেয়ে শোধ দিতে দেরি হয়েছে বলে অপমানিত হয়েছি। কাউকে কাউকে একটু বেশি কষ্ট করেই দাঁড়াতে হয়।'

রাণীর মুখের ভাব খেললো। ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এ সময়েই গুরুচরণ চা নিয়ে এলো। কিন্তু এক কাপ। আমি বললাম, 'রাণীর জন্য আর এক কাপ চা নিয়ে এসো।'

গুরুচরণ একবার রাণীর দিকে তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল। রাণী আবার মাথা নীচু করে বসলো। রাণীকে সামনে রেখে আমাদের সমাজ সংসারের চেহারাটা যেন ওর মতোই নিঃস্ব দেখাতে লাগলো।

সুরঞ্জন আসার পরেই আমি হাওড়া যাবার গাড়ির সময় জিজ্ঞেস করলাম। তখনো মোটামুটি ভালো সময়ই হাতে আছে। আমি জানতে চাইলাম, আজই রাত্রে টিকিট কেটে রাণীকে গাড়িতে তুলে দেওয়া যাবে কী না। সুরঞ্জন আর নীলা যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই পারছিল না। ওরা জানালো, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে দেওয়া যাবে। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে বললাম। আর নীলাকে বললাম, সে যেন রাণীকে কিছু খাইয়ে দেয়। আমি নিজে বাড়ির ভিতরে গেলাম, কলকাতার হোসিয়ারি কারখানার বন্ধুকে চিঠি লিখতে।

সুরঞ্জন আর নীলা ছুটে আমার ঘরে এলো। সুরঞ্জন আমার ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'তাহলে রণোর কথাই ঠিক? প্রেম করেই সব ম্যানেজ করতে হলো?'

ওদের এই ব্যাকুল উচ্ছ্বাসটা স্বাভাবিক। বললাম, 'তা এক রকম বলতে পারো।'

নীলা ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললো, 'কী ধরনের প্রেম করলেন মশাই? তার জন্যে আবার ফ্যাসাদে পড়তে হবে না তো?'

হেসে বললাম, 'প্রেম করলে তো ফ্যাসাদে একটু পড়তেই হয়। ব্যবস্থাই তো করছি এখন।'

সুরঞ্জন আর নীলা দুজনে চোখাচোখি করলো। ওদের বিস্ময় আর ঘুচছে

চায় না। সুরঞ্জন এবার ভিন্ন মূর্তি ধরলো। বললো, 'তোমাকে ব্যাটা ছাড়া হবে না। আগে বলো, কী করে ওকে রাজী করালে?'

আমি বললাম, 'রাণীর বুদ্ধি-সুদ্ধির অভাব নেই। আসলে ওর ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। মেয়েটা বড় দুর্ভাগা। সমস্ত ঘটনা আমি তোমাদের বাত্রে বলব। এখন আমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে। রাণী চিঠিটা নিয়ে কলকাতায় যাবে। আপাততঃ সেখানেই ওর আশ্রয় এবং কাজ।'

সুরঞ্জন বললো, 'যাক, আগে আমি জীবনকৃষ্ণদাকে খবরটা টেলিফোন করে জানাই। একটু শান্তি পাবেন।'

বলেই ও চলে গেল। নীলা বললো, 'দেখবেন, চিঠিপত্র লিখছেন, তারপরে এর জন্য আবার কোন রকম বিপদে পড়তে হবে না তো?

'কী বিপদে পড়তে হবে?'

'এ সব যা ভয়ঙ্কর মেয়ে, কিছু বলা যায়? হয়তো চিঠিটা দেখিয়ে, আপনার নামেই কলকাতায় গিয়ে যা তা বলে বেড়াবে।'

আমি হেসে বললাম, 'তা যদি ওর ইচ্ছা হয়, বলে বেড়াতে পারে হয়তো বিশ্বাস করবারও লোকের অভাব হবে না। তবু এটা আমাকে লিখতেই হবে, এবং রাণীকে আমি বিশ্বাস করি।'

নীলা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, তারপরে বললো, 'কী জানি বাপু, যা ভালো বোঝেন করুন। তবে হ্যাঁ, আপনি পারেনও বটে। কী দিয়ে যে ওই মেয়েকে তুক করলেন, কে জানে।'

আমি ভুরু কাঁপিয়ে হেসে বললাম, 'সে-সব সবাই কি জানে?

নীলা হেসে চলে গেল। আমি চিঠি লিখতে শুরু করলাম।

বন্ধুকে কিছুই গোপন করলাম না। সব কথা জানিয়ে, ওকে আমার সনিবন্ধ অনুরোধ জানালাম।

চিঠি লেখা শেষ হতে হতেই, ওদিকে রাণীও তৈরী। সুরঞ্জন টিকিট টাকা, সব ব্যবস্থাই ইতিমধ্যে করেছে। আমি রাণীর হাতে চিঠিটা দিয়ে বললাম, 'আমি দু'দিন গাড়িতে এসেছি, বড় ক্লান্ত। তা না হলে তোমার সঙ্গে ইষ্টিশনে যেতাম।'

রাণী বললো, 'না, আপনি বড়িতেই থাকুন।'

গলা শুনে বুঝতে পারছি, ওর গলায় দলা আটকে যাচ্ছে। যেমন একটা সবুজ পাড় মিলের শাড়ি পড়া দেখেছিলাম, এখনো তা ই আছে। ক'দিন স্নান করেনি, কে জানে। চুলগুলো রুক্ষ। কবেকার একটা বিনুনি, সেটা এখন

শিথিল। কপালের কাছে উড়ু উড়ু চুল। পায়ে একজোড়া সস্তা দামের স্যাণ্ডেল। সারা শরীরে সোনা বলতে দূরে থাক, এক টুকরো কাঁচের অলঙ্কারও নেই।

আমি বললাম, 'হাওড়া ষ্টেশন থেকে নেমে, চিঠির ওপরে যে ঠিকানা লেখা আছে, সোজা সেখানে চলে যাও। আমি তো এখন কিছুদিন আছি এখানে। কী হলো না হলো, এখানকার ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে জানিও।'

বাণী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তারপরেই ও সুরঞ্জনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। সুরঞ্জন বাধা দেবার সুযোগ পেল না। রাণী তারপরে নীলাকে প্রণাম করলো। নীলা সে রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। ওর মুখখানিও এখন যেন গম্ভীর। বাণীর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছে। রুদ্ধস্বরে বললো, 'আমার ওপর রাগ করবেন না যেন।'

নীলা বললো, 'না না, রাগ করব কেন।'

নীলার মুখ এখন সত্যি ভার। তারপর রাণী আমাকে প্রণাম করতে এলো। আমি ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম। বললাম, 'প্রণাম করতে হবে না বাণী। তোমাকে আমি এমনি আশীর্বাদ করছি। কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

কিন্তু কথা বলছো তুমি। কে-ই বা শুনছে। বাণী ওর কান্নাটা রোধ করতে পারলো না। একেবারে ঝরঝরিয়ে দিল। গোটা শরীরটা থরথরিয়ে উঠলো। নীলা হঠাৎ বাড়ির ভিতরে চলে গেল। জানি, নীলা, কেন অমন করে তুমি ভিতরে চলে গেলে। তুমি না এই আপদ মেয়েটার জন্য কয়েক ঘণ্টা আগেও বড় বিরক্ত হচ্ছিলে, আর রাগ করেছিলে! এখন তাকে বিদায় দিতে গিয়ে তোমাকেও চোখের জল চাপবার জন্য আড়ালে চলে যেতে হয়।

মানুষের কোনো পরিচয়-ই তার তাৎক্ষণিক আচরণ দিয়ে প্রমাণ হয় না। সুরঞ্জনের মুখের অবস্থাও সুবিধার না। নীলা যে কেন হঠাৎ তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল, তা ও বুঝতে পেরেছে। এখন হয়তো ওরও যেতে পারলে ভালো হতো।

আমি রাণীর হাত দুটো ধরে ওর মাথায় আর একটা হাত রাখলাম। বললাম, 'কেঁদো না রাণী। একটু শান্ত হও, চোখ মোছ। তোমার গাড়ির আর বেশি দেরি নেই।'

সব কাজ তো আর তোমার কথায় হয় না। একটু কাঁদতে দাও। অন্ততঃ

তোমার কাছে। জীবনে হয়তো এই প্রথম, তোমার কাছেই, মেয়েটি তার সমস্ত অন্ধকারকে হাট করে খুলে দিয়েছে। এ কান্নাটা এখানে কারোকে ছেড়ে যাবার জন্য না। এ কান্নাটা ওর নিজের জন্য।

আমি সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাণী ইষ্টিশনে যাবে কী ভাবে?'

সুরঞ্জন বললো, 'আমার গাড়িতেই যাবে। ড্রাইভার ওকে পৌঁছে দেবে।'

সুরঞ্জনের ড্রাইভার আছে জানতাম না। আমি রাণীকে বললাম, 'চলো। গুরুচরণ, রাণীর জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দাও।'

গুরুচরণ এগিয়ে এলো। রাণী বলে উঠলো, 'না থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

গুরুচরণ থেমে একটু দ্বিধাভরে আমার দিকে তাকালো। সুরঞ্জন ধমকের সুরে বলে উঠলো, 'আবার দাঁড়ালি কেন? নিয়ে যা।'

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি রাণীর জিনিসগুলো তুলে দিল। জিনিসপত্র আর কী। সতরঞ্চির মধ্যে দড়ি দিয়ে বিছানা বাঁধা। আর একটা ক্যামবিসের ব্যাগ। যা সম্বল করে একটি তেইশ বছরের মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাণীর সঙ্গে আমি আর সুরঞ্জনও নীচে গেলাম। গাড়িতে ওঠবার আগে রাণীর হাতে টিকিট আর টাকা গুঁজে দিল সুরঞ্জন। নিজেই গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালো। বললো, 'কিছু মনে করো না রাণী।'

রাণীর গলা শোনা গেল, 'কেন মনে করব দাদা।'

ও গিয়ে গাড়িতে বসলো। সুরঞ্জন দরজা বন্ধ করে দিলো। গাড়ি ছাড়বার আগে, রাণী আমার দিকে তাকালো। গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমার চোখের সামনে রাণীর মুখখানি ভাসতে লাগলো। আর এই মুহূর্তে, রাণীর চোখের জলে ভেজা মুখখানি মনে করে, ওকে যেন কেমন, কালো করুণ শ্রীময়ী বলে মনে হলো।

সুরঞ্জন ডাকলো, 'চলো, ঘরে যাই।'

আমরা দুজনে ওপরে উঠে এসে, বাইরের ঘরে বসলাম। সুরঞ্জন বললো, 'আশ্চর্য দেখ, সমস্ত ঘটনার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। এখন কী মনে হচ্ছে জানো? রাণীকে না হয় সিনেমায় নামানো যেত না। কলকাতা থেকে কতো লোক তো আমার বাড়িতে আসে, থাকে, কিছুদিন বেড়িয়ে আনন্দ করে চলে যায়। রাণীকেও যদি সেভাবে থাকতে বলতাম, ভালো হতো।'

এখন সেই কথা মনে হচ্ছে সুরঞ্জনের। কিন্তু সেটাও ভুল মনে হচ্ছে ওর। আমি বললাম, 'সেটা বোধহয় ঠিক হতো না। তা ছাড়া আসল ব্যাপার,

তোমার আতিথ্যকে ও ঠিকমতো নিতে পারতো না। ওর সেই মন মেজাজই নেই। বাইরের থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।'

এই সময়ে নীলা বাইরের ঘরে এলো। আমি হেসে বললাম, 'কী, চোখ ধুয়ে আসা হলো ?'

নীলা চমকে বললো, 'বা রে, চোখ ধোব কেন ?'

'ও, তবে মুছে আসা হলো ?'

নীলা মুখ ব্যাজার করে বললো, 'যান, ফাজলামি করবেন না।'

সুরঞ্জন ডাকলো, 'এসো নীলা, বসো। লেখকের মুখ থেকে, রাণীর ব্যাপারটা সব শোনা যাক। মেয়েটা যাবার সময় এমন মন খারাপ করে দিয়ে গেল।'

নীলা বসতে বসতে বললো, সত্যি। প্রথমে মনে হয়েছিল, একটা ঠ্যাটা পাজী মেয়ে। যাবার সময় এমন কাঁদতে লাগলো !'

নীলা আমার দিকে ফিরে বললো, 'কী হয়েছে ওর বলুন তো ?'

আমি বললাম, 'ওর এখানে চলে আসাটা একটা দৈবাৎ ব্যাপার। ও যে যেতে চাইছিল না, তার কারণ ওর যাবার কোনো জায়গাই নেই। ও হচ্ছে একটি বিতাড়িত মেয়ে। তোমাদের কাছে যেমন মনে হচ্ছিল অহেতুক বোঝা, আর একজন ও সেই রকম বোঝা হিসাবেই ওকে ভাগিয়েছে। তবে সেটা আরো ভয়ঙ্কর আর বীভৎস। তোমাদের বোঝা মনে করা তো খুবই স্বাভাবিক।'

বলতে বলতে, রাণীর সমস্ত ঘটনাটা আমি ওদের দুজনকে বললাম। শোনার পরে ওরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর নীলা বললো, 'মানুষ এমন কাজও করতে পারে ?'

আমি বললাম, 'মানুষই পারে। মানুষ মহৎ নিকৃষ্ট, দুই-ই হতে পারে।'

সুরঞ্জন বললো, 'সত্যি। সাহিত্যিক, তুমি কি রাণীর কথা কোনোদিন লিখবে ?'

আমি বললাম, 'তা কী করে জানব।'

সুরঞ্জন অন্য দিকে চোখ রেখে বললো, 'লিখো। লিখবে, আমি জানি। কিন্তু লেখা পড়ে লোকে বুঝবে না, বাস্তব জীবন সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের থেকে কতো বেশি বিস্ময়কর।'

আমি হেসে বললাম, 'সেই জন্যই তার উল্টো কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাই, পাঠক আবার অনেক সময় বই পড়ে এ কথাও বলে, জীবনে কি এ রকম ঘটে ? তারা অবাক হয়। মানুষ আসলে নিজেকেই চেনে কম। নিজেরই

জীবন সম্পর্কে যখন-বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, সেটা গল্পে উপন্যাসে স্থান পেতে পারে বলে সে ভাবতে পারে না।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, শ্রীমান রণো এলেন। এসেই আমার দিকে চেয়ে বললো, 'নাহ্, কোথাও মন টিকলো না। অনেকদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হলো। ভাবলাম, যাই কলকাতার গপ্পো শুনি গে।'

রণো ধপাস করে সোফার ওপরে বসলো। নীলা উঠে চলে গেল। রণো বসেই ভুরু তুলে বাত দিল, 'তারপর, সেটি গেলেন কোথায় ?'

সুরঞ্জনই জবাব দিল, 'রাণীর কথা বলছিস ?'

রণোর জবাব, 'কে জানে কী নাম, ও সব মনে রাখতে পারি না।'

সুরঞ্জন বললো, 'এতক্ষণে বোধ হয় ওর ট্রেন ছাড়লো।'

'তার মানে ?'

রণোর ভ্রূকুটি চোখে রীতিমত অবিশ্বাস আর বিস্ময়। আবার বললো, 'তার মানে আমাকে গুল মারা হচ্ছে ?'

সুরঞ্জন বললো, 'শুধু শুধু গুল মারব কেন। সত্যি চলে গেছে, ওর গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে পার হয়ে গিয়েছে।'

রণো একবার আমার দিকে তাকালো। আবার সুরঞ্জনের দিকে। আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী তুক্ করলি রে শালা ? পীরিত ?'

আমি হেসে বললাম, 'পীরিত্তী।'

রণো আবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, ব্যাপারটার সত্য-বুঝতে চাইলো। তারপরে একটা বিড়ি দাঁতে কামড়ে ধরে বললো, 'জানি শালা ও ব্যাপারে তুমি সিদ্ধহস্ত। প্রেমিক নাগর আমার। চেহারাটা করেছে দেখ দিকিনি। কেষ্ট ঠাকুরের মতো ভালগার, মেয়েরা দেখলেই পটে। তা, কী ধরনের পীরিত করলি ?'

রণোর আবির্ভাবে, আর কথাবার্তায়, বিষণ্ন আবহাওয়াটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। আমি জানি, রণো মুখে যা-ই বলুক, মনে ওর কৌতূহল। আর এও জানি, রাণীর সামনে ও যতো চোটপাটই করে থাক, পুলিশের কথা বলুক, আসলে রাণীর প্রতি সেটা কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ না। ওর এতদিন ধরে লেখা বা পরিচালিত যতো নাটক, সবই রাণীদের মতো অবহেলিত লাঞ্ছিত মনুষ্যদের নিয়েই। কিন্তু রাণীদের মতো মানুষেরা যখন এই সব জায়গায় ছুটে আসে বা এই ধরনের ভুল বা অন্যায় করে, তখনই ওর রাগ হয়। আমি বললাম, 'এ ক্ষেত্রে যে ধরনের পীরিত দরকার, সেই রকমই করলাম।'

রণো বললো, 'তবু শুনি। গল্প শুনিয়ে, গুল্‌বাজী করে ভোলালি, না কি বোন বললি, না মা বললি, না কি একেবারে ফাঁসিয়ে ছাড়লি? কী রে সুরঞ্জন, তুই বল না।'

সুরঞ্জনের ঠোঁটের কোণে হাসি। হাসিটার ভঙ্গি ভালো না। বললো, 'আমরা কেউ-ই ছিলাম না ভাই, বলতে পারব না। তুমিও চলে গেলে, কেশব বিধানও চলে গেল। তারপরে আমি আর নীলাও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। যাবার সময় মনে হলো রাণী বোধ হয় কাঁদছে, লেখক কী যেন বলছে।'

একে বলে পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলা। রণো ঠোঁট টিপে, ভুরু তুলে ঘাড় নেড়ে বললো, 'হুঁ, এতখানি? তা কী দিয়ে খুঁড়লি বাবা যে, জল বেরিয়ে পড়লো? একটু বল না শুনি।'

আমি হেসে বললাম, 'কী আবার? রাণীব জীবন-বৃত্তান্তটা জানা গেল। দুর্ভাগ্যের তাড়নায়, অন্ধের মতো ছুটে এসেছে।'

বণো গম্ভীর মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়লো। বললো, 'তা না হলে আর একটা বাঙালী মেয়ে, বম্‌বেতে ছুটে আসে ফিল্ম-এ নামবে বলে। তাও আবার ওই চেহারা নিয়ে? কিন্তু তোর বাবা ধৈর্য আছে। কতক্ষণ ধবে কথা বললি?'

'তা ঘণ্টা দুয়েক নিশ্চয়।'

'উহু, আমাকে যদি ওর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলতে হতো, তাহলে ওর কপালে মার ছিল। আমার বাবা এত ধৈর্য নেই। ওই জন্য জীবনে কোনো দিন শালা পীরিত করা হলো না।'

কিন্তু রণো জানতে চাইলো না রাণীর জীবনে কী ঘটেছিল। জীবনকে ও ভালোই জানে। রাণীর মতো একটি মেয়ের জীবনের ঘটনা বা গল্প শোনার ওর দরকার নেই। ও সুরঞ্জনের দিকে ফিরে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'তা, তোদের সেই ডিরেক্টর, মনিব, পরমগুরু জীবনকৃষ্ণ দাদাকে খবর দিয়েছিস?'

সুরঞ্জন বললো, 'দেব না? কী রকম দুশ্চিন্তায় ছিলেন।'

'তা ক্রেডিটটা নিজেই নিলি, নাকি আমাদের লেখকের কথা বললি?'

'লেখকের কথাই বলেছি।'

রণো আমার দিকে ফিরে বললো, 'তাহলে কিছু বেশি টাকা আদায় করে নিস। আসলে কী হয়েছে জানিস তো? কয়েকদিন আগে, ওদের স্টুডিওতে একটা মেয়েকে, ধর্ষণের পরে, অজ্ঞান অবস্থায় একটা শেডের পেছনে পাওয়া যায়।'

সুরঞ্জনের নিজের খেলায় হার। পাগলকে সে সাঁকো নাড়া দেওয়াতে চেয়েছিল। সাঁকো নাড়া লেগেছে, কিন্তু সেটা সুরঞ্জনের ডাঙায়, আমার না। রণোর কথা শুনে আমি সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম।

সুরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললো, 'স্টুডিওতে খালি তো আমরাই কাজ করি না। আরও অনেক পার্টি করে।'

রণোও ততোধিক গম্ভীর হয়ে বাজলো, 'তা জানি। আমি কি আর এ কথা বলেছি, তুই বা বিধান একটা অচেনা মেয়েকে রেপ্ করেছিস? ঘটনাটা তোদের স্টুডিওতে ঘটেছিল, সেটাই বললাম। সেই নিয়ে অনেক পুলিশি হুজ্জোত হয়ে গেল। তাই সামান্য রাণীকে নিয়ে, জীবনকৃষ্ণদার মাথা খারাপ হবার যোগাড়।'

সুরঞ্জন আমার দিকে ফিরে বললো, 'মেয়েটা বাঙালী না। আশে-পাশেরই কোনো গ্রাম থেকে বোধ হয় এসেছিল। ঘটনাটা আমরা জানলাম, যখন স্টুডিওতে পুলিশ এলো। দেখলাম, মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ্যও ভালো। কেউ স্বীকার করলো না, মেয়েটি প্রথমে কার কাছে এসেছিল। কারোর কাছে নিশ্চয় এসেছিল। হাসপাতালে মেয়েটি সুস্থ হবার পরে, তাকে আবার স্টুডিওতে পুলিশ নিয়ে এসেছিল। স্টুডিওতে যে-সব প্রোডাকশনের অফিস আছে, অফিসের কর্মচারী আছে, টেকনিসিয়ানস্ আছে, তাদের সবাইকে ডেকে ডেকে তাকে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা বলতে পারলো না, কে তার সঙ্গে কথা বলেছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু স্টুডিওতে সে এসেছিল কেন?'

রণো নিভে যাওয়া বিড়িটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে, আমাকে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো, 'এ শালা আবার ন্যাকা। সাতকাণ্ড রামায়ণের পরে, সীতা কার বাপ। তোমার রাণী গেছল কেন স্টুডিওতে?'

অন্যায় হয়েছে আমার। মনে ছিল না, রণদেব এখানে আছেন। যিনি রণ দিয়েই আছেন। রণে ভঙ্গ দিতে উনি কোনো দিন শেখেন নি। কিন্তু হেথাকার মহারাষ্ট্রের গ্রামের কোনো মেয়ে যে স্টুডিওতে আসতে পারে, রূপোলী পর্দায় ছায়াচারিণী হবে বলে, রণভীত এ অধম তা বুঝতে পারেনি। আমি বললাম, 'গ্রামের মেয়ে শুনলাম কী না। গ্রামের মেয়েও যে বায়স্কোপে নামবে বলে আসতে পারে, এটা বুঝতে পারিনি। যাই হোক, তারপরে শুনি।'

সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম। সুরঞ্জন বলল, 'মেয়েটির নিজের জবানীতে যা জানা গেছে, তা হলো, ও ভয়ে ভয়ে স্টুডিওতে ঢুকে চারদিকে দেখছিল।

কেউ কেউ ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা বলছিল না। জীবনে কোনো দিন ও স্টুডিও দেখেনি, ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিল না, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে কথা বলবে। বাগান, ঘর, গাড়ির যাতায়াত, এই সব দেখছিল। এ সময়ে, একজন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, সে কী চায়। তার খুব লজ্জা করলেও সেই লোকটিকে সে তার মনের কথাটা বলে। তখন লোকটি তাকে স্টুডিও-চত্বরের নানান্ পথে ঘুরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে বসায়। সেখানে আরো একজন লোক নাকি ছিল। মেয়েটির কথা থেকে বোঝা যায়, আর একজন যে ছিল, সে দেখতে বেশ ভালো, সুপুরুষ যুবক, সিনেমার হিরোর মতো দেখাচ্ছিল। সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে, মেয়েটিকে কিছু খেতে দেওয়া হয়, তাকে আশ্বাসও দেওয়া হয়, সিনেমায় নামানো হবে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। সারা দিনের কাজ শেষ। রাত্রের দিকে একটা ফ্লোরে কাজ ছিল, আমাদের না। টুকিটাকি কাজ, সে রকম ভিড় বা ব্যস্ততাও ছিল না। মেয়েটির জবানী হচ্ছে তারপরে ওকে আরো কিছু খাবার দেওয়া হয়, সঙ্গে পানীয়। তারপরে লোক দুটি তাদের দাবী পরিষ্কার জানায়, এও বলে, এ দাবী না মেটালে তাকে সিনেমায় নামানো যাবে না।'

রণো বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট করেক্ট।'

সুরঞ্জন রণোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তার মানে কী?'

রণো দাঁতে আবার বিড়ি কামড়ে ধরলো, গলায় তার রণো-রণো সুর, 'তার মানে শালা তোমাদের স্লো-কল্ড ফিল্‌ম লাইনের ওটাই আদত।'

সুরঞ্জনকে এবার একটু গম্ভীর আর বিরক্ত মনে হলো। বললো, 'তুই তাহলে কোন্ লাইনের লোক? তুইও তো ফিল্‌ম লাইনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিস।'

রণোকে তাতে রাগে আনা যায় না, এক স্বরে, এক সুরে বচন দিল, 'সে কি শালা তোদের মতো আপস করে ছবি করব বলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, না কি আমি তোদের স্লো-কল্ড লাইনের লোক! তার চেয়ে বাবা স্বীকার কর না, তোদের যারা মহারথী, তারা এই লাইনটাকে পচিয়ে মারছে।'

সুরঞ্জনও এবার আপসে নেই, সে-ও জেদে বাত দিল, 'মানতে পারি না। খারাপ লোক সব লাইনেই আছে। তার জন্য লাইনের দোষ নেই, আর খারাপ লোকদের জন্য কাজও পড়ে থাকবে না। তা ছাড়া, জে. কে. প্রোডাকশনের নামে, আজ অবধি কেউ একটা বাজে কথা বলতে পেরেছে?'

রণো বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বললো 'মাথা খারাপ, জে. কে. হলো প্রগ্রেসিভ প্রোডাকশন, বম্বেতে বাঙালীর ইজ্জত, নতুন থিয়োরি নিয়ে ভাবে—।'

সুরঞ্জন বলে উঠলো, 'নতুন থিয়োরির কথা আমরা ভাবি না, ও সব হল তোর ব্যাপার।'

রণোর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। হাসিটা সব সময়েই যে রণ দেবার হাসি, তা না। নজর করে দেখো, রণো ভিতরে মজাখোর আছে। সুরঞ্জনকে চটাতে পেরে রণবীরের এখন মেজাজ ধরেছে। সত্যি, ছোঁড়া পাজী আছে। আসলে আমি বাইরের লোক, ওদের বিবাদের তলায় তলায় যে-স্রোত বহে, সেটা আমাকে ধরতে দিতে চায় না। কানে যা শুনি, আসলে বাত তা না। বাক্ তাল অন্য দিকে। এ সব হচ্ছে, ফিল্ম জগতে, মতামতের লড়াই। নিজেদের ভিতরের ব্যাপার। তার মধ্যে যাকে বলে প্রতিষ্ঠা, সেটা এখনো রণোর জীবনে আসেনি। সুখের মুখ দেখেনি। সুখের মুখ দেখতে চায় বলে মনেও হয় না। কেননা, কাজে আর মতে ও রণংদেহি। তা যেন হলো, আমাকে গল্পটা শুনতে দিতে, রণোর রণবাজী কেন। বললাম, 'আচ্ছা হয়েছে বাবা, তোমাদের কথা-কাটাকাটি রাখো, ঘটনাটা আমি শুনি।'

রণো সঙ্গে সঙ্গে খাপ খুলে তৈয়ার। আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে, মুখ ভেংচে বললো, 'শালা মাছি পেয়েছে গুড়ের সন্ধান। রগরগে মাল ছাড়বে সাহিত্যের পাতায়। খবরদার, ধরে বলছি, আলাদা কথা। আমাদের লাইনের যদি কুচ্ছো করো, বেড়ন দেব।'

আমার সঙ্গে সুরঞ্জনও এবার হাসে। এও আবার রণোর কথা। আমাদের কথা আমাদের, হাতাহাতি মারামারি, নিজেদের মধ্যে, তুমি কে হে।

কেউ না। রণো নিজেও জানে, তার বন্ধু কুচ্ছো গাইবার লোক না। আমি সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম। সুরঞ্জন ধর্ষিতা মারাঠিনীর কিস্সায় ফিরে গেল। বললো, 'তারপরে আর কী, মেয়েটি তখন বুঝতে পারে, সে কাদের পাল্লায় পড়েছে। সে রাজী হতে পারেনি। তারপরেই গোলমাল, জোর-জবরদস্তি। মেয়েটির ধারণা, সে ওদের সঙ্গে লড়তে পারতো, কিন্তু আগে থাকতেই তার মাথা ঘুরছিল, গা-হাত পা ঝিমঝিম করছিল, পানীয়তে কোনো গোলমাল ছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কোন কেস হয়নি। মেয়েটির দেহাতের বাড়িতে খবর দিয়ে, ওর বাবাকে ডেকে এনে, তার হাতে মেয়েকে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাপের সঙ্গে বাড়ি চলে গেছে।'

বলে সুরঞ্জন গলার স্বর বদলে আবার বললো, 'আমার অবাক লাগে অন্য কারণে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে, বাপটাকে কান্নাকাটি করতে দেখে বুঝলাম, মেয়েটা যথেষ্ট আদরের। তবু সব ছেড়ে দিয়ে, এমন ভাবে ছুটে চলে আসে কেমন করে?'

রণোর মুখে বিকার, চোখ পাকিয়ে হাঁক দিল, 'বাপটা শালা কাঁদছিল? আমি হলে, ওর ওপরে, মেয়েকে ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে নিয়ে যেতাম।'

আর সে ঠ্যাঙানিটা যে কী, তাও জানা আছে। অমন করে হারানিধি পেলে কেউ মারে, কেউ কাঁদে। আসলে প্রাণের তারটা বাজে এক জায়গা-তেই। আমি ভাবি, সুরঞ্জনের কথা। যাদের রক্তের বীজে জন্মালে, ঘরে বাড়লে, তাদের সবাইকে ফেলে, রূপোলী ছায়া এমন করে টেনে আনে কেমন করে? বুঝি, পরামর্শ দেবার মানুষের অভাব নেই। মন বলে কি কথা নেই? অজানা বলে কি প্রাণে কোনো ভয় নাই গো মারাঠা দেহাতিনী!

আছে, মন বলে কথা আছে, অচেনাকে ভয় আছে। তবু সেই যে এক কথা, আশা, সে যে মরীচিকা। রাণীর কথা মনে পড়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের কূলেই সে স্বাদ পেয়েছিল, অপরূপ জলের রাশি লবণাক্ত। মারাঠা দেহাতিনী, আরব সাগরের রূপালী জলের ঝলকানি দেখে, ছাতি-ফাটা তৃষ্ণায় ছুটে এসেছিল। ঝাঁপ দিয়ে দেখলো, এ জলও নোনা, উপরন্তু উথালি পাথালি জলে আছাড়ি পিছাড়ি প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ছায়াকে যারা প্রাণ দেয়, সেই ছায়া যখন রূপালী ছায়ায় নাচে আর কর-তালি বাজে, তখন সেই আলোর নীচে কতো কালী থাকে, কে জানে। কিন্তু রাণী, মারাঠা দেহাতিনী বা গুরুচরণদের খবর কি কেউ রাখে? রূপোলী ছায়ার চারপাশে যারা আর এক ছায়া হয়ে বেড়ায়। আরব সাগরে রূপো গলানো তরঙ্গেও বড় তিক্ত স্বাদ।

গায়ে ধাক্কা দিল রণো, ধমকে বাজলো, 'শালা ধ্যানে বসেছে। বুজরুকি ছাড়ো, কী ভাবছিস বল্ দিকিনি?'

বললাম, 'এই এদের এমনি করে ছুটে আসার কথা।'

রণো যেন ঠেক খেল, ভুরুতে বিদ্যুতের খেলা। একটু চুপ করে রইলো, তারপরে নীচু স্বরে যেন দূর থেকে বাজলো, 'তবে যা-ই বলিস, যার যেখানে যাবার, সে এমনি করে ছুটেই যায়। আমরা সবাই ছুটেছি।'

বললাম, 'তোর কথা অস্বীকার করছি না, আমরা সবাই ছুটেছি। এর সঙ্গে দরকার, নিজেকে ঠিক মতো জানা, লক্ষ্য আর প্রেরণা।' *

রণোর ভুরুতে তেমনি চিকুর হানাহানি, তারপরে বাজ-ডাকা স্বরে বললো, 'তা ঠিক; কেউ ভজে না জেনে, কেউ ভজে চোট্টামি করে। আমি ভজি শালা পীরিতে।'

একে বলে রণোর কথা। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, 'একটু চা হবে নাকি ?'

রণোর তাতেও সোগাসুজি, 'এখন চা হবে কেন, জিনিস নেই ?'

সুরঞ্জন যেন একটু বেকায়দায় পড়লো। আমার দিকে একবার দেখে বললো, 'থাকবে না কেন। ঠাণ্ডা হয়ে খেতে পারবি তো ?'

রণো চোখ উল্টে বললো, 'খাব গরম জিনিষ, ঠাণ্ডা হয়ে থাকব কেন ?'

এমন কী খাবার যে তার আবার ঠাণ্ডা গরমের ঝকমারি ? রণো আমার দিকে চোখ ঢুলু ঢুলু করে হাসলো। এটাও রণো পারে। আমাকেই কবুল করতে বললো, 'তুই-ই বল্ না।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'বস্তুটা কী ?'

'ন্যাকৃকা!'

রণোর বিকারে। তারপরে উক্তি, 'জিনিস বললাম, তাও বুঝতে পারলি না ? ব্যাটা, কারণবারি কাকে বলে জানিস ?'

এই সময়ে সুরঞ্জন উঠে গেল। আমি অবাক চমকে বললাম, 'মদ ?'

রণো ঘাড় নেড়ে জবাব করে, 'আজ্ঞে না, মাল।'

হাসি আর ধরে রাখা গেল না। বললাম, 'বম্বেতে এসেও, একটু বদলাসনি, সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীটি হয়ে আছিস! সেই বিড়ি খাচ্ছিস, সেই উড়ুনচণ্ডে চেহারা।'

রণো নাকের পাটা ফুলিয়ে জবাব দিল, 'বদলা-বদলির আর কী আছে। বদলাবার কারণই বা কী ঘটেছে ?'

রণো সোফার ওপর মাথাটা এলিয়ে দিল। তাকিয়ে রইলো ওপরের দিকে। দেখছি, ওর মন আর এখানে নেই। এখানকার বিষয়ে নেই। এখন ওর নিজের সঙ্গে কথা। কপালের উপর রুক্ষু চুলের গোছা। ওর হাড়পুষ্ট মুখের কিছু অংশে আলো, কিছু ছায়ায়। আপসহীন লড়াইয়ে যে চলে। মদত দেবার মানুষ নেই। এমন একটা রাস্তা, কেউ এসে বিশ্বাস করে, টাকা দিয়ে, রাস্তা খুলে না দিলে, চলা বন্ধ্। ঘরে বসে নিঃসঙ্গ সেনাপতির মতো কেবল, ময়দানের ছক তৈরি করা, কল্পনায় সৈনিক-সজ্জা। এখন দেখো, নিঃশব্দ মানুষটির মুখে কোন্ ভাবের খেলা। চেহারায় আচরণে বদলা-বদলির কী আছে। আসল বদলের ধ্যানে আছে, আশায় আছে।

এই হলো আর এক রণো, রণেতে আছে। সুরঞ্জন এলো, পিছে গুরুচরণ। তার হাতের ট্রে-তে পানীয়ের যাবতীয় সরঞ্জাম। সুরঞ্জনের প্রবেশ, রণোর আসন ছেড়ে উত্থান, তৎসহ সশব্দে হাই তুলে, হাত পা ছোঁড়া।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো, বোস্।'

রণোর জবাব, 'না, যাই।'

সুরঞ্জন বললো, 'বাহ, আনতে বললি যে?'

রণোর তেমনি ঠাণ্ডা জবাব, 'আনতে বলিনি তো। সন্ধ্যের পরে এখন তুই চায়ের কথা বললি, তা-ই বললাম। আমি শালা তোমার ও জিনিস আবার কবে খাই। ওসব 'লেবেল মারা জিনিসে আমার চলবে না। দি'শ লোক, দিশিতেই আছি। আমার জিনিস এখন জুহুর বালির নীচে আছে।'

এবার আমিই অবাক স্বরে বাজি, 'জুহুর বালির নীচে আছে?'

'তুমি তো শালা জম্‌মো-ন্যাকা, জানবে কী করে? মোরারজীদাদা এ দেশকে ভালো করবে বলে, শুকনো ডাঙা বানিয়েছে, জানোনা?'

'হ্যাঁ, তা তো জানি, ভ্রাই—।'

'হ্যাঁ, সুরঞ্জনের ঘরে যা দেখছিস, বিলকুল চোরাই মাল, বেজায় দাম। আর আমার জিনিস, দিশি লোক, দিশি জিনিস, জুহু সমুদ্রের ধারে বালির তলায় রেখে বসে আছে, এখন সেখানে যাব। যাবি আমার সঙ্গে?'

আমার চোখে যেন একটু আলোর ঝিলিক লাগলো। রণোর দিশি লোক, দিশি জিনিসের জন্য না। আরব সাগরের কূলে, জুহু সৈকতের ঝিলিক। সুরঞ্জনই তার আগে ঠেক দিল, 'আজ ছেড়ে দে রণো। লেখক দু'রাত্রি জেগে এসেছে। আজ আর জুহুতে টেনে নিয়ে যাস না।'

রণো বললো, 'হ্যাঁ, লেখক তো আবার এখন তোর কেয়ার টেকারে, কিছু হলে জীবনকৃষ্ণদাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। ঠিক আছে, আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে। কলকাতার কথা কিছুই হলো না।'

বলে আমার দিকে একবার চেয়ে, লম্বা হাতটা তুলে, বেরিয়ে গেল। সুরঞ্জন বললো, 'ব্যাটা বরাবর এক রকম।'

কিন্তু রণোর বেরিয়ে যাবার মধ্যে, আমি যেন দেখতে পেলাম, গভীর চিন্তামগ্ন একটা অস্থির মানুষ। খানিকটা পথ হারানো অসহায়।

সুরঞ্জন আমাকে বললো 'একটু চলবে তো?'

বললাম, 'ধাতে হয় তো সইবে, আঁতে চাইছে না। কবে থেকে ধরলে?'

সুরঞ্জন পাত্র পূর্ণ করতে করতে বললো, 'ধরাধরি আর কী। বলতে পারো, ছকে বেঁধেছি বাসা।'

কথার ধরতাই মিললো না, তাই সুরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সুরঞ্জন বললো, 'বুঝতে পারলে না? রামকৃষ্ণ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরক্ত হয়ে

কী বলেছিলেন, মনে আছে তো, 'বাবা, যা খাচ্ছো, তারই ঢেঁকুর তুলছ ?' আমারও সেই অবস্থা। যাদের সঙ্গে আছি, খাচ্ছি বসছি কাজ করছি কথা বলছি, তাদের মতোই হয়েছি। কাজের পর যাদের সঙ্গে ওঠা বসা, তাদেরই ছক ধরেছি।'

পাত্রে চুমুক দিয়ে বললো, 'তা বলে, সকলেই যে আমার মতো হয়, তা না। জীবনকৃষ্ণদা স্পর্শও করেন না। বিধান ও-সবের মধ্যে নেই।'

এই বস্তুর প্রয়োজন কতোখানি, জানি না। যারা খায়, তাদের যুক্তি সংসার মানে না। একই বস্তু, সকলের বেলায় সমান না। কারোর কাছে আগুন, কারোর মৌতাত। যে যেমন করে নেয়। কারোকে পুড়িয়ে মারে। কারোকে রসিক করে। প্রয়োজনটা বোধ হয় বড় কথা না। একে বলে নেশা। যে গ্রহণ করে, সে তার শরীর আর মন দিয়ে গ্রহণ করে। বর্জনের বেলাতেও তা-ই। ছুতমার্গের কথা ছাড়ো, যাতে যার সাড়া।

তবে সাড়া থাকলেই ভালো। অসাড় হলেই কাল। অসাড় তো কেবল শরীরে না, মনেও বটে। যে-মন বাজে, বাজিয়ে শোনায়। রাঙিয়ে দেখায়। এক কথায় বলো, প্রসব করে। তা-ই যদি অসাড় হয়, তবে বিষ বলি।

সুরঞ্জনের বেলায়, এ বস্তু মৌতাতের মধু হোক, তাই প্রার্থনা। আগুন যেন না হয়। নিজের কথা এখনো জানি না, বিচার ভবিষ্যতে।

নীলা এসে বসলো একটি সোফায়। বোধ হয় রান্নার তদারকে ছিল।

কবুল করা ছিল আগেই, এ কেবল আমার, 'মন চল যাই ভ্রমণে' না। তথাপি, ভ্রমণে আমার চিরদিনের সেই ঘরছাড়া নিখিলের ডাক, যেখানে আমার বিগ্রহেরা ফেরে নানা রূপের রঙে। তীর্থ যে আমার নানা জনপদে, মন্দির হর্ম্য থেকে মৃত্তিকা-কুটিরে, বিগ্রহ লক্ষ লক্ষ, রূপে সে বহু। এক সময়ে, চোখ বুজে মনে হয়, অরূপের আলোর ঝলক আমার চোখে।

তা বলে মিছেই কবুল করিনি। বলেছি, এ যদি আমার রথ-যাত্রার যাত্রা, তবে কলা বেচতেও আছি। রথ দেখার সঙ্গে আমার কলা বেচার জড়াজড়ি। আরো পোক্তের করে বলো হে, মহাপ্রাণীর দানা খুঁটে নেবে ঠোঁটে। ফেরী ওয়ালার ডাক পড়েছে বোম্বাই নগরীতে, রূপোলী ছায়ার আসরে। আরব সাগরের রূপোলী তরঙ্গের ঝলকে, চলকে চলকে, এ নগরখানিও রূপোলী। এ রূপোলী নগরের, রূপের রোশনাই যতো রূপোলী পর্দায়। সেথায় ছায়া

হয়ে হাতছানি দেয় যতো, বহুরূপী বহুরূপিণী। তাদের রূপের রঙে, দুনিয়া আহা মরি!

পর্দায় যাঁরা ছায়াদের প্রাণদান করেন, তেমনি একজন জীবনকৃষ্ণ। বঙ্গের এই ফেরীওয়ালাকে ডেকে এনেছেন তিনি। অতএব, এক রাত্রি পার হতে, কলা বেচার শুরু। দু'দিন কেটে গেল জীবনকৃষ্ণদার সঙ্গে, কাজের কথায়, আলোচনায়। এ তো আর যেমন তেমন কাজ না, ফেরীওয়ালার মাল কেমন, বাজার দর কেমন, সেই হিসাবে দর-দস্তুর করা আছে। তবে কী না, ক্রেতাদের চাল বরাবরই একটু ভার ভারিক্কি। বিক্রেতা হাত কচলে, দুঃখের হাসিটা লাজে লাজানো করে, 'বাবু আর দু'পয়সা বেশি দেন। দশ জনে মিলে বানাইনি গো, একা ঘরে একলা। মজুরির হাপা ডেকে দেখাতে পারিনি। কেননা, এ মজুরি হাতে দাঁতে না, আঁতে মাপে একলা।'

সে যা-ই হোক, দর-দস্তুরেই সব শেষ না। তারপরে আছে দলিল-দস্তাবেজ। ফাঁকি-ঝুঁকির কারবার না, রীতিমত লেখাপড়া চুক্তির ব্যাপার। ঘামতেল মাখা হয়ে যাবার পরে, পিতিমেখানি দেখতে বড় সোন্দর। কিন্তু তার আগে কাদা কচলানি দেখেছো তো? তারও আগে, বাখারি আর খড়ের বাঁধন আছে। তখন মনে হয় না, এত হুদ্দ কর্ম করে, এত খড় বাখারি কাদার দলার ওপরে, ঝকঝকে প্রতিমাখানি জেগে আছে। সংসারের তাবত কাজের এই নিয়ম। তেতো পোড়া দিয়ে শুরু, মিঠেতে শেষ। তবে হ্যাঁ, যদি মিঠে থাকে!

তবে সৎ লোকের সঙ্গে কারবার, জীবনকৃষ্ণদা মানুষটি ভালো। সজ্জন, স্বল্পভাষী, অমায়িক, আপন ভাবেতে আছেন। নাম-ডাকের সঙ্গে, পাল্লা দেওয়া গৃহখানি চোখ জুড়ানো। ধনীর ধন দেখলে মন আর চোখ একটু ছম-ছম করে। রূপো হলে অন্য কথা বলতো। আমার মতো ফেরীওয়ালা তা বলতে পারে না। আর, জীবনকৃষ্ণদার নাম জগৎজোড়া। ফেরীওয়ালাকে এখানে, নিজের সৌভাগ্য মেনে, সব থেকে কম দরে বিকিয়ে, সব থেকে সেরা হাসিটা হাসতে হয়। সংসারের এও এক অমোঘ নিয়ম।

তা হোক, যাঁর সঙ্গে কারবার, ফেরীওয়ালার সঙ্গে তাঁর আঁতের মিল হলেই, দাঁত দেখাতে রাজী। জীবনকৃষ্ণদার সেটুকু আছে। পেট একটু কম ভরেছে, জাতটুকু আছে পুরোপুরি। এমন না যে, পেট ভরলো না, জাতও গেল। তা ছাড়া এই ফেরীওয়ালার খুশি আর ধরে না। আর এক কারণে। মনে মনে তাজ্জব, দু'চোখে আর বিস্ময় ধরে না। জীবনকৃষ্ণদার দরবারে দেখ, যতো

রূপোলী সংসারের ফুলটুসি ফুলকুমারী, বহুরূপী রূপকুমারেরা। এঁয়ারা যে রক্ত-মাংসের মানুষ-মানুষী, সে কথা আবার কবে ভেবেছিলাম হে!

কেবল দেখা না, আলাপও বটে! যেখানে সেখানে না, আরব সাগরের রূপোলী কূল বলে কথা। এখানকার ফুলকুমারী রূপকুমারদের কথা আলাদা। ছায়াদের কায়ায় দেখব, আগে ভাবিনি। চোখে যখন দেখিনি, তখনই বাঁশির সুরে কত কিস্‌সা শুনেছি। এ'তে ও'তে শিরিঁ ফরহাদ প্রেম, কা'তে কা'তে নাকি লায়লা-মজনু পিরীতি। শুধু সেই কিস্‌সা কহাঁনিতেই নাকি রূপোলী জগতের বেলা কেটে যায়, নায়ক-নায়িকাদের প্রেম জর-জর দিল, কর্মীদের হাল হাপিস করার দাখিল। সেই যে কী বলে ভিন্‌দেশি কথায়, যার নাম 'রোমান্স' —কুমার-কুমারীদের সেই রোমান্স নিয়ে, হেথায় ফিস্‌ফাস্‌, হোথায় গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর। যাদের তাদের কথা তো না, রূপোলী সংসারের নায়ক-নায়িকাদের কথা।

কেবল রূপোলী সংসারের নানা কর্মীদের কেন টানাটানি। ইষ্টিশনের প্লাটফরোমে, রাস্তা রাস্তাকে কিনারে, জুতা সাফাইওয়ালা ছোকরাদের বয়ান শোন গিয়ে, ঘর ঘরমে, দপ্তর দপ্তরমে, যেথায় তোমার প্রাণ চাহে, ছোকরা ছুঁকরিদের গাল গপ্পো গুল্‌জারি শোনো গিয়ে, এক কথা। রূপোলী নায়ক-নায়িকাদের প্রেম-কথা, অমৃত সমান। তবে এ কথা বললে শুনব না, এ কিস্‌সায় গুলজার কেবল বুম্‌বই, কলকাতার রূপোলী জগতেও এখানকার কথা, এদের আলোচনা। অনেক শুনেছি।

সেই তানারা এখন আমার সামনে বসে। কেবল দেখাদেখি না, বাত পুছ কতো রকমের। ছেলেবেলায়, রূপোলী জগৎখানি ছিল রূপকথার জগৎ। তার নায়ক-নায়িকারা সোনার জলে চান করে, সোনার থালে খায়। কত কল্পনা। এখন সামনা-সামনি তাদের দেখেও আমার পেত্যয় যায় না, সত্যি রক্ত-মাংসের মানুষ কী না! যা বলো, তা বলো, তোমাকে মানতে হবে, সত্যি এরা রূপবান, রূপবতী, ভাষণে মিষ্টি। কারোর কারোর জ্ঞান-গম্যি রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কথা বলে সুখ, মিশলে মেজাজ আসে। রূপকুমারীরা শত হলেও মেয়ে। তাদের বাত পুছ একটু কম সম্‌। রূপ থাকলে তার ঝালটাও একটু বেশি, বিশেষ রূপোলী জগতের তারা ফুলটুসি। কিন্তু কুমারদের কথা আলাদা। আলাপের প্রথম ধাপেই, তোমাকে বন্ধু বলে ডাক দিতে পারে।

এ সব দেখে শুনে, আমার গুমোর হবে, এ আর আশ্চর্য কী। সহজে আমার গ্যাদা ঘোচানো যাবে না। সবাই যাদের ছায়া দেখেছে, কায়া-কল্পনায় মস্‌গুল,

তাদের সঙ্গে ওঠা বসা খানা দানা বাত পুছ্, এ বড় আত্মসুখ। বিশেষ, লাখ টাকার কমে যাদের ঠোঁট নড়ে না, চোখের পাতা নাচে না, আট দশ লাখে কিংবা তার বেশিতে পুরোপুরি খেলে, তাদের দেখাটাও জীবনে একটা অভিজ্ঞতা বটে!

ভেবেছিলাম, জীবনকৃষ্ণদার কাজ দু'দিনই হবে। তা না, কলা বেচায় আর একটু বেশিই লাগল। আলোচনা আর শেষ হতে চায় না। এদিকে যতো আলোচনা, ওদিকে ততো আলাপ-পরিচয়, নয়া নয়া মানুষের সঙ্গে। ইতিমধ্যে রণোর দেখা পাওয়া যায়নি। কিন্তু কলকাতার আরো কিছু পুরনো মুখের দেখা মিলেছে। তার মধ্যে এক পুরনো বন্ধু বিমান। সেই যাকে বলে 'টাইপ' তা-ই। রণো এক দিকে, বিমান আর এক দিকে।

রণোর স্বপ্ন ছবি, নিজের মনের মতো। বিমানের স্বপ্ন গল্প, ওর নিজের বচনে, 'শালা এমন গল্প ছাড়ব, পর্দা ফেটে যাবে!'

এর পরে আর বলবার মতো কথা থাকে না। আরক্তচক্ষু বিমান যেন টগবগিয়ে ফুটছে, কথার আর শেষ নেই। মানুষটাও ছোটখাটো, হাতে পায়ে যেন যন্ত্র লাগানো; সর্বদাই তা চলছে। মানুষটাকে দেখলে, আর গলার স্বর শুনলে, মেলানো দায়। গলার স্বর শুনলে মনে হবে, অট্টহাসের অরণ্যের তান্ত্রিক, বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবার হুঙ্কার। এর মধ্যেই যখন চোখে-মুখে হাসির ঝলক লাগে, তখন মনে হয়, দুধ্‌চেটে শিশু একটা।

জীবনকৃষ্ণদার স্টুডিওর অফিসে বসেই কথা। ভয়ে ভয়ে বিমানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতার তো লেখা-টেখা চলছিল মন্দ না, এখানে চলে এলে কেন হঠাৎ?'

বিমান একেবারে ব্যোম্‌কে উঠলো, 'হঠাৎ? শালা ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারবার গোঁসাই। তোদের কলকাতাকে চিনতে আর আমার বাকী নেই। খালি বড় বড় কথা, ওদিকে ছুঁচোর কেত্তন। দূর দূর!'

বিমানের কলমের ঝোঁকটা একপেশে, কিন্তু সেদিকে জোরটাও নেহাত কম না। তবে কলকাতার যে-জগতের সঙ্গে ওর কলমের যোগাযোগ, সে জগৎটা আমার তেমন চেনাশোনার মধ্যে পড়ে না। সেটাও কলকাতার রূপোলী জগতের চৌহদ্দির মধ্যে। কথার প্রতিবাদ করার সাহস আমার নেই। তবু জিজ্ঞেস করি, 'তা এখানে ভাতের হালটা কেমন?'

বিমানের জবাব, 'মুদ্দোফরাসের মতন। তবে কলকাতা তো না। এখানে শালা মুদ্দোফরাস হলেই বা বিমান বাম্‌নাকে কে দেখছে।'

কথাটা শুনলাম এক রকম, তথাপি কৌতুহল ঘুচলো না। বিমানের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'বুঝতে পারলি না? বোম্বাই ফিল্মি সংবাদ আর কেচ্ছা লিখে পাঠাই কলকাতার কাগজে।'

সেই কলকাতাই! কিন্তু খবরদার, সে কথাটি বলতে যেও না। কেবল জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তাতে কি চলে?'

'মাথা খারাপ! শালা ধোঁয়ার খরচ ওঠে না।'

'তবে?'

'ওই জীবনকৃষ্ণদা কিছু দেন মাসে মাসে।'

শোনো এবার বাত। বলি, 'তাহলে জীবনকৃষ্ণদার ইউনিটেই—'

বিমান সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে হাঁক, 'না না, ইউনিট ফিউনিট না। মাঝে মাঝে গল্প-টল্প মাথায় এলে লিখে দিই। কিন্তু হবে না কোনো দিন, জানি।'

'কেন?'

'কেন আবার, বিমান বামনার গল্প ছবি করতে হলে শালা ধক্ চাই, ধক্ বুঝলি? এ কি তোর মতো মিঠে মিঠে গল্প?'

দোহাই, আর নিজেকে নিয়ে টানাটানিতে যেতে চাই না। কিন্তু জীবনকৃষ্ণদার ধক্ নেই, তবু কিছু যোগান তো দিয়ে যাচ্ছেন। বিমান ব্রাহ্মণ তার কাজ চালিয়ে যাক না। ওর হাল হদিস যতোটুকু জানা আছে, তাতে পরিবার পরিজনের কেউ ওর প্রত্যাশী না। ওর বাবা মা কেউ কলকাতার বাসিন্দা না, গ্রামে বসত। সম্পন্ন গৃহস্থ। বিমান বোম্বাই কলকাতা ছেড়ে, সেখানে গিয়ে থাকলেও, খেয়ে পরে ওর জীবনটা কেটে যাবে। এমন কি, ছাদনাতলা চষে, বামে একটি বামা থাকলেও। কিন্তু সে সব কথা বলবে কে! মন গুণে যে ধন। মাথায় রয়েছে, পর্দা ফাটাবে!

তবে মাথায় কি আর এমনি এমনি রয়েছে। এর পিছনে যে, অনেক দিবা, অনেক নিশির চিন্তা আর শ্রম রয়েছে। পর্দা কি আর সত্যি ফাটাবে! কিন্তু থোড় বড়ি খাড়া আর না। পর্দায় নতুন গল্পের জন্ম হবে, এই আকাঙ্ক্ষা। সেই খুকি রাঁধে, খোকা খায়, খুকি কাঁদে, খোকা জপায়, এমন গল্প আর না। এই হলো বিমানের কথা। একা বিমান না, হয়তো আজকের অনেকের মনের কথা। তবে বিমানের বলার রকমটা আলাদা, ভঙ্গিতে জোড়া পাবে না। তার জন্য বম্বে আসার দরকার ছিল কী না, এ কথা পুছু করি, তেমন সাহস আমার নেই। বাংলায় যার কদর নেই, তাকে কি এই নগরী নেবে?

নেয়নি, এমন বলব না। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার, কফি-ঘরের সেই মুখচোরা

লাজুক ছেলেটির কথা মনে পড়ে। সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রণী, একদল বন্ধুর সে পালের গোদা। গল্পে সাহিত্যে নতুন রীতি-প্রকরণ নিয়ে তার মাথা-ব্যথা। বিশেষ করে ছোট গল্পের আন্দোলন। যত দূর মনে পড়ে, সে পত্র-পত্রিকাও চালাত। তারপর কবে কোন্ এক লগ্নে সে এল এই নগরীতে। বিমানের মতো পর্দা ফাটাবার পাগলামি তার নেই। কিন্তু সে পর্দা ফাটিয়ে চলেছে। আরব সাগরের পারে, রূপোলী জগতের হাল হদ্দ তার জানা। এখানে কোন্ রঙের কী রোশনাই, সে রহস্য তার জানা। রূপোলী পর্দার ভেল্‌কি সে জানে। তবে হ্যাঁ, বিমানের সঙ্গে তার মূলে জাত আলাদা। এ নগরীর রূপোলী পর্দার চাবিকাঠি তার হাতে আছে। বিমান এই চাবিকাঠিটার খোঁজে নেই। বিমান নয়া চাবিকাঠি গড়ার তালে আছে। একমাত্র এই নগরীর রূপোলী পর্দার দেবতা জানেন, বিমানের দ্বারা তা কখনো ঘটবে কী না।

তবে আমাকে কবুল করতে হবে, রণো বিমানদের ভবিষ্যতে কী আছে, জানি না। ওরা আর এক নয়া জমানার স্বপ্নে আছে। তাতে রূপোলী পর্দা কাপড়ের পর্দা হয়ে দেখা দেবে কী না, কে জানে। একটা চেহারা হয়তো বদলাবে।

বিমান ওর আরক্ত চোখ ঘুরিয়ে, আর নিজের উরুতে চাপড় মেরে বললো, 'তবে জীবনকৃষ্ণদাকে গল্প নিইয়ে ছাড়ব, দেখিস।'

মহাদেবকে ঠাণ্ডা করা ভালো। বললাম, 'তা তুই পারবি।'

বিমানের জিজ্ঞাসা, 'বলছিস ?'

বললাম, 'আমার তো তা-ই বিশ্বাস।'

বিমান হো হো করে হাসতে লাগলো। এ হাসিকে বলে ক্ষ্যাপার হাসি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত হাসির কী হলো ?'

বিমানের এমনিতেই চোখ আরক্ত। হাসতে গিয়ে গোটা মুখ। অন্য ঘর থেকে সুরঞ্জন আর বিধান এসে হাজির। এমন অট্টহাসি শুনলে, না এসে উপায়ই বা কী। জীবনকৃষ্ণদার অফিসে বসে আমারই আড়ষ্ট অবস্থা। ভাগ্য ভালো, জীবনকৃষ্ণদা তখন ফ্লোরে গিয়েছেন কাজ করতে।

সুরঞ্জন বললো, 'হলো কী, পেটে কিছু পড়েছে নাকি ?'

বিমান আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'এর কথা শোন্ মাইরি, ওর নাকি বিশ্বাস, জীবনকৃষ্ণদা আমার গল্প নিয়ে ছবি করবে।'

সুরঞ্জন একবার আমার দিকে দেখলো। তারপরে বিমানের দিকে। সুরঞ্জন বললো, 'ওর যা বিশ্বাস, তাই বলেছে। তাতে অমন ডাকাতে হাসির কী আছে ?'

বিমান ওদের দিকে আর তাকালো না। আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে, চোখ ঘোরালো, বললো, 'জীবনকৃষ্ণদা আমাকে কী বলেন জানিস ?'

'কী'

'আমার মধ্যে নাকি অভিনয়ের গুণ আছে। তাই উনি এখন আমাকে দিয়ে, অভিনয় করাতে চান।'

কেন জানি না, আমার চোখের সামনে, জীবনকৃষ্ণদার অমায়িক মুখখানি ভেসে উঠলো। যদি কারণ জিজ্ঞাসো, বলতে পারব না। বিমান আমার ঘাড়ে একটা খোঁচা দিয়ে বললো, 'কী বুঝলি ?'

আমি নিরীহ স্বরে জ'ব করলাম. 'কলম ছেড়ে অভিনয়।'

'সেটা তো ব্যাটা সোজা কথা, তা ছাড়া ?'

তা-ই তো, বিমান যে ভাবনায় ফেললো। আমি কি এখানকার সব ব্যাপার বুঝি ? আমি প্রতিধ্বনি করি, 'তাছাড়া ?'

বিমান বললে, 'টোপ।'

'টোপ ?'

'হ্যাঁ, আপদটাকে বসিয়ে খাওয়াবেন কতদিন ? তা-ই এই টোপ, বুঝলি ? যদি গেলানো যায়, ফতে। পর্দা ফাটাব ভেবেছিলাম, কলম দিয়ে। এর পরে, ভাঁড়ামি করে।'

'ভাঁড়ামি কেন ?'

'তবে আর তোকে বলছি কী। আমি যদি অভিনয় করি, সেটা ভাঁড়ামি ছাড়া কী হবে ? তবে হ্যাঁ, ওই যে কী বলে, কমেডিয়ান বলে চালানো যাবে।'

বলে বিমান আবার হাসতে লাগলো। অট্টহাসিটা যতো জোরেই বাজুক, কোথায় যেন একটা অসহায়ের সুর তাতে জড়ানো। হয়তো সত্যি, কলকাতার লোকে একদিন দেখবে, বিমান এই নগরীর রূপোলী পর্দায়, ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তখন সকলে হয়তো হাততালি দিয়ে হাসবে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আমার হাতেও কি তখন তালি বাজবে!

বিমানের সামনে বসে, এই মুহূর্তে হয়তো মনে হচ্ছে, বাজবে না। কিন্তু অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের, সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকারের কথা কে বলতে পারে ? রূপোলী জগতের ইন্দ্রজাল, তার অনেক ভেলকি। হয়তো সেদিন, আমার হাতেও তালি বাজবে। লেখক বন্ধুকে, পর্দার বুকে, বিদূষকের ভূমিকায় দেখে, হয়তো আমিও তখন হেসে বাজব, হাততালিতে বাজব। দেখব, আমার বন্ধু আজকের মতোই

অট্টহাসে, পর্দায় বাজছে। এই অট্টহাসির সঙ্গে একটা অসহায় করুণ সুরের সঙ্গত শুনতে পাচ্ছি, তখন হয়তো তাও শুনতে পাব না।

এই মুহূর্তে বিমানের দিকে চেয়ে মনে হলো, রণোর আর এক পিঠ। বিড়ির বদলে, গোটা চুরুট মুখে। ঢলঢলে প্যান্ট পেটকোমরে চওড়া বেল্ট দিয়ে বাঁধা। জামাটাও সেই পরিমাণে মোটা আর ঢলঢলে। আরব সাগরের কূলে, বোম্বাই নগরী বলে কথা। সেখানে এমন বেচালে কি চলে? তাও আবার রূপোলী জগতের আওতায়? যাদের পোশাক-আশাক চুল-ফেরতা, সবাই হাতাবার তালে থাকে।

বিমান হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, 'কী রে, ধ্যানে বসলি যে।'

চমকে উঠে হেসে বাজি, 'না না।'

বিমানের গলায় এবার অন্য সুর। আমার হাতটা ধরে বললো, 'তবে শ্যাখ্ লেখক, তোকে কিন্তু সত্যি গালি দিইনি। জীবনকৃষ্ণদা তোর যে গল্পটা নিয়েছেন, ওটা সোনার হাতে লেখা।'

লজ্জা লজ্জা লজ্জা। বিমান আবার এমন সুরে, এমন কথায় ভাবে কেন? তাড়াতাড়ি বলি, 'সোনার হাতে লিখতে চাই না।'

'কিন্তু লেখাটা সোনার মতন। দে, হাম খাই।'

বলে আমার হাতটা টেনে, প্রায় হাম-ই খেল। এমন সশব্দ দম্ দম্ চুম্বন, এ বয়সে আর জোটেনি। তারপরেই বিমানের বয়ান, 'এবার চল, আমাকে আজ-খাওয়াবি।'

ধরতাই ধরতে না পেরে, আমি আওয়াজ দিই, 'অ্যাঁ?'

বিমানের জবাব, 'অ্যাঁ নয়, তুমি ব্যবসা করেছ, খাওয়াবে চলো। তারপর রাত্রে তো হাত পুড়িয়ে রান্না আছেই।'

সুরঞ্জন বলে উঠলো, 'তা কী করে হবে। ও তো এখন আমার সঙ্গে বাড়িতে খেতে যাবে।'

বিমান বললো, 'তোমার বাড়িতে তো চব্য চোষ্য রোজই হচ্ছে। আজ বাইরে, আমার হবে। তুমি তোমার বউকে টেলিফোনে জানিয়ে দাও।'

আমি সুরঞ্জনের দিকে চেয়ে বললাম, 'সেই ভালো। নীলাকে জানিয়ে দাও, তুমিও চলো।'

সুরঞ্জন আমার চোখের দিকে একবার দেখলো। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল। আমি বিমানকে বললাম, 'রণোকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? ওকেও ডেকে নিলে হয়।'

বিমান আরক্ত চক্ষু পাকিয়ে বললো, 'না না, খালি বিড়ি ফুঁকবে আর খিস্তি করবে, ও ব্যাটাকে আকি দু' চক্ষে দেখতে পারি না।'

এ আবার কেমন কথা। বিমান দু' চক্ষে দেখতে পারে না রণোকে? বিধান বসে বসে এক গাদা নেগেটিভ চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। সে বললো, 'দেখিস রে বিমান, রণোর কানে যেন আবার এ কথা না যায়।'

বিমান প্রায় তড়পে ওঠে, 'গেলেই বা, ওকে কি আমি ভয় পাই?'

বিমান নেগেটিভ থেকে চোখ না সরিয়েই বলে, 'ওটাকে ভয় বলে, না কি আর কিছু বলে, তা আমি ঠিক জানি না।'

'জেনে তোমার দরকারও নেই। যা করছো তা-ই কর।'

বলে বিমান মুখে একটি মুলোর মতো চুরুট গুঁজে দিল। তাতে আগুন ধরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। আমি রহস্যটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বিমানের কথা থেকে এইটুকু অনুমান করা গেল, রণোকে তার মোটেই পছন্দ না। কলকাতায় থাকতে এমনটি দেখি নি। এ নগরীর হাল-চালই আলাদা। এখানে এসে রণো বিমানে ছাড়াছাড়ি।

রথ দেখার সময় যখন এলো, তখনই একদিন রণো টেনে নিয়ে গেল ওর কোম্পানীর কর্তার কাছে। এই নগরীর রূপোলী জগতের যদি ডাকসাইটে কোন কোম্পানি থাকে, তবে, রণোকে যে কোম্পানি বেঁধে রেখেছে, সেটাই। কোম্পানির নামের ডাকে গগন ফাটে। জগৎ-জোড়া তার পরিচয়।

কোম্পানির মালিক নাকি হেলাত বেলাত করে বেড়ান, গায়ে হাওয়া দিয়ে। যা কিছু ক্রিয়া-করণ-পরিচালন, সবই এক এই নগরীর প্রবাসী বঙ্গ-আলী, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়। বলতে গেলে, তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। মহাশয়ের নাম শুনেছি ইতিমধ্যেই। কিন্তু এত বড় মানুষের কাছে, রণো কেন আমাকে নিয়ে যেতে চায়?'

রণো বললো, 'বাঙালী লেখকের সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

বড় ভয়ের কথা। শুনেছি, শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জী, গণ্ডায় গণ্ডায় বাঙালী পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা পোষেন। স্বয়ং রণোকেই তিনি পোষেন, এর থেকে আর বড় কথা কী। যে-রণোকে টাকা দিয়ে পোষেন, কাজ আদায়ের নাম নেই। এমন মানুষকে কে না ভয় করে। আমি কোন্ ছার,

শুনেছি তাঁকে ভয় করে, এই নগরীর তাবত রূপোলী জগতের নরনারী। ভয় না হোক, রেয়াত নাকি জবর।

রণোকে বললাম, 'থাক না, কী দরকার।'

রণো বিড়ি কামড়ে ধরে বললো, 'পরিচয় করে গ্যাখ না, অভিজ্ঞতা বাড়বে। কিছু ব্যবসাও হয়ে যেতে পারে।'

তা বটে, ফেরীওয়ালা মানুষ, বিকোতেই তো আছি, তবে আশা রাখি না। নতুন মানুষ দেখা তো হবে! রণোর কথায়, অভিজ্ঞতা।

গিয়ে দেখলাম, ব্যাপার তাই। জীবনকৃষ্ণদা যে স্টুডিওতে কাজ করেন, তার তুলনায়, এ অনেক বড়। ঢোকার মুখে ভিড় দেখে মনে হলো, ভিতরে কারখানা চলছে। বড় বড় টিনের শেডগুলো দেখে, কারখানার কথাই আগে মনে আসে। রণো নিয়ে গেল দোতলায় দর্শনার্থীদের কামরায়, মহিলা পুরুষের ভিড়। দেখেই আমি করুণ চোখে তাকালাম রণোর দিকে। এদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে যদি, মহাশয়ের কাছে যাবার সৌভাগ্য হয়, তবে রেহাই চাই। বড় মানুষের দর্শন আমার দরকার নেই।

রণো আমার দিকে ফিরে তাকালো না। লম্বা টেবিলের কোণের দিকে টেলিফোন। সেটা তুলে নিয়ে, গম্‌গম্‌ করে বেজে উঠলো, 'আমার সেই লেখক বন্ধুকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন, নিয়ে এসেছি। তবে মনে হচ্ছে, আজ আপনার দেখা করবার সময় হবে না।...অ্যাঁ? না, ভিড় দেখে বলছি।... আচ্ছা।'

রণো টেলিফোন রেখে দিয়ে, আমাকে ডাকলো, 'চল ভেতরে যাই।'

রণোর ভাব ভঙ্গি দেখে, অপেক্ষমানরা সবাই তাকিয়ে ছিল। আমিও তাকিয়ে ছিলাম। যাঁর নামে সবাই কম্প, রণো কি তাঁর সঙ্গে, এমনি ভাষে? তবে, এও বোধ হয়, রণো বলেই সম্ভব। অথচ শুনেছি, জীবনকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিও নিজেকে খুশি মনে করবেন, যদি শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জী এই কোম্পানিতে তাঁকে একটা ছবি করবার অনুমতি দেন।

রণোর পিছনে পিছনে যাই। দেখি গিয়ে, কেমন হোমরা চোমরা ব্যক্তি। দরজার কাছে, কঠিন মুখ বেয়ারা, চুপ করে দাঁড়িয়ে। একবার কেবল রণোর দিকে চেয়ে দেখলো। তারপরে ঠাণ্ডা ঘরের দরজা খুলে ধরলো। প্রথম সম্ভাষণ গরগরে গলায়, 'আসুন আসুন, বসুন বসুন।'

শুনেই যেন কেমন লাগে। সবই যে জোড়া জোড়া ডাক। সইবে তো! পরিচয়ের আগেই সম্ভাষণ, তথাপি রণো পরিচয় বাতলাতে ভোলে না। চ্যাটার্জী

অন্ত দিকে ব্যস্ত থাকা সত্বেও, গোল টেবিল ঘিরে যতো চেয়ার, তাঁর নিকট-তমটি দেখিয়ে, আমাকে আবার বললেন, 'বসুন, এক সেকেণ্ডে একটু কাজ সেরে নিই।'

তা নিন। বসতে বসতে ভাবি, আর যার সঙ্গে চ্যাটার্জী কাজ সেরে নিচ্ছেন, অধমের চোখের মাথা খাওয়া নজর সেদিকেই যেন বাতাসের ঘায়ে গোঁত্ত খেয়ে পড়ে। উ বাবা, ইনি যে এ নগরীর, রুপোলী ঘরাণার এক নাম-করা ফুল-কুমারী। জীবনকৃষ্ণদার আসরে একে দেখিনি। আমি একবার রণোর দিকে তাকালাম। আবার ফুলকুমারীর দিকে। ফুলকুমারী কেমন যেন বিব্রত, আড়ষ্ট। ওলন্দবাহার শাড়ির আঁচল খুঁটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চোখের পাতা নামানো।

চ্যাটার্জীর গরগরে গলা শোনা গেল, 'হুম, দেন, হোয়াট'জ্ য়োর এক্সপ্লানেশন ?'

একেবারে কৈফিয়ত দাবী ? তাও এমন দরের ফুলকুমারীর কাছে ? এমনটি আমার কল্পনায়ও ছিল না। তবে হ্যাঁ একটা কথা কবুল করতে হবে, চ্যাটার্জীর পক্ষেই যেন এমন কৈফিয়ত তলব সম্ভব। এমন চেহারার জুড়ি আজও দেখিনি, ভবিষ্যতে দেখব কী না জানি না। রণোকে জানতাম, ভারতবাসী হিসাবে, বেশ তে-ঢিঙে লম্বা। অমন আরো দেখেছি। চ্যাটার্জীকে দেখলাম, রণোর ওপরে। এমন গৌর অঙ্গ দীর্ঘদেহী, একবিন্দু মেদহীন, বলিষ্ঠ হাড়পুষ্ট বাঙালী, আগে সত্যি দেখিনি। কব্জি দেখলে, শিল্পীগুরু নন্দলালের আঁকা অর্জুনের কথা মনে করিয়ে দেয়। চোয়াল একটু উঁচু, চৌকো ভাবের মুখখানি। ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটিতে, মনে হলো, এ পুরুষসিংহ সদৃশ। চোয়ালে একটু রাক্তম আভা। গলার স্বর যেন চাপা গর্জনের মতন গরগরিয়ে বাজে। এই লোকের সঙ্গে কি না, রণো ও ভাবে কথা বলছিল !

তবে ও তো রণদেব ! চেহারার জন্য না, ও এমনিতেই, 'বল বীর, বল উন্নত মম শির।' এই চ্যাটার্জীই তো মাসে মাসে একগোছা টাকা দিয়ে, রণোকে সাদরে বসিয়ে রেখেছেন। গুণীকে গুণমূল্য দিচ্ছেন, কিন্তু কাজ করিয়ে না। রণো কাজের কথা বললেই নাকি এঁয়ার জবাব, 'আচ্ছা হবে, তুমি চিন্তা ভাবনা কোর না, তাড়া কিসের ?' আমার বুকের মধ্যে চমকায়। মনে হয় কী সর্বনেশে মানুষ হে ! মূল্য দেন, শ্রম চান না। এঁদের কি মতিগতি।

এদিকে চ্যাটার্জীর সিংহ-চোখের নজরে বেঁধা ফুলকুমারীটি, এমন ঠাণ্ডা ঘরেও যেন স্বেদ-সিক্তা। প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। দেখি কী না, ফুলকুমারীর ভঙ্গিতেও যেন, অপরাধের ভাব। তবে আর ছাই, সেই যে কী বলে, 'স্টারডম'- এর এত কচকচি কিসের।

চ্যাটার্জী যেন হঠাৎ একটু নরম হলেন, ইংরেজিতে যা বললেন, বাংলা তর্জমাতে, 'মনে রাখা দরকার, কোম্পানি তোমার সঙ্গে চুক্তিতে কোনো গোলমাল করেনি। কিন্তু তুমি পর পর চারদিন লেট। তোমার জন্য সব কিছু পড়ে থেকেছে, ডিরেক্টর, অ্যাক্টরস, ক্যামেরা, ফ্লোর, টেকনিশিয়ানস্‌। আমি আশা করব, এর পরে আর একদিনও এ রকম হবে না। এখন যাও। শুটিংয়ের পরে একবার দেখা করে যেও।'

ফুলকুমারী আনত মুখেই চলে গেল। আমার নিজেকেই কেমন যেন অপরাধী লাগছিল। কোথাকার, একটা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, বাঙালীর সামনে, এমন একটি তারকাকে এভাবে ধমকানো। এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর দেখিনি। বড় প্রাণে লাগে যে।

চ্যাটার্জী রণোকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।'

রণো তখন দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরেছে। বললো, 'মাপ করবেন, আপনি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি ততক্ষণ একটু এদিক ওদিক ঘুরি।'

চ্যাটার্জীর গলার স্বর এখন আর গরগরানো না। তবে নীচু গম্ভীর স্বরের মধ্যে এমন ভাব, গর্জন বেজে উঠতে পারে যে কোনো পলেতে। বললেন, 'সে তো তুমি এখন ফ্লোরে গিয়ে সকলের সঙ্গে গল্প করবে, কাজ-কর্ম করতে দেবে না। তার চেয়ে বোস।'

রণোর ঠোঁট বাঁকা, আর কাটা, 'না। আপনি এখন ফিল্ম লাইনের কতো কথা বোঝাবেন এই নতুন মানুষকে ও সব শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। তার চেয়ে আমি যাই, আপনারা কথা বলুন।'

বলে আমার দিকে চেয়ে, চোখের পাতায় ইশারা করে, বেরিয়ে গেল। চ্যাটার্জী হাসলেন। একেই কি স্ফিংকস-এর হাসি বলে নাকি! রণো আমাকে সিংহের খাঁচায় রেখে চলে গেল! ঝকঝকে গোল টেবিল, এক পাশে, কম করে আধ ডজন রঙ-বেরঙের টেলিফোন, ঠাণ্ডা ঘর, আর সিংহের মতো মানুষ। কারখানার মালিক না হয়ে ইনি রুপোলী জগতে কেন? মহাশয় বাজলেন, 'তারপরে বলুন, এখানে এসে কেমন লাগছে? এর আগে এসেছেন?'

সবিনয়ে জানাই, 'আজ্ঞে না।'

তারপরে এদিক ওদিক দু'চার কথার পরে, চ্যাটার্জী জিজ্ঞেস করলেন, 'লাইনে আসার ইচ্ছা আছে নাকি?'

এ লাইনে মানে, রুপোলী জগৎ। কথার ছন্দ ধন্দ আজকাল এমনি।

যা করবে, সব লাইনের কারবার। কিন্তু তাঁতী থাচ্ছি তাঁত বুনে, বজরা কিনে কি কাজ করব? ফেরীওয়ালার মাল যদি পছন্দ হয়, রুপোলী জগতের কর্তারা কিনতে পারেন। বললাম, 'সে-রকম ভাবে আমার আর কী আছে, ডাকলে আছি।'

চ্যাটার্জী বললেন, 'আপনাদের হাতে কলম আছে, আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন। তবে, বাঙালীদের একটা মুশকিল আছে, বিশেষ করে কলকাতার লেখক-টেখকদের কথা বলছি। তারা আবার সবটাই আর্ট করতে চায়।'

কথা কোন্ দিকে বহে, ধরতে পারি না। তা-ই মহাশয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। বাঙালী লেখক-টেখকদের সম্পর্কে ওঁর ভাষ্যি তো আমার জানা নেই।

চ্যাটার্জী বললেন 'খালি পথের পাঁচালী মাথায় নিয়ে বসে থাকলে তো হবে না। ফিল্ম হচ্ছে একটা আলাদা ব্যাপার। আপনার বন্ধু রণোর সঙ্গে আমার মতে মেলে না। ওরা সবাই খালি আর্ট করতে চায়। আর্টে চিঁড়ে ভেজে না।'

হুঁ, কথার গতিক যেন টুকুস্ টুকুস্ ধরা যায়। তাতেই ভুবনজয়ী পথের পাঁচালীর ঘাড়ে ঝাপ্পড়। বাঙালীর ঘাড়ে এমন রদ্দা মারেন কেন গো মশায়। আমি এ সবের কী-ই বা জানি। অতএব বাতে নেই, শুনতেই আছি।

কথায় কথায় চ্যাটার্জী ক্ষোভের কথা বললেন। নাম করলেন এক খ্যাত-নামা বাঙালী সাহিত্যিকের। তাঁকে তিনি কলকাতা থেকে, এই কোম্পানিতে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। লেখকের মর্জি মতন টাকার বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ওই সেই আর্টের ভাঁড়ামি। আসলে কুঁড়ে, টাকায় দেড়ে। কাজ করবে না। কেবল নাকি গা ঢিস ঢিস শরীর খারাপ না হয় তো, কলকাতা থেকে গিন্নীর শরীর খারাপের সংবাদ। গিন্নীর জন্য দুশ্চিন্তা। আরে এত যদি স্ত্রীর চিন্তা, এ নগরীতে কি একটা বউ ভাড়া মেলে না? তা-হলেই তো দুশ্চিন্তা শেষ হয়ে যায়।

চাটুজ্যে মশায়ের এই রকম বয়ান। বাঙালী মানেই ফাঁকি। আর্ট আবার কিসের? বলো এণ্টারটেনমেণ্ট। দশে মিলে কাজ করো, যা করবে, তা ফ্যাক্টরির নিয়মে করবে। এর নাম ইণ্ডাস্ট্রি। ও সব গড়ি-মসি আর্ট করা চলবে না। টাকা খোলামকুচি না। অতএব, সেই লেখককে 'রাম রাম' বলে বিদায়। আরে মশাই, কয়েক পাতা হিজিবিজি কাটা ছাড়া লোকটা কিছুই করেনি।

সত্যি-মিথ্যা জানি না। তবে চ্যাটার্জী যে প্রৌঢ়-সাহিত্যিক মহাশয়ের নাম করছেন, তিনি বঙ্গের সর্বজনশ্রদ্ধেয়। ভাবি সময়ে কী না হয়। মর্জি মতো টাকা দিলেই কি, মনের মতো কাজ পাওয়া যায়? কিন্তু আমার শোনা ছাড়া, বলবার কিছুই নেই। হেথায় বাত দেবার চেয়ে, বাত শোনাই ভালো।

তারপরে চ্যাটুজ্যে মহাশয়ের বয়ানে বোঝা গেল, বাঙালীরা কেবল কুঁড়ে বা আর্টের ভাঁড়ামি করে না। কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, মিথ্যা-ভাষণে জুড়ি নেই। বাঙালী-ই যখন বলছেন, বাঙালীকে শুনতেই হবে। সব জায়গায় কি প্রতিবাদ চলে, না করা-ই যায়? ভেবেছিলাম, বাঙালীর মুণ্ডুপাত এখানেই শেষ। তা বললে তো হয় না। চাটুজ্যে মশায় হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেবেন। কলকাতা থেকে এসেছেন লেখক মশাই, দেখে যান। শঙ্করকুমারের নাম শুনেছেন?

তা আবার শুনিনি! এ নগরীর রুপোলী জগতের এক মস্ত উঠতি তারকা। বঙ্গসন্তান। চাটুজ্যে মশাই ফোন তুললেন, কথা বললেন, 'আমি চ্যাটার্জী বলছি। শঙ্কর কি শুটিং করছে? ও!...পাঠিয়ে দিন আমার এখানে,...হ্যাঁ, মেক-আপ ড্রেস করা অবস্থাতেই চলে আসুক, কিছুক্ষণ শুটিং বন্ধ থাক।'

রিসিভার নামিয়ে, বেয়ারাকে ডেকে চায়ের হুকুম করলেন। কিন্তু শঙ্করকুমারকে আবার কেন? আমার অবিশ্যি দেখতে আপত্তি নেই। এমন সুযোগ ক'জনের হয়। কথার মধ্যেই শঙ্করকুমার উপস্থিত। তারকার গায়ে নবাবজাদার পোশাক, মুখের রঙ্-চঙ্ তেমনি। চেহারাটি সুন্দর, নবাবজাদার মতো বটে। এসেই সহাস্যে, 'কী ব্যাপার? এমন অসময়ে ডাকলেন?'

চ্যাটার্জীর আবার সেই গরগরে স্বর, 'বোস। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

কুমারের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তারকার চোখে ঈষৎ কৃপার নজর, মাপা হাসি, আমিও বর্তে গেলাম। তারপরেই চাটুজ্যে মশায়ের জিজ্ঞাসা, 'এবার বল তো শঙ্করকুমার, তুমি ওয়াধান ফিল্মসে একটা ছবিতে, হীরোর রোলে চুক্তি সই করেছ?'

তারকার চোখে-মুখে বিস্ময়। চকিতে একবার চোখের কোণে আমাকে দেখে নিল। তারপরে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার তো অনুমতি ছিল—।'

'তা ছিল, কিন্তু একটা কনডিশনে, এক লাখের কমে তুমি কোথাও সই করবে না! আমি তোমাকে প্রথম এক লাখ দিয়েছি।'

তারকার চোখে প্রবল বিস্ময়, 'তাই তো করেছি স্যার।'

চ্যাটার্জীর চোখ দুটি যেন একবার জ্বলে উঠলো, ইংরেজিতে যা বললেন, বাংলায় তা, 'একটি থাপ্পড় মারব, বাজে কথা বোল না। সত্যি করে বলো তো, কত টাকায় সই করেছো?'

তারকা লজ্জিত, মনে মনে নিশ্চয়ই আমার মাথা চিবোচ্ছে। কিন্তু আমার যে কী অস্বস্তি, তা কেমন করে বোঝাব। কোনো ভদ্রসন্তানই কি এ সব ব্যাপারে খুশী হতে পারে?

তারকা আরো অবাক, হেসে ভাবে, 'সত্যি আমি এক লাখে-তে—'

'আবার? কার কাছে লুকোচ্ছ তুমি জান না।'

চ্যাটার্জীর স্বরে বজ্র, 'এখনো সত্যি করে বলো। জানি, ভেতরের ব্যাপার সবই জানি। ওই পাঞ্জাবী ওয়াধান তোমাকে কিছু পাঞ্জাবী ছুঁড়ির মুখ দেখিয়েছে। বোধ হয় দেখানোর থেকেও বেশী কিছুই দিয়েছে। সে সব তুমি ওদের ওখানে অনেক পাবে। এদিকে মদও সমানে চালাচ্ছ। লিভার তো বোধ হয় পচতে শুরু করেছে। তুমি মরলে, তোমার পচা লিভারে আমিই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালব। যাক এখন—'

না, আর পারি না। বড় দায়ে বলি, 'আমি এখন উঠি, পরে আবার—'

চ্যাটার্জী হাত তুলে বললেন, 'কোথায় যাবেন মশাই, আপনাকে শোনাবার জন্যই এ সব। তা না হলে ভাববেন, খালি মিছে কথাই শুনলেন। একটা বাঙলা ছবিতে একে দেখে ভালো লেগেছিল। একে আমিই কলকাতা থেকে ডেকে এনেছি, হিরো করেছি, ওকে নিয়ে এখন এখানে টানাটানি। আমার খালি একটা অনুরোধ ছিল, ও যেন লাখ টাকার কমে কোথাও সই না করে। তাহলে ও একদিন দশ লাখে উঠতে পারবে। কিন্তু ও জীবনে তো টাকা দেখেনি, লাখ টাকা পেয়েও, লাখ টাকা এখনো ওর কাছে স্বপ্ন। তা ছাড়া ওই যে, কিছু পাঞ্জাবী ছুঁড়ির প্রসাদ পাচ্ছে, তাই এখনো মিথ্যে বলছে।'

তারকা কুমার প্রায় লজ্জাবতী কুমারীর মতো হেসে উঠলো। বললো, 'কী যে বলেন আপনি মিঃ চ্যাটার্জী।'

কুমারের দিকে ফিরে, টেবিলে চাপড় মেরে, গরগর করলেন, 'ও সব অশ্লীল শব্দ রাখো। এখন বলো, কততে সই করেছ?'

তারকার হাতে এখন চায়ের কাপ। তাতে কিন্তু মচকায় না। হেসে বললো,

'জানি না, আপনি কী শুনেছেন, তবে হ্যাঁ নব্বুই হাজারে সই করেছি। ওয়াধান বিশেষ ভাবে—'

চ্যাটার্জী তারকার হাত থেকে কাগটা টেনে নিলেন। নবাবজাদার পোশাকে চা চলকে পড়লো।

তারকা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো, 'এ হে হে, ড্রেসটা ··'

'নষ্ট হোক, এখনো সত্যি বলো। মিথ্যুক, (অশ্লীল গালাগাল , ও সব কালিঘাটের চালাকি আমার কাছে চলবে না। সত্যি বলো। নব্বুই, না, আরো অনেক কম ?'

কিন্তু আমাকে কেন রেহাই দেওয়া হচ্ছে না ? রুপোলী জগতেও এমন অরুপোলী কাণ্ড ঘটে, কে জানতো। এই ভাষায়, তা ও আবার এই নগরীতে অপিচ, আমি কেন এর সাক্ষী হে। ছেড়ে দাও সিংহমশাই, পালাই।

তারপরে শোনো, এদিকে জ্বর নামার মতো পারদের দাগে অঙ্ক নামে, নামতে নামতে, সত্তর। কুমারের মুখে রক্তশূন্য হাসি। চ্যাটার্জী এবার শক্ত মুখে ক্ষান্ত। তার মানে সঠিক অঙ্কটা তিনি আগে থেকে জানেন বলেই এবার ক্ষান্ত। কিন্তু কুমারের অবাক করানো বাত তখনো বাকী। বললো, 'কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জী, রত্নমালার মতো হিরোইন, ওয়াধানের কাছে মাত্র লাখে সই করেছে, যেখানে তার মিনিমাম দেড়লাখ।'

চ্যাটার্জীর চোখে-মুখে বিদ্রূপ আর ক্রোধ, 'হ্যাঁ, তাও জানি, আরো বেশি জানি, যেটা তুমি জানো না। রত্নমালার কণ্ট্রাক্ট পেপারের পিছনে, ওয়াধানের নিজের হাতে লেখা আছে, তার স্নেহের পাত্রী রত্নমালাকে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের একটি গাড়ি প্রেজেণ্ট করা হবে, বুঝেছ বুদ্ধু ? নাউ য়ু ক্যান গো, গেট আউট।'

শঙ্করকুমার হাসতে হাসতে উঠলো, হাসতে হাসতেই গেল। কিন্তু হাসির পিছনে যেটুকু রয়েছে, সেই গ্লানিটা যেন আমার মনে বাজতে লাগলো। আজ লিখতে বসে দেখছি, দশ লাখ না হোক, সেই তারকার এখন বাজারদর ছ' সাত লাখ। চাটুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে এখনো তার যোগাযোগ ঠিকই আছে। তথাপি, সেই তারকার উঠ্তি সময়ের ঘটনাটা এখনো আমার মনে একটা গ্লানি হয়েই আছে।

তারপরে শ্রীযুত চ্যাটার্জীর বচন, 'দেখলেন তো, মিথ্যে বলিনি! এবার আপনি বলুন, আপনাকে আমি কী মূল্যে পেতে পারি।'

'আমাকে ?'

কানে ঠিক শুনেছি তো হে। চাটুজ্যে মশাইয়ের বয়ান, 'হ্যাঁ, আপনাকে আমি চাই। আপনি আমাকে গল্প দেবেন, যাকে বলে কাহিনী। আপনার সব রকম ব্যবস্থা আমি করব, সব রকম সুখ সুবিধে। টাকার জন্য ভাববেন না। আপনারা হলেন ইয়ং রাইটার, আপনাদের কাছে আশা আছে।'

চোখের সামনে সবই যেন রুপোর ঝলকে ঝলকাচ্ছে। আমার ভিতরে রুপোর ঝলক, বাইরে রুপোর ঝলক। আরব সাগরের কূলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে রুপোর চল্‌কানি। রুপোয় রুপোয়, রুপোলী জগতের, রূপসাগরে যেন দোল খাচ্ছি। কিন্তু এমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কেন হে? রুপোর আলোয়, রূপের আলোয়, চোখে এমন ধন্দ কেন? যেন রুপোর পাতে পাতে, সোনার কাঠি আঁটা দিয়ে জড়ানো। সোনার তার দিয়ে নয়নমোহর সাজে সাজানো। হাত দিতে গিয়ে মনে হলো, সোনা-রুপোর বাঁধন বড় শক্ত। দমে কুলোয় না, যতো টানাটানি, ততো বাঁধাবাঁধি। কেন, এ কী বস্তু? যেন খাঁচার মতো লাগে।

নজর একটু তফাত করে দেখি, খাঁচা বটে, সোনা-রুপোর খাঁচা। কিন্তু আমি যে ফেরীওয়ালা। স্বভাব যায় না ম'লে। নাকি কপালেরই লিখন। একা মনে গড়ি, ফেরী করি। সোনার খাঁচায় নাকন চিকন, মিঠে ফল পানী, বল তো ময়না, হরে কৃষ্ণ। পোড়ার কপালে এমন করে বুলি কপচাবার সুখ নেই। ফেরী করে বেড়াই, বেড়িয়ে ক্লান্ত হই। তখন একটা কী সুর বাজে, শুকনো ভাতের স্বাদ তাতে বড় মিঠে লাগে।

দম ফেলে, হাত জোড় করে হাসি। সিংহমশাইকে বলি, 'আজ্ঞে সে-সৌভাগ্য করিনি। আমি এ ভাবে কাজ করার যোগ্য না।'

তা বললে তো হয় না। যোগ্যতা অযোগ্যতা চাটুজ্যে মশাইও বোঝেন। তাই অনেক বোঝানো সোজানো। তবু আমি তো নিরুপায় না,মন নিরুপায়। হরিণকে যদি পুছ্‌ করো, 'কোথায় থাকতে চাও হে? মানুষের কাছে পোষমানা হয়ে, না জঙ্গলে?' জবাব পাবে, 'জঙ্গলে।' ফির্ পুছ্‌, বনে যে বাঘ আছে খেয়ে ফেলবে।' জবাব, 'তবুও জঙ্গলে।'

যার যেখানে বাস। বনেতে বাঘ আছে জেনেও, বনের হরিণ বনেই থাকতে চায়। মরণ আছে জেনেও মানুষ বাঁচে। খাঁচাকে কে কবে চেয়েছে? তথাপি চাটুজ্যে মশাই হতাশ নন। এই নগরীতে থাকতে থাকতে তাঁর গৃহে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলেন। তার আগে টেলিফোনে ডেকে নিয়ে এলেন রণোকে। রণোকে বললেন, 'তোমার লেখক বন্ধু তোমার চেয়ে আর এক কাঠি ওপরে। হাসি দিয়েই মাত্‌ করতে চায়।'

রণোও এবার তালে তাল দেয়, 'আপনিও সেটা বুঝেছেন তাহলে ? বন্ধুটি আমার সাবলাইম—'

একটি প্রকৃত গালাগাল, যদিও হাসিতে মাখানো মিঠে। কিন্তু চ্যাটার্জীর সামনে কোন্ সাহসে উচ্চারণ করে, জানি না। বাইরে এসে রণোর জিজ্ঞাসা, 'কেমন বুঝলি ?'

'খাঁটি।'

'কোন হিসাবে ?'

'নিজের মতে আর পথে। তারপরে তোমার সঙ্গে না বনে তো, লড়াই করো।'

'আর বাঙালীর মুণ্ডপাত ?'

'বোধ হয় নিজে বাঙালী বলেই, বাঙাল'র ত্রুটি বেশি পীড়া দেয়।'

রণো গম্ভীর ভাবে, 'হুঁ। তোকে আটকাতে চাইলো না ?'

'চাইলেন।'

'কী বললি ?'

'কী বলব। আমি যে ফেরিওয়ালা, সেটা বললাম।'

রণো নাকের পাটা ফুলিয়ে, শক্ত মুখে, আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর আওয়াজ দিল, 'শালা।'

বলে পিঠে হাত চাপড়ে, ঘাড়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো রাস্তায়, এমন সময়ে আওয়াজ, 'এই যে রণোদা।'

কালো কুচ্‌কুচে, রোগা ডিগডিগে, যাকে বলে একখানি বাঙালী ছেলে। তেল-চক্‌চকে না, এই নগরীর ধুলায় রুক্ষ মাথায় চুলের জটা। পরণে প্যান্ট তো না, গোড়ালির ওপরে ওঠা, নড়নড়ে দো-নলা। বোতাম খোলা ময়লা জামা, তাতে বুক আর কণ্ঠার হাড়গুলো যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। শরীরের চেহারায় কিছুটি নেই, কিন্তু ডাগর দুটো চোখ আছে, আর আছে একখানি হাসি। বয়স কতো, রোগা চেহারায় বোঝা যায় না, যোলো থেকে কুড়ি ?

রণোর ধমক, 'তুই আবার এখানে কেন ?'

'বাজারের টাকা দিন।'

রণোর মুখে আর বিরক্তি ধরে না, 'সকালে চেয়ে রাখিসনি কেন ?'

জবাব, 'আপ'নি-ই তো বললেন, বিকালে বাজারের টাকা এখানে এসে নিয়ে যেতে।'

রণোর ধমক, 'কখনো না।'

দিব্যি, 'মাইরি।'

বচন শোনো! এদের সম্পর্ক কী! এদিকে রণোদা, ওদিকে বাজারের টাকা, তারপরে আবার মাইরি! কিন্তু রণো সেদিক দিয়ে গেল না। আমাকে দেখিয়ে বললো, 'এ দাদাকে চিনিস?'

বেচারী! ডাগর কালো চোখে চেয়ে ঘাড় নাড়লো। রণো ধমক দিল, 'শীগ গির পেন্নাম কর।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমান যেন ঢুঁ দিতে এল। 'থাক থাক' বলবার সময় নেই, তার আগেই স্যাণ্ডেল স্পর্শ, কপালে হাত ছোঁয়ানো। রণো বাত দিল, "কলকাতার একজন লেখক রে। জেবনকেষ্টদা ছবি করবেন বলে এঁর গল্প নিয়েছেন।'

আমার না, শ্রীমানেরই ধূলা-রুক্ষ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রণো আমাকে ডেকে বললো, 'আয়।'

চলতে চলতে রণো বললো, 'ওর নাম জীবন না, শুধু কেষ্ট। আমার আপদ।

আমি কৃষ্ণর দিকে তাকালাম। হাসিখানি যেন বাঁধানো। রণো একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো। আমার দরকার ছিল না। রণোর দরকার ছিল। কেবল চা না, কিছু রাম সামোসার অর্ডারও হলো। এখানে রাম মানে বিরাট আকারের কথা বলছি। খাবার এলে, রাণো প্রথমে তার আপদের দিকে চেয়ে বললো, 'নাও গেলো।'

এমন করে না বললে কি খাওয়া যায়? কৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে সিঙাড়া নিল। রণো নিজেও নিল। আমার দিকে ফিরে বললো. 'শ্রীমান আসাম থেকে এসেছেন, এখানে ফিল্মে নামবেন বলে।'

অবাক হয়ে ভাবি, 'আসাম থেকে?'

কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বললো, 'বন্যা হয়েছিল কী না, তা-ই।'

বন্যার সঙ্গে আসাম থেকে বোম্বাইতে ফিল্মে নামবার জন্য ছুটে আসার সম্পর্ক কী? জবাব দিল রণো 'ওর বাবা গেছে ডুবে, দিদি গেছে ভেসে। উনি ভাসতে ভাসতে বম্বেতে। কেন? না, ছেলেবেলা থেকে নাকি ওনার ফিল্মে নামার শখ। তারপরে একদিন দেখি, এক স্টুডিওর দরজায় ধুঁকছে। তার আগে তো রোজই দু-এক টাকা চাঁদা দিচ্ছিলামই। নিয়ে গেলাম বাসায়। এখন খাটিয়ার ছারপোকা, রক্তচোষা নড়তে চায় না।'

কৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হাসিখানি উজ্জ্বলতর। আর একখানি সিঙাড়া তুলে নিল। কেমন ছারপোকা ভাবো। রণো বললো, 'প্রথমে এখানে এসে, কার কাছে যেন গেছিলি?'

কৃষ্ণ বললো, 'জীবনকৃষ্ণদার কাছে।'

কৃষ্ণও বলে জীবনকৃষ্ণদা। রণোর বলার ভঙ্গিটিও তেমনি। যেন জানে না, কেষ্ট কার কাছে প্রথম গিয়েছিল। রণো বললো, 'লেখক দাদাকে ঘটনাটা বল্, কী কী হয়েছিল। দাদা লিখে দেবেন।'

বলা মাত্রই, বলা শুরু। কৃষ্ণ গলা-খাঁকারি দিয়ে শুরু করলো, 'প্রথমে জীবনকৃষ্ণদার বাড়িতে গেলাম। কুকুর চাকর সবাই তাড়া করলো। আমিও তেমনি দেখা না করে যাব না। তারপরে জীবনকৃষ্ণদা এলেন, দেখলেন আমাকে, জিজ্ঞেস করলেন কী চাই। বললাম, ফিল্মে নামব, আমাকে চান্স দিতে হবে। উনি বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। একটা রাগী চাকর বাইরের বেঞ্চে বসতে দিয়ে, আমাকে খেতে দিল। ডিম, পাঁউরুটি, চা। খাবার দেখে মনে হলো, তাহলে আমি চান্স পাব। তারপরে জীবনকৃষ্ণদা বেরিয়ে এলেন, আমাকে ডাকলেন ড্রাইভার গাড়ী বের করলো। উনি গাড়িতে উঠে আমাকেও উঠতে বললেন। আমার তো মনে খুব আনন্দ। এরকম ভাবে যে ওঁর গাড়ীতে করে আমাকে নিয়ে যাবেন, ভাবতে পারিনি।'

কৃষ্ণ একটু থেমে, হাতের সিঙাড়াট শেষ করলো। তারপরে আবার, "একটা মাঠের মতো জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে, আমাকে নিয়ে নামলেন। মাঠের ওপরে একটা দালান দেখলাম। দালানের গায়ে একটা সাইনবোর্ড 'বেঙ্গলী ক্লাব'। ওদিকে দেখিয়ে জীবনকৃষ্ণদা বললেন, 'ওই যে বাড়িটা দেখছো, সন্ধ্যেবেলা ওখানে গেলে তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' বাড়িটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। জীবনকৃষ্ণদা গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।"

না হেসে পারলাম না। এ যে হাসিরই গল্প। জীবনকৃষ্ণদার এ রকম কঠোর বাস্তববোধের কথা আমার জানা ছিল না। রণো বললে 'তারপরে তোর কী মনে হয়েছিল, সেটা বল্।'

কৃষ্ণ চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'বেড়াল তাড়ানো।

রণো গম্ভীর। বললো, তারপরে সন্ধ্যেবেলা কী ঘটলো বল্।'

কৃষ্ণ বললো, 'সেই বাড়িটার কাছে গিয়ে শুনলাম, সন্ধ্যেবেলা বিজিতকুমার আসবেন।

রুপোলী জগতের স্মরণীয় নাম, কিন্তু বাঙালী। এই নগরীর সব থেকে নাম-করা চিত্রনট, মস্ত বড় অভিনেতা। আজকাল যে চিত্র-নটদের এত কুমার কুমার বাতিক, বছর তিরিশ আগে উনিই তার প্রবর্তক বলা যায়। কৌতূহলিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী করলে?'

কৃষ্ণ বললো, 'সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করলাম। শুনেছি বিজিতকুমার খুব দয়ালু লোক। সন্ধ্যেবেলায় উনি এলেন, গাড়ী থেকে নামতেই, আমি কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই। আমি মনের কথা বললাম। উনি ধমক দিয়ে বললেন, 'ভাগো বুদ্ধু।'

'তারপরে?'

'তারপরে উনি চলে গেলেন।'

রণো খেঁকিয়ে উঠলো, 'তারপরেও তুই এখানকার সমুদ্রে না ডুবে, আমার ঘাড়ে চাপলি। নাও, এখন টাকা নিয়ে যাও, বাজার করবে কি মুণ্ডু করবে, করোগে।'

বলে রণো তাকে টাকা দিল। কৃষ্ণ হাসিখান ঝকঝকিয়ে আমাকে বললো, 'যাচ্ছি দাদা, বাড়িতে আসবেন।'

কৃষ্ণ চলে গেল। রণোর কোনো মন্তব্য নেই। বললো, 'চলো, তোমাকে সঙ্গীত পরিচালক সুরঞ্জনের সুখী ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

কিন্তু সুরঞ্জনের সুখী ঘরের পরিবর্তে, রণো আমাকে টেনে নিয়ে এলো আরব সাগরের কূলে। সুরঞ্জন আর নীলার সঙ্গে, ইতিপূর্বেই সৈকতবিহার হয়ে গিয়েছে। তীরের নাম জুহু। নামে কেমন যেন মন টানে। সুখী ঘরের থেকে, এ বাইরের অন্তঃহীন সিন্ধু কূল ভালো। সাগরের পাগল হাসি ফেনায় উপছানো। গর্জনে সুদূরের ডাক। ঘড়ির কাঁটায় সাত ঘটিকা। কিন্তু আকাশের গায়ে এখনো অস্তরাগের রক্তাভা। পশ্চিম দেশ। বঙ্গোপসাগরের আকাশে যখন অন্ধকার নামে, এই সাগরের আকাশে তখন সূর্যদেব অস্ত যেতে গড়িমসি করেন।

তা করুন এ য হাট। হাট ভালো লাগে না। বালুবেলার ওপরে রাস্তায় গাড়ির সার। মেয়ে পুরুষ শিশু বৃদ্ধ, রঙিন জনতার মেলা লেগেছে সৈকতে। বাদাম-চানাচুর-ফুচকাওয়ালা থেকে শুরু করে, ইকড়ি মিকড়ী কী সব বলে। (দোষ নেবেন না গো ভিনদেশীরা, এ বাঙালীর খাবারের নাম মনে রাখার দৌড় বেশি দূর না।) তাবত ফেরিওয়ালা নানা স্বরে বাজে ও বিকোয়। দোষ তাতে নেই। সব ফেরিওয়ালার নিয়ম তা-ই। আমারো। তবে সেই যে কথায় আছে, মন গুণে ধন। সিন্ধুর কূলে যদি এলাম, নির্জনতা দাও। নগরে যখন যাব, তখন হাট বাজার মেলা থাকুক। যেখানে যেমন।

কিন্তু এসেছো কার সঙ্গে ? রণোর সঙ্গে। কথাটি বলো না। কী বলে, শোনো। কী করে, দেখো। দুর্বাসা তো দেখছি, দাঁতে একখানি বুমবুই বিড়ি কামড়ে ধরে, রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে, সৈকতের চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। এক দিকে মেরিন ড্রাইভ দূরে, আর এক দিকে ধূ ধূ। রণো যেন নাকের পাটা ফুলিয়ে বাতাসে কিছু শুঁকছে। তারপরে বললো, 'যমের অরুচি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ?'

'স্বয্যি ঠাকুর, আবার কে। দেখছিস না, এখনো যাবার নাম নেই, সাতটা বেজে গেল। চল্। শুরু করে দিই।'

কী শুরু করবে, খানিকটা আন্দাজ করলেও, এখানে এই হাটের ভিড়ে কী করে সম্ভব বুঝতে পারছি না। সমুদ্রের মুখোমুখি থেকে, ডাইনে চলতে আরম্ভ করলো। আমি পাশে পাশে। বললো, 'মেজাজ খারাপ হচ্ছে বোধ হয় ?'

আমাকেই বলছে, যদিও নজর অন্য দিকে। বললাম, 'মেজাজ খারাপ হবে কেন ?'

'রণো হতভাগার সঙ্গে জুহুতে ঘুরতে হচ্ছে।'

বললাম, 'এখনো হয়নি, হলে বলব।'

'তুই বলবি ?'

'কেন, বলতে পারব না ?'

'শালা জানি, ওটাই তোমার প্যাঁচ। আজ হাজার হলেও মুখটি খুলবে না, কাল থেকে আমাকে দেখলেই পালাবে। ছায়াটি মাড়াবে না।'

কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা না। তবু হেসে বাজি, 'তা কেন ?'

'চোপ, ব্যাটা ভিজে বেড়াল। তোর মতো যদি আমি হতে পারতাম, এখানে অনেক কিছু করে ফেলতে পারতাম।'

এ হিসাবটা অবিশ্যি আমার জানা নেই। মিলে জুলে থাকতে পারলে ভালো। না পারলে নিজেতে নিজে। কাজিয়ায় রাজী না। এ রকম হলে যে এ সাগরকূলের নগরে অনেক কিছু করা যায়, তা আমার জানা নেই। ডানদিকে দেখতে পাচ্ছি, ঘন নারকেল কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে নানা ছাঁদের বাড়ি। কোথাও কোথাও, সমুদ্র মুখ করে, ছোট ছোট বাগান। সেখানে চেয়ার টেবিলে বসে, চা কফি গল্প কথাবার্তা চলছে। এ সময়েই হঠাৎ যেন সৈকতের বালি ফুঁড়ে একটি মূর্তি বেরিয়ে এলো। ময়লা হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট গায়ে,

পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। কালো কুচকুচে রঙ, পেটানো গড়ন, একটু খাটো। কালো চোখ চকচক করছে, মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। রণোকে দেখে, কপালে হাত ঠেকালো, হাসিটি আরো বিস্তৃত হলো। রণোর মুখখানিও হাসিতে ভরে গেল। এমন হাসি ওকে আর হাসতে দেখিনি। ইংরেজিতে বললো, 'এসে গেছ রামু।'

রামুও ইংরেজিতেই বললো, 'হ্যাঁ স্যার।'

'জিনিস আছে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'পাহারা কেমন?'

'সে জন্য ভাবতে হবে না। আজ তো আর নতুন না।'

'তা ঠিক, কিন্তু এখনো সে রকম অন্ধকার হয়নি।'

'না-ই বা হলো এদিকে কেউ আসবে না।'

রণো ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বললো, 'তাহলেই বুঝতে পারছ রামু, আমি কেন এ দিকটায় চলে এসেছি।'

রামু একবার তার হাসি চকচকানো চোখে, আমাকে দেখে বললো, 'আপনার তো সবই জানা আছে স্যার।'

রণো বললো, 'তাহলে নিয়ে এস তোমার জিনিস। এখানেই শুকনো বালিতে বসে পড়ি।'

রামুকে দেখলাম, দুই উঁচু জমির মাঝখান দিয়ে, এক শুকনো বালির খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। রণো আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছিস?'

বললাম, 'যদিও ভেল্‌কি, তবু একটু একটু পারছি'

'তবে আয়, এখানেই বসে পড়ি।'

রণো উঁচু জমির ধার ঘেঁষে, শুকনো বালির ওপরে, ওর আজানুলম্বিত বাহু, সুদীর্ঘ শরীরটা নিয়ে বসে পড়লো। স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে, ঠাণ্ডা বালির মধ্যে পা ডুবিয়ে দিল। বললো, 'আহ! শান্তি। বুঝলি লেখক, এই আমার ভালো। সুরঞ্জনের মতো টাকা থাকলে, অনেক টাকা দিয়ে চোরাই স্কচ্‌ খেতাম কী না জানি না, কিন্তু আমার ও সব ভালো লাগে না। স্কচ্‌ টচ্‌ আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না। দিশিই আমার ভালো লাগো।

বললাম, 'না খেলেই বা কী হয়।'

রণো ধমক দিয়ে বললো, 'মেয়েদের মতো কথা বলিস না। সংসারে

অনেক কিছুই তো না করলে হয়, তবু করে কেন লোকে? তুই ব্যাটা লেখক, আর এটা বুঝিস না, মনের একটা খিদে আছে।'

গ্লানি। পানীয় দিয়ে কি সেই ক্ষুধা মেটে? হয়তো মেটে। কার কিসে কী মেটে, কে বলতে পারে। কিন্তু এ মুহূর্তে, রণোর সেই উগ্রচণ্ডী মূর্তি আর নেই। ওর মেদবর্জিত ঋজু লম্বা চেহারাটা যেন বালির ওপরে, অবসাদে ভেঙে পড়েছে। জামা কাপড় ময়লা। চুলগুলো উসকো খুসকো। মুখে ধুলার স্তর। বড় বড় চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক। কলকাতায় ওর স্ত্রী আর সন্তান রয়েছে। ওর স্ত্রী বীণাকে চিনি, লক্ষ্মীর মতো ঠাণ্ডা সহিষ্ণু মেয়ে। এখন বোধ হয় কোনো ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে। এখান থেকে রণোও নিশ্চয়ই কিছু পাঠায়। এই রণোও, ওর যা শিক্ষা দীক্ষা আছে, এবং যে-পরিবারের ছেলে ও, অনায়াসেই একটা ভালো চাকরি করে ভালোই থাকতে পারতো।

কিন্তু পারলো না। যে-ঘাড়ে চেপেছে, তাকে তুমি ভূত বলবে কী না জানি না। আমি বলি ওটা সৃষ্টির ব্যথা। একটা আর্তি। একটা ঘোর। সে যখন বেছে শুনে, উপযুক্ত ঘাড়টিতে চাপে, তখন আর তার মুক্তি নেই। এই রণোও তা-ই। রণো ছুটছে। জীবনকৃষ্ণদার সম্পর্কে যে ওর নানা বিদ্রূপ, তার কারণ আর কিছু না। মঞ্চ আর চিত্রের জগতে, ও হলো উজানের মীন। ও যদি উজানগামী না হতো, তবে কলকাতার টালিগঞ্জের দরজা ওর জন্য খোলা থাকতো। খোলাও ছিল। কিন্তু ওর একটা কাজ দেখেই, স্রোতের চলমানরা পিছন ফিরে দৌড়। সেই ছবিটা আজও লেবরে-টরির অন্ধকার ঘর থেকে, রুপোলী পর্দায় মুক্তি পায়নি। কাগজে যাকে বলে মঞ্চসফল নাটক, তা ও কোনোদিন সৃষ্টি করতে পারেনি। ওর দৃষ্টি অন্যত্র, মন অন্যখানে। আজ ও বম্বেতে এসে বসে আছে। টাকা পায়, কাজ পায় না। কী বিচিত্র দেশ হে। কী বা নির্মাতাদের মনের কারসাজি।

আমি ওর পাশে বসলাম। রামু এলো। তার হাতে একটি বোতল, জল রঙ পানীয়। এবার দেখ, কাকে বলে শুকনো দেশ। সামনে আরবসাগর রুপোলী ঢেউয়ে চলকায়। এখানে বোতল টলটল করে। আইন আছে ফিতেয় বাঁধা কাগজে। যে খান চিনি, তারে যোগান চিন্তামণি। মনে পড়ে যাচ্ছে, বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের ব্রহ্মচর্য বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কেবল ওপরের এই চাক্ষুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভূমি দেখলেই হবে না। ঝোপ জঙ্গল সাফ করে, নিকিয়ে চিকিয়ে রাখলেই হবে না। মনে রাখতে হবে, এই ভূমির পাতাল

অন্ধকারে, অতি ভয়ংকর বিশাল বিষাক্ত সরীসৃপ আছে। ওকেও নিঃশেষে নির্মূল করতে হবে।' সরকারি বয়ানে অবিশ্যি এ সব ঠেকে না। আইনের চোখ রাঙানি তার জানা। কিন্তু হাদ্যাখ্ মোর কলাটা। ওপরের ডাঙা তুমি শুকনো রাখো। তলায় তলায় অন্তস্রো্তে বহে!

বোতল দিয়েই রামু আবার অদৃশ্য। পানীয়র দিশি নামটি আমার এখন মনে নেই। রণো বোতলের ছিপি খুলে, ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল। মুখটা যেন একটু বিকৃত হলো। বারদুয়েক ঢোক গিলে বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নে একটু খা।

আমি ভয় পাওয়া চমকে বাজি, 'ওরে বাবা, তোমার ও বস্তু আমার চলবে না।'

রণো বললো, 'জানি, এ ব্যাপারে তুমিও একটি সুরঞ্জন।

হেসে বলি,'তুই ভালোই জানিস, সুরঞ্জনের বস্তুও আমার তেমন চলেনা।'

তবু তো উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়। ঠিক আছে শালা নিতে হবে না। আমারটা আমিই খাই।'

বলে মহাদেবের মতো বিষপান করলো আবার। অল্পেতে নেই। পান করা দেখলে মনে হয়, তীব্র পিপাসা। আমিই ভয় পাই। রণো আমার আস্তিনে ঠোঁট মুছে বিড়ি ধরালো। এবার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এখনো রণোর মুখ দেখা যাচ্ছে। পানীয়ের ছটা ওর মুখে, চোখে ঈষৎ রক্তাভা। তাকিয়ে আছে দূরের সমুদ্রে। সেদিকে চোখ রেখেই বললো, 'জানলি লেখক, আর এখানে থাকতে পারছি না। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম…।'

বলতে বলতে আবার বোতল তুলে গলায় ঢাললো। এ গলা যেন রণোর না। অন্য কারোর মোটা গোঙানো স্বর! আবার বললো,'তিলে তিলে মরে যাচ্ছি।'

কথাটা শুনে, এই আরব সাগরের কূলে বসে, আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। আমি রণোর মুখের দিকে তাকালাম। ভুরু কোঁচকানো নেই, মুখের ভাঁজে কোন নড়াচড়া নেই। যেন অনেক শান্ত, স্থির, অথচ তিলে তিলে মরার কথা বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রণো এ ছাড়া কি কোনো উপায় নেই?'

রণো গলায় পানীয় ঢাললো। বললো,'বুঝতে পারি না, কী করব। চ্যাটার্জি আমাকে দিয়ে কোনো দিনই কাজ করাবে না, অথচ টাকা দিচ্ছে, আশা দিয়ে রাখছে। জীবনকৃষ্ণদা আমাকে দিয়ে কখনো কাজ করাবেন না। ওঁকে লোকে প্রগতিশীল ডিরেক্টর বলে। এটা কোনো কথা হতে পারে না। ও সব প্রগতি-শীলতা হলো, ছবির গল্প। গল্পের প্রগতিশীলতা দিয়ে আমি কী করব।

আমি চাই ছবি, ছবি তৈরি করতে চাই। সবাক চিত্র মানেই কথা বলে। কিন্তু আমি চাই, ছবি নিঃশব্দে কথা বলুক, ছবি কবিতা হয়ে উঠুক, ছবি মানুষের মনে বিঁধে যাক। আমি প্রগতিশীল গল্প নিয়ে ছবি করতে পারি, কিন্তু আমি ছবি করতে চাই, আর সেটা আদ্যিকালের ভঙ্গিতে না। তোদের কনটেন্টের সঙ্গে ফর্ম বদলায় না? সেই ফর্মটা কী, তা অনেকেই বোঝে না। বিশ্বাসকরে না। ভাবে ওদের টাকা আমি খোলামকুচির মতো নষ্ট করব।..'

একটানা অনেকগুলো কথা বলে, রণো আবার বোতল তুলে গলায় ঢাললো। ও এমন একটা জগতের কথা বলছে, যে জগতের বিষয় আমি প্রায় কিছুই জানি না। রুপোলী পর্দার সৃষ্টির বিষয়ে ওর যা সমস্যা, তার কোনো সম্যক ধারণা আমার নেই। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, এটা রণোর জীবন মরণের সমস্যা। ছবি তৈরি করা ওর কাছে টাকার স্বপ্ন দেখা না, বড়লোক হওয়া না। অধিকাংশের কাছে যেটা আসল চিন্তা।

অন্ধকার নেমে এলো। আমরা স্পষ্ট ভাবে, কেউ কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। সামনে দিগন্তহীন সমুদ্র। এখানে যখন একজন নৈরাশ্যের পাঁচালী গায়, তখন অন্ধকারেও আরব সাগরের তরঙ্গে ফেনিলোচ্ছল ফসফরাসের ঝলকানো হাসি কেন। জীবনের রহস্য কি তবে এই ফেনিলোচ্ছল হাসিতে রয়েছে। জানি না। কিন্তু রণোকে কী বলা যায়, বুঝি না। চোখের সামনে একটা প্রকাণ্ড শক্তি যেন, অন্ধ আর অবশ হয়ে পড়ে আছে।

রণো একটা বিড়ি ধরালো। সাগর গর্জনের আবহ সঙ্গীতের বুকে, ওর মোটা গম্ভীর গোঙানো স্বর আবার শোনা গেল, 'বুঝলি লেখক, থাকব না এখানে আর। এখানে আমাকে কেউ আমার মতো কাজ করতে দেবে না! চ্যাটার্জী তো নয়-ই, জীবনকৃষ্ণদাও না। জীবনকৃষ্ণদা একবার আমাকে একটা ছবি করতে বলেছিলেন, একটা অত্যন্ত এলোমেলো গল্প, সুপারভিশন ওঁর—প্রতি পদে পদে চিত্রনাট্য উনি দেখে দেবেন, হয়তো ফ্লোরে এসেও আমাকে নানা ভাবে উপদেশ দেবেন। আমি তা পারি না। সুরঞ্জন বিধান ওরা সবাই আমার অফারটা এ্যাকসেপট করতে বলেছিল। করিনি। যে-কাজ আমি আমার নিজের মন থেকে করতে পারব না, তা আমি করতে চাই না। আমি কাজের স্বাধীনতা চাই। বড় স্টারদের নিয়ে, আমি আমার ছবিকে জাঁক-জমকেভরিয়ে তুলতে পারবো না। কিন্তু—কিন্তু তোকে এ সব কথা বলে কী হবে লেখক, তুই আমার এই বস্তু একটু চেখে দেখবি না শালা।....'

বলতে বলতে রণো আবার বোতল তুলে গলায় পানীয় ঢাললো। 'কিন্তু

এ আবার কী কথা! বেশ তো সমস্যা দুঃখ ধান্দার কথা বলছিল। তার মধ্যে আবার অন্য সুর বাজে কেন। আসলে, কান পেতে শোনো, অন্তরের গভীর রাগিণী যখন বাজে, তখন দুই দুই ভাবে তালে মেলে না। কিন্তু আমার তো মিলছে। রণোর সৃষ্টির সমস্যা না বুঝতে পারি, ওর দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। তবু বললাম, 'তুই যদি বলিস, তাহলে আমি খাব, কিন্তু আমি কি এ বস্তু গলায় ঢালতে পারব। তোর মতো শক্তি আমার নেই।'

এবার শোনো গর্জন, 'শালা! শালা আমার শক্তি দেখাচ্ছে। আমার যদি শক্তিই থাকবে, তবে আমি এ দেশে পড়ে আছি কেন। কই, তোকে তো এখানে অনেকে ডেকেছে, তুই তো আসিসনি। এই যে চ্যাটার্জী তোকে অফার দিল, তুই দিব্যি কেসটো মার্কা হাসিটি দিয়ে, মাথা নাড়িয়ে চলে এলি, আমি তো তা পারিনি। তুই এলি, মাল ঝাড়লি, এবার কেটে পড়বি। আমার কাজটা তো তা নয়। আমাকে এদের চাকরি করতে হবে। এদের হাত ধরা হয়ে থাকতে হবে। তোকেও ওরা সেই ভাবে পেতে চায়। তুই কখনোই তা নিবি না। আর আমার শক্তির কথা বলছিস।'

আবার ঢক ঢক করে গলায় ঢাললো। সোজা হয়ে বসলো। বললো, 'তোর রাস্তাই ঠিক। বাঙলা দেশে ফিরে যেতে হবে। আমার জায়গা বম্বে না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে, দরজায় দরজায় ঘুরে, ভিক্ষে করে, যে ভাবেই হোক আমাকে কাজ শুরু করতে হবে। এ ভাবে আমি আর বসে থাকতে পারছি না। আর দু' একটা মাস দেখব, তারপরে ফিরে যাব। এখানকার রুপোর জেল্লা আর রূপ আমার মনে ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। স্টুডিওগুলোতে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। ওরা নিজেরাই জানে না, ওরা কী করছে। অবিশ্যি আমি বলছি না, এখানে কেউ কিছু করছে না। কিন্তু অধিকাংশই বোঝে টাকা আর সেক্স্। না না, এখানে আর না, এবার চলো কলকাতা।'...

এখন রণোর গলায় যেন নতুন সুর বাজছে। আশার সুর। কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছে, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আপাততঃ বম্বে ওর জায়গা না। কলকাতার মাটি খুঁড়েই ওকে আপন ধন আবিষ্কার করতে হবে। অন্ধকারে সমুদ্রের ফেনপুঞ্জ হাসি যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এ সময়ে দূর থেকে দুটি ছায়া এগিয়ে এলো। কথায় বলে, চোরের মন বোঁচকার দিকে। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। শুকনো ডাঙার দেশে বসে, রসে গলা ভেজানো হচ্ছে। পুলিশ আসছে না তো? রণো ডেকে উঠলো, 'রামু।'

অন্ধকার থেকে জবাব এলো, 'ইয়েস স্যার।'

'হু'জ্ দেয়ার?'

'য়োর ফ্রেণ্ড স্যার।'

যাক, বাঁচা গেল। কিন্তু দোস্তটি কে? নিশ্চয়ই রসের সন্ধানী। মূর্তিটি দেখে মনে হচ্ছে, বেশ লম্বা, পাতলুন শার্ট শোভিত। দূরের আলো এখানে একটু ফিকে রোশনাই দিয়েছে। রণো হাঁক দিল, 'কে রে?'

জবাব এলো, 'হামি রে হামি, তেরে রতন।'

রণোও বাজলো তেমনি সুরেই, 'আরে শালা, পাঁচ লাখিয়া রতনকুমার, তুই এখানে কেন? মাতাল হয়েছিস নাকি?'

রতন নামক মূর্তি এসে সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু পাঁচ লাখিয়াটা কী বুঝতে পারছি না। এ কি বম্বের সেই রূপকুমার রতন নাকি? কাছে এসে, তার নিজের মতো বাঙলায় বাত দিল, 'কেনো হামি মাতাল হোবে? এখোন তো মাতাল বনবে। মেজাজ বিলকুল খারাপ, তো সী বীচে চলে আসে। কোই দেখতে পায় তো মুশকিল। ইধারেই আসতে লাগে। রামুর সাথে দেখা হয়ে গেল, বোললো রণোবাবু ইধার আছে। হামি ভাবে, ঠিক হ্যায়, আজ কান্ট্রিলিকার পিয়েগা।'

রণো বললো, 'কেন বাবা, আবার এ সব শখ কেন? তোর মতো স্টারের পেটে এ সব সইবে না। স্কচ্ না হলে, তোদের চেহারা বদলে যাবে।'

রতনকুমার ধপাস করে বালির ওপর বসে বললো, 'হটাও শালা চেয়রা, এক রোজ কান্ট্রিলিকার পিনেসে যদি চেয়রা বদল হোয়ে যায়, তো জানে দো। এ রামু, এক বোতল্ লাও ইয়ার।'

চমৎকার! রসিক জানে রসের সন্ধান। রামুকেও চেনে। রতন আবার বললো, 'দেখ্ রণো, এখোন রতনকুমার পাঁচ লাখ টাকায় ছবি কোরে। কিন্তু এই সীবীচেই তো দারু পীতে শিখেছি। যখোন হামি রতনকুমার হোয় নাই, তখোন তো কান্টিলিকার পিয়েছি। হামার ঘোরে ভি কান্ট্রিলিকার থাকে।'

বোঝা গেল, ইনিই তাহলে সেই রতনকুমার! আত্মপরিচয়ে নিজেই ভাষে। অস্পষ্ট হলেও, কুমারের গোরা রঙটি বোঝা যাচ্ছে। কপালে এলানো চুল। কোনোদিন কি ভেবেছি হে, এমন একজন রূপকুমারকে বালিতে চেপে বসে, দেশি মদ্য পান করতে দেখব।

রণো বললো, 'সে তো তোর শখ। ঘরের সেলারে, স্কচের পাশে দিশি রেখেছিস, স্রেফ লোক দেখাবার জন্য। খাস ক'দিন?'

রতন বললো, 'ক্রিকোয়েন্টলি, আপন গড রণো। কান্ট্রিলিকারের আলাক্ মেজাজ, দ্যাট'জ্ ইন্ মাই ব্লাড।'

ইতিমধ্যে রামু আর একটি বোতল এনে রতনকুমারের হাতে তুলে দিল। রতনকুমার বললো, 'গুড।'

রণো আমাকে দেখিয়ে বললো, 'তোর সঙ্গে আমার এই বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে বাঙলা দেশের একজন প্রখ্যাত (এবার রণোকেও আমার একটি গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছে) লেখক। জীবনকৃষ্ণদা এর একটা. গল্প কিনেছেন।'

রণো আমার নামটা বলতে, রতনকুমার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বলে উঠলো, 'আহ্‌হা। আপনার নাম তো আমি শুনেছি। আপনার গল্পে কাজ করার জন্য, আমি তো জীবনকৃষ্ণদার কাছে চুক্তি সই করেছি।'

করমর্দন করে বললাম, 'শুনে খুব খুশি হলাম।'

রতন তাতে থামলো না। বললো, 'আহ্‌হা, আপনার উপন্যাসে তো অথর নিজেই হিরো। চমৎকার, দাদা আপনার সঙ্গে আমি একটু মিশব। দু'দিন আমার কাছে থাকুন।'

রণো গর্জে উঠলো, 'এই শালা, এখন তোদের ওসব ফিল্‌মি বাত রাখ তো। মাল টানতে এসেছিস, তা-ই টান। লেখকের সঙ্গে পরে কথা বলে নিবি। তবে এ লেখক তোর থেকে ঘাগী মাল, দেখিস যদি কিছু বাগাতে পারিস্।'

রতন বাঙলায় বললো, 'জরুর বাগাবে। হামি দাদাকে একদম কার্বন কপি কোরবে, দেখে লিস্।'

বলে, বোতলের ছিপি খুলে, আমার দিকে এগিয়ে দিল। আবার ইংরেজিতে বললো, 'দাদা, এবার আমার বোতলটা আপনি উদ্বোধন করুন।'

যে যার নিজেতে আছে। হেসে বলি, 'আপনি পান করুন, আমার এটা চলবে না।'

'সে কি দাদা, আপনি রণোর বন্ধু, আপনার এ সব চোলে না?'

বললাম, 'পারি না।'

রণো এখন ওর পুরনো সুর খুঁজে পেয়েছে। বলল, 'অথচ ও পারে সবই। এ ভাবেই ওকে বুঝতে শেখ্, রতন, ব্যাটা ঘোড়েল ঘুঘু।'

আহ্। কী সুন্দর বিশেষণ আমার প্রতি। না হেসে পারি না। রতন বললো, 'তাহলে দাদা আমার বাড়ি চলুন, আপনার যা ইচ্ছা, তা-ই পান করবেন।'

আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'ব্যস্ত হবেন না। এটা আমি খুব প্রয়োজনীয় মনে করছি না।'

রণোর ধরতাই সঙ্গে সঙ্গে, 'কিন্তু আমরা মদ খেয়ে মাতলামি করব, সেটা দেখা ওর খুব প্রয়োজনীয়। একে বলে লেখক।'

আর একে বলে রণো। একে বলে রণোর বাত। জানি বিষ নেই, খাঁটি মধুতে একটু তিক্ততা থাকে, উষ্ণতাও থাকে। সেটাই নিয়ম। অতএব, রতন-কুমার, 'উইথ য়োর কাইণ্ড পারমিশন' বলে, রণোর মতোই গলায় পানীয় ঢাললো। পকেট থেকে বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বের করে, আমাকে দিল, নিজে নিল। সেই ক্যাচাকল না খ্যাচাকল বলে, তা-ই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল। এক লহমায় রুপোলী পর্দার নায়কের মুখখানি দেখলাম। অস্বীকার করার উপায় নেই, সুন্দর আর সুপুরুষ চেহারা। 'কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহুতের মত।' সত্যি, কে জানতো, লক্ষ পুরুষের মন মাতানো, কোটি মেয়ের প্রাণ মাতানো, রুপোলী পর্দার এই নায়ককে দেখব এমন পরিবেশে। তা তোমার সেই কী বলে, রুপোলী জগতের আঁতেলেকচুয়েল, তারকাদের সম্পর্কে তারা যতোই ঠোঁট উল্টাক আর নাক কোঁচকাক, সাগর সৈকতের আঁধারে, এই বালির ওপরে থেবড়ে বসা, দেশী চোলাই, চোরাইও বটে, সুরার বোতল নিয়ে বসা তারকাটিকে দেখে, আমার মন গলছে। পাঁচ লাখ টাকা তো সে ভিখ্ মেগে নেয় না। তোমরা দাও। তবে তো নেয়। যারা দেয়, তারা যে কী দায়ে দেয়, সিটি কি কেউ বোঝে না! তবে বলি, কলকাতায়, কলকাতার দরিদ্র রুপোলী জগতে, কোন্ পরিচালকের টাকার দক্ষিণা সব থেকে বেশি? সে টাকার অঙ্কও তো কম না। অনেক তারকার থেকে, অনেক বেশি। কেন? যে কারণে রতনের পাঁচ লাখ, সেই কারণেই। কারণ কলকাতায় সেই পরিচালকের ছবি বিকোয়, তাঁরই নামে ডাকে। তাঁর ছবিতে তিনিই তারকা, যারে কয় ইস্টার। হিসাব করে দেখো গিয়ে, দুয়ে দুয়ে চারই হয়। কলকাতার সেই পরিচালক এই আরব সাগরের কূলে এলে, পাঁচ কেন, আরো অনেক বেশি লাখেও বা বিকোবেন। এই কলের এই রকম কারবার।

রতনকুমার তার বিদেশী রাজা মাপের সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল রণোর দিকে। জিজ্ঞাসার ভাষা এই রকম, 'লিবে?'

জিজ্ঞাসার কারণ আছে। জবাব এই রকম, 'আ বে স্সালা পাঁচ লাখিয়া, আমি তোর মতো নেশার নামে ফুটানি করি না। আমি আস্‌লি নেশা করি।'

রতনকুমার বালির ওপরে প্যাকেট রেখে দিয়ে বললো, 'উ তো হামি জানে। ইস্ মে তুমার বিড়ি সে কম্‌তি নাশা হোয় না।'

'আব্বে রাখ্ তোর নাশা।' রণোর জবাব।

দুজনেই একসঙ্গে, বোতল তুলে গলায় ঢাললো। একই পানীয় দুজনে, বড় আনন্দে গলায় ঢালতে পারে। কিন্তু ধোঁয়ায় বিপরীত। তা হোক। রতন-কুমারের দোষ দিতে পারি না। যার যে রকম চলে। তারপরেই রতনের নতুন জিজ্ঞাসা, 'তো রণো, তুমার ছবি কব্ বন্‌ছে।'

রণোর জবাব, 'চিতায় উঠলে।'

এতটা নাউ স্নুচি নেবুর মতো বাঙলা বুলি, রতনকুমারের জানা নেই। জিজ্ঞেস করলো, 'চিতায় কী হোয়?'

রণো বললো, 'বুঝলি না? বার্নিং ঘাটের আগুনে যখন আমাকে পোড়ানো হবে, তখন আমার ছবি হবে।'

রতন বলে উঠলো, 'তোবা তোবা। উ হোয় না; উ হোয় না। কেনো তুমি বার্নিং ঘাটে যাবে।'

'তা না হলে আমার ছবি হবে না।'

'না না রণো, এটা ঠিক বাত হোয় না। তুমি ছবি বানাও, হামিও কাম করবে, মগর বাঙলা পিক্‌চার।'

রণোর ভাষা, 'শালা, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। পাঁচ লাখিয়া কাজ করবে আমার ছবিতে! পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারব না।'

তারকার জবান, 'কেনো রণো, হামি তুমাকে জবান দিয়েছে, তুমার ছবিতে হামি টাকা চায় না।'

রণো তাতেও দমে না, বলল, 'তোমাকে হাওয়াই জাহাজে যাওয়া আসা করার, কলকাতার ফাইভ স্টার হোটেলে রাখব, তাতেই আমার দম বেরিয়ে যাবে চাঁদ।'

কিন্তু রতনকুমারের কথা কেবল কথার কথা না। তা-ই সে যুক্তিতে যাচে, 'তো কী হোয়, হামি ট্রেনে পীসফুলি ট্রাভেল করতে পারে? ক্যালকাটা মে তুমার ঘরে হামাকে রাখতে পারে? আই হ্যাভ নো অবজেকশন, মগর নতিজা দেখতে হোবে।'

এবার দেখ রণোর আচরণ। আলো আঁধারে দেখতে পেলাম, ওর একটা হাত উঠে গেল রতনকুমারের মাথায়। চুলগুলো আস্তে নেড়ে দিয়ে, নরম গলায় বাজলো, 'জানি রে রতন, তুই যা বলছিস বুঝতে পারছি। তুই ট্রেনে যাচ্ছিস শুনলে, বম্বে কলকাতার সমস্ত স্টেশনে ভিড় লেগে থাকবে। আর কলকাতায়

আমার বাড়িতে? তুই থাকবি? পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু রতন, তুই যা ভাবছিস, তা কবে হবে, তা আমি জানি না।'

রণোর হাতটা ঝরে পড়লো রতনের কাঁধে। দুজনেই বোতল তুলে গলায় ঢাললো। রতন এবার গম্ভীর স্বরে বাজলো, 'রণো, বম্বে তোমার প্লেস্ না। তুমাকে কোই কাজ দিবে না। এভরিবডি তুমাকে লিয়ে হাসে, জোক করে, তুমার মিস্টার চ্যাটার্জি ভি। থোড়া দিন পহ্লে, এক বিগ প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটর মিস্টার চ্যাটার্জিকে বাতাচ্ছিল, কেনো সে রণোবাবুকে ধরে রেখেছে। হামার সামনে বাত, দুখ্ না পায় রণো, তো মিস্টার চ্যাটার্জি হাসি করলে, বাতালে, তুম্‌বা কা গোস্ত্ বান্‌তা, কোই দিন খায়েগা। তো বিগ প্রডিউসার বাতালে, রণোবাবু তুম্‌বা ভি নহি।'

এই নিষ্ঠুর কথাগুলো রতনের গলায় বাজলো এক গভীর ব্যথা গম্ভীর স্বরে। রণোর হাতটা রতনের কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওর মতো গুণী ছেলের, কথাগুলো কোথায় বেজেছে, একটু অনুমান করতে পারি। আর তা পারি বলে, একটা অসহায় ব্যথা আর ক্ষোভে, আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। রণো সহসা কোনো কথা বললো না। রতন গলায় বোতল উপুড় করে ধরলো। রণো তাও করলো না। দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে রইলো। দেখছি, আরব সাগরের ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গের ফসফরাসে হাসির ঝলক। একটু আগে, রণোর সঙ্গে এ সব কথাই হচ্ছিল। কিন্তু ওকে নিয়ে, এই হাসি ঠাট্টার নিষ্ঠুর দিকটা আলোচিত হয়নি।

রণো হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো। বোতল তুলে গলায় ঢাললো। আধ ফুট লম্বা বিড়ি ধরালো। বললো, 'ঠিক বলেছিস রতন, বম্বে আমার জায়গা না। তুই আসবার আগে, আমার এই লেখক বন্ধুর সঙ্গে, এ সব কথাই হচ্ছিল। আমি ডিসিসন নিয়েছি, খুব শীগগির কলকাতায় ফিরে যাব। যেমন করে হোক আমি কাজ আরম্ভ করব।'

রতন বলে উঠলো, 'ভেরি গুড।'

রণো আবার বোতল গলায় ঢেলে বললো, 'আর আজ তোকে এই জুহু সী বীচে বসে বলে যাচ্ছি, ওই মিস্টার চ্যাটার্জি কিংবা তোর ওই বিগ প্রড-ডিস্ট্রিবিউটর, একদিন আমার কাছে ছুটে যাবে।'

রণোর গলা শোনালো যেন, ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কোনো শপথ বাক্য উচ্চারণ করছে।

[জুহু সী বীচের এ কথা আজ যখন লিখছি, তখন কি আমার বলা উচিত হবে, বেশ কিছু বছর আগে, রণো যখন সেই শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিল, তা ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ওর প্রতিভা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ না, বিশ্বের দরবারে ওর প্রতিভা আজ স্বীকৃতি পেয়েছে।]

রতন বোতল শূন্যে তুলে আওয়াজ দিল, 'হেইল্ রণো! উসি দিনের রাস্তায় হামি দেখে।'

বলে বোতল একেবারে শূন্য করে গলায় ঢাললো। আমার দিকে ফিরে বললো, 'দাদা এখোন আপনার একটু রণোর হেলথ্ টেস্ট করা দরকার। হেই রামু।'

অন্ধকার থেকে জবাব এলো, 'ইয়েস স্যাব।'

রতন আওয়াজ দিল, 'জেরা দেখ্ ভাল্ করো জী। কিক্ নহি দে রহে।'

রামু ছুটে এসে শূন্য বোতল রতনের হাত থেকে নিয়ে, হিন্দীতেই জবাব দিল, 'চিজ্ তো খারাপ নহি দিয়া স্যার। ঠিক হ্যায়, আভি লে আঁতে।'

রতন আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'লিন দাদা।'

এতে আমার 'না' নেই। কিন্তু এই সমুদ্র সৈকতে বসে, গলায় বোতল ঢেলে, রণোর স্বাস্থ্য পানে আমার 'না।' তবে এবার দেখছি, রতনকুমার মোগল হয়ে উঠলো। বোতল আনতেই, ছিপি খুলে আগে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'লিন দাদা, এক সিপ্। বেশি না।'

আমি নিরুপায়ের ভঙ্গিতে, রণোর দিকে তাকালাম। ওর বয়েই গিয়েছে, ফিরেও দেখলো না। কিন্তু রতনে আমার কিঞ্চিৎ মন মজেছে। বাঙালীরই তো কথা, উপরোধে নাকি ঢেঁকিও গিলতে হয়। তবু বললাম, 'এ জিনিস এ ভাবে কখনো খাইনি।'

রতন বললো, 'কুছু হোবে না দাদা, ওনলি ওয়ান সিপ্।'

বোতল হাতে তুলে নিলাম। ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা। উঁচু করে ধরে, মুখে ঢালতে না ঢালতে মনে হলো, জিভ্ পুড়ে গেল। মুখে ধরে রাখার চেয়ে, তাড়াতাড়ি গিলে ফেলতে হলো। তাতেও মনে হলো, গলা জ্বলে গেল। মুখ ভরে উঠল লালায়। চোখে জল এসে পড়লো। আহ্, সুধার কি স্বাদ হে! রণোর কথা না হয় আলাদা। এই পাঁচ লাখিয়া তারকা কী করে পারে। তাড়াতাড়ি বোতলটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে, রুদ্ধ গলায় বললাম, 'ধন্যবাদ, নিন।'

রতনের খুশি গলা বাজলো, 'থ্যাংকু দাদা, কোই ট্রাবল?'

বললাম, 'হরিবল্।'

রতন হেসে বাজলো। আর রণো গরগরিয়ে উঠলো, 'শালা।'

ওটাও আমাকেই। কারণ শেষ পর্যন্ত যে এই অমৃতের বিষের স্বাদ নিতেই হলো। কিন্তু রণোর হাত থেকে তো নেওয়া হয়নি। অতএব ও বিশেষণটি আমার প্রাপ্য। রণোই আবার ওর পুরনো সুরে বাজলো, 'গুলি মারো এ সব কথায়। তা হ্যাঁরে পাঁচ লাখিয়া, তোর ফুলটুসি···(অশ্লীল বিশেষণ) কোথায় ?'

কিন্তু রতনের তাতে কোনো বিকার নেই। বললো, 'রাত ন' বাজে তক্ রীনার শুটিং আছে। ইস্কে বাদ খালাস।'

রণো বললো, 'তারপরে রীনার বাড়িতে তোমার গমন হবে, দুজনে সারা-রাত্রি মাতামাতি করবে।'

নাহ্, রণোর মুখে দেখছি কোনো কথা আটকায় না। কিন্তু রীনা নামটি যেন খুবই শোনা শোনা লাগছে। শোনবারই কথা। তিনি এই নগরীর রুপোলী জগতের এক নামী তারা। যেমন লাস্যে, তেমনি হাস্যে, রীনা তারকা রূপসী উর্বশী। এই ফেনিলোচ্ছল আরব সাগরের মতোই তার যৌবনের তরঙ্গে রুপোলী জগতের ভক্তেরা মুগ্ধ। জানা গেল, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সেই তারকা ছায়া, তারপরে কায়ায় ফিরে আসবে। চোখে দেখিনি, শুধু চিত্র দেখেছি। কিন্তু মাতামাতির কথাটা কী ?

রতনের জবাবে তার ধরতাই পাওয়া গেল, 'মাতামাতি কা কী আছে বোলো রণো। রীনা ঘরে ব্যাক করবে, ড্রিংক চালাবে, হাসবে আর রোবে, হামাকে সামাল্‌তে হোবে।'

রণোর বাজখাঁই গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, তুমি তো শালা রোজ সামলাতেই যাও। সারা রাত ধরে সামলে, ভোরবেলা বাড়ি ফেরো। আমার আর কিছু জানতে বাকী নেই।'

রতন খানিকটা অসহায় স্বরে বললো, 'সবকোই এক বাত বোলে। মগর রণো, তুমি বিশওয়াস্ করো, হামি আর পারে না।'

'তবে তোমার যাওয়া কেন ?'

'সে বাত তুমার জানা আছে রণো।'

'মহব্বত ?'

'ইসকো মহব্বত বোলে কি ঔর কুছু বোলে, হামি জানে না। তুমি জানে, রীনা কী রোকোম পাগলামি কোরে। হামাকে না পেলে, সারা রাত ঘুম্‌বে, মাতাল হোয়ে গাড়ি ড্রাইভ করবে। আসলি মে কী জানো রণো, রীনার একঠো হাজব্যাণ্ড দরকার। উস্ কি সাদী হোনা চাহি।'

রণো বললো, 'তবে সেটা সেরে ফেললেই পারিস।'

'হামি?' রতন বোতল তুলে গলায় ঢেলে বললো, 'তবে আর তুমাকে কী বোলে। হামার যদি সাদী করবার হোত তো, বহুত পহলেই হোত। তুমি বোলে মহব্বত, হামি বোলে প্যার, দোস্তি কা প্যার।'

রণো তৎক্ষণাৎ হুম্‌কে বাজে, 'শালা দোস্তি কা প্যার। একটা মেয়ের বাড়িতে রাতের পর রাত কাটিয়ে, এখন দোস্তি কা প্যার বোঝাতে এসেছে? তোমাদের শালা চিনি না? কে এখন মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইবে?'

রতন বললো, 'কেনো, এখোনো বহুত ভারি বড় আদমি লোগ্ উসকি পিছ্‌নে ঘুমছে। রীনা এক দফে আওয়াজ দিলে আভি সাদী হোয়ে যায়।'

রণোর সেই হুমকানো স্বর, 'কেন করবে? সে জানে, রতনকুমারের সঙ্গে তার সাদী হবে।'

রতন মাথা নেড়ে বললো, 'কোভি নহি। তুমি উস্‌কে পুছ্ করে, হামি কোভি বোলে নাই, উস্‌কে সাদী করবে, উ ভি বোলে না।'

'বলবে কেন? ও জানে, তোর সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। এ কথা আবার বলতে হয় নাকি?'

'মাইরি (এ দিব্বিটাও জানে দেখছি!) রণো, তুমি বোঝে না। হামি নিজে রীনাকে কেতো বলেছে সাদী করতে। বোলে, হামার সাদী হোবে না। হামি কিসি কো হ্যাপী করতে পারবে না। হামার জীবনটা এ্যায়সাই বিত্ যাবে।'

রণোর কোনো কথা শোনা গেল না। দুজনেই বোতল তুলে গলায় ঢাললো। আমি নতুন কথা শুনছি। রুপোলী জগতের আর এক দিকের কথা। এই চোখের সামনে ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গের যেমন আর একটি দিক আছে। প্রাণপূর্ণ তৃষ্ণা নিয়ে, এই রুপোলী ছটার অগাধ জলে চুমুক দিলে, তার স্বাদ তিক্ত লবণাক্ত। এত জল, তবু তৃষ্ণা মেটে না। এত রূপ, এত রুপা, এত ঝলক, চলক, তবু সুর বাজে হতাশার রাগিণীতে। চোখের জলও গলে নাকি? সে সব তো জানি শুধু পর্দাতেই গলে, সেখানেই শুকিয়ে যায়। থাকে শুধু হাসি, অজস্র হাসি। তবে এমন কথা শুনি কেন।

রণো বাজলো, 'তবে মরো গে শালা। তোদের এ ছাড়া কোনো গতি হবে না। টাকার পাহাড়ে শুয়ে, কাঁটার খোঁচায় মরবি। মন নিয়ে তোদের কারবার হয় না। খেয়ে খেয়ে তোদের বমি হওয়া ছাড়া আর কী হবে।'

রতনের স্বর যেন গোঙানো। বললো, 'হাঁ, এ জীবনটা লিয়ে কী কোরবে, জানে না।'

রণো বললো, 'কী আর করবি, বুড়ো বয়সে, এ বয়সের মালা জপবি, তখন বেবাক রঙ ফরসা।'

রতন যেন চমকে উঠে বললো, 'বোলে না বোলে না রণো, হামার শুনতে ডর লাগে।'

রণো গলায় বোতল ঢেলে বললো, 'যমে ছাড়ে না রে। জীবনের যা কিছু পাওনা গণ্ডা, সব এখানেই শোধ হয়ে যায়।'

রতন কিছু বললো না। বোতলে চুমুক দিল। আর আমি পাঁচ লাখ টাকার তারকার ভয়ের কথা ভাবছি। এমন করে কোনো তারকার কথা ভাবিনি। কারোর মুখ থেকেও শুনিনি। এই যে আজকের এই জীবনটা, ঢেউয়ে তরঙ্গে দুরন্ত গতিতে গর্জমান, তা একদিন শান্ত নিস্তরঙ্গ স্থির হয়ে যাবে। হয়তো নিঃসঙ্গও হয়ে পড়তে হবে। একটি নিরিবিলি নির্জন শান্ত জলাশয়ের মতো। সেই ভবিষ্যতে, জলাশয়ে দোলা লাগবে না, ঢেউ খেলবে না। কিন্তু কানে বাজবে তরঙ্গের গর্জন, চোখের সামনে ভেসে উঠবে দুরন্ত চকিত অল্প কতগুলো দিনের ছবি। তখন কি ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠবে বুকে? চোখ ভেসে যাবে জলে? ভাবতে ভয়-ই তো লাগে। একমাত্র মুক্তি বোধ হয়, নিরিবিলি নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে একটি নিবিড় শান্তিকে খুঁজে নেওয়া। নিস্তরঙ্গ নিরিবিলিতেই যা সম্ভব।

রতনের হঠাৎ আমার দিকে খেয়াল পড়লো। আমার দিকে ফিরে বললো, 'আপনি কিছু বোলেন দাদা। জীবনকৃষ্ণদা আপনার যে স্টোরিটা লিয়েছেন' উস্‌কে হীরোকে ক্যারেকটর ক্যায়সা আছে?'

রণো জবাব দিল, 'কিছু না। তোকে গরু চোরের মোতো মুখ করে, একটা মেয়ের সঙ্গে খালি প্রেম করে যেতে হবে।'

রতন উচ্চারণ করলো, 'গরু চোরের মোতো? সেটা কী হোয়?'

'কী আবার। তোমার ভাবখানা হবে, যেন সব সময়েই চোর দায়ে ধরা পড়ে আছো। এই লেখক শালা যা করে! আর ওই ভাবটি করতে পারলেই, মেয়েরা জখম।'

এবার আমিও হেসে বাজি। চোর দায়ে ধরা পড়া ভাবের পুরুষের প্রেমেই যে মেয়েরা পড়ে, এতদিন তা জানা ছিল না। তাও রণোর ভাষায়, প্রেমে পড়া মানে জখম। রণো আমাকে ধমক দিল, 'থাক শালা আর হাসতে হবে না।'

রতন বললো আমাকে, 'হামি কী একটা কথা বোলে দাদা, চোলেন, হামি আর আপনে পুণা নহি তো মাদ্রাজ চলে যায়। কিছু রোজ থাকে, বাত চিত

কোরে, আপনে আমার গেস্ট। আপনার সঙ্গে ঔর ভি স্টোরি লিয়ে হামি ডিসকাস করবে।'

রণো বেজে উঠলো, 'হ্যাঁ, যা রে যা লেখক, ক'দিন ফুর্তি লুটে আয়।'

রতন বললো, 'ফুর্তি কেনো রণো ?'

রণো হেঁকে বাজলো, 'ফুর্তি নয় তো কী রে শালা। লেখককে নিয়ে গিয়ে তুমি রাজ্যের আজগুবি গল্প শোনাবে, যাতে তোমাকে হীরো বানানো যায়। আর যতো বিদেশী ছবির গল্প মারার ফন্দী শিখিয়ে দেবে। তোমাদের জানি না ?'

রতন মাথা নেড়ে বললো, 'না না, রাইটার দাদাকে হামি সে রকম কোই বাত বোলবে না।'

'চুপ কর।' রণো ঝেঁজে বললো, 'তুই একটা বাংলাদেশের লেখককে বগল-দাবা করে পুণা মাদ্রাজ নিয়ে যাবি, আর কাজ না বাগিয়ে ছাড়বি ? তার ওপরে তুই এখন প্রোডাকশনে টাকা খাটাবার তালে আছিস।'

রতনের তথাপি মাথা নাড়া। বললো, 'না না, এ রকম কোনো কথা হোয় না। দাদা হামাকে হামার ক্যারেকটর সম্‌ঝিয়ে দেবে, ঔর কুছ্ কহানি ভি শুনাবে, ঔর দোনো মিলে বহুত আড্ডা মারবে। রাইটার দাদা কো সাথ্ হামি হলি ডে মানাবে, বম্বে ফিলম্ ওয়ার্লড কে বাহার যাবে।'

রণো তথাপি ঝাঁজে বাজে, 'আর কাঁড়ি কাঁড়ি মদ খাবে। তারপরে তুমি শালা যেখানেই যাবে, সেখানেই ছুঁড়িদের ভিড় লেগে যাবে, তখন কে কাকে দেখে।'

রতনের তেমনি মাথা নাড়া। কিন্তু রণোর 'তখন কে কাকে দেখে' এর মানে কী। মনের কথা নিজের মতো করে ব্যক্ত করতে ওর জুড়ি নেই। তা বলে, ওর কথায় যারা 'ছুঁড়ি'—(রণো কিছুই বাকী রাখল না।) তাদের নিয়ে আমিও মেতে যাব নাকি ? প্রাণের ভয় বলে আমার কিছু নেই ? রতনকুমার যা পারে, তার যা সাজে, পশরা মাথায় নিয়ে আসা ফেরীওয়ালা তা পারে না। সাজে না তো বটেই।

রতন বললো, 'তব্ তুম ভি সাথ চলো রণো।'

'মাথা খারাপ! পাঁচ লাথিয়ার সঙ্গে দিন রাত্তির! মারা যাব।' বলে বোতল তুলে, একেবারে শূন্য করে ঢেলে দিল। পাশেই বালির ওপর ঝুপ করে ফেলে দিল বোতল। প্রায় গোঙানো স্বরে বললো, 'তার চেয়ে যা, লেখককে নিয়ে যা। তোকে নিয়ে ওর নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্‌স গ্যাদার হবে।'

রতনও বোতল শূন্য করে বালির ওপর ফেলে দিয়ে বললো, 'ও কে। কব্ যাবেন দাদা বোলেন, দো দিন হামাকে টাইম দিতে হোবে।'

যাক্, তবু এতক্ষণে কথার স্রোত আমার দিকে বাঁক নিল। যদিও আমারই যাওয়া নিয়ে কথা। বললাম, 'আপনার সঙ্গে যেতে পারলে খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমার হাতে আর তেমন সময় নেই, ফিরতে হবে।'

রতন বললো, 'তিন চার রোজ কে লিয়ে চলেন।'

নিরুপায়ে হাসি। রতনকুমারের কথার মধ্যে এখন্ পানীয়র ঝোঁক লেগেছে। ঝোঁকটা মেজাজেরও। আবার বললো, 'প্লেনে যাবে আসবে, টাইম কে লিয়ে কোনো ফিকির নাই। ঠিক আছে দাদা?'

নিরীহ অনুনয়ে বলি 'এর পরে যখন বম্বে আসব, তখন আপনার সঙ্গে যাব।'

রণো তাড়াতাড়ি, প্রায় জড়ানো স্বরে বলে উঠলো, 'চেপে ধর রতন, ব্যাটা কাটছে। পাঁকাল মাছ।'

বলতে বলতেই রণো উঠে দাঁড়ালো। ওর লম্বা ঋজু শরীরটা যেন একটু টলমল। কোঁচা লুটোচ্ছে বালিতে। রতন বললো, 'দাদাকে হামি ছাড়বে না, ম্যানেজ করবে।'

ভয় পাব কী না, বুঝতে পারছি না। রতনকুমারের ম্যানেজের রকম সকম আমার জানা নেই। লুট করে নিয়ে যাবে না তো! ঝাপসা অন্ধকার থেকে রামু আবার ভেসে উঠলো। তার গলা শোনা গেল, 'নৌ মোর স্যার?'

রণোর এখন মাতাল স্বর, 'আরো? কেন বাবা, আজ কি এখানেই ফেলে রাখতে চাও? মন্দ না অবিশ্যি। কিন্তু আমার ঘরে যে বউয়ের বাড়া মানুষ আছে, সে আমাকে খুঁজতে এখানে চলে আসবে'

সে আবার কে হতে পারে। রামু বাঙলা কথা বোধ হয় বুঝতে পারলো না। রতন উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল, 'সে কে হোয়?'

রণো বললো, 'কেন, আমার কেষ্টমানিক?'

তাওতো বটে। ভুলেই যাচ্ছিলাম, রণো একলা না, ওর কেষ্ট আছে। আমিও উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি এখানেও আসতে পারে নাকি।'

রণোর লম্বা শরীরটা যেন বাতাসের ঝাপটায় টাল খেল। বললো, 'পারে মানে? অনেকবার ধরে নিয়ে গেছে। এক্কেবারে প্রেমিকা যাকে বলে। মারো ধরো বকো, হারামজাদা কথা শোনে না। বলে, রেঁধে বেড়ে একলা খেয়ে নিয়ে থাকতে ও পারবে না। শুনলে বীণাটাও বোধ হয় হিংসে করতো।'

ওর স্ত্রীর কথা বলছে। ইতিমধ্যে রতনকুমার তার পাতলুনের উরত-পকেট থেকে বের করেছে বেশ মোটাসোটা একটি চামড়ার ব্যাগ। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল কয়েকটি কর-করে কাগজের টাকা। তবে কাগজের শব্দ আর টাকার শব্দ আলাদা, শুনলেই কানে বাজে। ডেকে বললো, 'লাও রামু।'

রামু কাছে এসে হাত বাড়িয়ে কর-করে নোট নিয়ে, গুণে দেখে বললো, 'বহুত জায়দা দিয়া সাব।'

রণো ঝুঁকে গলা ঝাঁকিয়ে বললো, 'চুপ রামু, রতনকুমারের ব্ল্যাক টাকা। য়ু বেটার ইনসিস্ট্ ফর মোর।'

ঝাপসা অন্ধকারে মনে হলো, কালো রামুর সাদা দাঁত, দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ঝলকাচ্ছে।

রণোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, সে একেবারে সাহেবি কেতায়, রতনকুমারের দিকে ঝুঁকে সম্মান জানালো, শব্দ করলো, 'থ্যাংকু স্যার। মেনি থ্যাংকস্।'

রণো পা বাড়িয়ে বললো, 'এখন চলো তো পাঁচ লাখিয়া, আমাদের পৌঁছে দেবে তোমার গাড়িতে।'

রতনকুমারের গলার আওয়াজও বেশ মোটা। বললো, 'হাঁ চোলে। গুডনাইট রামু।'

'গুডনাইট স্যার।'

আমরা তিনজনেই জুহু তাবের আলোর সীমায় ফিরে চললাম। এখন ভিড় অনেক কম। আলোর ঝলকও কম। কখন যেন আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। লক্ষ্য পড়েনি। সেই আলোয় দেখি, অস্পষ্ট নারকেল গাছে, একটু বাতাস লেগেছে। কিন্তু রতনকুমার সোজা রাস্তার পথিক না। কেননা, রুপোলী জগৎ তার অনেক স্বাধীনতা হরে নিয়েছে। তাই দেখি, একেবারে হোটেল সারির, নিচের আঁধার কোল ঘেঁষে, কোণ বরাবর পাড়ি দিয়েছে রাস্তার দিকে। সেদিক দিয়ে লোক চলাচল নেই। রাস্তায় উঠে, বাঁয়ে খানিকটা গিয়ে ঠেক। তারপরে দেখো, কাকে বলে ময়ূরপংখী নাও। আমার চোখে সেই রকম। এই নগরীতে এসে ইস্তক, এঁয়ার ওঁয়ার নানা প্রকারের আরামদায়ক নয়ন ভোলানো গাড়িতে উঠেছি। রতনকুমারেরটি সবার সেরা লাগছে। বাইরে থেকে দেখেই মনে হচ্ছে, অনায়াসে হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া যায়।

এ গাড়ির হাতে যন্তর আবার বাঁয়া। রতনকুমার দরজা খুলে আগে উঠে, অন্যদিকের দরজা খুলে দিল। ভিতরে এখন বাতি জ্বলছে। আশেপাশে আরো

কয়েকটি গাড়ি, কিছু নরনারী ছিল। হঠাৎ মনে হলো, তাদের তাবত নজর এদিকে। নারীর উৎফুল্ল কণ্ঠে ইংরেজিতে যা শোনা গেল, তার মানে করলে দাঁড়ায়, 'বলেছিলাম, এটা রতনকুমারের গাড়ি। ওই দেখ্ রতনকুমার!'

রণো বাজলো জড়ানো স্বরে, 'মরণ তোর মেয়ে। আর আগ্ বাড়িস নে, কেটে পড়। সব কাঁচা খেকো দেবতা।'

বলেই আমাকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'দেখছিস কী, ওঠ তাড়াতাড়ি। এখুনি সব এসে পড়বে।'

আমি ঠেলা খেয়ে উঠলাম। রণো আমার পাশে বসে, দরজা বন্ধ করতে না করতেই এঞ্জিনে আওয়াজ উঠলো। তিনজনের সামনে বসতে কোনো অসুবিধা নেই। রতনকুমার দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার আগেই, মনে হলো ছায়ার মতো কারা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। রতনকুমার দিল দৌড়। তবু ডাকাডাকি হাত তুলে। কোথা থেকে আলো এসে পড়লো তার গায়ে। পাশে আমরা দুটো ভূত। রতনকুমারের মুখে হাসি। দেখি, সে হাত তুলে সবাইকে তখন প্রীতি জানাচ্ছে। তারপরেই গাড়ি চলে যায় দূরান্তে, শহরের অভ্যন্তর দিকে। চলে না, ভাসে, যেমনটি বলেছিলাম, ময়ূরপংখী নাওয়ের মতো। রতকুমারের গাড়ি, চালক নিজে, চলেছি তার সঙ্গে, এমনটা কোনো দিন ভাবি নি। এই নগরের ছবি দেখি বা না দেখি, তবু মন কেমন একটা খুশি কৌতূহলের দোলায় দুলছি। এই মন দোলানোটা বোধ হয় অনেকটা শিশুর মতো। যে শিশু থাকে সকল সাবালক ব্যক্তির মধ্যেই।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো এমন জায়গায়, মূল নগরীর বাইরে বলতে পারো। তবু সে আলো জ্বালানো শহর। রণো দরজা খুলে নামতে উদ্যত হয়ে বললো, 'লেখককে কোথায় নামাতে হবে জানিস তো?'

রতনের গম্ভীর স্বর বাজে, 'জানে, সুরঞ্জনের ঘর।'

কিন্তু রণোর বাড়ি কোন্‌টা, দেখতে পাচ্ছি না। রতনকুমারের নজর সেদিকে ঠিক, ঠিক জায়গায় এসে নোঙর করেছে। হঠাৎ দেখি একটি লাইট পোস্টের পাশ থেকে সাদা দাঁতের ঝলক দিয়ে এগিয়ে এলো কৃষ্ণচন্দ্র। বললো, 'এতক্ষণে এলেন রণোদা। খুঁজতে যাব ভাবছিলাম।'

রণো ধমকে বাজে, 'তা যাবে না? তা না হলে আর আমার হাড় জ্বালানো হবে কেমন করে। গিলেছ?'

কৃষ্ণর কৃশ মুখের চিকচিকে হাসিটি একবার খেলে গেল আমাদের দিকে চেয়ে। বললো, 'আপনাকে না খাইয়ে আমি খাব ?'

রণোর স্বরে ভেজা ভাব পাবে না, বললো, 'মরণ ধরলে আর কী হবে। আজ আর জর আসেনি তো ?'

কৃষ্ণর শীর্ণ মুখের হাসিটা করুণ। বললো, 'বুঝতে পারিনি।'

'মরোগে।'

রণো গাড়ির দিকে ফিরে হাত তুলে বিদায় নিল, 'চলি রে লেখক। রতন ওকে পৌঁছে দিস।'

রতনকুমার গাড়ি ছাড়বার আগে, কৃষ্ণ বলে উঠলো, 'ভাল আছেন রতনদা ?'

রতনের মন যেন আর এখানে নেই। আর সেই স্বরহীন মোটা গলা শোনা গেল, 'ভালো। তুমি ভালো আছো কিষ্ট ?'

যাক্‌, পাঁচলাখিয়ার সঙ্গে বাত করে সর্বহারা কৃষ্ণ। সবাই তার দাদা। সবাই চেনা। তারপরেও কৃষ্ণ আমাকে ডেকে বলে, 'নামবেন না লেখক দাদা, চলে যাবেন ?'

বললাম, 'রাত হয়েছে। আর একদিন আসব। তোমাদের বাড়িটা কোথায় ?'

কৃষ্ণ আঙুল তুলে দেখালো, 'ওই লাইট পোস্টের পাশ দিয়ে যে গলি গেছে, তার মধ্যে।'

এ রাত্রে ঠাহর করা মুশকিল। রতনকুমারের পংখীরাজ ভাগলো। কোন দিকে ভাগে, বুঝতে পারি না। দিনের বেলাতেই যেখানে রাস্তাঘাট ঠাহর করতে পারি না, এই রাতের মায়াপুরীতে আরোই অসম্ভব। রতনকুমারের গম্ভীর মোটা গলায় ডাক শোনা গেল, 'দাদা।'

বললাম, 'বলুন।'

'আপনাকে হামি রীনার ঘরে লিয়ে যানে চাই।'

সর্বনাশ! এখন এই রাত্রে, রুপোলী পর্দার ফুলকুমারীর আস্তানায় ? সুরঞ্জন আর নীলা চিন্তা করবে। তা ছাড়া, নিজেকে তো একটু জানি। জলের মাছকে ডাঙ্গায় টেনে নিয়ে যাওয়া কেন। কথা বলতে পারব না। কারণ বলার কিছু নেই। একটু আগেই, যে কথা শুনেছি, রতন আর রীনার কথা, তাদের মাঝখানে বসে আমার খাবি খাওয়া ছাড়া, কিছু করবার থাকবে না। অনুনয়ের সুরে বাজি, 'আজকে রাত হয়ে গেছে, আজ ছেড়ে দিন।'

রতন এক হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে, আর এক হাতে দিব্যি সিগারেট

ধরালো। ক্যাচাকলের চকিত ঝলকে তার মুখ রক্তিম দেখালো। দৃষ্টি বাইরের দিকে। যেন রুপোলী পর্দারই ছবি। বললো, 'কেনো দাদা, ই ক্যায়া ভারি রাত? দশ তো বাজে। আপনার ভূখ্ লাগে?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না না ভূখ্ লাগে না। সুরঞ্জন চিন্তা করবে।'

আবছা আলোয় দেখি, রতনকুমারের মাথা দুলে যায়। বললো, 'সুরঞ্জনকে হামি টেলিফোন করে দেবে, শোচনে কা কোনো জরুরত নাই।'

এ সহজ ঝোঁকের কথা না, পানীয়ের ঝোঁকের কথা। কতটা গাঢ়, তা বুঝতে পারি না। কিন্তু একে বোঝাব কেমন করে, ফুলকুমারীর দুয়ারে আমার কাঁটা। আমি সেখানে কোনো রকমেই বাজব না। রতনকুমার আমাকে কেন বিড়ম্বিত করতে চায়। কিন্তু ময়ূরপংখীর পালে যে বাতাস লেগেছে রীনার কূল ধরে, তা বুঝতে পারছি। সুরঞ্জনের বাড়ির রাস্তার কিছু কিঞ্চিৎ চেনা চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। তাড়াতাড়ি বলি, 'শুনুন রতনকুমার, এখন আপনার বন্ধুর কাছে আপনি যাচ্ছেন যান, আমি অন্য সময় যাব।'

রতনকুমারের গলা শোনা গেল, 'অন্য সোমায় না, হামি চায় আপনি আভি চলে। অফিস ঔর স্টুডিওতে দেখাটা কুছ না, উ দুসরা রীনা আছে। দাদা, আপনি একজন রাইটার, হামি চায়, আপনি রীনাকে এখোন দেখেন।'

রাইটারের কী বিড়ম্বনা! অস্বীকার করব না, মানুষ দেখতে ভালোবাসি। চাখতে? তাও। তবে ভুল করো না গো মশাইরা, মন দিয়ে চাখার কথা বলছি। প্রাণের আস্বাদন দিয়ে। যদিও, চেয়েও, পারিনি। চিরদিন রূপেই আমার চোখ ভুলেছে। তারপর বিস্ময়ে আর রহস্যে, বুকের কাছে হাত জোড় করে চুপ করে থেকেছি। মনে হয়, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে, কোথায় যেন আমার মাথা নত হয়ে যায়। রীনার মতো রুপোয় বাঁধানো, রূপকুমারীকে দেখতে আমার অসাধ নেই। কিন্তু স্থান কালের কথাটা যে ভুলতে পারি না। একটু আগেই তার সম্পর্কে যে কথা শুনেছি, সংকোচবোধ সেই জন্যই বেশি। না হয় রূপকুমারী রীনার রাত্রের রূপ না-ই দেখলাম। অন্য সময়েও আমার লেখকের চোখ তাকে দেখে ধন্য হতে পারবে। আবার না বলে পারলাম না, 'দেখুন, আমার দেখাটা, একজন সাধারণ মানুষেরই। সেই চোখকে লেখকের চোখ তৈরি করে আলাদা কিছু দেখা যায় না।'

রতনকুমার যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ইজ ইট দাদা?'

বললাম, 'হ্যাঁ, লেখকের চোখ বলে আলাদা কিছু নেই। দেখার চোখ সকলেরই এক। মনটা অবিশ্যি আলাদা।'

রতন বলে উঠলো, 'ভাট ভাট, হামি মনের কথা বোলে। আপনি একবার রীনাকে দেখেন, আপনার মন দিয়ে দেখেন, আপনি সমঝাবেন, কী একটা ক্যারেক্টার। আপনি রাইটার আছেন।'

আবার সেই রাইটার। যে দেখে, সে-ই লেখে না। কিন্তু যে লেখে, সে-ই কি দেখে। তা বোধ হয় না। হাসি কান্না রাগ দুঃখ শোক সুখ, সকলের মনে আছে। মানুষ তো ভিন্ন না। আন্ মানুষের কথা আলাদা। অন্যথায় বলি, মানুষ সব সমান। যেমন যেমন ঘটনা দেখে, সকলের এক জায়গাতেই বাজে। লোকে একসঙ্গে কাঁদে কেন। রাগে কেন। হাসে কেন। দেখার প্রতিক্রিয়া সকলের সমান। হ্যাঁ, কথা আছে তারপরেও। দেখা আর প্রতিক্রিয়া—অচিরাৎ শেষ, সেটা এক রকম। কিন্তু কেউ কেউ ভাবে। যাকে ভাবায়, তার কথা আলাদা। তখন তার মনে মনে দেখা। তখন তার চোখে দেখার, তাৎপর্যের সন্ধান। তাৎপর্যের সন্ধানীর চোখে তখন অনেক কিছু বদলে যায়। উচ্ছল হাসির পিছনে সে, ফেনিলোচ্ছল লবণাক্ত চোখের জলের ধারা দেখতে পায়। দুর্জয় ক্রুদ্ধকে দেখে ভীরুর রূপে। শক্ত পায়ে চলা মানুষটাকে মনে হয়, সারা জীবনটা যেন লোকটা খুঁড়িয়ে চলেছে। এই দেখাটা অনেক পরের দেখা। এই দেখাটা সেই দেখা, যখন একজন একলা ঘরে, আপন মনে, কলম নিয়ে কাগজে দাগ বুলিয়ে দেখে, বলে। তখন সে লেখক, তখন তার দেখাটা অনন্ত। একমাত্র তখনই। অন্য সময় না। অন্য সময় সবাই সমান। সকলের দেখা এক।

আমি কি গলা বাজিয়ে বলব নাকি, আমি তো মানুষ নই হে, লেখক। এমন দুর্ভাগ্য যেন কখনো না হয়, কারোর না হয়। আগে মানুষ। তারপরে বাদ বাকী, তা তুমি যতো বড় কীর্তিমান হও গিয়ে। কীর্তিমানে আমার টান আছে, তার আগে আছে মানুষের টান। অগ্রে তা না থাকলে, কীর্তিমানে আমার প্রয়োজন নেই। তবে, মানুষ ছাড়া কে বটে কীর্তিমান। অতএব, লেখক না, রূপকুমারীকে দেখব মানুষের চোখেই। কিন্তু দশজনের সঙ্গে ঘোরাফেরা করা মানুষ, নিয়ম কানুন স্থান কাল পাত্র পাত্রী মেনে চলতে হয়। রূপকুমারীর ঘরে যাবার এই কি সময়? রতনকুমার যেতে পারে। তাকে যা মানায়, আমাকে তা মানায় না। কিন্তু আর কি রতনকুমারকে নিরস্ত করা যাবে।

না। সে সময়ও নেই। দেখছি, পংখীরাজ দাঁড়ালো এক বন্ধ গেটের সামনে। পংখীরাজের যন্ত্রে বাজলো ব্যস্ত হাঁক। একটু পরেই গেটের পাল্লা খুলে গেল। রতনকুমার গাড়ী চালিয়ে দিল ভিতরে। বাগান ঘুরে দাঁড়ালো

গিয়ে গাড়িবারান্দায়। আলো জলছে সেখানে। অট্টালিকার আয়তন তেমন বড় মনে হচ্ছে না। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছোট একটা বাড়ি। রতনকুমার গাড়ি থেকে নামতে নামতে ডাকলো, 'কাম দাদা।'

অগত্যা। সামনের সাজানো গোছানো ঘরে আলো জলছে। চোখে ভুল দেখছি না তো। বিশ বাইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। কিন্তু সে তো রূপকুমারী রীনা না। যদিও একে রূপকুমারীই বলা যায়। পোশাকে আশাকে তো বটেই, শ্যামাঙ্গিনীর রূপও কিছু কম না। ভঙ্গিতে শান্ত, হাসিটি মিষ্টি। ভাষ্যেও বেশ বিদিশি কেতাবী ; 'হ্যালো স্যার, গুড ইভ্‌নিং। কাম্ ইন।'

রতনকুমারও তেমনি ভাবে, 'গুড ইভ্‌নিং হাসিনা। হোয়ার ইজ য়োর দিদি ?'

হাসিনা যার নাম, তার চোখে যেন হাসির ইশারার ঝিলিক। হাসিনা নামের সঙ্গে হাসির কোনো সম্পর্ক আছে কী না জানি না। থাকলে বলি, নামটি সার্থক। হাসিনার হাসিটি কেবল ঝলকানো না, মাধুরী মেশানো। চোখের পাতা কাঁপিয়ে, ইংরেজিতেই বললো, 'দিদি তাঁর শোবার ঘরে আছেন।'

রতনকুমারের মুখ লাল, চোখও কিঞ্চিৎ রক্তিম। ঘরের আলোয় তাকে এখন আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কপালের ওপর এক গুচ্ছ চুল এলিয়ে পড়েছে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে—।'

কথা শেষের আগেই হাসিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তা-ই।'

ইশারায় কথা, নিজেদের মধ্যে জানাজানি। কেবল রতনকুমারের রক্তাভ মুখে যেন একটু দুশ্চিন্তার ছায়া নামে।

হাসিনা বললো, 'আপনার বাড়িতে এবং সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় টেলিফোন করেছেন, পাননি। আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'জুহুতে, রণোর সঙ্গে। তোমাকে এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি কলকাতার একজন লেখক। জীবনকৃষ্ণদা এঁর একটি গল্প নিয়েছেন, আমি আর রীনা তাতে কাজ করব।'

ইতিপূর্বেই হাসিনার কৌতুহলিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। হাসিনা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। জবাবে আমিও। রতনকুমার আমাকে জানালো, 'হাসিনা হলো রীনার সেক্রেটারি।'

চমৎকার। রূপকুমারীর এমন ফুলকুমারী সেক্রেটারি না হলে কি মানায়।

আমি তো ইতিমধ্যে ভেবে নিয়েছিলাম, হাসিনা বুঝি ভবিষ্যতের অপেক্ষমানা রুপোলী পর্দার ছায়াচারিণী। হাসিনা আমাকে ইংরেজিতেই অভ্যর্থনা করলো, 'আসুন, দয়া করে বসুন।'

রতনকুমার বললো, 'না, দাদা এখানে বসবেন না, আমার সঙ্গে রীনার ঘরেই যাবেন। অবস্থা কেমন?'

'স্তব্ধ সমুদ্র।'

চমৎকার জবাব, যদিও গূঢ় ভাষায়। হাসিনা কথা বলতেও জানে। উপযুক্ত সেক্রেটারি। অনুমান করি, রীনার সম্পর্কেই কথা হচ্ছে। রতনকুমার আমাকে ডাক দিল, 'কাম দাদা।'

এই তো গোলমাল। রীনা শ্রীমতী এখন শোবার ঘরে। অবস্থা স্তব্ধ সমুদ্রবৎ। ব্যাপার সঠিক কিছু অনুমান করতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমি না হয় রীনার সচিবের সঙ্গে এ ঘরে বসেই একটু কথাবার্তা বলি। বললাম, 'আপনিই যান না, আমি এ ঘরেই একটু বসি।'

রতনকুমার আবার বাংলায় বাজে, 'সে হোয় না। আপনি হামার সাথ্ আসেন।'

নিরুপায় হয়ে একবার হাসিনার দিকেই তাকাই। হাসিনা হেসে ঘাড় দোলায়, বলে, 'যান আপনি।'

হাসিনাকেই জিজ্ঞেস করি, 'আমার যাওয়াটা কি খুব শোভনীয় বা জরুরী?'

হাসিনার জবাবের আগেই, রতনকুমার আমার হাত ধরে টানে। ইংরেজিতেই বলে, 'বী ইনফর্মাল দাদা, কাম্ উইথ মী। আয়াম রেসপনসিবল ফর য়োর প্রেস্টিজ।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে টেনে নিয়ে চললো। এ দেখছি আর এক রগো। সম্মানের ভয় করি না, স্বস্তি অসস্তির ভয়। অসহায় চোখে একবার সচিব হাসিনার দিকে তাকাই। সে হেসে ঘাড় কাত করে। আমাকে সাহস যোগায়। সামনের বিশাল ঘর পার হয়ে চলি রতনকুমারের টানে। এর নাম বসবার ঘর। গরীব গৃহস্থের পুরোপুরি খানদুয়েক বাড়ির সমান। সোফা সেট রকমারি। এক দিকে মস্ত পিয়ানো। অন্য দিকে রেডিওগ্রাম। আর এক দিকে লাইব্রেরি কর্ণার। তার পরের দরজা পেরিয়ে, এক করিডর। রতনকুমার টেনে নিয়ে চলে বাঁদিকে। খানিকটা গিয়ে, একটি ঘরের পর্দা তুলে ধরে। সেই সঙ্গে আমার হাতে টান দিয়ে বলে, 'কাম ইন দাদা।'

তখন পর্দার ফাঁকে, আমার নজর ঘরের দিকে। বোধ হয় রতনকুমারের

গলায়, অপরকে ডাকতে শুনেই, ফিরে তাকালো একজন। যার পরনে রয়েছে ঢিলে সালোয়ার, (হায়, চোখ গেল, চোখ গেল) কামিজের বোতাম নেই। সোফার ওপর উপুড় হয়ে আধশোয়া। ঘাড় ফেরানো দরজার দিকে। চোখের দৃষ্টি রক্তিম। ঢুলুঢুলু? তেমন বুঝতে পারছি না। খোলা চুল কাঁধে, গালের পাশে, কিছু বা কপাল ঢেকে। হাতের সামনেই, কারুকার্য খচিত কাঠের নিচু টেবিলের ওপরে বোতল, দেখলেই যার গুণের কথা বলা যায়। গেলাসেও সেই পানীয়, সোডার জলে মেশানো জলের ক্রম উর্ধ্বগতি থর দীপ্তি দেখলে বোঝা যায়। এ মুখ আমি পর্দায় দেখিনি। .কাগজের পাতায় হাজারবার ছবি দেখেছি।

রতনকুমার বলতে গেলে, জোর করে টেনেই আমাকে ঘরে ঢোকালো। অনুমতি নেবারও দরকার মনে করছে না। বিশেষ, রুপোলী পর্দার ইনি একজন জাদুকারিণী, মহিলা তো বটেই। চোখের নজরে যতটা পড়ে, অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি। অবিশ্যি নজর ফিরিয়েছি পলকেই। এ কক্ষে, যাকে বলে শয়নঘর, রতনকুমারের হয় তো অবারিত দ্বার। আমাকে কেন?

এবার বাত পুছ সব হিন্দী ভাষায়। রতনকুমার এবার নায়িকার দিকে ফিরে বললো, 'তোমার কাছে নিয়ে এলাম এঁকে। জীবনকৃষ্ণদা ওঁর গল্প নিয়েছেন, যার নায়িকা করবার কথা তোমার। আমাদের একটু বসতে বলো।'

আমি তাকিয়ে ছিলাম রতনকুমারের মুখের দিকে। রতনকুমার রীনার দিকে। রীনার গলা যেন রুদ্ধ, ভাঙা ভাঙা, 'তাই বুঝি? আসুন, বসুন দয়া করে।'

আমি সংকুচিত লজ্জায় হেসে, রীনার দিকে ফিরে, হিন্দী ভাষার গুরুচণ্ডালি করে বললাম, 'বসছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

কিন্তু বলেই থমকে গেলাম। দরজার কাছ থেকে যা চোখে পড়ে নি, এখন সামনে এসে মন চমকে যায়। দেখি, রূপসীর রক্তিম চোখ ভেজা, গালে জলের দাগ। সে তখন আবার বললো, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে রতন?'

রতনকুমার সহজ গলায় বললো, 'যেখান থেকে টেলিফোন করা যায় না। তুমি চোখ আর গাল মোছ।'

রীনা উঠে বসবার চেষ্টা করলো। তেমন সার্থক হলো না। কামিজের হাতা বুলিয়েই চোখ আর গাল মুছলো। তবু বলি, চোখ গেল, চোখ গেল। সেই পাখিটা কেন এই বলে ডাকে? যাকে দেখতে চায়, তাকে দেখতে পায় না বলে? নাকি তার রূপের আগুনে চোখ জ্বলে যায়? আমার 'চোখ গেল' সেজন্য না। হয়তো রূপের কথা কিছু আছে, কিন্তু কামিজের বোতাম ঘর খোলা

শরীরের দিকে এই চোখের নজর পড়ে কেন। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই, তেমন হলো যে। আমি কেন চোখের মাথা খাই না।

রীনা আমার উদ্দেশে আবার বললো, 'আপনি দয়া করে বসুন।'

বসবার জায়গা অনেক নেই, তবু আছে, এবং রীনার কাছ থেকে তা দূরে না। তার শোবার বিলাতি পালঙ্ক ঘরের অন্য পাশে। আমি কি নিরুপায়। কেন এখানে, এ ঘরে, এ মেয়ের সামনে, তার কোনো জবাব নেই। তথাপি এক সোফায় বসতে হয়। অতঃপর রীনার আবার বাত, 'রতন, শুনেছি বেহুস্তে টেলিফোন নেই।'

এবার আমার লম্বা সোফার পাশে, রতনকুমারও তার আসন নিয়ে বসলো, 'বেহেস্ত সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

ফুলকুমারীর শরীরে ঢেউ লাগলো, একটু বা হাসিতে বাঁকানো ঠোঁট। তেমনি ভাঙা ভাঙা রুদ্ধ স্বরে বললো, 'তবে, শুনেছি সেখানে খুব সুখ। সেখানে সরাবও পাওয়া যায় কী না, আমি জানি না।'

রতনকুমার বললো, 'তা যায়। আমি জুহুতে ছিলাম।'

রীনার আফসোসের স্বর, 'আহ্‌হা, এখান থেকে অনেক দূর। সঙ্গে কে ছিল, জানতে পারি?'

রতনকুমারের জবাব, 'রণো আর এই দাদা। রণোকে তার বাড়ী পৌঁছুতে গেছলাম।'

রীনার চোখ এবার আমার দিকে। কথা রতনকুমারের সঙ্গে, 'কিন্তু দাদার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, উনি তোমার সঙ্গে জুহুতে ছিলেন।'

রতনকুমার বললো, 'তার কারণ, দাদা মোটেই স্পর্শ করেন নি। পান করেছি আমি আর রণো।'

রীনার রক্তাভ টানা ডাগর চোখ তখনো আমার দিকে। আমার কাছে, আমার বিব্রত জিজ্ঞাসা, আমি কেন এখানে। আমি কি রুপোলী পর্দার সামনে নাকি হে। ব্যাপার যেন সেই রকম। বাত পুছ দুয়েতে, আমি শুনি আর দেখি। তবে পর্দার কথা না, দুজনের জিজ্ঞাসা আর জবাবদিহি।

রীনা চোখ ফিরিয়ে তাকালো রতনকুমারের দিকে, জিজ্ঞাসা, 'আমাকেও সেখানে নিয়ে গেলে না কেন?'

রতন বললো, 'তুমি তখন ফ্লোরে।'

'আমি বাড়ি ফিরে আসার পরেও দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে।'

'তা গেছে। রণো সঙ্গে ছিল, তোমাকে আগেই বলেছি। তা ছাড়া আমার মতো তোমার সবখানে যাওয়া চলে না।'

'তোমাকে সেখানে কে নিয়ে গিয়েছিল ?'

রতনকুমার জবাব দিতে এক পলক দেরি করলো, তারপরে বললো, 'কেউ না, নিজের ইচ্ছায়।'

রীনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, বিচিত্র এক গোঙানো শব্দ করলো। বললো 'আহ্, তাই বল।'

বলেই গেলাস তুলে, এক চুমুকেই পানীয় শেষ করলো। বোতলের গায়ে ছাপ, সে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। গড়ন পেটনখানিও চোখ ভোলানো। কিন্তু এই কি প্রথম খুলে বসা হয়েছে ? তাহলে কী পরিমাণ জঠরস্থ হয়েছে, ভাবতে ভয় লাগে। তারই প্রতিক্রিয়া কি, চোখ ভেজা, গালে জল ?

রীনার ঘাড়টা যেন হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো, বললো, 'প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার মনে করার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। আমি এবার বিদায় নিতে চাই।'

রীনা হঠাৎ নতুন হয়ে উঠলো। এবার নিজেকে সোজা করে তুলে বসলো, কিন্তু হায়, আমার চোখ যায়। সচিব হাসিনা এসে তো একটা উত্তরীয় তার কর্ত্রীর গায়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারে। রীনা বলে উঠলো, 'অসম্ভব ! অসম্ভব ! রতন, কেউ এখানে আসছে না কেন ?'

সে তার রক্তিম পদযুগল কার্পেটের ওপর নামাতে উদ্যত হয়। সেই সময়েই একটি মাঝবয়সী লোকের আবির্ভাব। হাতে তার ট্রে, সাজানো দুটি গেলাস, কয়েক বোতল সোডা। লোকটির পোশাক আশাক মোটেই ভৃত্যের মতো না। কিন্তু আচরণে তাই। রীনার ভুরু বাঁক খেল। জিজ্ঞেস করলো, 'এত দেরি কেন রহমান ?'

রহমানের অপরাধী স্বর, 'আমি মেহ্‌মানদের নজর রাখতে পারি নি। হাসিনা বিবিজী বলতেই এসেছি '

বলে সে ট্রে থেকে গেলাস আর সোডা নামিয়ে রাখলো টেবলে। সোডার বোতলের মুখ খুলে দিয়ে, নিজেই বোতল নিয়ে পানীয় ঢালতে গেল। রীনা বলে উঠলো, 'থাক্, তুমি যাও। একটু কিছু খাবার ব্যবস্থা দেখ।'

রহমান ট্রে হাতে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু শ্রীমতী সচিব হাসিনার নামটা

মুসলমান বলে মনে হয়েছে। এখন দেখছি, ভৃত্যের নামও তা-ই। রীনা নামের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। যদিও, একটি ধ্বনি ছাড়া, রীনা শব্দের আর কি অর্থ হয়, সঠিক জানি না। এ নামের কোনো মানে আছে কী? হিন্দু মুসলমান বোঝবার কোনো উপায় নেই। অথচ সচিব এবং ভৃত্যের নাম মুসলমান।

রীনা ততক্ষণে বোতলের ছিপি খুলে, নিজের হাতে গেলাসে পানীয় ঢালছে। তার বড় বড় নখ রাঙানো। করতলও রাঙানো কী না, জানি না। দেখায় যেন সেই রকম। কিন্তু এই আসরে আর আমাকে কেন। রীনা দেখছি, নতুন দুটি গেলাসেই সোনালী রঙের পানীয় ঢালছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকেও দিচ্ছেন?'

রীনা বললো, 'নিশ্চয়ই। অবিশ্যি আপনার অনুমতি ছাড়াই।'

বললাম, 'আমি কিন্তু বিদায় নিতে চেয়েছিলাম।'

রীনার রঙহীন ঠোঁটে হাসি, যদিও ওষ্ঠ রঙিন। বললো, 'এসেছেন একজনের ইচ্ছায়, বিদায় আমার ইচ্ছায়। এখন ত'-ই হওয়া উচিত নয় কী?'

সর্বনাশ, এদের সকলের বাত-সাত্ রকম-সকম এক রকম দেখছি। এখন আমি এ ফুলকুমারীর ইচ্ছাবন্দী। তার চেয়ে বেশ তো ছিল, চোখ গলানো গালের জল, ভাঙা রুদ্ধ স্বর, দুজনের মধ্যে কথা। এখন গলার স্বরে সুর লাগছে। পরিস্থিতি বদল হতে বসেছে। কবজির ঘড়িতে সময় প্রায় এগারো। বললাম, 'আপনাদের এ আসরে, আমি ঠিক সুবিধা করতে পারব না।'

এবার কথা রতনকুমারের, 'জুহুতেও সুবিধা করতে পারেননি, এখানে কেন পারবেন না দাদা। রণো আমাকে বলেছে, সুরঞ্জনের সঙ্গে আপনার আসর বসে।'

বললাম, 'সেখানে আসরের কোনো প্রশ্ন নেই। আমি ওর বাড়িতেই রয়েছি, ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি।'

রতনকুমার বললো, 'তখন পানীয়ের গেলাসও আপনার হাতে থাকে। একটু হাতে ধরুন, রীনা আপনাকে দিচ্ছে।'

রীনা তখন গেলাসে সোডা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। আমি গেলাস ধরবার আগেই, রতনকুমার আবার, এবার বাংলায় বললো, 'দাদা, রীনা আছে দশ লাখিয়া হিরোইন, হামি পাঁচ লাখিয়া রতন।'

আমাকে হাত বাড়িয়ে গেলাস নিতেই হয়। রীনা রতনকুমারের বাঙলা বোঝে, বলে, 'তার জন্য আমাকে খাতির করবে প্রডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটর। ইনি আমার মেহমান।'

তবু একটু সহবত কথায় আছে। মনে করি মনেও আছে। কিন্তু দশ লাখ! বলতে ইচ্ছা করে, টাকা যে সত্যি খোলামকুচি গো! একে ভাগ্য বলে, না প্রতিভা বলে, আমি জানি না। এমন নারীর হাত থেকে পানীয়ের গেলাস নেওয়া, সৌভাগ্য বলে মানতে হবে। রীনা গেলাস তুলে দেয় রতনকুমারের হাতেও। তারপর পূর্ণ করে নেয় নিজের গেলাস। মাথা নুইয়ে ভঙ্গি করে, দীর্ঘ চুমুক দেয়। মুখে রক্তের ছটা ফুটে ওঠে। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসবার ভঙ্গি করে বলে, 'কিন্তু দশ লাখের আগুনের জোর কতো, তা তো জানো রতন।'

রতন হাত তুলে বললো, 'ও সব কথা থাক। আমি কিন্তু টাকা ভালোবাসি।'

রীনা বললো, 'জানি রতন, টাকা আমিও চাই, অনেক, অনেক টাকা। কেন না, সবাই জানে, আমার বাবা সামান্য তবলচি ছিল, মা সামান্য বাঈজী। আমি এগারো বছর বয়সে ফ্লোরে গিয়ে ঢুকেছিলাম, এখনো সেখানেই রয়েছি। কিন্তু তোমরা পুরুষরা টাকার সঙ্গে অনেক কিছু পাও। আর আমরা? শুধু টাকা, আর কিছুই না।'

রতনকুমারের কোনো জবাব নেই। যদিও আশা করেছিলাম। রীনার সে আশা ছিল কিনা, জানি না। দেখলাম, আবার সে দীর্ঘ চুমুক দিল গেলাসে। চোখ বুজে কয়েকবার ঢোক গিললো। কিন্তু আমার কাছে নতুন সংবাদ। দশ লক্ষে যে একটি চিত্রে কাজ করে, তার জনক জননী ছিল সামান্য তবলচি আর বাঈজী। এগারো বছর বয়সে সে রুপোলী পর্দায় এসেছিল। এখন তার বয়স কত কে জানে। নায়িকার বয়স নেই, শুনেছি। কথা শুনে মনে হলো, এগারো বছর বয়স থেকে কোনো এক বন্দীগৃহে যেন সে আটকা পড়েছে।

রতনকুমার কথা ঘোরাতে চাইলো। বললে, 'দাদার যে গল্পটা জীবনকৃষ্ণদা করবেন, সেটা তুমি জানো?'

রীনা চোখ খুলে, আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো, বললো, 'না, এখনো গল্প শুনিনি। নতুন গল্প নেওয়া হয়েছে, সে কথা শুনেছি। শুনেছি, উনি খুব নাম করা লেখক।'

এবার আবার আমার বিরাগ। তার চেয়ে, রীনার জীবনের কথা ভালো। রতনকুমার বললো, 'আর গল্পটা হলো দাদার জীবনের কাহিনী। রণো আমাকে বলেছে।'

রণো আবার এ কথা কখন বললো, শুনিনি। তাড়াতাড়ি বলি, 'ব্যাপারটা ও ভাবে নেবেন না। জীবনের কথা বলা খুব সহজ না।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল রীনা, 'খুব ঠিক কথা, খুব ঠিক কথা। বললেও তা সহজ হয় না। আচ্ছা রাইটার সাহেব, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, জীবনের সব কথা কি কখনো বলা যায়?'

কঠিন প্রশ্ন, যদিও আমি সব থেকে সহজ জবাবটাই রীনাকে শুনিয়ে দিই, 'বলতে পারা উচিত, তবে খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই।'

তারপরেই রীনার প্রশ্ন, 'আপনি পেরেছেন কখনো?'

অকুণ্ঠে জবাব দিই, 'পারিনি।'

রীনার রক্তিম চোখের তারা কটাক্ষ করলো রতনকুমারের প্রতি। তারপরে আবার আমার দিকে। আমি একবার রতনকুমারের দিকে দেখলাম। তার চোখে একটি চকিত ইশারা যেন খেলে গেল। ভুরুতে ঈষৎ কাঁপন। কিন্তু ব্যাপার ঠাহর হলো না। রীনা গেলাসে চুমুক দিয়ে পাত্র শূন্য করলো। আবার ঢাললো।

রতনকুমার বললো, 'ধীরে রীনা, ধীরে।'

রীনার গলায় আবার সেই রুদ্ধ গোঙানি স্বর ফিরে আসছে যেন। বললো, 'এখনো কি আমাকে শিখতে হবে? রতন, আমি মদ খেতে শিখেছি তোমার আগে।'

'জানি, কিন্তু সেজন্য বলিনি। কেন বলেছি, তুমি জানো। তুমি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবে।'

'মদে কি আউট হই?'

রতনকুমার চুপ। তার সঙ্গে আমার একবার চোখাচোখি হলো। রীনা পাত্রে চুমুক দিল। বললো, 'তোমরা দুজনেই আমার কাছ থেকে এত দূরে বসেছ কেন রতন? একজন কেউ আমার কাছে এস। নয়তো দুজনেই এস।'

আমি আবার রতনকুমারের দিকে তাকালাম। রীনা হঠাৎ হেসে উঠলো। কথার স্রোত কোন্ দিকে বহে বুঝতে পারি না। কিন্তু রীনার কাছাকাছি দাবী কেন, বুঝতে পারছি না। এমন কথা, ফুলকুমারীদের মুখে শোনা যায়, ভাবিনি কখনো।

রতনকুমার বললো, 'দাদা তোমার কাছে বসতে পারেন।'

কেন? এ আবার কী খেলা। এ খেলার নাম আমার জানা নেই। ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে যে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি, রীনা রক্তিম চোখে আমাকে অপলক দেখছে। তার ঠোঁটের হাসিটা বড় ভয়ের। ভুরু কাঁপিয়ে বললো, 'রতন, রাইটার সাহেবকে তুমি ভালো করে তাকিয়ে দেখেছো?'

রতনকুমার বললো, 'নিশ্চয়। দাদাকে জোরে টেনে নামালেই হয়।'

সেটা আবার কী। রীনা সুরে সুর মিলিয়ে আওয়াজ দিল, 'ঠিক বলেছ। তুমি যদি ওঁকে রাইটার বলে পরিচয় না দিতে, তা হলে আমি ধরেই নিতাম, উনি একজন আর্টিস্ট।'

ভোবা ভোবা! কী আমার দুর্গ্রহ হে। এ নগরে এসেছিলাম ফেরি-ওয়ালা হয়ে, পশরা বিকোতে। সংযোগটা রুপোলী পর্দার সঙ্গে বটে। তা বলে রুপোলী পর্দার বুকে ছায়াচারী! আমাকে দেখে রূপকুমারের ভাবনা। তার ওপরে, রতনকুমারের মতো রূপকুমার আমার পাশে আলো করে বসে আছে। দু'হাত দূরে রীনার মতো ফুলকুমারী। হেসে বললাম, 'আপনাদের কল্পনার দৌড় অনেকখানি।'

রীনা বললো, 'কল্পনা নয় সাহেব, চোখে দেখে বলছি। সত্যি, আপনাকে কেউ কখনো ছবিতে কাজ করতে ডাকেননি?'

সে রকম পাগল বন্ধুর দেখা যে কখনো মেলেনি, তা বলব না। তবে সে সব পাগলামিই। এদের মনেও যে সে পাগলামি জাগতে পারে, ভাবতে পারিনি। তবু আমি আওয়াজ দিই অন্য রকম, বলি, 'না, কেউ ডাকেনি। কেনই বা ডাকবে বলুন। তাহলে তো এ রকম অনেককেই ডাকতে হয়।'

রীনা মাথা নেড়ে বললো, 'মোটেই না। আমার চোখ আছে, অনেক দিনের পুরনো চোখ মনে রাখবেন। ছবির জগতে কাকে দিয়ে কী হয়, আমি বুঝি। আপনার চোখ, আপনার চুল, আপনার হাসি, আপনার মুখ—।'

রতনকুমার বলে উঠলো, 'একটু বেশি মিষ্টি।'

রীনা তার সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আর একটু দুষ্টুমি মাখানো।'

এবার মরো গিয়ে তুমি লজ্জায়। ধিক্কার দাও গিয়ে নিজের এই বাংলা মার্কা চেহারাকে। কারোর কিছু আসবে যাবে না। কেবল শব্দ করে হাসতে পারলাম।

রীনা আবার বললো. 'জীবনকৃষ্ণদার উচিত, আপনাকে ছবিতে কাজ করানো। তাঁর চোখে পড়েনি?'

রতনকুমার বলে উঠলো, 'দাদার গল্পেই দাদাকে হিরো করতে পারলে হয়, আর রীনা হিরোইন।'

বিদ্রূপ? রতনকুমারের দিকে তাকিয়ে দেখি। সে আমার দিকে চেয়েই বলে, 'ঠাট্টা করছি না দাদা, খুব ভালো দেখাবে।'

রীনা যোগান দিল, 'সে রকম হলে, আমি খুশি হতাম।'

আমি হেসেই বললাম, 'এ আলোচনায় আমি অস্বস্তি বোধ করছি। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা যাক।'

রীনা হেসে উঠলো। কিন্তু খিলখিল করে না, কেমন একটা গোঙানো ভাবে, শরীর কাঁপিয়ে। তারপরেই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তাকাতে পারি না, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। আমার যে চোখ গেল। বুকের দুয়ার এমন হাট করে খোলা কেন। আবার ভয় হলো। রীনা টলছে, পড়ে যাবে না তো। ভাবতে ভাবতেই দেখি, সে আমার আর রতনকুমারের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। হাতে গেলাস। রতনকুমারই বলে উঠলো, 'বসো রীনা, পড়ে যাবে।'

বলে সে একটু সরলো। রীনা আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে পড়লো। স্পর্শ বাঁচানোর প্রশ্ন নেই। মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। রীনা বললো, 'রাইটার সাহেব, জীবনের অনেক ঘটনার কথা বলা যায়। মনের কথাই বলা যায় না, তা-ই না?'

আমার এখন বুক দুরু দুরু। রতনকুমারের দিকে তাকাই। পরমুহূর্তেই দেখি, রীনা যেন হাসছে, তার শরীর কাঁপছে, সে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রতনকুমার তাকে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরলো, ডাকলো, 'রীনা।'

রীনা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো, 'তুমি কেন রাত্রি ন'টার সময় আসোনি রতন?'

রতন বললো, 'সে কথা তো তোমাকে বলেছি রীনা।'

রীনা মাথা নেড়ে কান্নার স্বরে বলে উঠলো, 'না না, ও কথা আমি শুনতে চাই না। আমি জানি, আমাকে নিয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। আমাকে নিয়ে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

রতনকুমার বললো, 'তোমার কোটি কোটি দর্শক কোনো দিনই ক্লান্ত হবে না।'

রীনা কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো, 'কিন্তু তাদের সকলের সঙ্গে আমি শুতে যাবো না।'

আমার শ্রবণ কি এখনো স্থির আছে? আমার শ্রবণ কি নতুন জন্ম নিচ্ছে? কোনো নারীর মুখে এ কথা কখনো শুনিনি, শুনবো, এ চিন্তাও ছিল না। ভয় আর বিস্ময় অথচ একটা উৎকণ্ঠিত কষ্ট আমার মনের মধ্যে মিশ্রিত ক্রিয়া করছে। আমি রতনকুমারের দিকে তাকালাম। রতনকুমারের মুখে বিব্রত ব্যথার অভিব্যক্তি।

রীনা তখন প্রায় ফিস ফিস করে বলছে, 'দশ লাখ টাকা ওরা আমাকে আজ দিচ্ছে, একটা ছবির জন্য। এগারো বছর বয়স থেকে আমাকে নিয়ে খেলেছে, আমার রক্তে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

বলতে বলতে হঠাৎ হাতের গেলাস ছুঁড়ে ফেললো। ঝনঝন করে চূর্ণবিচূর্ণ হলো। আমি সভয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। রতনকুমার আমাকে ইশারায় শান্ত হয়ে বসতে বললো। রীনা ঝরঝর কান্নার স্বরে বললো, 'আমি এখন একটা রাস্তার কুত্তি ছাড়া কিছু না।'

রতনকুমার রীনাকে নিজের বুকের কাছে তুলে নিয়ে ডাকলো, 'রীনা প্লিজ।'

রীনা রতনকুমারের ঠোঁট তার আতপ্ত রক্তিম ঠোঁট দিয়ে গ্রাস করলো, শোষণে চুম্বনে আলিঙ্গনে মত্ত হলো। কী করতে হবে, কী বলতে হবে, জানি না। অনেক মানুষ দেখেছি, এই এক অহংকার ছিল মনের কোণে। আর যেন তা কোনোদিন না করি। শেষ পর্যন্ত চিরদিন যা করেছি, আজও তাই করি। অবাক হয়ে, নিজের বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে, সেই বিচিত্রের কাছে মাথা নত করে থাকি। আমি বুঝতে পারছি, আমার বুকের কাছে প্লাবনের কলকল ধারা। মানুষের এমন দুর্ভাগ্য কি আর কখনো দেখেছি।

এ সময়েই আবির্ভাব হলো সুরঞ্জন আর নীলার। দৃশ্য দেখেই, সুরঞ্জন ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আমাকে কথা বলতে বারণ করলো। নীলার চোখে বিস্ময় ভয়। ওদের পিছনে সচিব হাসিনা। সুরঞ্জন আমাকে হাতের ইশারায় উঠে আসতে বললো। আমি উঠে গেলাম। যাবার আগে দেখলাম, রীনা নিজের কামিজ ধরে টানছে, ছেঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রতনকুমার তার আলিঙ্গনের মধ্যে অর্ধশায়িত।

সুরঞ্জনের সঙ্গে বাইরের ঘরে এলাম। সুরঞ্জন বললো, 'ভাগ্যিস রণোর বাড়ি গেছলাম। তা না হলে জানতেই পারতাম না কোথায় গেছ। আর একটু হলে থানায় খবর দিতে হতো।'

নীলার দিকে এখন তাকাতে পারছি না। বললাম, 'রতনকুমার জোর করে টেনে নিয়ে এলো।'

সুরঞ্জন বললো, 'বুঝেছি। এখন চলো।'

হাসিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এক চরিত্র, এক ঘটনা না। রানী, কৃষ্ণ, সুরঞ্জনের বাড়ির হরিরেণ, সেই মারাঠি তরুণীতেও শেষ না। এমন কি রীনা রতনকুমারেও না। এ নগরীতে থাকাকালীন, এমন চরিত্র আরো মিলেছে। এমন ঘটনা আরো অনেক। যারা রুপোলী পর্দার ছায়া হতে পারেনি। হতে চেয়েছিল। এমন কি, রণো, সুরঞ্জনের মতো মানুষের আশ্রয়ও, সিকের ভাগ্য, এক আধটি বেড়ালের। সস্তা নোংরা হোটেল-ঘর, অথবা দরিদ্র বস্তি, কিংবা পেভমেন্টে যারা নিজেদের ছায়া আর চেয়েও দেখে না। সে কাহিনী বলতে গেলে, বেদব্যাসের মতো সময় আর স্থান চাই। রণোর একটা কথা-ই মনে পড়ে, 'এই আপদ ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলোর ঘটনা নিয়ে কোনোদিন কি ছবি হবে না? এর চেয়ে আর মজার ছবি কী হবে?'

তা বটে। রুপোলী পর্দার স্বাদটা ওরা এক রকম জানে। এই নগরীর প্রহরিণী, হাসি-ফেনিলোচ্ছল সাগরের, রুপোলী জলের স্বাদ যে লবণাক্ত, ওদের মতো কে জানে?

তা ও জানে। হয়তো অনেকেই জানে। রূপকুমার ফুলকুমারী থেকে ছবির গড়নদার পর্যন্ত। তাও দেখেছি, শুনেছি। মধ্যরাত্রির সুরার প্রলাপে শুনেছি। শেষরাত্রের নির্লজ্জ নগ্নতায়, চোখের জলের দুরন্ত কাঁদনে দেখেছি। যারা পারেনি, যারা পেরেছে, তাদের অন্ধকার আর আলো, একটা কোথায় যেন মেশামেশি করে আছে। শেষ পর্যন্ত, তিক্ত স্বাদের বিষে, আকণ্ঠ ভরেছে সকলের। কারোরটা হাসি আর ঐশ্বর্যে ঢাকা পড়ে আছে। কারোরটা লুকিয়ে রয়েছে, অন্য জীবনের অন্ধকারে।

দশ দিন কেটে যাবার পরে, একদিন সুরঞ্জনের স্ত্রী, নীলার চোখে দেখলাম কৌতূহলের ঝিলিক। ভুরুতে একটা বিস্ময়ের বাঁক। সারা বেলায় দেখা ছিল না। সাঝবেলাতে প্রথম সাক্ষাতে, নীলার ঠোঁটের কোণের হাসিটাও কেমন যেন রহস্যে নিবিড়। জিজ্ঞেস করলো, 'লিজা কে?'

ঘরে তখন বিধান সস্ত্রীক। স্বয়ং দুর্বাসা রণো—রণবীর। সুরঞ্জনের চোখমুখের ভঙ্গিটাও ভালো না। সবে মাত্র কলকাতা-ত্যাগী এক কমার্শিয়াল শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ফিরছি। নীলার জিজ্ঞাসাটা যেন কোনো অর্থ বহন করলো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

বিধান এদের মধ্যে একটু ভালো মানুষ গোছের। ওর স্ত্রী রমাও তা-ই।

তথাপি নীলার হাসি আর জিজ্ঞাসাটাই সকলের মধ্যে সংক্রামিত। কেবল রণো ছাড়া। সে-ই হুমকে আওয়াজ দিল, 'চিনতে পারছো না? লিজা, লিজার বোন রোজা, তাদের বৌদি মেরী, তাদের মা মিসেস গোমেজ…'

আর বলবার দরকার ছিল না। সকলের মুখগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সত্যি আমি মিথুক নাকি? এমন বিস্মরণও হয়? তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'হঁ। হঁ্যা, তাদের কী হয়েছে?'

রণো বাজলো চড়া সুরে, 'তাদের কী হয়েছে, আমরা জানি না। তুমি এখানে আসতে না আসতে, এদের জোটালে কোত্থেকে, সেটি বল তো জাদু?'

রণোর কথাই এমনি। বললাম, 'আরে না না—।'

কথা বলবে কে? তার আগেই রণোর ধমক, 'চোপ। আগে বোস, তারপরে শুনছি তোমার কেচ্ছা।'

সকলেই হেসে বাজলো। আমিও হাসতে হাসতে বসলাম। রণো আবার বলে উঠলো, 'ওই জন্যই আমি বলি, চেহারাটাই ভাল্‌গার কেষ্ঠাকুর মার্কা। দেখো, আসতে না আসতেই, একটা ঘটিয়ে বসে আছে।'

সুরঞ্জন বললো, 'এখন মুখখানা ছাখ রণো।'

'দেখিনি আবার? শালা মুরলীধর।'

নীলা বলে উঠলো, 'আমি তো প্রথমে টেলিফোনে গলা শুনে ভাবলাম, কোনো হিরোইন কথা বলছে। ইংরেজিতে লেখকের নাম বলে জিজ্ঞেস করলো, উনি আছেন নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে বলছেন? জবাব এলো, আমি লিজা বলছি বলুন, তাহলেই বুঝবেন। আমি বললাম, উনি তো এখন বাড়ি নেই, এলে বলব। কিন্তু আপনি লিজা মানে, কে বলুন তো? কোথা থেকে বলছেন? জবাব এলো পাকা বাংলায়। প্রথমে ভেবেছিলাম, মেমসাহেব। বাংলা শুনে তো আমি-থ। বলল, বলবেন, মিসেস গোমেজ আমার মা, রোজা আমার দিদি, মেরী আমার বৌদি—আমি সে-ই লিজা। উনি যেন দয়া করে একটা টেলিফোন করেন।'

নীলা আমার দিকে তাকালো। আমার চোখের সামনে লিজার মুখটা ভাসছে। নীলার বলার মধ্যে, আমি যেন লিজার হাসি-ঝলকানো চোখ আর কথার ভঙ্গিটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু সবাই যে ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, তাতে যেন কেমন একটা ঘনীভূত বিস্ময় আর রহস্য। কেন, ঘটনার এমন বৈচিত্র্য কী? রণোর মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে, কী একটা অপরাধ করেছি। সে-ই আওয়াজ দিল, 'বোঝো এখন ব্যাপারটা।'

নীলা আবার বললো, 'আমার অবিশ্যি খুবই জানতে ইচ্ছে করছিল, উনি কে, কী ভাবে লেখকের সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু লজ্জা করলো। কিন্তু টেলিফোনে আবার শুনতে পেলাম, কিছু মনে করবেন না, এ ভাবে বললাম, তাহলে হয়তো লেখক মশাইয়ের আমাদের কথা মনে পড়ে যেতে পারে। আর উনি যদি টেলিফোন করবার সময় না পান, তা হলে কাল আমাদের বাড়িতে চলে আসতে বলবেন।...আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ফোন-নাম্বার ঠিকানা কি উনি জানেন? জবাব এলো, হ্যাঁ।'

নীলা থামলো। রণো শক্ত মুখে শিবনেত্র হয়ে, ঘাড় দুলিয়ে বললো, এবার বলো তো নাটের ঠাকুর, প্রথমে মেমসাহেবি চাল, তারপরে খাঁটি বাঙালী খুকিটি কে?'

আমি হেসে বললাম, 'আরে না না, মেয়েটি আসলে—'

'মেয়ে!' সুরঞ্জন যোগান দিল। বাকীরা হাসলো। এখন তো দেখি, সুরঞ্জন রণোতে বেশ মিল।

রণো হুঁশিয়ারী দিল, 'চাপবার চেষ্টা করো না চাঁদ, ভালোয় ভালোয় বলে দাও। না হলে বম্বে তোলপাড় করে দেব।'

হাসির কথা ছাড়া কিছু না। আমি বললাম, 'এত কিছুর দরকার নেই। এরা আর আমি এক সঙ্গে কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছি। কেন, সুরঞ্জনের সঙ্গে তো তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।'

বলে আমি সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম। সুরঞ্জন সোজা হয়ে বসে বললো, 'মায়ের কাছে মাসীর গল্প। সেটা ছিল একটা গোয়ানিজ-পর্তুগীজ ফ্যামিলি। আমি হলফ করে বলতে পারি, আজ যে-মেয়েটা টেলিফোন করেছিল, সে কখনো সেই দলের হতে পারে না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

সুরঞ্জনের জবাব, 'আমাকে আর গোয়ানিজ মেমসাহেব চেনাস নি। ওদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনোদিন ও রকম বাংলা বলতে পারবে না।'

নীলা তাল দিল, 'চমৎকার বাংলা। আমি নিশ্চিত, লিজা নাম নিয়ে, কোনো বাঙালী মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে।'

রণোর তালে তাল বাজলো, হাঁকড়ানো সুরে, 'আরে এ তো স্পষ্ট, ওই নামে মেয়েটাকে টেলিফোন করতে বলেছে, যাতে কেউ ধরতে না পারে।'

বিধানের মতো নিরীহ শান্ত মানুষও আমার নাম ধরে ডেকে বললো, 'বলেই দাও না, এতে আর কী হয়েছে।'

বিধানগিন্নীও বাজলো, 'হ্যাঁ, সেই তখন থেকে আমরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করছি।'

রণো বললো, 'কেউ তো কেড়ে নিচ্ছি না।'

একা রণো ক্ষ্যাপাতেই রেহাই নেই, এখন দেখছি, সবাই সাঁকো নাড়া দিচ্ছে। আমার অবাক লাগছে সকলের চোখ-মুখ দেখে। আমার বচনে কারোর বিশ্বাস নেই। একে বলে, না-হক বিপদ। মানুষের নিজের অভিজ্ঞতার সীমানায় যদি না পড়ে, তাহলেই অবিশ্বাস। বললাম, 'আসলে এ-সব কিছুই না। লিজা মেয়েটি অনেক কাল কলকাতায় ছিল, ছেলেবেলা থেকেই। অনেক বাঙালী ছেলে-মেয়ে ওর বন্ধু। বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশাও ছিল, তাতেই—'

এখন রণোই, সরকারী বলো, বাদি পক্ষের বলো, উকীল মহাশয়। বলে উঠলো, 'থাক তোমাকে আর নভেলি গুল্ দিতে হবে না। ব্যাটা গল্প লিখে লিখে ভেবেছে, যা তা বানিয়ে বললেই হলো।'

সুরঞ্জন এর মধ্যে আর একটু নতুন রসের মিশেল দিল, 'এখানে যে দু-একজন বাঙালী হিরোইন আছে, তারা কেউ না তো?'

সকলের জিজ্ঞাসু নজর আমার দিকে। এদের তুমি বোঝাতে যাবে? বোধ হয় ভাষায় কুলোবে না। রণো বাতালো, 'আর সেটি যদি মনোরমা হয়, তাহলে আর দেখতে হবে না। আজ মাঝরাত্রেই এসে দরজা ধাকাধাক্কি করবে।'

নীলা আঁতকানো আওয়াজে বললো, 'কেন?'

রণো বললো, 'জানো না? রাত্রে পেটে খানিক দ্রব্য পড়লেই হলো। তারপর মাথায় যার চিন্তা, তার কাছে ছুটবে। যখন পৌঁছবে, তখন দেখবে, আঁতুড় ঘরের, প্রথম জন্মদিনের পোশাক। এসেই লটকে পড়বে।'

নীলার আঁতকানো আওয়াজ আর একটু চড়লো। যাকে কেন্দ্র করে কথার উত্থাপন, সেই আমিও চোখ বড় করে তাকালাম। এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কি ঘটতে পারে? না কি কোনো মহিলার পক্ষে এমন সম্ভব?

সুরঞ্জন বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই।'

রণো বললো, 'শুধু তা-ই না। টেনে নিয়ে ছুটতে পারে জুহুতে, তারপর সেখান থেকে শ্রীঘরে।'

আমার চোখের সামনে, জুহুর বাদামি বালি সমুদ্রতীর ভেসে উঠলো। কিন্তু তার সঙ্গে বাকীটা মেলাতে পারলাম না। এ জীবনে পারব না।

নীলা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, 'অসম্ভব। তাই বলুন না কে? মনোরমা নাকি?'

এ একমাত্র নবদ্বীপের নিমাই ঠাকুরের দলের কাণ্ডই হতে পারে। সুলতানের কাজী যতো সবাইকে বেঁধে মারে, সবাই ততো বেশি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। নামেতে কারোর ভুল নেই দেখছি। তথাপি হেসে বলি, 'কিন্তু সে-সব কিছুই না, লিজা একটি গোয়ানিজ মেয়ে। ওর এক দাদা এখানে চাকরি করে। আর এক দাদা কলকাতায়। বিশ্বাস না করলে আর কী বলব।'

প্রায় অসহায় মুখেই, অসহায় হেসে সকলের দিকে তাকালাম। রণো আমার দিকে চেয়ে, বাকাদের বললো, 'ব্যাটা বরাবর এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ, মুখ দেখ।'

তারপরেই ও স্বর বদলে বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তোর কাছে তাদের ফোন নম্বর আর ঠিকানা আছে?'

'আছে।'

'নিয়ে আয়, আমি নিজে তাদের বাড়িতে ফোন করব, তাহলেই বোঝা যাবে।'

এমন কাজে আমি বাধ্য না। বিশেষ রণোর পাগলামিতে। কিন্তু সকলে যদি তাতেই খুশি, তা-ই হোক। আমি উঠে গেলাম, আমার ঘরে। ট্রেন থেকে নামার সময়, জামার পকেটে ছিল। তারপরে যতদূর মনে পড়ছে, ছোট ব্যাগের কাগজপত্রের মধ্যে, লিজার লেখা সেই, ডাইনিং কারের বিলের কাগজটা রেখে দিয়েছি। ব্যাগ খুলে, বই কাগজপত্র ঘাঁটলাম। সেই কাগজটি নেই। এবার যেন আমার একটু ঘাম দেখা দিল। সব আছে, সেই ছোট কাগজের টুকরোটি কোথায় গেল? এদের খুশি করতে পারি বা না পারি, কথা রক্ষার জন্য, লিজাদের সঙ্গে আমাকেও টেলিফোনে একবার কথা বলতে হবে বৈকি। ওদের বাড়ির ঠিকানাটাও যে সেই কাগজে লেখা ছিল।

শেষ পর্যন্ত লিজার কথাই সত্যি হবে নাকি? মিথ্যুক হয়ে যাব? ব্যাগটা উল্টো করে টেবিলের ওপরে ঢেলে ফেললাম। একটা একটা করে কাগজ দেখলাম। কিন্তু ডাইনিং কারের সেই বিলের কাগজের টুকরোটি কোথাও নেই।

এ সময়েই পিছন থেকে রণোর গলা শোনা গেল, 'বুঝেছি বাবা, খুব হয়েছে, এখন এসো।'

আমি অস্বস্তির স্বরে বললাম, 'না না, সে-জন্য না। মুশকিল হচ্ছে, ভদ্রতার খাতিরে যে একটা টেলিফোন করব, তারও উপায় নেই। কোথায় হারালো কাগজটা?'

রণো এসে ঘরে ঢুকলো। পিছনে পিছনে নীলা। কিন্তু সেদিকে আমার নজর নেই। আমি আবার নতুন করে খুঁজতে লাগলাম। যদি কোনো আশা থাকে, তা-ই নীলাকে শুনিয়ে বললাম, 'রেলের ডাইনিং কারের বিলের পেছনে সব লেখা ছিল।'

নীলার কোনো জবাব পাওয়া গেল না। এতক্ষণে বোধ হয় ক্ষ্যাপা ঠাকুরের দয়া হলো, আমার অবস্থা দেখে। রণো আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'সত্যি নাকি রে?'

বললাম, 'শুধু শুধু মিছে বলব কেন? ওদের নামগুলো ছাড়া, আমার কিছুই মনে নেই। আর কিছু না, ওরা ভাববে, আমি বাজে কথা বলেছি।'

নিরুপায় হতাশায় ব্যাগ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হতাশাতেই হেসে রণো আর নীলার দিকে তাকালাম। ওরা নিজেদের চোখে চোখে তাকাচ্ছে। আমি বাইরের ঘরে গেলাম। ওরাও এলো পিছনে পিছনে।

নীলা বললো, 'আমার মনে হয়, কাল আবার ওরাই টেলিফোন করবে।'

না করলেও, আমার কিছু বলবার নেই। বললাম, 'তাহলে অন্ততঃ তোমাদের সন্দেহ-ভঞ্জনটা করা যেত।'

রণোর এবার বিচারপতি রায়, 'হুঁ, ব্যাটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সত্যি কথাই বলছে। কাগজটা খুঁজে না পেয়ে, একটু মুষড়েই পড়েছে।'

বিব্রত হেসে বললাম, 'মুষড়ে পড়িনি।'

রণোর বক্তব্য, 'ওটাকে মুষড়ে পড়াই বলে। তার মানে, ব্যাপার কিছু আছে। কিন্তু বাংলা জানে, এ রকম গোয়ানিজ মেয়ে তো কখনো দেখিনি।'

সুরঞ্জন বললো, 'সত্যি, আমার অবাক লাগছে। সে তো পাকা মেমসাহেব দেখলাম। সেজন্যই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

রণো বললো, 'ব্যাপার গণ্ডগোল। দেখ, আবার সেখানে কী বাঁধিয়ে বসে আছে।'

এ রকম কিছু না বললে, রণোর আত্মার শান্তি হয় না। তবে আমার স্বস্তি, ব্যাপারের হাতী ঘোড়া চিন্তাটা, মোটামুটি সকলের মাথা থেকে গিয়েছে। কেবল একটা-ই যা মজা দেখলাম। রণোর সঙ্গেও সুরঞ্জন আর নীলা যে কখনো কখনো জোট বাঁধতে পারে, এটা জানা ছিল না। আসলে ভেদের কারণটা আলাদা। সেটা না থাকলেই, অভেদ।

সুরঞ্জন আবার তালি দেবার তাল করলো, 'তবে এ সব পরিবারকে বিশ্বাস নেই, সে কথা আমি আগেই লেখককে বলে দিয়েছি।'

রণো তার ওপরে ধরতাই দিল, 'হুঁ, পগাতে আর রাগাতে আর মিথ্যে কথার কারসাজিতে আর পুরুষদের ভেড়া বানাতে, ওদের জুড়ি নেই।'

যার যার কথা, সে সে বলে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। অন্ততঃ আমার পরিচিত গোমেজ পরিবারের 'সে-পরিচয় আমি পাইনি। আর ভেড়া কি কেবল ওরাই বানাতে জানে? অনেক হিন্দু ও বঙ্গরমণীকেও তো দেখেছি, ভেড়া বানাবার মন্ত্র তাদের, নানা রঙ্গে ভঙ্গে, ঠোঁট ভুরুর ধনুকে, চোখের তারায়। ভেড়া বানাতে, তারাও অনেক জগৎবরেণ্যা পারদর্শিনী। ভারত-পর্তুগীজ মিশেল রক্তে যে-নারীদের জন্ম, তারাই কেবল ভেড়া বানাতে জানে না। আরো খতিয়ে বলো, আসলে যে ভেড়া বনে, তার মধ্যে মেষত্ব না থাকলে কি বানানো যায়? সেজন্য আমরা নারী দেবীর সামনে, যূপকাষ্ঠে মেষ বলির আয়োজন করেছি। সেইখানে আমাদের ধন্দ করা, ছন্দ বানানো। ধন্দটাকে বলো গিয়ে, প্রতীকি। সব প্রতীক-ই গূঢ়, ছদ্ম। ধন্দ ধরিয়ে পূজা আর সাধনা।

আর ছল চাতুরি মিথ্যা যদি বলো, তা-ই বা আর এক শ্রেণীর ওপরে দাগানো কেন? দাগাও তো, আপন মুখ দর্পণে দেখে দাগাও। কিন্তু সে কথা যাক। লিজার লিখে দেওয়া সেই কাগজের টুকরোটা পাওয়া গেল না, সেই একটু মন খুঁত খুঁত। সেটা আর কিছু না। সামাজিক মনের একটা অস্বস্তি। নিজেকে অকারণ মিথ্যাবাদী বানাতে কে চায়।

তবে মনে মনে জানি, এই তো ভালো। পথ চল্‌তি, কাছাকাছি আসা। পথেই যেন দূরান্তরে যাই। পথের দেখা পথেই শেষ। আর তার যা কিছু, সে মনের তারে। হয়তো সে অনেক দিন ধরে বাজে, কিংবা একেবারেই বাজে না। দেখাদেখির শেষ কথাটা সেখানেই। কোনো এক গোয়ানিজ গোমেজ পরিবারের কথা হয়তো অনেক দিন ধরে বাজবে। সকলের জন্য যদি না-ও বাজে, তবে দুখ্ চাপা একটি আশ্চর্য মেমসাহেব মেয়েকে মনে থাকবে। এই কারণে, সে সকলের মধ্যে, কেমন করে যেন, অ-সকল। সে অচিরাৎ খোলা, ঝটিতি ঢাকা! কারণ, কী যেন একটা সে চাপা দিয়ে রেখেছে, সেখানে চোখের জল আছে। হাসিটা তার সেখান থেকেই ঝিলিক দেয়।

ভাবি, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে কত অচিন দেশ, কত অচিন মানুষ। সেই অচিনের এক সেই গোয়ানিজ পরিবার। তার মধ্যে সব থেকে, অচিনের বিস্ময় লিজা। আসলে সে আমার এই ভারতের অচিন কূলের বিস্ময়।

গোটা দুদিন কাটল শুধু নিমন্ত্রণ খেয়ে আর বেড়িয়ে। কে জানত, এত বন্ধু পাব হেথা, এই পশ্চিম সাগর কূলে, এত বন্ধু ছিলো। পুরনোর হিসাবে, তাজ্জব। কলকাতার সবাই কি এখানে? নতুন নতুন পেয়ে, মন আরো ভরপুর। নগরী ছেড়ে, দুরান্তরে যাবার কথাটা তোলাই যাচ্ছে না। নগরীর মেলাতেই, মেলা দেখে দিন কেটে যায়। মানুষে মিশে মন পাগল। সমুদ্র কলকল, নারিকেল কুঞ্জের ঝিরিঝিরিতেই রাত্রি যায় দূরে।

ইতিমধ্যে হাসি যত দেখেছি, চোখের জলের হিসাবে, খতিয়ানের পাতা ভারী। রূপোলী জগৎ ছাড়িয়ে, রূপসাগরের নানান্ কূলে কূলে, এক হিসাব।

দু'দিন ধরে, সাঁঝবেলাতে, যতোবার তার-ভাষায় যন্ত্রে ঝঙ্কার উঠলো, নীলা ততবার আমার দিকে তাকিয়ে, ছুটে ছুটে গেল। কিন্তু কানে যন্ত্র তুলতেই, ওর চোখের দ্যুতি, মুখের আলো হারিয়ে যায়। গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকায়। নজরে নালিশও আছে। অপূরিত আমার নালিশ এখন আমার ওপর। আকাঙ্ক্ষিত একটি গলা কেন বাজে না? এখন যে ওটা নীলারই দায়। আমি মনে মনে হাসি। এ হাসিটা ডানা ঝাপটানো পাখির হাসি। নীলাকে সে কথা বোঝাতে পারব না।

রাত পোহালে রবিবার। ছুটির দিন। অতএব, আগামী কালের দিলখুস আয়োজনের জল্পনা-কল্পনায় মাতে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে। আমার ইচ্ছা, রণো বিমানরা সবাই থাক। আয়োজনেরই বা দরকার কী। আরব সাগরের কূল ধরে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

অতএব, রাত পোহাতেই, সাজো সাজো' রণো এলো ঘুম-চোখেই। গতকাল রাতে বোধ হয়, সমুদ্র-কিনার থেকে আর সেই কাকের বাসায় ফেরা হয়নি। কৃষ্ণ বেচারী বোধ হয়, চারিদিকে বইয়ের বাণ্ডিলের মধ্যে, ভাত নিয়ে বসে ছিল।

রণো এসে হাঁক দিল, 'চা।'

সেই সময়েই, ডাকের ঘন্টা বেজে উঠলো। দরজার বাইরে আগন্তুক। গুরুচরণ গিয়ে দরজা খুলে দিল। খবর এলো, দুজন মেমসাহেব। লেখক দাদার খোঁজে। দোতলায় ডেকে, বাইরের ঘরে নিয়ে আসা হলো তাদের। আমি ঢুকে দেখি, লিজা আর রোজা, দুই বোন। আমার পেছনে নীলা। রণো টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে, সোফায় এলিয়ে বসে ছিল। পা দুটো নামিয়ে নিল। মনে মনে বললাম, বোকো ঠ্যালা। তারে ভাবে না, সশরীরে হাজির। এবার ডানা ঝাপটে কোথায় যাবে যাও।

তাড়াতাড়ি ইংরেজিতেই ব্যক্ত করি, 'আ রে কেমন সব, ভালো তো? বসুন।'

রোজার চোখে হাসির দ্যুতি। ও যেমন, তেমনই। কিন্তু লিজাকে এমন বেশে দেখব ভাবিনি। মেমসাহেব আরব সাগরের জলে তৈরী শাড়ি পরে এসেছে। তাতে সোনালী বালির পাড়। চোখে ঠোঁটে যা মাখবার, তা ঠিকই আছে। তবে সিন্ধুর বুকে রক্তিম সূর্যের টিপটা যেন ভাবাই যায় না। টকটকে লাল একটা ফোঁটা দিয়েছে কপালে। চুল আ-বাঁধা ছাড়া।

রোজা বসতে বসতে বললো 'ব্যস্ত হবেন না।'

লিজাকে বাংলায় বললাম, 'বসুন।'

লিজার চোখে যেন চকিত বিস্ময়ে ঝিলিক দিল। ভুরু একবার কুঁচকে গেল। না বসে, বাংলাতেই বললো, 'বিরক্ত করলাম না তো?'

বললাম, 'বিরক্ত হব কেন। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

পরিচয়ের পালা শেষ হলে, গৃহিণীর দায়িত্ব নিয়ে, নীলাই অগ্রসর হলো। লিজাকে বসতে বললো, লিজা বসলো। রোজা বিশেষ ভাবে, সুরঞ্জনের দিকেই বারে বারে দেখছিল। তারপরে বলেই ফেললো, 'আপনার সঙ্গে যে কোনো দিন পরিচয় হবে, ভাবতেই পারিনি। আপনার গানের আমি ভীষণ ভক্ত।'

সুরঞ্জন বিনীত হেসে বললো, 'আমি তো গান করি না।'

রোজা হেসে বললো, 'ওই হলো, আপনার মিউজিক আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

লিজা বাংলায় বললো, 'আমারও খুব ভালো লাগে।'

সুরঞ্জন বললো, 'ধন্যবাদ।'

নীলা লিজাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলো, সে এ রকম বাংলা শিখলো কেমন করে। জবাব একই পেল।

সুরঞ্জন বললো, 'আমরা তো বিশ্বাস করতে পারিনি।'

নীলা লিজার দিকে চেয়ে বললো, 'এ রকম ভাবে শাড়ি পরে আপনি যদি ওই রকম বাংলা বলেন, তাহলে আপনাকে বাঙালী ছাড়া কিছু ভাবাই যাবে না।'

লক্ষ্য করেছি, নীলার সঙ্গে কয়েকবারই রণোর দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছে। রণোর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পেরেছি, দুর্বাসা মুনির চোখ, আমার ওপরে বেঁধানো। কখন হুঙ্কার দেবে, কে জানে।

এতক্ষণে রোজা আমার দিকে কটাক্ষ করে বললো, 'আমাদের কথা বোধ হয় ভুলেই গেছেন?'

বললাম, 'না, ভুলব কেন ?'

রণোর গলায় খাঁকারি বাজলো, না ধমক, ঠাহর হলো না। নীলা লিজাকে বললো, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় আপনি টেলিফোন করেছিলেন। আমি কিন্তু ওঁকে সে-কথা বলেছিলাম।'

লিজা রোজা, দুজনেই, অবাক চোখে নালিশ নিয়ে আমার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, এবার একটু বেকায়দা। তাই আমার হাসিটা একটু লজ্জায় বিব্রত।

রোজা বললো নীলাকে, 'আমরা ভেবেছি, আপনি হয়তো ওঁকে বলতে ভুলে গেছেন।'

আমিই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না না, ওর ঠিক মনে ছিল, আমাকে বলেও ছিল।'

দু' বোনের চোখে বিস্ময় বাড়লো। দুজনে চোখাচোখি করলো। রোজা বললো, 'মা অবিশ্যি বলছিল, ও একটা বাউণ্ডুলে ছেলে, কতো মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে।'

আমি হেসে বললাম, 'না, মানে—'

তার আগেই রোজা হেসে আবার বলে উঠলো, 'মেরীর ধারণা, আপনি কোনো স্কুপ নিউজের জন্য এখানে এসেছেন, আমাদের কথা তাই মনে নেই। আর—'

আমি কিছু বলবার চেষ্টা করছিলাম। রোজার চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। ও লিজার দিকে একবার তাকাল। লিজা যেন ভয়ে ডেকে উঠলো, 'রোজা।'

রোজা সকলের দিকে চেয়ে, আবার আমার দিকে তাকালো। বললো, 'লিজার কথা অবিশ্যি আমরা বুঝি না। ও বলছিল, যে যত বেশি মিষ্টি—'

লিজা আর একবার ডেকে উঠলো, 'রোজা, কী হচ্ছে ?'

রোজা বললো, 'আচ্ছা সে কথাটা থাক। এ কথা তো বলেছিলি, উনি মুখ ফেরালেই পেছনের কথা সব ভুলে যান।'

রণোর রণরণে গলায় চাঁছা-ছোলা ইংরেজি শোনা গেল, 'একশো-ভাগ সত্যি কথা, আমি সমর্থন করি। এবার আপনি কী বলছিলেন মিস রোজা, বলুন, তারপরে আমি আরো বলব।'

রোজা ওর রুপোলী তারায় আমাকে একবার বিঁধিয়ে বললো, 'আমি বলেছি, লোকটি হেসে ভোলাতে পারে।'

রণো বেজে উঠলো, 'জবাব নেই, ওই যে দেখছেন, মিটি মিটি হাসছে, যেন

কতোই লজ্জায় পড়েছে, সব মিথ্যা। কেবল ভোলাবার তাল। ওকে আমি বহুকাল ধরে চিনি। মন বলে কিছু নেই, কিন্তু মন-ভোলানো কথা বলতে পারে।'

লিজা রণোর দিকে ফিরে বলে উঠলো, 'অশেষ ধন্যবাদ।'

রণোও বললো, 'আপনাকেও, আমি বুঝতে পেরেছি, ধূর্তটিকে আপনিও বোঝেন।'

লিজার মুখে এবার রঙের ছটা, চোখের কালো তারায় মেঘ উড়েছে, ঝিলিক দিচ্ছে। বললো, 'আপনার মতো না হলেও অনেকটা বুঝেছি। ওঁকেও সে কথা বলেছি।'

মনে মনে বলি, চমৎকার রণো। কোনো ব্যাপারেই তোমার জুড়ি মেলা ভার। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায়, গোয়ানিজদের সম্পর্কে কতো সমালোচনা, সাবধানী সতর্কীকরণ। এখন দেখছি, সুর তাল সবই ভিন্ পর্দায় বাজছে। কেবল যে রণো, তা না, সুরঞ্জনও। সতর্কতা তারও ছিল। তবে রণো বলে কথা। নতুন সুরে গাইলো, 'অবিশ্যি আগে আমি আপনাদের এতটা সরল সহৃদয় বলে, বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন দেখছি, আমার বন্ধুটি আপনাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে।'

আমি রণোর দিকে তাকালাম। রণো চোখের পাতা ছোট করে বললো, 'তোকে আমি চিনি না?'

বাবা, রণো চেনে না, চেনে কে? রোজা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি একটা টেলিফোন করলে আমরা খুব খুশি হতাম।'

রণোই আবার তাল দিল, 'করবে কোত্থেকে, সেই কাগজই তো হারিয়ে ফেলেছে।'

রোজা লিজা দু'বোনেই অবাক অবিশ্বাসে তাকালো। আমি লজ্জিত হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, সেই কাগজের টুকরোটা যে কোথায় রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না, তা না হলে তো—'

'টেলিফোন করতোই।' রণোর বাত। লিজা রণোর দিকে চেয়ে, যেন খুশি কৃতজ্ঞতায় হেসে উঠলো, 'ওঁর সে কথা মনেও ছিল?'

রণো বিড়ি হাতে নিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আপনাদের কথাই তো খালি ভাবত।'

তারপরে অনায়াসে চার ইঞ্চি লম্বা বিড়িটা ধরিয়ে বাংলায় বললো, 'ওই জন্যেই তো বলি, ওর হাসিমুখ দেখলে ভুলে যাই, এক এক সময় প্যাঁদাতে ইচ্ছে করে।'

লিজা হাসতে হাসতে পিছনে হেলে পড়লো। চুলের গোছা ছড়ানো ওর পিছনে। মনে মনে ভাবি, তোমার তুলনা তুমি হে রণো। অবিশ্যি এও জানি, সবই বন্ধু-প্রীতির আলোয় ঝলকানো। তবে, ক্ষ্যাপাকে সাঁকো নাড়াতে দিলে, পারাপার চলবে না।

রোজা বললো, 'যা-ই হোক, আমরা কিন্তু আপনাকে নিতে এসেছি, মা পাঠিয়ে দিয়েছে। ফ্রেড-এরও আজ ছুটি আছে।'

লিজা চকিতে একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'কিন্তু ওঁর যদি কোনো রকম অসুবিধা থাকে?'

আমি তাড়াতাড়ি একবার সুরঞ্জন আর নীলার দিকে দেখে বললাম, 'হ্যাঁ, আজ আমরা সবাই মিলে—'

নীলা ঠেক দিল, 'না না, তার কোনো দরকার নেই। আমরা যে-কোনো দিনই যেতে পারব। আপনি আজ এদের সঙ্গে যান। ক'দিন বাদেই তো কলকাতায় ফিরবেন।'

রণো প্রায় হুঙ্কার দিল, 'ওর ঘাড় যাবে।'

সুরঞ্জন বললো, 'হ্যাঁ, আজ ওদের সঙ্গেই যাও।'

একে বলে মানব-চরিত্র। এত ভয়, এত সন্দেহ, কোথায় গেল। দুটি মেয়ে এসে, সব উড়িয়ে নিয়ে গেল। চাক্ষুষের এই পরিণতি। আমি একবার লিজার দিকে তাকালাম। ও তাড়াতাড়ি আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। যেতে অসাধ অনিচ্ছা না। পাছে সুরঞ্জন নীলারা কিছু ভাবে, তা-ই একটু আড়ষ্ট বোধ করেছিলাম। রোজাকে বললাম, 'তাহলে ওঠা যাক।'

নীলা প্রায় ধমক দিয়ে বললো 'দাঁড়ান মশাই, আমার বাড়িতে এসে, চা না খেয়ে যাবেন নাকি?'

বলেই সে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

রণো বলে উঠলো, 'এখন যে ওর মন ছুটেছে।'

সবাই হেসে বাজলো। কিন্তু রণোর চোপা বাঁধব, সে ক্ষমতা আমার নেই।

সুরঞ্জনের এলাকা থেকে, লিজাদের বাড়ি দূরে। শহরের এক ঘিঞ্জি প্রান্তে। ট্রেনে গিয়ে, শহরে নেমে গেলেই, সাধারণ ভাবে যাওয়া সহজ। সুরঞ্জন ওর গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়ে দিল। রোজা আগের থেকেই সামনে গিয়ে বসে ছিল।

আমি ওকে পেছনে এসে বসতে বলেছিলাম। ও জবাব দিয়েছিল, 'আমি সামনে বসতে ভালোবাসি।'

সমুদ্রের বুকে ছিটকে যাওয়া একটা ফালি ডাঙা। তার নাম বোম্বাই নগরী। যতো শেষের দিকে যায়, ততো সমুদ্রের ধার ঘেঁষে রাস্তা। বালির চরে ঘর বাঁধা যায় না। এ ডাঙা পাথর মাটি বালি দিয়ে প্রকৃতির হাতে গড়া। উঁচুতে নিচুতে চলে। তার সঙ্গে মানুষের হাত পড়েছে, সমুদ্রকে তালে তালে রাখা।

সমুদ্রের দিকেই চেয়ে ছিলাম। আরব সাগর নাম। কাছে শান্ত, দূরে ফেনিলোচ্ছল রূপোলী হাসি। বাতাস ছুটোছুটি, তার সঙ্গে লিজার শাড়ি আর চুল। এক সময়ে হঠাৎ মনে হলো, লিজা তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার তৎক্ষণাৎ আমার দিকে দেখলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ?'

লিজা আবার মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও বললো, 'আমাকে 'আপনি' করে বলছিলেন কেন ?'

আগে কি ওকে আমি 'তুমি' বলেছি ? মনে করতে পারি না। হয়তো বলব বলে কথা দিয়েছিলাম।

লিজা আবার বললো, 'বেশি ভদ্রতা করলে, এড়িয়ে যাবার কথা মনে আসে।'

হেসে, আন্তরিক ভাবেই বললাম, 'এড়িয়ে যাব কেন ?'

'তবে কি বিরক্ত ?'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকালো। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। আমি বললাম, 'একেবারেই না।'

বলে আমি ওর কপালের রক্তসূর্য টিপটার দিকে তাকালাম। তারপরে ওর মুখ আর সমস্ত শরীরটার দিকে। শাড়ির রঙে জামা। মুখে যা-ই বলি, মন আর চোখের মুগ্ধতাকে ফাঁকি দিই কেমন করে। ট্রেনে ওকে যে-পোশাকে দেখে ছিলাম, তাতে খারাপ লাগেনি। কিন্তু দৃষ্টিকে এমন মুগ্ধ করতে পারেনি। লিজা নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, 'কী ?'

আমি অকপট মুগ্ধতায় বললাম, 'খুব সুন্দর লাগছে।'

লিজা চোখের পাতা নামিয়ে বলে উঠলো, 'উহু, ভগবান।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

লিজার নীচু স্বর শোনা গেল, 'এ যে বড় মিথ্যা কথা।'

বললাম, 'একটুও না।'

লিজা মুখ তুললো। ওর চোখকে বিশ্বাস নেই। আমার ডান দিকের সমুদ্রের ছায়া ওর চোখে। বললো, 'কাছে এলাম বলে, না?'

বললাম, 'না। এ বেশে তোমাকে যেখানেই দেখতাম, ভালো লাগত।'

'কী করে বিশ্বাস করব?'

লিজা সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালো। বাতাসে ওর গলা শোনা গেল, 'কোনো কথা শোনা দূরের কথা, টেলিফোনটার দিকে চেয়ে চেয়ে—'

লিজার গলা বাতাসেই হারিয়ে গেল। চিবুকের নীচে ওর শ্যামস্নিগ্ধ গলাটা যেন কাঁপছে। এইটুকুকেই আমার ভয়। আমি জানি, লিজার চোখ এখন সমুদ্র। ওকে কয়েক মুহূর্ত সময় দিলাম। তারপরে ডাকলাম 'লিজা!'

লিজা ফিরলো না। আঁচল উঠল ওর চোখে। ব্যাগটা পড়ে আছে গাড়ির আসনের ওপর। আরো একটু পরে লিজা ফিরে তাকালো। আর সে সময়েই, রোজার গলা শোনা গেল, 'আমি আর থাকতে পারছি না!'

চেয়ে দেখি, ও এদিকে চেয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

হাত বাড়িয়ে বললো, 'দিন।'

অবাক হয়ে তাকালাম। লিজার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো। লিজা আমার দিকে চেয়ে, ভেজা হাসি হাসলো। আর চকিতে আমার মনে পড়ে যেতেই, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করে রোজার হাতে দিলাম। রোজা সেটা নিয়ে বললো, 'সেই কখন থেকে আপনাদের খাওয়া দেখছি।'

'সত্যি আমার খেয়ালই ছিল না।'

রোজা ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে বললো, 'আপনার তো কোনো খেয়ালই থাকে আপনার বন্ধু রণোবাবু আপনাকে ঠিক চেনে।'

লিজা বলে উঠলো, 'সত্যি।'

বলে ও আমার দিকে তাকালো। গাড়ি সমুদ্রের ধার ছেড়ে, ঠাসা-ঠাসি ইমারতের সীমানায় ঢুকছে।

সারাটা দিন কাটল যেন একটা চড়ুইভাতির উৎসবে। ফ্রেডকে খুব ভালো লাগলো। একটু যেন সংশয়ই ছিল, সে আবার আমাকে কী ভাবে নেবে। কিন্তু সে একটি হাসি-খুশি যুবক। মুখটা অনেকটা রোজার মতোই। বম্বেতে এসে, বিল

বেশ মেজাজে আছে। কেবল ঠাকরুণেরই যতো বকাবকি, ঝকাঝকি। আমাকে তো মারতে বাকী রেখেছেন। দেখা হতেই খালি এক কথা, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই পাজী ছেলে। ভালোবাসার কোনো দাম নেই তোমার কাছে। আমাদের একদিন মনেও পড়লো না?'

মনে মনে খুবই খুশি হয়েছেন। আমরা সবাই মিলে গল্প করলাম, রেকর্ডের গান শুনলাম। কেবল লিজার দেখাই কম পাওয়া গেল। ও রান্নার কাজে ব্যস্ত। ঠাকরুণ কতবার বললেন, শাড়িটা ছাড়তে। লিজার তাতে ঘোর আপত্তি। মেরী জোর করে এ্যাপ্রনটা বেঁধে দিয়েছিল।

রোজার বন্ধু, রিজ্ নামে একটি যুবকও এসেছে। ভাবতেই ভাব বোঝা যায়। রিজ্ যে ওর আঁতের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায়। রিজ্ আর রোজা, রেকর্ড বাজিয়ে নাচলো। ফ্রেড নাচলো মেরীর সঙ্গে। লিজা এসে দু'বার তাল দিয়ে গেল, রিজ্ আর ফ্রেডের সঙ্গে। তাকিয়ে হাসল আমার দিকে। আর ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বঙ্গসন্তানটি মুগ্ধচোখে দেখলো। সব থেকে বেশি দেখলো ঠাকরুণকে, যিনি, মুখে সিগারেট দিয়ে, পা ঠুকে ঠুকে তাল দিয়ে, গানের সঙ্গে গুণ গুণ করছিলেন। তারপরে এক সময়ে আমার কাছে এসে বললেন, 'নাচতে পারতো বটে সেই বুড়োমানুষটি, ফ্রেডের বাবার কথা বলছি। আমরা সারা রাত নেচেছি। এরা তো একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে।'

বলতে বলতেই ঠাকরুণের নিশ্বাস পড়ে। এবার শোনো বাত, মন যায় কোথা থেকে কোথায়। আবার বললেন, 'কী জানি, কী করছে একলা একলা।'

ঠাকরুণের চোখে অন্যমনস্কতা। মন গিয়েছে সমুদ্রের আর এক কূলে, গোয়ার এক গৃহের অঙ্গনে। বয়স কী কথা হে, এবে নারী পতি স্মরণ করেন।...

খাদ্য পরিবেশন হলো প্রচুর। নিরামিষ ব্যঞ্জনের সঙ্গে, চারপেয়ে পশু আর দু'পেয়ে পাখির মাংস তো ছিলই। কিন্তু একটি পাত্রের দিকে চেয়ে, আর চোখ ফেরাতে পারি না। কোথা থেকে এলো এমন নয়ন ভোলানো। নয়ন থেকেই যে জিভে সংবাদ যায়। এও কি সম্ভব, ইলিশমাছের ঝাল দেখছি আমি। চোখ তুলে লিজার দিকে তাকাতেই, ওর শ্যাম-চিকন মুখে ছটা লেগে গেল। আমার এই বিস্ময়টা রোজা মেরীও উপভোগ করলো। মেরী বললো, 'লিজা রেঁধেছে।'

আমার চোখের ওপর থেকে লিজাকে মুখ ফেরাতে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কি ইলিশমাছ পাওয়া যায় নাকি?'

মেরী বললো, 'যায়। কেন, আপনার বাঙালী বন্ধুর বাড়ি খাননি?'

বললাম, 'না, সে সৌভাগ্য তো হয়নি।'

রোজা বললো, 'তবে, ওই ডিসটা একান্তই আপনার।'

হেসে বললাম, 'তার কারণ, আমি তো একটা কুমীর।'

রোজা হেসে বললো, 'অবিশ্যি লিজাও ভাগ বসাবে।'

সেটাই যা রক্ষে, মিথ্যা ভাষণে নেই, বাঙালী ঝাল হয়নি। নুন কম, মিষ্টি বেশি, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টাটা টের পাওয়া যায়। ইলিশ খাবার সময় লিজা তাকিয়ে ছিল। বললাম, 'বেশ ভালো।'

লিজা বাঙালী মেয়েদের মতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললো, 'মোটেই পারিনি। মিথ্যা কথা।'

'এমন অনেক বাঙালী মেমসাহেবও পারে না।'

লিজা বললো, 'আমি তো আর মেমসাহেব নই, আমি ভারতবর্ষের একটা মেয়ে।'

কিন্তু লিজা না খেতে বসে, পরিবেশনেই ব্যস্ত। আমি শুধু দেখলাম, ওর দিকে চেয়ে, রিজ্ আর রোজার, মেরী আর ফ্রেন্ডদের চোখাচোখি, হাসাহাসি। লিজার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। রাঁধুনির খাইয়েই সুখ।

বিকালে বিদায়ের আগে, ঠাকরুণের কাছে, প্রায় দিব্যি গালতে হলো, বম্বে ত্যাগের আগে, আবার আসব। এবার লিজা একলা আমাকে এগিয়ে দিতে এলো। রিজ্‌কে ছেড়ে রোজা এখন বেরোবে না। সুরঞ্জনের গাড়িটা আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাস্তায় এসে লিজা জিজ্ঞেস করলো, 'বন্ধুর বাড়িতে এখনই ফিরে যাবার দরকার আছে?'

বললাম, 'না।'

'তবে একসঙ্গে একটু বেড়াই।'

'চলো।'

আমার পথ জানা নেই। লিজার পথেই চলি। একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে, লিজা নিয়ে এলো, নারকেলের ঘন নিকুঞ্জ সমুদ্রধারে। অচেনা নতুন তীর। মানুষের ভিড় কম।

কথা আমরা বেশি বলতে পারলাম না। সন্ধ্যের মুখে, লিজার চোখে যেন

কেমন এক অপ্রস্তুত হাসি মাখানো ঝিলিক। কী যেন বলতে চায়। কয়েকবার জিজ্ঞাসার পরে বললো, 'ট্রেনে আপনার একটা কথা শুনে, হঠাৎ চোখে জল এসে গেছল, প্রথমবার। সেই কথাটা বলব।'

মনে আছে, একজন বাঙালীকে বিয়ে করে, কলকাতায় ঘর-সংসার পাতার কথা বলেছিলাম। তখনই ওকে প্রথম ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। ওর কাছ থেকে শুনলাম, একটি বাঙালী ছেলেকে ও ভালোবেসে ছিল। হিমাদ্রি তার নাম। ওর বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই জানতো, হিমাদ্রির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। ওর দাদা-বৌদিও তা-ই জানতো। এমন কি ওদের সমস্ত পরিবার। আপত্তি সকলেরই ছিল। বিশেষ করে মায়ের। হিমাদ্রিও চেয়েছিল ওকে বিয়ে করতে।

এম. এ. পাশ করার পরে, হিমাদ্রি আইন পড়া শুরু করেছিল। রাজনীতি সে বরাবরই করেছে। আইন পড়ার সময়, বেশি মেতেছিল। সেই সময় থেকেই, লিজার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। লিজা যতো কাছে যেতে চেষ্টা করেছে, হিমাদ্রি ততো সরেছে। তারপরে হিমাদ্রির সরে যাওয়াটা যখন বড় বেশি স্পষ্ট আর রূঢ় হয়ে উঠতে লাগলো, তখন ও হিমাদ্রিকে বলেছিল, কেন সে এমন করে সরে যাচ্ছে? হিমাদ্রি জানিয়েছিল, তার জীবনের সঙ্গে, লিজার জীবনের অনেক তফাত। হিমাদ্রির জীবন উৎসর্গ বিপ্লবের জন্য। লিজা সেখানে নেই।

লিজার প্রশ্ন, কেন নেই? লিজার জীবনও কি বিপ্লবে উৎসর্গ করা যায় না? না, হিমাদ্রির তা-ই বিশ্বাস। সোজা বুঝতে পেরেছিল, হিমাদ্রি সত্য বলছে না। ভারতের বিপ্লবে লিজা থাকবে না কেন? হিমাদ্রির এমন বিচিত্র উদ্ভট বিশ্বাস কেন? লিজার নিজের ভাষা, 'আমি আর হিমাদ্রিকে জোর করিনি। কারণ তারপরে জোরটা বড় অপমানের। কিন্তু চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেছল। হিমাদ্রিকে আমার পক্ষে কোনো দিনই ভোলা সম্ভব না। আসলে ওর মধ্যে একটা অন্য বাঙালী সত্তা দেখেছিলাম বলেই, অল্প বয়স থেকে, ওর দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারিনি।...তবে হিমাদ্রিকে আমি ভুলব না কোনো দিনই। ওর ছেড়ে যাওয়াটাই, জীবন সম্পর্কে আমাকে অনেক বুঝতে শিখিয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

শুনতে শুনতে, লিজা-হিমাদ্রিতেই ডুবেছিলাম। চমকে উঠে বললাম, 'বল।'

'আমি কি সত্যি রাজনীতিতে বাধা?'

'ভারতের কোনো রাজনীতিতেই তুমি বাধা হতে পারো বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

লিজা হাসলো, সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালো। বিষণ্ণতা ওর চোখে নেই, কিন্তু ব্যথা ধরা একটা হাসির ঝিলিক আছে। সন্ধ্যারাত্রের দূরের সমুদ্রের মতো, যেখানে গভীর জলাশয়, দুরন্তে দোলে না, কেবল আকাশে মেশে। আমি হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেসা করলাম, 'লিজা, আমাকে এ কথা কেন বললে ?'

লিজা মুখ ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালো। যেন কিছু দেখলো। আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে বললো, 'জানি না। লজ্জা করছে, তবু বলি, নির্লজ্জের মতো প্রথম দিনই বলতে ইচ্ছা করেছিল। কেন, তা আমি জানি না।'

আমি সহসা আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। আমিও সমুদ্রের দূরে তাকালাম। সেখানেও যেন এই মুহূর্তে আমি লিজাকেই দেখতে পেলাম। আপাতঃ-দৃষ্টিতে, এই ভারত-পর্তুগীজ মেশানো মেয়েটিকে দেখলে, ওর পোশাক, চেহারা, বেশবাস, ভাবভঙ্গি, মনে হবে, নিতান্ত মন-রাঙানো, হাল্‌কা একটি মেয়ে। এমন কি, ওর কোনো কোনো কথাও। কিন্তু আমি যেন অনুভব করছি, তার কিছু বেশি না, অনেক কিছু বেশি। ওর মতো একটি রূপসী যুবতী ইংরেজি জানা গোয়ানিজ মেয়ে, স্বাভাবিক ভাবেই, হেসে রঙ্গ করে, জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। যে-জগৎটা আমাদের অচেনা না। কিন্তু লিজা সেই জগতে নেই। ওর ভিতরে কোথাও একটা গভীর সমস্যা আছে। আপাততঃ সে-সমস্যা ব্যক্তিগত হলেও, তা সমাজের এবং দেশের প্রশ্নে জড়িত। কারণ, বারে বারে একটি কথা বলেছে, ও 'ভারতের মেয়ে'। এ অনুভূতিটাই সম্ভবতঃ লিজার সকল সমস্যার মূলে। বাংলা ভাষায় কথা বলা বা তার চর্চাটা নিতান্ত একটা প্রাদেশিক ভাষার প্রতি আকর্ষণ বলেই না। বোধ হয়, আরো গভীর কিছুর সঙ্গে জড়িত ওর হিমাদ্রিকে বিবাহ করতে চাওয়া।

হঠাৎ মনে হলো, আমার চোখের সামনে অন্য কিছু। তাকিয়ে দেখি, লিজার দুটি চোখ। ও অনায়াসে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?'

লিজার সম্বোধনটা এত স্বাভাবিক মনে হলো, কোথাও একটুকু ধাক্কা লাগলো না। বললাম, 'আমার জানতে ইচ্ছা করলো। আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি হিমাদ্রিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে কেন ?'

লিজা যেন অবাক হলো, বললো, 'হিমাদ্রিকে আমি ভালোবেসে ছিলাম।'

অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় আমি লিজার চোখের দিকে চেয়ে ছিলাম। লিজাও। এক মুহূর্ত পরেই লিজার চোখে যেন চকিত ঝলক হানলো। বললো,

'আমি জানি, তুমি কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলে। তবে বলি শোনো, পুরুষের রূপ গুণ বলতে যা বোঝায়, হিমাদ্রির সবই ছিল। একটি মেয়ে হিসাবে তাকে ভালোবাসাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বোধ হয় আরো বেশি কিছু চেয়েছিলাম। হিমাদ্রিদের পরিবারে, ওর মা, বৌদি, সবাইকে দেখে আমার মনে হতো, সেই জীবনের ওপর আমার কেমন একটা আকর্ষণ। ভেব না যেন, তাঁদের দেব-দেবী ব্রত পূজা, এ সবের ওপর আমার কোনো মোহ ছিল। ভারতবর্ষ কেবল দেব-দেবী ব্রত পূজা দিয়েই ভরা নয়। ওটা যেন একটা খোলশ, বাইরের ব্যাপার। আরো ভেতরে কিছু আছে। হিমাদ্রিকে বিয়ে করে আমি সেই আরো কিছুর তল্লাসে যেতে চেয়েছিলাম।'

লিজা এমন ভাবে থামলো, যেন ও আরো কিছু বলতে চাইছিল, বললো না। মাথা নীচু করে যেন একটু হাসলো, আবার বললো, 'হিমাদ্রি বলতো, আমার কথা নাকি ও সব বুঝতে পারে না, ধারণা, আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা আছে। পরে অবিশ্যি ও, ওদের স্বজাতি এক ধনী অ্যাডভোকেটের মেয়েকে বিয়ে করেছে, তবে বিপ্লবের রাস্তা থেকে নাকি সরে আসেনি! ও যা-ই করুক, আমাকে বিয়ে করলে, ভালো হতো না ঠিকই। ওর মা বৌদির ওপর আমার যে আকর্ষণ, সেটা তাঁদের বিশ্বাস, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা। আমি কিন্তু ঠিক ভারতবর্ষের কোনো হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের ঘোমটা ঢাকা বৌ হতে চাইনি।'

লিজা যেন অস্বস্তিতে একটু হাসলো, বললো, 'আমি বোধ হয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি সন্ন্যাসিনী হতে চাইনি, সেটা পরিষ্কার, কিন্তু আমি আমার দেশকে জানতে চাই, বুঝতে চাই। সেটা খুব সহজ কাজ না। কেবল বই পড়ে তা সম্ভব না, কেন না, কেবলি মনে হয়, কোথায় কোন্ দূরের ওপারে রহস্যের মতো একটা কিছু আছে। না না, আমি ঘরে থাকতে চাই না, আমি আমি—'

লিজা কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো। হাসলো, যেন স্বপ্নের ঘোরে, ফিস ফিস করে বললো, 'আমিও প্রয়াগের মেলায় যাব, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে মেশে।'

এই মুহূর্তে যেন আমিও একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেলাম। সহসা মনে হলো, আমার ভিতরের ভাষা, সুর ও স্বরের সঙ্গে কোথায় যেন লিজা একাকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হলো, আমার মন যেমন নাচে, 'মন চল যাই ভ্রমণে'র সুরে আর তালে, সেই সুর আর তাল যেন, লিজার ভিতরেও বাজছে। হাতের

স্পর্শে ফিরে তাকালাম। লিজা আমার একটা হাতের ওপরে, ওর হাত রেখেছে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছ?'

বললাম, 'মনে হয়। কিন্তু লিজা, তোমার পক্ষে এটা সুখ বা স্বস্তি, কোনোটাই নিয়ে আসবে না।' লিজা আমার হাতটা যেন আর একটু জোরে ধরলো। বললো, 'কিন্তু দুঃখের মধ্যেও কোথাও একটা সুখ আছে। সেই দুঃখটা ভোগ করার শক্তি আমার আছে।'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকালো, ঝুঁকে এলো কাছে। সমুদ্রে তরঙ্গ ভাঙছে, নারকেলের পাতায় পাতায় ঝাপটা ঝিরিঝিরি। লিজা বললো, 'কিন্তু সেই সুখ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না। তুমি আমাকে কথা দাও।'

লিজার কথায় যেন রহস্য। কিন্তু আমার বুকের তালে বেতাল। বললাম, 'বল?'

'যেখানেই থাক, আমাকে ত্যাগ করো না। আমি জানি, তোমাকে নিয়ে ঘর করা যায় না, আমি এমন উদ্ভট চিন্তাও করি না, চাইও না। যোগাযোগ রেখো। যদি কখনো ছুটে যাই, যেন দেখা পাই।'

আমি কথা বলতে পারি না, কেবল ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ও আবার বললো, 'আমার কথা বুঝতে পারছ না, এমন একটা ভাব করো না। আমি তোমাকে নিতান্ত মেয়ে-পুরুষের মিলের কথা বলছি না। কিন্তু তোমাকে আমি চিনি, বুঝি, তুমি আমাকে বুঝবে, শুধু এই কারণে।'

বললাম, 'তোমার যদি শ্রেয়ঃ মনে হয়, তবে তাই হবে।'

লিজা হঠাৎ অবাক হয়ে, পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। ও হাসতে হাসতে ভেঙে পড়লো ঘাসের ওপর, আমার একটা হাতের ওপরে মুখ চাপলো। একটু পরে হাসির শব্দ বন্ধ হলো। কিন্তু টের পেলাম, আমার হাতে, উষ্ণ জলের ফোঁটা পড়ছে। আমি ডাকলাম, 'লিজা।'

লিজা উঠলো, চোখ মুছলো, কিন্তু হাসিমুখেই বললো, 'কি মিথ্যুক তুমি। আমি যা শ্রেয়ঃ মনে করবো, তুমি বুঝি তা-ই মানবে? তুমি মিথ্যুক, কপট, নিষ্ঠুর। তবু, তোমার কথাটাকেই মাথায় করে রাখলাম।'

তারপরে যে কয়দিন এই নগরীতে রইলাম, প্রায় প্রতিদিন বিকালটা কাটলো লিজারই সঙ্গে, নানান্ নিরালা সাগরকূলে। চলে যাবার আগের দিন, লিজা

জানালো ও আমার সঙ্গে ইষ্টিশনে দেখা করতে আসবে না। তাই মাউণ্ট মেরীর নীচে, সমুদ্রের ধারে, ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

ফিরে আসবার কয়েক দিন আগেই, রণো বলেছিল, কৃষ্ণটা জ্বরে ভুগছে। আসবার আগের রাত্রে রণো বললো আমাকে, 'আমি জানি না, কেষ্টটা বাঁচবে কী না। খালি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাইছে। তুই কি ওকে নিয়ে যাবি ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমি ?'

রণো করুণ ভাবে অনুরোধ করলো, 'টাকা-পয়সা সব তোকে আমি দেব। কোনো রকমে যদি হাসপাতালে দিয়ে দিতে পারিস। বেঁচে উঠলে না হয় বাংলাদেশ দেখবে।'

এই সেই রণো। বজ্রের হুংকার ছাড়া যে কথা বলে না, তার চোখও যেন কেমন রঙ বদলায়। ও পকেট থেকে টাকা বের করলো। আমি হাত দিয়ে ঠেলে বললাম, 'থাক। তুই ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে যাস, তাহলেই হবে।'

মনে মনে ভাবলাম, ফেরার যাত্রাটা কৃষ্ণ নিয়ে 'মন চল যাই ভ্রমণে, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।' কৃষ্ণ-ই আমার সঙ্গে।

পরের দিন কৃষ্ণকে রণো গাড়িতে তুলে দিল। কৃষ্ণর কালো মুখটা ফ্যাকাশে, ডাগর চোখ দুটো হলুদবর্ণ। কিন্তু আমাকে দেখে যখন হাসলো, দেখলাম, হাসিটা তেমনি আছে। অনেকেই তুলে দিতে এসেছিল, সুরঞ্জন, নীলা, বিধান, বিমান। কৃষ্ণ আমার সহযাত্রী, এটা অনেকেরই বোধ হয় ভাল লাগলো না।

গাড়ি ছাড়বার কয়েক মিনিট আগে লিজা এলো। অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি তো আসবে না বলেছিলে।'

'পারলাম না থাকতে।'

বন্ধুদের সামনে আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। লিজা বললো, 'আমি গাড়ির ভিতরে বসছি। তুমি কথা বলে এস।'

আমি গাড়ির মধ্যে গেলাম। ভাবলাম, লিজা কিছু বলবে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। বললাম, 'কিছু বলবে ?'

লিজা যেন অবাক হয়ে বললো, 'না তো। গাড়ি ছাড়বার সময় হলেই চলে যাব। একটু দেখতে এলাম।'

আমি আবার বাইরের দিকে তাকাতে গিয়ে, কৃষ্ণর দিকে চোখ পড়লো। কৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে হাসলো। জ্বরের জন্যই বোধ হয় চোখ দুটো ছলছল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলছ কৃষ্ণ ?'

কৃষ্ণ ঘাড় নেড়ে হাসলো। লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কে ?'

বললাম, 'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

লিজাকে কৃষ্ণর কথা বললাম। লিজা কৃষ্ণর দিকে দেখে, আমার দিকে তাকালো। দেখলাম, ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মুখে হাসি। বলে উঠলো, 'আমাকেও কি তুমি এমন করে নিয়ে যেতে?'

বললাম, 'তুমি তো কৃষ্ণ নও, তোমাকে এমন করে নিয়ে যেতে হবে কেন?'

লিজার চোখ জলে চিক চিক করে উঠলো, অস্পষ্ট গলায় বললো, 'জানি।'

গাড়ি দুলে উঠলো। লিজা আমার হাত চেপে ধরলো। বললো, 'আসলে এই যে কৃষ্ণকে নিয়ে তুমি যাচ্ছ, তোমার মধ্যে এই মানুষ-টাকেই দেখতে আর বুঝতে চেয়েছি।'

কৃষ্ণর মাথায় একবার হাত দিয়ে লিজা নেমে গেল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ মুহূর্তে লিজা এসে, বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়-পর্বটা জমলো না। লিজা তাকিয়ে রইলো। ওর চোখে জল। ফিরে দেখি, কৃষ্ণর চোখ দুটো জলে ভাসছে।

এই প্রথম অনুভব করলাম, আমার চোখ দুটোও যেন টন টন করে উঠলো। দৃষ্টি ঝাপসা, লবণাক্ত স্বাদ আমার জিভে।

নারী ত্রৈলোক্যজননী নারী ত্রৈলোক্যরূপিণী
নারী ত্রিভুবনধারা নারী দেহস্বরূপিণী ॥

পঞ্চাশন্মাতৃকা যা সা যুবতী পরিণীয়তে।
যুবতীরহিতং দেবি কুতো বিদ্যা মন্থঃ।
নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম প্রধানা যুবতীগণাঃ ॥

বৈরাগ্যের মধ্যেও বীরত্ব নাকি আছে, সন্ন্যাসে কঠিন ব্রহ্মচর্য। এর কোনোটাই আমার মধ্যে নেই। আর এ কথা হলপ করে বলতে পারি, গোটা সংসারসহ দারাপুত্র পরিবার নিয়ে, যাকে বলে দেশে ভ্রমণ, রামোঃ রামোঃ। অমন একটি জবরদস্ত মরদ মিনসে হতে পারলে, কতো না সোহাগ ভোগ করতে পেতাম। কপালে নেই, হবেটা কী। অমন ভ্রমণের কথা শুনলেই গায়ে, কম্প দিয়ে জ্বর আসে। তবু চোখের সামনেই ও রকম কতো দেখতে পাই। হৈ হৈ রৈ রৈ করে, গিন্নির হাত ধরে, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, ষেটের কোলে আধডজনটাক কাঁখে কোলে কাঁধে নিয়ে, কেমন গোটা দেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন না কি যে, কেবল হাসিটা নিয়ে বেরিয়েছে, ঘরে কুলুপ দিয়ে রেখে এসেছে যতো ঝগড়া বিবাদ কান্না। না, মোটেও তা না। হাসি ঝগড়া বিবাদ কান্না, সব কিছু নিয়েই যাত্রা। তার মধ্যে খাই খাই, নাই নাই আছে, প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ থেকে নেই কী। সব মিলিয়ে মনে হবে, কেবল ভ্রমণ না, একটি ভ্রমণ যজ্ঞি। দেখে-শুনে, ইচ্ছা করে কর্তাটিকে গড় করে বলি, 'মহাদেব মা দুগ্‌গাকে নিয়ে, জোড়া জোড়া ছেলেমেয়ে নিয়ে, এমন আর কী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দেবতা

বলে কথা, ওঁর কতো মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক জানা আছে, চলতে ফিরতে কষ্ট নেই। কিন্তু হে ভ্রমণপিয়াসীরা, আপনাকে প্রণাম। আপনার ক্ষমতাকে নমস্কার।'…

বেশী বলতে চাই না, ট্যুরিস্ট বিভাগ, না কী সব আছে, ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়াই যাঁদের কাজ, তাঁরা বলতে পারেন, কারবারে ঘা দিচ্ছি। সেদিকে আমার মোটেই নজর নেই। যা কিছু বলতে চাই, সব কিছুর মূলে নিজের ক্ষুদ্রত্ব। ছোটখাটো কথা। আমার বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্যের মধ্যে যে বীরত্ব আছে, তা তো আদপেই নেই। সন্ন্যাসের কথা জীবনে কোনোদিন চিন্তায় আসেনি। আসেনি একেবারে বলতে পারবো না। সংসারকে যখন যমের দুয়ার বলে মনে হয়েছে, তখন সন্ন্যাসী হবার মতলব মাথায় এসেছে। কিন্তু জানতাম তথাপি যমে ছাড়বে না। কেন না, দায় আছে সব কিছুরই। সন্ন্যাসী হওয়া যে মুখের কথা না, তার প্রমাণ, 'মাছি করে রাখলি শ্যামা/মৌমাছি তো করলি নে মা।'… ব্রহ্মচর্য কাকে বলে, তাই জানলাম না কস্মিনকালে, তায় আবার সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রহ্মচর্য। বলতে পারি ক্ষ্যামা দে মা।

জীবনে সন্ন্যাসী অবিশ্যি অনেক দেখেছি, গাজন নষ্ট হতেও কম দেখিনি। তাদের কথায় আমি নেই। পাড়ায় বেপাড়ায় তো তাদের অনেক দেখেছি। তাদের করুণা করি না, এমন কি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও না। মনটা টাটায়। বেচারিদের কমণ্ডলুর জল নিতান্তই তৃষ্ণার পানীয়, ঝোলাটা ভিক্ষের। কালি পড়া চোখের দিকে তাকিয়ে, ইচ্ছা করে, মানুষটিকে পেট ভরে খাওয়াই। সমাজ-সংসারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, কী দুর্ভোগ না বেচারিকে ভুগতে হচ্ছে। সেই এক সাধকের বাণীকেই, এদের ক্ষেত্রে উল্‌টা খাতে চালান করা যায়।

অরমান্ বহুত্ রখ্‌তে থে হম দিলকে চমন মেঁ।
বৈঠে ন খুশীসে কভু সাথে কে তলে হম॥

'আমার হৃদয়ের বাগানে অনেক সুখ বাসনা ছিল। কিন্তু আমি কখনো মনের সুখে গাছের ছায়ায় বসিনি।' সাধকের গাছের ছায়ায় বসাটা নিশ্চয়ই প্রতীকী, সে প্রতীক তাঁর সিদ্ধিলাভের। আমি যে সন্ন্যাসীদের কথা বলছি, তাদের গাছের ছায়া আসলে, সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

এ মুহূর্তেই একটি যুবকের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মফঃস্বল শহরে, যে-পাড়াতে ওর বাস, জীবিকা তাদের শূকর পালন। যুবকটি বেঁটে-খাটোর ওপর দেখতে শুনতে মন্দ না। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। এক বিকেলে মমালয়ে, যাকে বলে আঙিনায় বসে, নারী পুরুষ

মিলে, অলস গল্পে কাল কাটাচ্ছি। এমন সময়ে সেই যুবকের আবির্ভাব। হেতু, তার একটি আর্জি আছে, সে রূপালী পর্দায় আবির্ভূত হতে চায়। এমন কতো আর্জি যে জীবনে শুনতে হয়েছে, আমার সে দুঃখের কিস্যাকাহিনী আপাতত তোলা থাক। আমার অপরাধ হয়েছিল, সেই যুবককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি করো ভাই?'

যুবক ত্রিভঙ্গ হয়ে, অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতে হেসে বলেছিল, 'নাচি।'

'নাচো?'

আমার অবাক জিজ্ঞাসা শেষ হবার আগেই, সে বলে উঠেছিল, 'দেখবেন?' বলেই, ধাই তিনা তিন নাচ আরম্ভ করে দিয়েছিল। কোমর বাঁকিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে, চোখের কটাক্ষে হেসে, অবলীলাক্রমে সে এমন নাচ শুরু করেছিল, আমি প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে সকলের স্ফূর্তির হাস্যে, আমি স বিৎ ফিরে পেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, ঘটনাটা কী ঘটছে। সকলের লুটিয়ে পড়া হাসিতে, আমার হাসির অনুভূতিটিও সংক্রামিত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু আমাকে কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই, নর্তককে বলতে হয়েছিল, 'বুঝেছি, থামো। এখন কী করো?'

'আজ্ঞে রিক্‌শা (সাইকেল) চলাই।'

তাকে আমি বৃথাই কিছুটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, ফিলিম-টিলিমে এ ধরনের নাচের বিশেষ কদর হবে না। কিন্তু আমি বলতে পারি, মানামানিটা আমার হাতে নেই। সেও মানেনি। বরং সংসারের দুঃখের কথা শুনিয়েছিল, তারও কারণ, একবার রূপালী পর্দায় আবির্ভূত হতে পারলেই হয়, সব দুঃখের যাতনা রাতারাতি ঘুচে যাবে। অতএব, আমার একমাত্র বলার বাকী ছিল, 'আচ্ছা দেখবো।'

কী যে দেখবো, তা আমিই জানতাম। বলবার কিছু ছিল না, তাই বাড়িতে থেকেই বলতে হতো, আমি বাড়ি নেই। তারপরে বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন রাস্তায় মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো এক নবীন সন্ন্যাসী। কৃষ্ণকালো দাড়িগোঁফে চেনা দায়। তার ওপরে গেরুয়া লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। সেই রঙের চাদর ঝোলানো গলায়। পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো দৃষ্টিটা চেনা-চেনা। সন্ন্যাসী বললো, 'জয় গুরু! ভালো আছেন দাদা? আমি আপনাদের সেই কটিক, মানে খাঁদন!'

বটে! একেই বোধ হয় কলির লীলা বলে। খাঁদন সেই নর্তক। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখন সাধু হয়েছ নাকি—মানে দীক্ষা-টীক্ষা নিয়েছ বুঝি?'

খাঁদন খুব সরল ভাবে হেসে বললো, 'না দাদা, ওসব কিছু না। বে-থা করিনি। বড় হয়ে বোনটা নিজেই নিজের পথ দেখেছে। রিকশা-টিকশা চালাতে আর ভালো লাগলো না। সেই কথায় বলে না, পেটে ভাত নেই, ইয়েতে সিঁদুর? আপনাকে আর লাইনের কথা কী বলবো। মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, ও সব আর ভালো লাগছিল না। তাই ধরাচূড়া পরে বেরিয়ে পড়েছি। লোকে নেহাত ভিখিরি ভাবে না, এই যা। একটা পেট কোনো রকমে চলে যাচ্ছে।'

শুনে কেমন কষ্ট হলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, নবীন সন্ন্যাসী খাঁদনের চোখের কোল বসা, মুখটি ম্লান শুকনো। ওকে বাড়িতে দেখা করতে বলে চলে গেলাম।

খাঁদন সেই থেকে মাঝে মাঝে, এখনো আসে। বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ায় বেশি। ও এলে, যখন যা পারি, দিই। অবিশ্যিই নগদ অর্থে। তাছাড়া, খাওয়ানোটাও আছে।

এ তো না হয় গেল খাঁদন সন্ন্যাসীদের কথা। রাজা সন্ন্যাসীও কম দেখিনি। যাদের দেখলে চোখ ঘুরিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, 'মন না রাঙায়ে, বসন রাঙায়ে, কী ভুল করিলি যোগী।'…তবে ওই ইচ্ছা পর্যন্তই সার। আমার এমন মুরোদ নেই, বসন রাঙানো রাজা সন্ন্যাসীদের সামনে গিয়ে, এ কথা উচ্চারণ করি। ওঁয়াদের শিষ্যরা মহাপরাক্রমশালী। ঝেঁটিয়ে না হোক, বেত্তিয়েই আমার বিষ ঝেড়ে দেবে। তবে কী না, আমাকে গীত গাইতেই বা বাধা কে দেবে। যদি আমি নিজের মনে গাই:

মনকা ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো না মনকা ফের।
করকা মনকা ছোড় কর মনকা মনকা ফের॥

তবে, আমি তো আর ধার্মিক ভক্ত-টক্ত না, এ সব গাওয়া আমার সাজে না। তার চেয়ে রাজা সন্ন্যাসীদের শুনিয়ে আমার গাইতে ইচ্ছা করে:

সতীকো না মেলে ধোতি গন্তান পহরে খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥

'সতী স্ত্রীর একখানি ধুতি মেলে না, দুরাচারিণী উৎকৃষ্ট বসন পরে।'…তারই বা দরকার কী? ওঁয়াদের জপতপের ব্যাপার-স্যাপার দেখে, বরং বলতে ইচ্ছা করে:

পাথর পুজে হরি মিলেঁ তো হম পুঁজে পহাড়।
মালা ফেরে হরি মিলেঁ তো হম ফেরে ঝাড়॥

'পাথর পূজলেই যদি হরি মেলে তো, আমি পাহাড় পূজা করি। মালা ফেরালেই যদি হরি পাওয়া যায়, তা হলে আমি গাছের ঝাড় ফেরাই।'...

কিন্তু দরকার কী আমার এ সব ভাবনায়। রাজা সন্ন্যাসী যেমন দেখেছি, ভিখিরি সন্ন্যাসী যেমন দেখেছি, তেমনি এমন সন্ন্যাসীও দেখেছি, যাঁর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ ফেরাতে ভুলে গিয়েছি। সাধন ভজন সিদ্ধি আমার কর্ম না, লক্ষ্যও না, তবু তাঁদের সান্নিধ্য কেন ভালো লেগেছে, আমি তার ব্যাখ্যা জানি না। ধর্মে বা কর্মে, যে কোনো রকমের সৎ মানুষের সান্নিধ্যই বোধ হয়, মনে একটি ভাব এনে দেয়, যা অনির্বচনীয় আনন্দ।

কিন্তু এ সব কথাবার্তাতেই বা আমার কী প্রয়োজন? আসল আলাপ তো ধরেছিলাম, নিজের ক্ষুদ্রত্বের সাতকাহন গাইবো বলে। পরকে নিয়ে টানাটানি করি কেন? বলার ছিল, আমি বৈরাগী না, বীর তো না-ই, সন্ন্যাসীও না। তীর্থ ভ্রমণ? কোষ্ঠীতে লেখা নেই। মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে, দেবতাকে চকিত করে তুলবো, ও সবের ধারেকাছে নেই। তবে, কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। মনের মধ্যে আছে এক জোড়া পাখা, প্রায়ই সে ছটফটিয়ে ঝাপটা মারে। উড়াল দিতে চায়। যেমন নাকি, 'শুনিয়া বাঁশির গান/মন করে আনচান/গৃহকার্য রয় না আমার স্মৃতিতে।' শ্যামের বাঁশি সেটা না, সত্যি বলতে, বলতে হয়, ওটা আমার প্রাণেরই বাঁশি। সে বাঁশি যখন বেজে ওঠে, তখন ঘরেতে আর মন থাকে না। ছেলেবেলা থেকেই। তার জন্য কপালে লাঞ্ছনা জুটেছে অনেক। সেটা যে কেবল ঘরে, তা না। বাইরেও। তবু কার বাঁশি শুনি, কে আমাকে ঘরছাড়া করে ডেকে নিয়ে যায়, তাকে আজ অবধি চিনতে পারিনি। কখনো কখনো গভীর আনন্দে বা চোখের জলে তাকে অনুভব করেছি। আর মনে হয়, আমার ঘরে, বাইরের লক্ষ্য মানুষের মধ্যেই, সে যেন ঘুরেফিরে বেড়ায়। নানা মুখে সে যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি করে বেড়ায়।

এ বাইরের ডাকটা অনেক দিন আগের। আর ডাকটা এমনই, হঠাৎই এক শীতের দিনে, ঝোলা নিয়ে একেবারে রেলগাড়ির কামরায়। রেল যাবে আসামে। কেন যে মনে এমন একটা সাধ জাগলো, পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারি না। অবিশ্যি, একেবারে ঘরছাড়ার ডাকের যাত্রা বলা উচিত না। গৌহাটিতে এক বন্ধু ছিল, রেলের কর্মচারী। আইবুড়ো আমার বন্ধুটি রূপে গুণে সব

দিক থেকেই আমার চেয়ে অনেক সরস। কিন্তু কেন যেন আমাকে একটু প্রীতির চোখে দেখেছিল। এটা একটা বড় সান্ত্বনা, বিদেশ বিভুঁয়ে একটা ঠাঁই অন্ততঃ আছে। তথাপি বলতে হয়, অমন ঠাঁই তো অনেক ঠাঁই আছে। হঠাৎ একেবারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কেন ?

এই 'কেন'টারই কোনো ব্যাখ্যা নেই। বন্ধু তো নিমন্ত্রণ করেছে অনেকবার। যাওয়া হয়নি। তারপরেই হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই, দে দৌড়। একেই বলে ডাক। ডাকেরও একটা সময় আছে, সেটা যে ডাকে, আর যে ছোটে, তারাই জানে।

সময়টা খারাপ না, মাত্র চার মাস আগে ভারত স্বাধীন হয়েছে। টাটকা হলেও, সর্বাঙ্গে এখন বিস্তর ঘা। তা নিয়ে যাঁদের মাথা ঘামাবার, তাঁরা ঘামান আমি তো ছুটি।

তৃতীয় শ্রেণীর ডাব্বা, কিন্তু খুব একটা ভিড় নেই। এসে বসেছি অনেক আগেই। আশেপাশে অনেক জায়গা, কোণ নিতে ছাড়িনি। সেই কারণেই আরো বিশেষ করে, আমার মনটিও বেশ তরতরানো। যাকে বলে গিয়ে, খুশ তবিয়ত। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়াটা যেমন তেমন হোক, একটু যুতসই আরাম আসন কে না চায়। যে না চায়, তার কথা আমি জানি না। এলাত বেলাত না হোক, এ-ই আমার অনেক দূরের যাত্রা। গোটা শীতের রাতটা গাড়িতে কাটবে। আগে থেকেই নিজের রাজ্যপাট ঠিক করে গুছিয়ে না নিতে পারলে, বেদখলের সম্ভাবনা ষোল আনা। গুছিয়ে রাখবার মতো মালপত্র বাকসো প্যাঁটরা আমার নেই। কবুল করেছি আগেই, সে রকম কোমর বেঁধে কোথাও যাত্রার যোগ্যতা আমার নেই। ছোট একখানি চামড়ার পেটি—যার মধ্যে কিছু জামাকাপড়। বিছানা বলতে একটি শতরঞ্চি, এক কম্বল, তৃতীয় শয্যাসামগ্রী কিছু নিইনি, অর্থাৎ বালিশ। আর যা কিছু সবই টুকিটাকি—সাবান, তোয়ালে, দাঁত মাজার বুরুশ ইত্যাদি। দাড়ি কামাবার যন্ত্র দরকার হয় না। নিতান্ত গাল চুলকালে, সাত দিনে একবার নরসুন্দরের কাছে গিয়ে বসলেই হলো। বিটাহেল্যার আর দরকার বা কী হে ?

অশনবসনে আর ফিটবাবু হবার দরকার নেই। কিন্তু যাত্রাটি উত্তরে। কামের যিনি আধ্যাদাত্রী, সেই তাঁর কামরূপ বলে স্থান। ভৌগোলিক ক্ষেত্রে উত্তরে সে অবস্থিত। আর এই পঞ্চম ঋতুতে, উত্তরের বাতাসের থাবায় আছে ধারালো কৃপাণ। এক এক ঝটকায় চামড়া ছিঁড়ে নেবে। বিশেষ করে, এ গাড়ি যতোই উত্তরে ধাবিত হবে, কৃপাণের ধার ততোই বাড়বে। ইচ্ছা করে কে আর

মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিতে চায়। অতএব, কোণ নিয়েছি উত্তরের শেষ প্রান্তের দেওয়াল ঘেঁসে। প্রয়োজন মতো হাত বাড়ালেই জানালা। খুলে দিয়ে দেখে নাও না কেন, বন প্রান্তর গ্রাম জনপদ, মানুষ পশুপাখি। প্রাণের যদি কোনো প্রভু থাকে, তাহলে, সেই দর্শনেই তার তৃপ্তি। এবার একবার প্রাণ খুলে বলো, 'ক্ষ্যাপা মন, মনের বশে চল্/বশে না চললে পরে, যাবি রসাতল।'...

অবিশ্যি প্রাণ খুলে বললেই বা কী। আমি মনের বশ বলতে বুঝি, কারোর সাতে-পাঁচে থেকো না। আপনার মনে আপনি থাকো, তা হলেই সব ঠিক থাকবে। পারানির আসল যেটি, সেই টিকেটখানি সযত্নে রেখেছি। ভদ্র-লোকের অভিমানটুকু তো আগে। বিনা টিকিটের যাত্রী—বড় অপমান। তার ওপরে গাড়ির দেওয়ালের লিখন স্পষ্ট, 'চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।' বোঝ এবার? এ কি সাবধান করার নমুনা হলো?

একজন দেখছি, ক্রমেই আমার দিকে অগ্রসরমান। মহাশয়ের আচরণকে রীতিমত আগ্রাসী বলতে হয়। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে বাঙালী। ধুতির ওপর শার্ট, তার ওপরে গরম কোট। রোগা লম্বা কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণকালো সরল কেশে দশ আনা ছ' আনা ছাঁট। চলেছেন সপরিবারে, সঙ্গে পত্নী ও দুটি শিশুপুত্র, অবিশ্যি গোটা পরিবারটি তাঁর, অনুমান মাত্র। কিন্তু এত মালপত্র কেন? বেশ কিছু সাইকেলের টায়ার টিউব পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধা। বেশ কয়েকটি সাইকেলের নতুন রিম। সবই তুলেছেন বাংকের ওপরে, আমার মাথা তাগ করে। তাছাড়া, দড়ি দিয়ে বাঁধা একরাশ পিজবোর্ডের বাক্সো, বোঝবার উপায় নেই, কী আছে। সন্দেহ হয়, পাদুকা। এ সব ছাড়া ঢালাও বিছানা, বাক্সো ইত্যাদি তো আছেই। থাকুক, কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু ক্রমেই দেখছি, তাঁর ঢালাও বিছানা, ঠেলতে ঠেলতে আমার দিকে আসছে। শিশুরা আমার জায়গায় খেলা জুড়েছে। মহাশয়ের স্ত্রী, যাকে বলে ঘোমটা ঢাকা কলা-বউ, তা মোটেই নন। তিনি বেশ আয়েশ করে বসেছেন, ভাবখানা, যা করেছেন, যথেষ্ট করেছেন। পরস্ত্রীর বর্ণনা দেওয়া শোভনীয় কী না জানি না, মহিলাকে বয়স্কা বলা যাবে না। মাজা মাজা রঙ, খাটোর ওপরে স্বাস্থ্যটি শক্তপোক্ত। যাকে বলে আলগা চটক, যা আছে তাঁর মুখে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা খরতা বিদ্যমান। লালবাহার শাড়িটি, সেই যাকে বলে 'ড্রেস' দিয়ে পরা, তেমনি পরেছেন। জামা পরেছেন ফ্লানেলের। ব্যস্ত তিনি দুটি বিষয়ে। প্ল্যাটফরম আর কামরার মধ্যে লোকজনদের প্রতি নিরীক্ষণ করে দেখা, আর পান চিবোতে চিবোতে মাঝে মাঝে স্বামীর কথার জবাব দেওয়া। শিশু

দুটির প্রতি তাঁর নজর দেবার কোনো লক্ষণ নেই।

আমার মনে একটাই খটকা, কর্তা-গিন্নিতে কী ভাষায় কথা বলছেন? এক একবার শুনে মনে হয়, বাঙলা কথাই শুনছি। কিন্তু একবর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না। আসামের ভাষা আমার জানা নেই। দু-একবার শোনা আছে, বুঝতে পারিনি। এঁরাও আসামের ভাষা বলছেন কী না, বুঝতে পারছি না।

বোঝার দরকার নেই, নিজের সীমান্ত রক্ষাই বিশেষ প্রয়োজন। ঝগড়া বিবাদে মোটে রুচি নেই। তা বলে, শিশুরা আমার হাঁটুর কাপড় ধরে টানবে, বইয়ের পাতা খাবলে দেবে, আর মাতৃদেবী পান চিবোতে চিবোতে, রাঙা ঠোঁটে অলস কৌতুকে চারদিকে দৃষ্টিপাত করবেন, এ-ই বা কেমন কথা? এদিকে ওদিকে আরো যে সব যাত্রী বসে আছেন, তাঁদের তো এমন ভাবটা মোটেই নেই। মহাশয়ার কর্তাটিই বা কেমন? কেবল মালপত্র গুনছেন, সাজাচ্ছেন। মনোমত না হলে, আবার জিনিসপত্র নামাচ্ছেন, সাজাচ্ছেন। একবার গিন্নিকে সাহায্য করতেও বলছেন না।

বিরক্তি ক্রমে বাড়তে লাগল। আমার আবার সে ভাবটি মোটেই নেই, গাড়িতে উঠে পরের সন্তানকে নিয়ে স্নেহ ভালোবাসার আদিখ্যেতা করা। অনেককেই ও রকম করতে দেখি। মনস্তত্বটা কী, জানি না। সব কিছু সকলের সহ্য হয় না। আমার কোলের উপর, রমাঁ রলাঁর 'বিমুগ্ধ আত্মা'-র পাতার ওপরে, শিশুর মুখ থেকে গড়িয়ে পড়লো এক গাদা লালা, তারপরেই ছোট একটি হাত দিয়ে সেই লালার ওপরেই থপ্ থপ্ করে মারতে লাগলো। এ কি জ্বালাতন বলো তো? দেবো নাকি পাছায় একটা চিমটি কেটে? শিশু বলে কি চেনা অচেনা থাকবে না? আমি বইটা সরিয়ে নিয়ে, চোখ পাকিয়ে তাকালাম। কাঁচকলা। অনধিক এক বৎসরের বাছুরটার তাতে বয়ে গেছে। বরং, ওর ওপরেরটা, বয়স যার তিন হতে পারে, সেটা আবার ছোট ছোট দুধের দাঁত দেখিয়ে হেসে, ভাইটাকে আমার দিকে আরো ঠেলে দিল। আর ছোটটা, রীতিমত আমার কোলের ওপর চেপে উঠে, সরিয়ে রাখা বইটার দিকে হাত বাড়ালো।

মনে মনে প্রায় একটা খারাপ গালাগাল দিতে যাচ্ছিলাম। সামলে নিলাম। এ শিশুকে আর স্ত্রীর ভ্রাতা বলে কী হবে। বরং কনুই দিয়ে আস্তে একটু ঠেলা দিলাম। সেটা হলো আর এক কেলেংকারি। কথায় বলে, পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলতে নেই। কনুইয়ের মৃদু ঠেলায় সেই সাঁকো নাড়া দেওয়াই হলো। বাধা পেয়ে, শিশু আরো উদ্দাম হয়ে, আমার কোল ধামসিয়ে,

বইয়ের দিকে হাত বাড়ালো, আর গলায় একটা গোঙানির শব্দ করলো, যেন বেশ মজা পেয়েছে। আর বড়টা হাততালি দিয়ে উঠলো।

হাততালি শুনে মাতৃদেবীর চেতন হলো, তিনি ফিরে তাকালেন। বাঁচা গেল, এবার নিশ্চয় শিশুটিকে টেনে, নিজের কোলে নেবেন। হায় রে পোড়া ভাগ্য! সন্তানের আচরণে, মায়ের চোখে স্নেহের হাসি উথলে উঠলো, এবং সেই হাসির কিঞ্চিৎ উপহার দিলেন আমাকেও, তাঁর চোখের তারা ঘুরিয়ে। তারপরে মুখ ফিরিয়ে, স্বামীর উদ্দেশে কিছু একটা বললেন, যার বিন্দুবিসর্গ বোঝার ক্ষমতাও আমার নেই। পিতৃদেবও স্নেহ মাখানো চোখে একবার তাঁর শিশু সন্তান এবং একবার আমার দিকে তাকালেন। মুখ ফিরিয়ে আবার যেমন গোছগাছ করছিলেন, তেমনি করতে লাগলেন। মাতৃদেবীও, যা করছিলেন, চারদিকে দেখতে লাগলেন।

এর মানে কী? ওঁরা কি ভেবেছেন, ওঁদের ছেলেদের নিয়ে, আমিও স্নেহে বিগলিত হয়ে গিয়েছি? শিশুদের খেলায় আমি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি? নিকুচি করেছে! দেবো নাকি ধাক্কা দিয়ে ফেলে? নাকি, আমাকে আমার এই সাধের জায়গাটাই ছেড়ে দিয়ে, অন্য কামরায় যেতে হবে? অবস্থা প্রায় সেই রকমই দেখছি। আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্র না তো? দুটি বিচ্ছুকে লেলিয়ে দিয়ে, আমাকে জায়গা-ছাড়া করার মতলব?

তাহলে, আমিও কিছু কম যাবো না। দু'হাত ধরে, শিশুটিকে কোল থেকে নামালাম। চারদিকে একবার দেখলাম। এবার কাঠপিঁপড়ের কামড়টি বাছাধনের কেমন লাগে, দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগেই, আমাকে অবাক করে দিয়ে, শিশুটি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। কী হলো? আমি তো কিছু করিনি? করবো ভেবেছিলাম। তার আগেই, হঠাৎ এই ডুকরে উঠে কান্নার কারণ কি? ব্যাটা অন্তর্যামী নাকি?

মাতৃদেবী এবার ঝটিতি ফিরলেন। দৃষ্টিতে সপ্রশ্ন উদ্বেগ, এবং হাত বাড়িয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে কী সব বলতে লাগলেন। তিন বছরের শিশুটিকে কিছু জিজ্ঞেসও করলেন। জবাবে সে, আমার সরিয়ে রাখা বইটি দেখিয়ে দিল। মাতৃদেবী আমার দিকে তাকিয়ে, আবার কিঞ্চিৎ হাসি উপহার দিলেন, বইটির দিকে একবার দেখলেন, তারপর ছেলেকে আদর করে, কিছু বোঝাতে লাগলেন।

বোঝবার ছেলে বটে। ব্যাটা পা ছুঁড়ে, মাকে মেরে, কানের পর্দা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। মায়ের হাতের কাছে, যা দু-একটি খেলনা ছিল, সেগুলো

দিতে গেলেন। শিশু সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওর চাই রমাঁ রলাঁর 'বিমুগ্ধ আত্মা।' ও তাতে লালা মাখাবে, পাতা ছিঁড়বে—এ কী আবদার বলো তো? এখন যেন আমিই কেমন অপরাধী হয়ে উঠছি। কেননা, ভাবখানা, আমিই ছেলেটাকে কাঁদাচ্ছি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু বার্তা বিনিময় হয়। কর্তা একবার আমার বইটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসিটির অর্থ পরিষ্কার, তিনি জবাব দিতে চাইলেন, ব্যাপারটা নেহাতই শিশুর বায়না। জবাবে, অতএব, আমিও একটু হাসলাম। মাতৃদেবী ক্রন্দমান শিশুকে বসিয়ে নিচের থেকে টেনে বের করলেন ট্রাংক। আঁচলের চাবি দিয়ে, তালা খুলে একটি বই বের করলেন। চমৎকার! যাকে বলে একেবারে খাঁটি ষোল আনা বাঙলা বই। বোর্ড বাঁধাই, রঙীন মলাট, 'শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা।' কোথায় রমাঁ রলাঁর 'বিমুগ্ধ আত্মা' আর কোথায় বাঙলায় অনূদিত, ভাষ্য ও টীকাসহ গীতা। মাতৃদেবী বইখানি তুলে দিলেন ক্রন্দমান শিশুর হাতে।

শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর। যে চায় 'এনচ্যান্টেড সোল্', তাকে দেওয়া হচ্ছে গীতা? কিন্তু আমার চিন্তায় তখন অন্যতর জিজ্ঞাসা জেগেছিল। এঁরা কি বাঙালী নাকি? তাহলে কথা বলছেন কী ভাষায়? শিশুটি কান্নার স্বরে আরো খানিকটা জিদ মিশিয়ে, গীতা ছুঁড়ে ফেলে দিল। মা ছেলেকে আদর করে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে, বইটি আবার এগিয়ে দিলেন। কোনো ব্যাপারই নেই। ইতিমধ্যে আরো অনেকের কানের পর্দাই বোধ হয় ছেঁড়বার যোগাড় হয়েছিল, তাদের দৃষ্টিও শিশুর দিকে। কর্তা-গিন্নিতে, (ধরেই নিয়েছি ওঁরা স্বামী-স্ত্রী) আবার কিছু কথা হলো। কর্তা বাংকের ওপর মাল সাজাতে সাজাতে কিছু বললেন। মাতৃদেবী হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকালেন।

মুখ কখনো চুন হয় কী না, জানি না, হলেই বা তা কেমন, কে জানে। আমার বোধ হয় তা-ই হলো। এখন কি আমার এই 'বিমুগ্ধ আত্মা' দিয়ে, শিশুর কান্না সামলাতে হবে নাকি? এ কেমন শিশু? রমাঁ রলাঁর সঙ্গে আগের জন্মে বাচ্চাটার জান পহ্‌চান ছিল নাকি? মাতৃদেবী শাঁখাচুড়িসহ হাতের গীতাটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, বিব্রত লজ্জায় হেসে বললেন, 'আপ্‌নে বইখান অর হাতে দেন। আপ্‌নে দিলে, নিব।'

এই তো ভাষা বেরিয়েছে, রীতিমত বঙ্গা আলের বচন। তবে এতক্ষণ কী ভাষা বলছিলেন, যার একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। 'ছাটিগাঁ নি?

ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, অনেক জেলার কথাই বুঝতে পারি, ঢাকার কথা বলতেও পারি, যা আমার রক্তে আছে। কিন্তু চট্টগ্রামের ভাষায় আমাকে কেউ যদি সামনে বসে গালাগালিও দিয়ে যান, আমার বাবার ক্ষমতা আছে কী না জানি না, আমার বোঝবার ক্ষমতা নেই। এখন শিশুর মাতা আমাকে যে ভাষায় বাতলালেন, সেটা অনেকটাই ঢাকাই। কিন্তু আমি দিলেই কেন শিশুটি নেবে? ওইটিই কি তার অভিমান? আমার কাছে বই না পেয়ে বিচ্ছুটির মানে লেগেছে বুঝি?

মা আবার বললেন, 'বড় জিদ্‌দি ছেলা। আপনে বই দেন নাই, তার জন্যই এই রকম করতে আছে।'

অতএব, হেসে, বইখানি আমাকে নিতেই হয়। মহাশয়াকে বেশ খুশি দেখায়। তাঁর কালো ভুরুর মাঝখানে, সিঁদুরের বড় ফোঁটাটি যেন কেঁপে যায়। ক্রন্দমান ছেলেকে তুলে বসিয়ে দিলেন আমার কাছে, তারপরে আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষা। শিশুটির চোখের জলে, কষের লালায়, সারা মুখ মাখানো। চোখের কাজলও কিছু ধেবড়ে গিয়েছে কোণের দিকে। দেখলো আমার হাতের বইয়ের দিকে। দেখেই হাত বাড়ালো না, আরো খানিকক্ষণ কাঁদলো, আর কাঁদতে কাঁদতেই গীতার ওপরে থাবা বসালো। বারকয়েক গীতা থাবড়িয়ে, কান্নাটা আস্তে আস্তে কমলো। তারপরে, আমার কোল ঘেঁসে বসে, দু' হাতে বইটা তুলে নিল। ওর পক্ষে বইটি মোটেই হালকা না, অতএব, ঘন ঘন পতনোত্থান চলতে থাকলো। জানি না, অনধিক এক বৎসরের শিশুটির কাছে, বইটির আকর্ষণ কী, তবে গগ্‌গো তাত্‌তা ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ সহকারে, গীতার ওপরে তার ছোট থাবার অজস্র আঘাতের সঙ্গে, লালা ঝরতে লাগলো। ওর মায়ের অভিব্যক্তি দেখবার জন্য চোখ তুলতেই, তাঁর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। আসলে, তিনি আমারই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিলেন। দৃষ্টি বিনিময় হতেই, তিনি মুখে আঁচল চেপে, নিঃশব্দে, কিন্তু বেশ শরীর কাঁপিয়েই হেসে উঠলেন। বিভ্রান্ত বলবো না, আমি রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম, এবং তারপরে আবিষ্কার করলাম, আমিও একটু হাসছি। আমরাই যে কেবল হাসছি, তা বলা যায় না। শিশুটিও হাসছে। ঠেলে ঠেলে, আরো খানিকটা কোল ঘেঁষে, আমার জামা ধরে টানতে লাগলো। সম্ভবত, এটাই তার খুশি জানাবার ভঙ্গি।

কিন্তু মা কি তাঁর সন্তানটিকে আমার কোলের কাছ থেকে সরিয়ে নেবেন? না, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি তাঁর ব্যস্ত স্বামীকে আবার কিছু

বললেন। স্বামী তাঁর শিশুপুত্র এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাস্য করলেন' অর্থাৎ, দৃশ্যটি উপভোগ করলেন।

আর আমি? আমি মনে মনে বললাম, 'বাবা কেতাবপ্রিয় বিচ্ছু, তুমি আমার কোল চেপে, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার বারোটা বাজাও, আমার 'বিমুগ্ধ আত্মার দিকে নজর দিও না। কপালে যখন আছে, তুমি আমার কোলজোড়া হয়ে থাকবে, তাই থাকো।'

মনে মনে ভাবলাম, গাড়ি ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। ছাড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু তা গেল না। না, শিশুটির জন্য না, ওকে এখন আমি মেনেই নিয়েছি। তেমন একটা অস্বস্তিও বোধ করছি না। হঠাৎ ঝড়ের বেগে, কয়েকজন আমার কোণটির দিকে ছুটে এল। আমার বিপরীত দিকে, দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের বেঞ্চে তখনো জায়গা খালি পড়েছিল। অনেকখানি জায়গাই খালি। কারণ বোধ হয়, জানালার ধার বাদ দিয়ে, মাঝখানের আসন, কারোরই বিশেষ পছন্দ না। কামরার দু'দিকের জানালার ধারের আসনই প্রায় যাত্রীদের দখলে। মাঝখানেই যা কিছু ফাঁকা পড়ে ছিল।

শেষ মুহূর্তে যারা ছুটে এল, তাদের ভাবখানা, যেন বাঘে তাড়া করেছে। সবাইকেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মনে হলো। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু মালপত্র। একজন বলে উঠলো, 'এই শেষের দিকে তো এলে, ওঁর এ জায়গা পছন্দ হবে তো?'

অন্যজনের জবাব, 'আরে তুমি আমার কথা শোনো তো। আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এর থেকে ভালো জায়গা আর পাওয়া যাবে না। কারোর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হবে না, এক পাশটিতে দিব্যি শুয়ে বসে যেতে পারবেন। হরনাথ কোথায় গেল?'

আমি যে একটা লোক কোণে বসে আছি, সেটা কারোর যেন খেয়ালই নেই। সামান্য পরিসরে, চার পাঁচজন একসঙ্গে গুঁতোগুঁতি করছে, ধাক্কাটা এসে লাগছে আমার গায়েই। পাছে শিশুটির আঘাত লাগে, সেইজন্য এক হাত আগলে তাকে রক্ষা করতে হচ্ছে।

নাম যার হরনাথ, সে-ই বোধ হয় বললো, 'এই যে আমি এখানে।'

দেখা গেল, সে একটু পিছনে, ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড একটা বেডিং। যে

তার খোঁজ করছিল, সে একটু বিরক্তির স্বরে ধমক দিয়ে বললো, 'ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? বেডিং খুলে, এখানে পেতে দাও তাড়াতাড়ি। উনি এসে কি দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

বেডিংবহনকারী হরনাথ প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লো দেওয়ালের ধারে, আর তার পশ্চাদ্দেশের ধাক্কাটি সোজা আমার কাঁধে। রাগ করে যে কিছু বলবো, কিন্তু বলবো কাকে? দেখছি, একসঙ্গে তিনজন, বেডিং খুলে, বিছানা পাততে লেগে গিয়েছে। কিছু বললেও যে তাদের কানে যাবে, সে রকম কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বিছানাপত্রও কম কিছু না। একজন, যে বিশেষ কিছুই করছে না, কেবল তদারকি ছাড়া, সে বললো, 'ওঁকে এত করে বললাম, ফার্স্ট ক্লাসে আরাম করে যান, কিছুতেই রাজী হলেন না। সেই এক কথা, ওঁর ফার্স্ট ক্লাসও যা, থার্ড ক্লাসও তাই। বরং থার্ড ক্লাসে লোকজন বেশি থাকবে, তাতেই নাকি ওঁর শান্তি। এখন কী বলবে, বলো?'

জানি না, এরা কোন্ লাট-বেলাট মহারাজার কথা বলছে, তবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন যে আসন্নপ্রায়, তা অনুমান করা যাচ্ছে। এদের ব্যস্ততা আর কাণ্ডকারখানা দেখে, যে-মহাশয় তাঁর মালপত্র গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন, তিনিও যে একটু হতভম্ব হয়ে, ঘটনা দেখছেন, এবং তাঁর গিন্নিও। আশেপাশে আরো অনেকেই। আমি দেখছি, বিছানার বহর। মোটা তোশক, তোশকের ওপর গেরুয়া রঙের শাটিনের চাদর, তার ওপরে আবার একটি হরিণের চামড়া পাতা হলো। ভাঁজ করা দুটি মোটা কম্বল, গেরুয়া রঙের ওয়াড় দিয়ে মোড়া, রাখা হলো পায়ের কাছে। দুটি বেশ নরম অথচ স্ফীত বালিশ, যার ওয়াড়ও গেরুয়া রঙের শাটিনের, রাখা হলো দেওয়ালের দিকে, শিয়রের অবস্থানে।

দেখে-শুনে এখন আর আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো রাজসিক সন্ন্যাসী মহারাজার আগমন ঘটছে। ব্যবস্থাপকেরা যে সবাই ভক্ত শিষ্য, ইথেও কুনো সন্দ নাই। কেবল, মনটা আমারই যা বেজার হয়ে উঠল। প্রথম শ্রেণীতে যেতে অরাজী, অথচ তৃতীয় শ্রেণীতেও যে-ব্যবস্থা হলো, তার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর তফাত কতটা হলো, আমার মতো অবিশ্বাসী অধমের পক্ষে তা অনুধাবনের যোগ্য না। কিন্তু মনটা বেজার হচ্ছে অন্য কারণে। আমাদের খাঁদন সন্ন্যাসী হলে আপত্তি ছিল না। রাজা সন্ন্যাসীদের ধাত আবার একটু অন্যরকম। তাঁরা সব সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, তার জন্য তাঁদের এমন সব আচরণ করতে দেখা যায়, তা যেমন হাস্যকর, তেমনি বিরক্তিকর। তাঁকে সবাই ভক্তি করবে, ভক্তিভরে তাঁর প্রতি লক্ষ্য করবে, তাঁর

ইঙ্গিত মাত্র সবাই তাঁর সেবায় নিয়োজিত হবে, মহারাজদের অনেকেরই ভাবভঙ্গি সেই রকম। সেই রকম একজন মহাশয় আসছেন আমারই গা ঘেঁষে, আমার মনের ব্যাজ সেখানেই। তার উপরে, চেলাচামুণ্ডা ক'টি সঙ্গে যাবে, কে জানে? তাদের আচরণ আরো বিরক্তিকর। যেন জীবন্ত বিগ্রহ নিয়ে চলেছে। এদিকে, বিছানো শয্যা থেকে যে কেবল চন্দনের গন্ধ ঘ্রাণে আসছে, তা না, ঈষৎ আতরের গন্ধও যেন ছড়িয়ে পড়ছে। মহারাজ সোনার কলকেয় সপ্তমী পান করেন না তো? সপ্তমী অর্থে গঞ্জিকা। ওটি ওয়াঁদের নিজস্ব ভাষা, সকলের বোধগম্য না।

শয্যা পাতার পরেই, বেঞ্চের সামনে তলায় নানাবিধ মালপত্র গোছগাছ হলো। তার মধ্যে গুটিতিনেক বেতের তৈরি শক্ত পেটিকা। আরো খুচরো-খাচরা কয়েকটি বস্তু রাখতে গিয়ে, বাংকের ওপর থেকে সরানো হলো সাইকেলের টায়ার টিউবের দড়ি বাঁধা গোছা। অবাক হয়ে দেখলাম, টায়ার টিউবের মালিক নিজের হাতেই তাড়াতাড়ি সব সরিয়ে, জায়গা করে দিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর কৃষ্ণকালো মুখে ভক্তির একটা ভাব দেখা দিয়েছে। গিন্নির চোখে অবিশ্যি কৌতূহলই বেশি। এমন কি, শিশু দুটিও, গোছগাছের লম্ফঝম্প দেখে, নিজেদের খেলা ভুলেছে।

একজন বললো, 'সবই হলো, থার্ড ক্লাসের একটাই বড় খারাপ, বাথরুম। উনি কি এখানকার বাথরুমে যেতে পারবেন?'

একজন বললো, 'দেখ ক্ষেত্তর, উনি নিজে যখন বলেছেন, ও সব নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বলা-কওয়া তো অনেক হয়েছে, আর কেন ওঁর কথার ওপরে কথা বলছো? হয়তো সারাটা পথ বাথরুমে একবারও যাবেন না। চেনো না ওঁকে?'

ক্ষেত্তর—সম্ভবত ক্ষেত্র যে, সে বললো, 'তা ঠিক। কিন্তু সময় তো হয়ে এল, উনি এখনো এসে পৌঁছুলেন না!'

একজন বললো, 'ও সব ভাবতে হবে না। প্রিয়নাথবাবুর মোটর গাড়িতে আসছেন। ঠিক সময় মতো এসে পড়বেন।'

আর ভাবতে হবে না, যা ভেবেছিলাম তা-ই, রাজা সন্ন্যাসী আসছেন। তা না হলে আর মোটর গাড়িতে আসছেন! হঠাৎ ঢং ঢং করে ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠল। ভক্তবৃন্দ ব্যস্ত সচকিত হয়ে উঠলো। একজন দরজার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো বদ্যিনাথ, দেখতে পাচ্ছো, উনি আসছেন কী না?'

বিশ্বিনাথ—বৈশ্বনাথ নিশ্চয়ই, দরজার কাছ থেকে, কেমন একটু উদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিল, 'না, দেখা যাচ্ছে না।'

সবাই বিচলিত হয়ে উঠলো, নিজেদের মধ্যে নানারকম উদ্বিগ্ন জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল। পথের মধ্যে কোনো গোলমাল হলো না তো? প্রিয়নাথবাবুর গাড়ি বিগড়ায়নি তো? এখন কী করা যায় বলো তো? শেষ পর্যন্ত যদি না আসতে পারেন তাহলে বিছানাপত্র গোটানো দরকার। এই সব নানান্ কথার মধ্যেই গাড়ি ছাড়ার শেষ সঙ্কেতের ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমি মনে মনে বেশ খুশিই হচ্ছিলাম, আপদ যা! কিন্তু সেই মুহূর্তেই চিৎকার শোনা গেল, 'আসছেন, আসছেন, এসে পড়েছেন।'

মনে মনে একটু চুপসেই গেলাম। একটা কৌতূহলও যে নেই, তা না। ঘটাঘটা আয়োজন যা দেখছি, কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, গাড়ির বা গার্ডের, কারোর বাঁশিই বাজলো না, গাড়িও নিশ্চল। অথচ যাত্রার শেষ ঘণ্টা বেজে ওঠা মানেই, বাঁশি বেজে ওঠা অনিবার্য, গাড়ির দুলে ওঠাও নিশ্চিত।

আমার কানে বাজলো, একটি ব্যস্ত, কিন্তু ততোধিক ব্যাকুল না, নারীর গলার স্বর, 'কই, কোথায় আমার জায়গা করেছ।'

বলতে বলতেই, দরজা দিয়ে যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি মোটেই কোনো সন্ন্যাসী নন। দৃষ্টিপাত মাত্র মনে হলো, ইনি একজন রানী সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনী যে, তার প্রমাণ, তিনি ভক্তদের পথ করে দেওয়া, সারি সারি জোড় হাতের মাঝখান দিয়ে যতোই এগিয়ে আসতে লাগলেন, ততোই লক্ষ্য পড়লো, বস্ত্র তাঁর গেরুয়া, কিন্তু গেরুয়া বস্ত্রে লাল টকটকে চওড়া পাড়। লালপাড়। গেরুয়া রঙের শাড়ি বলা যায়। রেশমি না, কাপাসি শাড়িই বটে, তবে তা তাঁতীর হাতে বোনা অতি সূক্ষ্ম, যার ভিতর দিয়ে, তাঁর গেরুয়া রঙের জামা, শায়া বা সেমিজ, যা-ই পরে থাকুন, তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তিনি এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'দেরি হয়ে গেল। দোষ আমারই। হঠাৎ কী মনে হলো, একবারটি কালীঘাট ছুঁয়ে এলাম। প্রিয়নাথের ইচ্ছে ছিল না, ওর ভয় ছিল, গাড়ি ফেল করবো। তা কিন্তু করিনি।'

হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর আসন ও শয্যার কাছে এসে বললেন, 'বাহ্ চমৎকার! এর কাছে আবার ফার্স্ট ক্লাস লাগে? দেখ দিকিনি, কী সুন্দর ব্যবস্থা? জগত কোথায় গেলি? এদিকে আয়।'

তাঁর পিছনেই, আর একটি স্ত্রীলোক, তিনিও গেরুয়াধারিণী, তবে সবই একটু নিরেস গোছের। তিনি বলে উঠলেন, 'এই যে মা,

আমি আপনার পেছনেই আছি।'

এ সময়েই বাইরে গার্ডের বাঁশি বেজে উঠলো। আর তৎক্ষণাৎ ভক্তবৃন্দ সন্ন্যাসিনীর পা ছোঁবার জন্য, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল। তিনি হেসে বললেন, 'হয়েছে গো হয়েছে, মা জগত্তারিণী তোমাদের এমনিই ভালো করবেন। এখন তোমরা এসো, গাড়ি ছাড়ছে। পরে আর নামতে পারবে না।'

গাড়ি সত্যি একটু দুলে উঠলো, এবং দূরে এঞ্জিনের বাঁশিও বাজলো। যেন মৃতবৎ নিশ্চল অজগরটার নিদ্রাভঙ্গ হলো, মন্থরগতিতে চলতে আরম্ভ করলো। ভক্তরা ছুটে দরজার দিকে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগলো, সেই সঙ্গে সমবেত স্বরে শোনা গেল, 'জয় মা জগদম্বে, জয় মা জগত্তারিণী ! ...'

দেখলাম, সন্ন্যাসিনীর মুখে হাসি, চোখ বোজা, এবং তিনি জোড় হাতে দণ্ডায়মান। যতোক্ষণ গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে না গেল, ভক্তদের চিৎকার যতোক্ষণ শোনা গেল, ততোক্ষণ তিনি একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর জোড়হস্ত বিচ্ছিন্ন করে, চোখ খুলে, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে স্নিগ্ধ হাসি, কিন্তু দৃষ্টি করুণ, অন্তত আমি তাই-ই দেখছি। বললেন, 'জগত, বোস্।'

জগত কি জগত্তারিণী না জগতলক্ষ্মী, জানি না। তাঁর কাঁধে একটা বড় ঝোলা, দু' হাতে একটি বেশ বড় মাপেরই, কাশ্মীরী ওয়ালনাটের কারুকার্য করা বাক্‌সো। বললেন, 'আপনি বসুন মা, আমি বসছি।'

মা হরিণের চামড়ার ওপর প্রথম পা ঝুলিয়ে বসলেন। হাত না ছুঁইয়ে, দু' পায়ের তলা দু' পায়ে ঘষে, ধুলো ঝেড়ে, পা তুলে নিলেন। আমার অন্যদিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না, কারণ মনে হচ্ছিল, আমি এক অদ্ভুত নাটক দেখছি। সন্ন্যাসিনী না হয় না-ই বললাম, মহিলার কণ্ঠস্বর যখন প্রথম শুনেছিলাম, মনে হয়েছিল, স্বরটা কেবল মিষ্টি না, রীতিমত সুরেলা, এবং সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয়, তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, একান্ত ঘরোয়া, গৃহস্থ মহিলাদের মতোই। দেখে অবাক হচ্ছি আরো। সচরাচর মহিলাদের বয়স নিয়ে ভাবতে সাহস পাই না, কারণ, এই একটা ব্যাপারে অঙ্ক মেলানো কঠিন। এঁকে দেখে মনে হচ্ছে, বয়স ত্রিশোর্দ্ধে কখনোই না। যুবতী শব্দটা ব্যবহার-যোগ্য কী না, ঠিক বুঝতে পারছি না, তাঁকে দেখে বলতে ইচ্ছা করছে, তা-ই। নাতিদীর্ঘ শরীরের সুগঠনে, স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে তিনি উজ্জ্বল। কিঞ্চিৎ তাম্রাভ হলেও, তাঁকে গৌরাঙ্গী বলতে হয়। তাঁর কপালে, খুব স্পষ্ট না হলেও,

বিভূতি চিহ্ন বর্তমান, যা তিনটি বাঁকা রেখায় আঁকা, অথচ ভোরের প্রথম সূর্যের মতোই, সুগোল একটি সিন্দুরের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে ভুরুর ওপরেই মাঝখানে। মাথায় তাঁর ঘোমটা নেই, ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ সিঁথার কেশে কোনো রেখা নেই, বাঁয়ে এলানো চুলের গোছায়, অতএব সিন্দুরের কোনো চিহ্নও চোখে পড়ছে না, কিন্তু চুলের একপাশে একটি শক্ত জটা, যা প্রায় সাত আট ইঞ্চি লম্বা, ইঞ্চি তিনেক চওড়া, ঝুলছে। যেন চুলের সঙ্গে আটকানো। জটাটির রঙ তাঁর চুলের রঙের সঙ্গে মেলেনি, সেটি ধূসর, তার মধ্যেই কয়েকটি গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের রেশমের মতো কেশ চিকচিক করছে। আমি বুঝতে পারছি না, তিনি চোখে কাজল পরেছেন কী না। যদি না পরে থাকেন, তবে বলতে হবে, তাঁর চোখ কাজলকালো, দীর্ঘ এবং আয়ত। নাকটি তেমন খাড়া না, টিকলো বলা যায়, এবং বাম নাসায় একটি ছিদ্র স্পষ্ট। কোনো অলঙ্কার—অর্থাৎ নাকছাবি বা নাকের কোনো অলঙ্কার, বেসর বা নোলক বা ফাঁদি, কিছুই নেই। কিন্তু তিনি যে পান খান, তা তাঁর তাম্বুল-রঞ্জিত বিম্বোষ্ঠ দেখলেই বোঝা যায়, এবং এখনো তাঁর মুখে পান রয়েছে, ঠোঁট আর গাল দেখলেই অনুমান করা যায়। একটু অবাক লাগছে, তাঁর গালের রক্তাভা দেখে। ঈষৎ রক্তাভা তাঁর আয়ত কালো চোখেও। গেরুয়া রঙের ঘটিহাতা জামার হাতার নিচেই, দু'হাতে, দুটি ঝকঝকে তামার চওড়া তাগা, কারুকার্যহীন। তাগার নিচেই, রুদ্রাক্ষের তাগা, এবং দু'হাতে রুদ্রাক্ষের বালা। রুদ্রাক্ষগুলো যে সোনার সুতোয় গাঁথা, তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গলার হারটিকে সোনার সরু বিছা আর রুদ্রাক্ষে জড়ানো অবিকল সাপের মতো দেখাচ্ছে। সেই হারের এক জায়গায় একটি লোহার ছোট মাদুলি, আর রুদ্রাক্ষের মাঝে মাঝে এক একটি রক্ত প্রবাল, এবং শ্বেতবর্ণেরও কয়েকটি কী বস্তু গাঁথা, যা আমি কখনো দেখিনি, চিনিও না। শ্বেত প্রবাল হয় কী না, জানি না, হলে, হয়তো তা-ই গাঁথা আছে।

তাঁর খালি পায়ে ধুলার কোনো চিহ্ন নেই, বরং মার্জিতই বলা যায়, একটা চিকণ ভাব। যেন ধুলা লাগলেও, তা আপনিই গড়িয়ে পড়ে যাবে। বাঁ হাতের একটি আঙুলে, একটি মাত্র শাঁখের আঙটি। তিনি বসে, নিজের হাতে, পায়ের কাছের কম্বল সরিয়ে বললেন, 'এখানে বোস্ জগত।'

জগৎ নাম্নী মহিলা, দু'হাতের কাশ্মীরী ওয়ালনাটের কারুকার্য করা বাক্সোটি হরিণের চামড়ার ওপরে রেখে, কাঁধের ঝোলাটা অন্য পাশে নামিয়ে রেখে বসলেন। যিনি জগত, তাঁর বয়সও বেশি মনে হলো না। যাঁকে তিনি

যা বলছেন, সেই মহিলায় থেকে ছোটই হবেন। তাঁরও গেরুয়া লালপাড় শাড়ি, কপালে বিভূতি আঁকা, কিন্তু সিন্দুরের ফোঁটা নেই। মাথায় ঘোমটা নেই, কালো চুল উলটে টেনে, মাথার পিছনে আঁট খোঁপা করে বাঁধা। সিঁথার কোনো চিহ্ন এঁরও নেই, সিন্দুরের রেখাও অবর্তমান।

এঁদের কি মনে মনেও, 'রমণী' বলে উচ্চারণ করা যায়? দরকার কী। মারণ উচাটন ইত্যাদি, দৃশ্যত ঘটনায় ঘটতে, কদাপি দেখিনি। দু-একবার ত্রিশূলের তাড়া খেয়েছি, ঝাপটা খেয়েছি ইটপাটকেলের, মনে পড়ছে এই কারণে, তিনিও ছিলেন এক বয়স্কা সাধুনী জটাজূটধারিণী, লাল রঙের চেলি পরিহিতা, যদিও তাঁর রঙ কখনো বোঝা যেতো না। সেটা অনেক ছেলেবেলার কথা। তাঁকে সবাই বলতো ক্ষেপী, আমরাও বলতাম ক্ষেপী। শুধু বলতাম না, তাঁকে ক্ষ্যাপাবার সেই একটি মাত্র বিশেষণই আমাদের জানা ছিল। তিনি ক্ষেপে যেতেনও নির্ঘাৎ, আর ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করতেন আমাদের, হাতের কাছে যা পেতেন, তাই ছুঁড়ে মারতেন, আর যে সব ভাষায় ও বিশেষণে আমাদের গালি দিতেন—অসম্ভব, তা আর এ বয়সেও উচ্চারণ করতে পারবো না। তিনি কেবল গালি দিয়ে ক্ষান্ত থাকতেন না, আমাদের মুণ্ডুগুলো কেটে কেটে গলায় পরার অঙ্গীকার ঘোষণা করে, চোখ পাকিয়ে, হাতের বিচিত্র সব মুদ্রা করতেন, আর ঠোঁট নেড়ে, বিড়বিড় করে কিছু বলতেন, যেন তৎক্ষণাৎ জাদুকরি কিছু ঘটে যাবে।

. সেই সব মুদ্রার মধ্যে, মারণ উচাটনের কিছু ছিল কী না, আজও জানি না, এই রানী সন্ন্যাসিনী, আর তাঁর সঙ্গিনী সন্ন্যাসিনীকে দেখে, সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। জন্মসূত্রে এঁরা উভয়ে রমণী বটে, এখন আর তা আছে কী না, কে জানে। অতএব, কাজ কি আমার আন্ চিন্তায়। চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি, এঁরা উভয়ে বেশবাসে সন্ন্যাসিনী, বলা যাক সাধিকা। কিন্তু যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, জগত যাঁর নাম, রানী সন্ন্যাসিনীর কিন্তু তাঁর মতো চুল টেনে খোঁপা বাঁধা নেই। এলো চুল পিঠে ছড়ানো, কাঁধের ওপর দিয়ে টানা তাঁর চিকণ স্বচ্ছ গেরুয়া লালপাড় শাড়ির আঁচল, যে-আঁচল ডাইনের কাঁধ ডিঙিয়ে বুকের কাছে ধারণ করে আছে, গ্রন্থিবদ্ধ কয়েকটি ছোট ছোট পাথর, রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির গাঁথা ছোট একটি থলি।

এ পর্যন্ত বেশ সাফা ব্যাপার। সাফা মানে, সন্ন্যাসীর শিরোভূষণের কথা বলা হচ্ছে না। সে জন্যই বলে, কথা যে বলে, দায় তার। শুনেছি, সন্ন্যাসী বা অবধূতগণ মাথায় যে বস্ত্রের শিরোভূষণ ধারণ করেন, তাকে নাকি সাফা

বলে। আপাতত সাফা বলতে, সাফ্‌সুরত্‌-এর কথা বলতে চাইছি। কামরার বিপরীত দিকে মুখ করে বসলে, আমার ডানদিকেই, সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের এ পর্যন্ত সবই সাফা। গুণের বিচার জানি না, রূপের বিচারে জগত সন্ন্যাসিনী বয়সে ছোট বটে, তাঁর চোখে মুখে কেমন একটি কঠিন ভাব। লক্ষ্য করেছি আগে, তাঁর গেরুয়া পোশাকাদি সবই, মা সন্ন্যাসিনীব তুলনায় কিছু নিরেস, রঙটিও তাঁর শ্যামলী। চক্ষু দুটি আয়ত এবং কালো বটে, বিন্দুমাত্র রক্তিম আভা নেই, আর দৃষ্টি যেন সদাই সচকিত, তীক্ষ্ণ, কঠিন। নাকটি বেশ খাড়া, এবং এঁর বাম নাসারন্ধ্রেও ছিদ্র আছে, কিন্তু অলংকারহীন। এঁর ঠোঁটে তাম্বুলরাগের চিহ্ন মাত্র নেই। শরীরের গঠন অনম্র, উদ্ধতই বলা যায়, অবিশ্যিই সুগঠিত। কিন্তু রানী সন্ন্যাসিনীর সবই যেন একটু জ্যোৎস্নাকিরণে ঢলঢল। এমন কি চোখের দৃষ্টিতে, বসার ভঙ্গিতেও একটি ঢলঢল আবেশ। তাঁর তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটে, ও কিঞ্চিৎ রক্তিম চোখে যেন একটু হাসি লেগেই আছে। যেন মনে মনেই হাসছেন, কেবল চোখে আর ঠোঁটে তার একটুখানি ছোঁয়া লেগে রয়েছে, ফলে, আমার চোখে, তিনি যেন কিঞ্চিৎ রহস্যময়ীরূপে দৃষ্ট। যার ধারেকাছে জগত নেই। তাঁর চোখে ঠোঁটে কোথাও হাসির লেশ নেই, বরং বলতে হয়, একটি রুক্ষতাই আছে।

কিন্তু এ সবেও আমার মন তেমন ঠেক খায়নি। ঠেক খাচ্ছে, এক কারণে, এত সুগন্ধ কিসের? কোথায়ই বা তার উৎস? এই দুজনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই, একটি সুগন্ধ ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে, ইন্দ্রিয় মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। তার আগে তো, আমার কাছাকাছি, নতুন টায়ার টিউব, নেপথলিন, হেজলিন, নারকেল তেল, ইত্যাদি মিলিয়ে বিচিত্র এক গন্ধ বিরাজ করছিল, এবং সেই সব গন্ধের সন্ধানও জানা ছিল আমার। এ সুগন্ধটি কিসের? ঠিক যাকে বলে সাবেকি ভাষায়, এসেন্স, এ তা না। আবার আতরও না। চন্দন হলে, এক নিঃশ্বাসেই বোঝা যেতো। পাউডার পমেটম বা খুশবো কেশতৈলের গন্ধ হলে, একটু-আধটু চিনতে পারতাম। এ ঠিক তাও না। এক কথায় বলতে হয় গন্ধটি সুমিষ্ট, অনতিতীব্র। রানী সন্ন্যাসিনীর তাম্বুলের মশলার গন্ধ না তো?

হলেও হতে পারে। সুগন্ধ চোঁয়ানো জর্দার কথা জানি। তেমন জর্দা হলে, শুনেছি গন্ধে মাতোয়ারা করে দিতে পারে। আর মায়ের চোখের বা গালের রঙ যেমন দেখছি, একটু বেশি মাত্রায় জর্দা সেবনের ফলও হতে পারে। মনে আছে, এক গাজীপুরী বাঙালী ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম,

এমন গন্ধের জর্দা আছে, যে খাবে, মনে হবে, তাকে চুমো খাই।'...মা আমাকে ক্ষমা করুন, শুধু গন্ধে মত্ত হয়ে, অমন কাজটি আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। গাজীপুরী দাদা গাঁজা দিয়েছিলেন কী না জানি না, তবে কাশীর জর্দা সম্পর্কে ওই রকম তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু এ সব ভেবেই বা আমার কী লাভ, মনকে অকারণ ধন্দে ধাঁধিয়ে, ক্লান্ত করা। যাই হোক গিয়ে, ধরে নেওয়া যাক, রানী সন্ন্যাসিনীর সর্বাঙ্গ থেকেই একটি সুগন্ধ উত্থিত হয়ে, ছড়িয়ে পড়ছে। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্ত। গাড়িও গতি নিয়েছে। দেখছি, জগত একটি নরম বালিশ মায়ের পিঠের দিকে দেওয়াল চেপে রাখছে। আমি আমার 'বিমুগ্ধ আত্মা' তুলে নিতে গেলাম।

কিন্তু তার আগেই একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা, অন্ততঃ আমার চোখে। ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার কাছাকাছি আর একজন মা আছেন, যিনি ছেলের বই থাবলানো খেলার জন্য, ট্রাংক খুলে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা বের করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখি, সেই মা, আসন ছেড়ে, মেঝেয় বসে, সন্ন্যাসিনী মায়ের পা ছুঁয়ে মাথা লুটিয়ে দিল প্রণামে, এবং বলে উঠলো, 'মা, মাগো। তাই তো কই, বোলে মায়রে আমি চিনি চিনি, তবু ক্যান্ চিনতে পারি না।'

সন্ন্যাসিনী মা, ত্রস্ত ব্যস্ততায় মহিলার মাথায় হাত রেখে বলে উঠলেন, 'আহা হা, ও কি করো মা, ওঠো।'

ছেলের মা উঠলেন তো, তৎক্ষণাৎ ছেলের বাবাও ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ন্যাসিনীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু মা আপনারে দেইখ্যাই চিন্‌ছি। কইলকাত্তায় যে আপনারে দেখুম, এইটা ভাবি নাই। অরে (স্ত্রীকে) আমিই কইলাম, এই আমাগো বিমলা পবিত্রী মা। ও কয় কি, না, উনি আমাগো পবিত্রী মা না।'

কখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই সব বাক্যবিনিময় হয়েছে, কিছুই জানি না। জানবার কথাও না, কারণ, আমিও তখন মায়েদের দেখতেই ব্যস্ত ছিলাম। বিমলা পবিত্রী মা! কোনো সন্ন্যাসিনী বা যে-কোনো সাধিকার এমন নাম হতে পারে, আমার জানা ছিল না। কর্তা একবার শুধু পবিত্রী মাও বললেন। পবিত্র থেকে পবিত্রী? এমন বলতে পারি না, বাঙলার শব্দ সম্ভারে ডুব দিয়ে আছি, অজানা কিছু নেই। কিন্তু পবিত্র-র স্ত্রীলিঙ্গে পবিত্রা হয় বলেই জানি। পবিত্রী শব্দের অর্থ কী? বিমলা বুঝি, বিমলা পবিত্রী মা, আমার বোঝার সাধ্য নেই।

না-ই বা থাকলো। জেনে রাখলাম, উনি বিমলা পবিত্রী মা, বা শুধু

পবিত্রী মা। পবিত্রী মায়ের ঈষৎ রক্তিম চোখে হাসি, এবার তাঁর স্বকরঞ্জিত দন্তপংক্তিও বিস্তৃত হাসিতে কিছু প্রকাশ পেল। তাম্বুলজনিত যতোটা রক্তিম হওয়া উচিত ছিল, ততোটা মোটেই না, কিন্তু চোখের মুখের কোনো হাসিতেই, ভক্তদের নির্দিষ্ট পরিচয়ের সংকেত পাওয়া গেল না। বরং দৃষ্টিতে একটু অচেনা ভাব। বললেন, 'তাই বুঝি? চিনতে পারলে, সেই ভালো। কোথায় যাবে তোমরা?'

কর্তা বললেন, 'ডিবরুগড় যাইতেছি মা, সেইখানেই ব্যবসাপাতি। আপনে তো কাম্যখ্যার আশ্রমে যাইতাছেন?'

পবিত্রী মা বললেন, 'হাঁ বাবা, তা-ই যাচ্ছি।'

গিন্নী হেসে গদ্‌গদ বাত দিলেন, 'আমাগো কী ভাইগ্য, মায়ের লগে গৌহাটিতক যাইতে পারুম।'

পবিত্রী মা হেসে কিঞ্চিৎ ঘাড় ঝাঁকালেন, বললেন না কিছুই। কাশ্মারী ওয়ালনাটের বাক্‌সোর ঢাকনা খুলে, কিছু খুঁজতে লাগলেন। আমার অবাক লাগছে, পাশের পরিবারটিকে দেখে। এঁরা যখন অন্যের সঙ্গে কথা বলেন, তখন সেটি বাঙ্গাল। নিজেদের মধ্যে বাতপুছ হলেই, তা পুস্তু কিংবা হিব্রু, কিছুই বোঝা যায় না। তার চেয়েও অবাক কাণ্ড, গীতা ঘাঁটা ঐ ছোট্‌কাটাও গীতা ঘাঁটিতে ভুলে গিয়েছে। পবিত্রী মাকে এমন হাঁ করে দেখছে, যেন দিব্য-দর্শন করছে। অবিশ্যি কশ গড়িয়ে লালা তেমনই গড়াচ্ছে। তিন বছরেরটির গতিও সেই রকম। গর্ভধারিণীকে নজর নেই, কাজল ধ্যাবড়া চোখে মাতৃদর্শন করছে। এখন আর ডিবরুগড়ের ব্যবসায়ী মহোদয়ের গোছগাছের ব্যাপার নেই। বেঞ্চিতে পাতা বিছানায় বসে, তিনিও মাতৃদর্শন করছেন। হয়তো তেমন অবাক হবার কিছু নেই, দেখছি তাবত কামরার অনেকেই, পবিত্রী মা এবং জগত মাকে দর্শন করছেন। দর্শন আমিও করছি। জানতেও পারলাম ওঁর নাম, আপাত গন্তব্য।

এমন কথা বলবো না, এই সব মহিলাদের—থুড়ী, মাতৃদেবী বলাই বোধ হয় উচিত, এঁদের বিষয়ে আমার মন একেবারে নির্বিকার, কৌতূহলরহিত। কৌতূহল একটাই, এঁরা করেন কী, ভাবেন কী, এবং কী কী চান এঁরা এই সংসারে। কী অলৌকিক গুণ এঁদের আছে, আজ অবধি কখনো জানতে পারিনি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম এঁদের ভক্তবৃন্দকে। ভক্তরা সবাই আত্ম-সম্মোহিত কী না, জানি না, তবে একটা কোনো সম্মোহন যে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্মোহন শব্দে অনেকের হয়তো আপত্তি থাকতে পারে,

ভাবনাটা আমার নিজের বিশ্বাস মতো। অবিশ্যি, নানারকমের সাধক আমি দেখেছি, পবিত্রী মায়ের মতো ঠিক এই রকম সাধিকা আমি কখনো দেখিনি। সন্ন্যাসিনী না, দু-চারজন ভৈরবী যাঁদের দেখেছি, পবিত্রী মায়ের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা চলে না। তা ছাড়া, ভৈরবীরা গেরুয়া বস্ত্র ব্যবহার করেন না, তাঁরা রক্তাম্বরী। তাঁদের সবাই লালে লাল। মিলের মধ্যে একমাত্র, রুদ্রাক্ষের মালা বালা তাগাসমূহ। তা ছাড়া সেই সব ভৈরবীদের নিতান্ত গ্রাম্য স্ত্রীলোক ছাড়া বিশেষ কিছু মনে হয়নি। পবিত্রী মাকে সেই তুলনায়, ধনীর গৃহিনী বললেই হয়। তাঁর চেহারা, আচার আচরণ আর ভাষা শুনে, যে-কারণে আগেই তাঁকে আমি রানী সন্ন্যাসিনী বলেছি।

কিন্তু ভারতবর্ষে কি মহিলারা সন্ন্যাসিনী হন? আমার কোনো ধারণা নেই। ভৈবরী আর সন্ন্যাসিনীতে নিশ্চয়ই তফাত আছে। ভৈরবীদের কার্য-কলাপ রীতিনীতি বিষয়ে, কিঞ্চিৎ ধারণা আছে। আমার বাবার যিনি গুরুদেব, তিনি একজন তান্ত্রিক। ছেলেবেলা থেকে অনেকবার তাঁকে দেখেছি। কৃষ্ণকালো বৃষস্কন্ধ বিশালকান্তি পুরুষ, সেই রকমই তাঁর বজ্রসম কণ্ঠস্বর, আর সেই স্বরের অট্টহাসি শুনে, অনেকবার মায়ের আঁচলের আড়াল নিয়েছি। একটু বড় হয়ে, ভয়টা অনেক কেটেছিল, তাঁর সামনে যাবার সাহস পেয়েছিলাম। বাবা-মায়ের নির্দেশে, তাঁকে প্রণাম করতে গেলে, তিনি বড়জোর জিজ্ঞেস করতেন, 'এটা আবার কে রে?' যেন পোকামাকড় বিশেষ, এমনি তাঁর জিজ্ঞাসা। তিনি গৃহী ছিলেন—ছিলেন না বলে, বলা উচিত, আছেন। তিনি এখনো জীবিত, কিন্তু আমার ছেলেবেলার সেই কৌতূহল আর নেই। তাঁরও দেখেছি, সব লালে লাল। সিঁদুর মাখা ছাড়া তাঁর কপাল দেখিনি। লাল জবা ফুলের মতোই প্রায় তাঁর চোখ। আমার বাবার গান শুনতে তিনি ভালোবাসতেন। বিশেষ করে মালসী, এবং শ্যামা সঙ্গীত। গান শুনে, তাঁকে আমি ঝরঝর কাঁদতে দেখেছি, নাচতে দেখেছি, পাগলের মতো অট্টহাসি হাসতে শুনেছি। তাঁর মাথায় ছিল মস্ত বড় বড় চুল। গোঁফ দাড়ি ছিল না। আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে কয়েকবার তাঁর বাড়ি গিয়েছি। সেখানে, কুলুঙ্গিতে, তাকে, খাটে, সর্বত্র দেখেছি লালবস্ত্রের ছড়াছড়ি, শুল্‌বাঘের বা হরিণের চামড়ার আসন পাতা, এবং কংকালের করোটি। তাঁর বাড়িতেই আমি দু-একবার কয়েকজন ভৈরব-ভৈরবীদের দেখেছি। শুনেছি, তিনি নাকি নিশাযোগে শ্মশানে সাধনা করতে যান। কী সাধনা? এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, আঠারো

বছর বয়সে আমার বাবার হাতে, গালে একটা বিরাশী সিকা ওজনের থাপ্পড় খেতে হয়েছিল। সেটা আলোচনার জন্য না, বরং বাবা সে বিষয়ে যথেষ্ট উদার ছিলেন। থাপ্পড়টা খেতে হয়েছিল, অবিশ্বাস আর সংশয় প্রকাশের জন্য। এবং সেটা তান্ত্রিক সাধকদের সাধনপ্রণালী এবং দেহতত্ত্বে মুক্তির বিষয়ে অস্বাভাবিকতার কথা উচ্চারণের অপরাধে। বাবার হাতের আঘাতটা একেবারে বিফলে যায়নি, পরবর্তীকালে বাবার বইপত্র ঘেঁটে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান এবং কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছু বুঝেছিলাম, তা একেবারেই বলা যায় না।

বাবার গুরুদেবের বিষয়ে, একটি ঘটনা আমাকে আজ অবধি এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, যার কোনো প্রকৃত জবাব কখনো মেলেনি। আমার দশ বছর বয়সের সময়, আমার আট বছরের ছোট ভাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মৃত্যু যখন ওকে তিলে তিলে গ্রাস করছিল, তখন বাবার গুরুদেব হঠাৎ এসে উপস্থিত। মনে আছে, আমার ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তিনি অপলক রক্তাভ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপরে হঠাৎ মুখ তুলে, ওপর দিকে তাকালেন। আমাদের সেই ঘরের মাথার ওপরে ছিল টিনের চাল, নিচে ছেঁচা বেড়ার আস্তরণ, রৌদ্রের তাপকে রোধ করার জন্য। গুরুদেব হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও তো ঘোরাঘুরি করছে দেখছি। আচ্ছা, এখন চলি, কাল একবার আসবো।'

বলেই বেরিয়ে গেলেন। আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে রাত্রে সে ঘরেই শুয়েছিলাম। হঠাৎ গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়, টিনের চালের ওপরে প্রচণ্ড শব্দে। মনে হচ্ছিল, একটা প্রলয়ঙ্কর দাপাদাপি মারামারি চলছে। আমাদের ইলেকট্রিকের আলো ছিল না, হ্যারিকেন জ্বলছিল। বাবা-মাও, স্তব্ধ হয়ে, সেই শব্দ শুনছিলেন। আমি তো ভয় পেয়েছিলামই, বাবা-মার মুখেও ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল। আমরা সবাই ভয়ে আতংকে মৃতপ্রায়, চালের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কখন ভেঙে পড়বে মাথার ওপরে। আমার অসুস্থ ভাই চোখ বুজেছিল।

তার পরের দিন, গায়ে চাদর জড়িয়ে গুরুদেব এলেন। থমথমে মুখে, ঘরে ঢুকে আমার বাবাকে বললেন, 'মোহিনী, তোর ছেলেকে আমি রাখতে পারলাম না।'

বলে, গা থেকে চাদরটা খুলে ফেললেন। ভয়ে বিস্ময়ে দেখলাম, তাঁর সারা গা যেন ধারালো দাঁতে নখে আঁচড়ানো, রক্তাক্ত ক্ষতে ভরতি। আবার

গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বললেন, 'কালের জয় হলো, গত সারা রাত সে আমাকে মেরেছে। ত্বাখ, ছেলে বোধ হয় জল চাইছে। আমি আর দাঁড়াবো না, চলি।'

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমার অসুস্থ ভাই তখন হেঁচকি তুলছিল, এবং ঠোঁট নাড়ছিল। বোধ হয় জলই চাইছিল। মা তাড়াতাড়ি ওর মুখে জল দিলেন। সবটুকু জল ভিতরে গেল না, কিছুটা কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই, সেই অল্প ফাঁক করে রাখা মুখ নিয়ে, আমার ভাই মারা গেল।...

কথাটা মনে করার হয়তো কোনো হেতু ছিল না—আসলে চেষ্টাকৃত মনে করা না, আপনিই মনে পড়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত, সেই ছোট ভাইটির কথা মনে করে, অনেক দিন পরে হঠাৎ মনটা টনটন করে উঠলো। আমার বরাবরের একটা ধারণা, আমার অসুস্থ ভাইটির চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে কোনো গোলমাল ছিল। তার কারণ বোধ হয় দুটি। এক: যে-ডাক্তার আমার ভাইয়ের চিকিৎসা করেছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সেই ডাক্তারবাবুকে আমার ভালো লাগতো না। দুই: আমার একমাত্র ভগ্নিপতিকে, অন্তরালে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুনেছিলাম, চিকিৎসা ঠিকমত হয়নি। সম্ভবত এই দুই কারণে, প্রায় চৌদ্দ বছর পরেও, আমার ধারণা প্রায় এক রকমই থেকে গিয়েছে।

কিন্তু আপাতত প্রশ্নটা সেখানে না। জানালার দিকে পাশ ফিরে বসলে, যাঁরা আমার ডাইনে, সামনে ফিরে বসলে মুখোমুখি, যাঁদের দর্শন এবং জিজ্ঞাসু চিন্তার সূত্র ধরে, বাবার গুরুদেবের কথাটা মনে এল, প্রশ্ন সেই চিরমৌন উত্তরহীন বিস্ময়ের কাছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে কী না, ভূ-প্রকৃতির সে-সংবাদ আমার জানা নেই, আমার জীবন এবং চিন্তার জগতে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে বিস্তর। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা অদ্যাপি অমলিন। ম্যাজিক আমি জীবনে অনেকবার দেখেছি, তথাপি আমার দশ বছর বয়সের ঘটনাকে, দর্শকদের সঙ্গে বসে, মঞ্চের যাদুকরী খেলা ভেবে, মন থেকে দূর করে দিতে পারি না। অতঃপরেও, অনেকের অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনে, অনায়াসে অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছি। স্বীকার করতেই হবে, এ সব বিষয়ে আমার মন পুরোপুরি অবিশ্বাসী। যুক্তি বিজ্ঞান বা বাস্তববাদ, যা-ই বলা হোক না কেন, কোনো কারণেই, কোনো অলৌকিক ঘটনার কারণ আমি খুঁজে পাই না। কিন্তু ভূত যে সর্বের মধ্যে।

চৌদ্দ বছর আগে, আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর আগের রাত্রের ঘটনা, টিনের চালের ওপর সেই ভয়ংকর দাপাদাপি মারামারির শব্দ, যেন মনে হচ্ছিল, মড়মড় করে, মাথার ওপরে চাল ভেঙে পড়বে, এবং পরের দিনে, গুরুদেবের চাদর খুলে গাত্র প্রদর্শন, এবং সেই কথা 'মোহিনী, তোর ছেলেকে আমি রাখতে পারলাম না।'...এবং 'কালেরই জয় হলো, গত সারা রাত সে আমাকে মেরেছে।'...শুধু তা-ই না, আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, রাত্রের ঘটনার আগে, গুরুদেব এসে আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ও তো ঘোরাঘুরি করছে দেখছি।...'

একদিক থেকে, এ সব আমার কাছে, অনেকটা অর্থহীন প্রলাপের মতো লাগে। এমন কি সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে, সমস্ত ঘটনাটাই সাজানো কী না। কিন্তু নানান কারণেই, তারও কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। অবিশ্যিই, আমি ভক্তিনতচিত্তে, পরবর্তীকালে গুরুদেবের কাছে ছুটে যাইনি। তাঁর সঙ্গে, আমি কখনোই ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিনি, বরং তাঁকে এড়িয়েই চলেছি। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি। বলা বাহুল্য, বাবার ভক্তিগদ্গদ জবাব, আমার কৌতূহল মেটাতে পারেনি। কারণ, তাঁর গুরুদেব, তাঁর দেবতা, এবং সবই দেবতার মায়া। অতএব, অনিবৃত্ত কৌতূহলের ইতি সেখানেই।

'অ জগত, ছাখ্ কী আমার বেভ্ভুল মন! সেই বস্ত্র আমার বাক্সোতেই রয়ে গেছে, রেবাকে দিয়ে আসতে একেবার ভুলে গেছি!'

কথাগুলো বললেন পবিত্রী মা, যাঁর কোলের ওপর কাশ্মীরী ওয়ালনাটের বাক্সো, কিন্তু ডালাটি তিনি পুরোপুরি খোলেননি, হাতেও কিছু দেখা গেল না। একটি হাত তাঁর বাক্সের ভিতরেই। কিন্তু তাঁর কথাগুলো যেন সংসারের সীমায়, উদ্বেগে বিভ্রান্ত, নারীর স্বরে ঝঙ্কৃত, সাধিকার সাধনমার্গের লক্ষণ তেমন নেই। তাঁর তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটের নিয়ত রহস্যের হাসিতে যেন হতাশ বিষণ্ণতার ছায়া। 'বিমুগ্ধ আত্মা' আমি তখন হাতে তুলে নিয়েছি।

জগত ঈষৎ ভ্রূকুটি করলেন, তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'রেবার নিজের যদি মনে না থাকে, আপনি কি করবেন। আসলে, ওটা পাওয়া রেবার কপালে ছিল না।'

পবিত্রী মায়ের ঠোঁটের ও চোখের কোণে, একটু যেন বিরক্তি দেখা দিল, জগতের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'তোদের এ সব কথা আমার একটুও ভালো লাগে না। কপালে ছিল না! কপালে ছিল না আবার কী? সব কিছুই কি কপালে লেখা থাকে নাকি? আমি নিজে বলে রেখেছি, ওকে

বস্ত্র দিয়ে আসবো। মেয়েটা তখন ব্যস্ত, বাড়িতে দশটা লোক, তাদের আদর আপ্যায়ন, খাওয়ানো-দাওয়ানো, কত কী ? ওসব ছেড়ে, বস্ত্রের চিন্তা ওর মাথায় থাকবে কেমন করে। ভুল আমারই।'

কথাগুলো বলতে বলতে, জগতের দিক থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন আগেই। জগত তারও অনেক আগেই, চোখ নামিয়ে নিয়েছেন। তাঁর মুখে দেখলাম একটু বিব্রত অপ্রস্তুত ভাব। পবিত্রী মা বাক্সো থেকে বের করলেন ছোট একটি বাঁধানো খাতা। যাকে বলে নোটবুক। বাক্সো বন্ধ করে, তার ওপরেই নোটবুকটি রেখে পাতা খুলে, কি দেখতে লাগলেন।

এদিকে আমার 'বিমুগ্ধ আত্মা'-র পাতা উল্টানো বন্ধ, দৃষ্টি নত থেকেও, অক্ষরে নিবদ্ধ নেই, মনের কৈজত্ আর কাকে বলে! এ আবার কীরকম কথা শুনছি। কপাল মানেন না, এ রকম সন্ন্যাসিনী আছেন—মানে, থাকতে পারেন কখনো ভাবিনি। সন্ন্যাসিনী না হোন, যেমন রকমের সাধিকাই হোন, গেরুয়, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, ছোটখাটো জটা যাঁরা ধারণ করেন, কপাল বিষয়ে তাঁদের মুখে এমন বিরূপ বাক্য ? অবিশ্যি, বিরূপ ঠিক বলা যাবে না, কিন্তু কপালে যে সব কিছু লেখা থাকে না, ঐ বিষয়ে পবিত্রী মায়ের মতো সাধিকার তেমন বিশ্বাস নেই। অন্ততঃ তাঁর কথা থেকে তাই মনে হয়। এও কি সম্ভব ? আমার ধারণায় ছিল, কপাল আর ভাগ্যের ব্যাপারটা, তাঁরাই বিশ্বাস করেন, এবং অন্যদেরও বিশ্বাস করাতে কসুর করেন না। তা ছাড়া, মনের কৈজত্ যাকে বলে, সেটা সবটা কপালের ভাগ্যে না। আমার চমক খাওয়া ঠেক লাগার বিশেষ কারণটা—সাধিকার বাচনভঙ্গি।

বাবার গুরুদেব-পত্নীকে, তাঁর গৃহে আমি কয়েকবার দেখেছি। যাকে বলে লাল কস্তাপাড় শাড়ি, বরাবর তাঁর পরিধানে আমি তা-ই দেখেছি। গায়ে অলংকার কখনো বিশেষ কিছু দেখিনি। কপালে সিঁথায় সিঁদুর দেখেছি, আমার মা কাকীমাদের মতোই। হাতে শাঁখা, নোয়া, বালা, গলায় একগাছি সোনার হার, সবই সাধারণ, কিন্তু গুরুপত্নীর গলায় সব সময়ে দেখেছি একটি রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি ছিলেন সকলের মা, গৃহদেবীর সেবিকা ও সংসারী। তথাপি স্পষ্ট মনে আছে, তিনি যেন সব সময়েই কিছুটা ভাবাবেশে থাকতেন, তাঁর বাচনভঙ্গি ও ভাষায়ও থাকতো সেই ভাবেরই আবেশ। তিনি কথা বলতেন যেন এক ভিন্ন জগত থেকে, যেখানে 'সবই তারা মায়ের ইচ্ছা' বা 'মহাদেবের ওপরে কোনো দেবতা নেই, সেই জগত-পতির নাম করো' কিংবা, 'গুরুর কৃপাই বড় কৃপা' ইত্যাদি কথাবার্তা তিনি

বারে বারে বলতেন; মনে হতো, সংস্কারের সীমায় থেকেও, তিনি যেন সাংসারের বাইরে। কিন্তু পবিত্রী মায়ের কথার সুর স্বর ভঙ্গি, প্রথমেই আমাকে যেমন চমক লাগিয়ে দিয়েছে, যেন সংসারের সীমানায়, নারী ভাবেণ তাঁর স্ব-ভাবের মহিমায়। একেবারে গোড়াতেই একটু চমক লেগেছিল, তাঁর সুর-ঝংকৃত স্বর শুনে, যা একেবারেই কোনো সন্ন্যাসিনী সাধিকার বলে ভাবতে পারিনি। দেখে চমকটা লেগেছিল আরো বেশি। তাঁর ঈষৎ রক্তিম ঢুলুঢুলু চোখের, আর ঠোঁটের হাসিকে, আমার ভাবাবেশ বলে মনে হয়নি, একটু যেন রহস্যময়ীই মনে হয়েছিল। এখন তো তাঁর বচনবাচন শুনে, মনে হচ্ছে, একটু রাশভারী, যুবতী ঘরণী।

আবার মনে মনে 'যুবতী' উচ্চারণ করে ফেললাম! কী করবো! চোখের দোষ। মনকে দোষী করে লাভ কী। যেমন জগত সন্ন্যাসিনীকে দেখে, বারে বারেই মনে হচ্ছে, ইনি বোধ হয় কুমারী, হলেনই বা গুরুণী। এ ক্ষেত্রেও সেই চোখেরই দোষ। সত্যি, দোষ নাকি? তা হলে, মনকেই বা রেহাই দেওয়া যায় কেমন করে। দৃষ্টি আর মনের ব্যাপারটাই বোধ হয় এই রকম, ওরা দুটিতে মিলেমিশে কাজ করে। দোষ বোধ হয়, সেই মহাপ্রাণীর, যে সব মানুষের ভিতরে বসত করে।

কিন্তু হাতের 'বিমুগ্ধ আত্মা' ছেড়ে, নিজের আত্মাকে বেহাত করা কোনো কাজের কথা না। তবে সেটা যে একলা আমার তা না। আশেপাশের আরো অনেকেরই সেই অবস্থা, যদিও তাদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাটা আমার চক্ষু বা মনের মতো কী না জানি না। আমার পাশের ডিব্রুগড়ের ব্যবসায়ী কর্তা এবং গিন্নীর তো কথাই নেই, তাঁদের তো দিব্যদর্শন ঘটছে। অবিশ্যি ছোট্‌কাটা আবার লালায় গীতা ভিজিয়ে চাপড়াতে আরম্ভ করেছে, এবং সেই সঙ্গে ধামসানো চলছে আমার কোল। গোঙানো শব্দে কী উচ্চারণ করছে, আমার বোঝবার সাধ্য নেই। আমার দৃষ্টি অনধিকারচর্চায় চেষ্টায়, পবিত্রী মায়ের নোটবুক থেকে, পশ্চিমের জানালাগুলোর দিকে গেল। চেষ্টা ব্যর্থ, কারণ নোটবুকের একটি পাতাও আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, এমন ভাবেই তিনি হাতের আড়াল করে নোটবুক দেখছেন। সেটা ইচ্ছাকৃত কী না, জানি না। কিন্তু, মহাপ্রাণীর দোহাই দিয়ে যা-ই বলি না কেন, মনটা কেমন খচখচ করে উঠলো। পশ্চিমের আসনে যারা বসেছে, শীতের দুপুরের মিঠা রোদটা ওরাই ভোগ করছে। এটাই মন খচখচানির কারণ। একেই বোধ হয় বলে, মহাপ্রাণীর দীনতা। কোথায় সন্ন্যাসিনী সাধিকাদের বেশবাস,

রূপ স্বর সুর ইত্যাদি নিয়ে মন ব্যস্ত ছিল, তার মধ্যেই হঠাৎ, পশ্চিমের জানালার রোদের জন্য টাটানি। অথচ, প্রথম যখন এ জায়গাটি নিয়েছিলাম, তখন রৌদ্রের কথা একবারও মনে আসেনি।

পবিত্রা মা হঠাৎ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, সেই সঙ্গে তাঁর গলার সেই সোনার সুতোয় গাঁথা রুদ্রাক্ষ ও নানা পাথরে জড়ানো মালা, এবং মাথার ছোট জটা খণ্ডটিও। আর এই প্রথম চোখে পড়লো, তাঁর জটায়ও ছোট ছোট সাদা, এবং সম্ভবত লাল প্রবালের দু'গাছি মালা জড়ানো। ডাকলেন, 'জগত!'

জগত সেই থেকে অধোমুখী ছিলেন। বিব্রত অপ্রস্তুত ভাবের থেকে, এখন যেন তিনি গভীর অন্যমনস্ক। একটু চমকে উঠে, ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে, মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, বললেন, 'হ্যাঁ মা?'

পবিত্রী মায়ের মুখে ঠিক আগের সেই হাসি নেই, একটু যেন করুণ আর স্নিগ্ধ, জিজ্ঞেস করলেন, 'রাগ করলি নাকি?'

দেখলাম, জগত জবাব দেবার আগেই, তাঁর ডান হাতটি চলে গেল পবিত্রী মায়ের জোড়াসনে বসা পায়ের দিকে, ত্রস্তব্যস্ত স্বরে বললেন, 'না মা', ছি ছি, রাগ করবো কেন? আমি তখন থেকে রেবার কথাই ভাবছি। সত্যিই তো, বাড়িতে অতগুলো লোক, আপনি রয়েছেন তার মধ্যে, সবাইকে দেখা-শোনা, খাওয়ানো! কারোর একটু অযত্ন হতে দেয়নি। আমি তখন থেকে ভাবছি মা, একলা হাতে, কী অসীম ক্ষমতা মেয়েটার।'

পবিত্রী মা বললেন, 'সে আমি জানি, তুই বুঝবি। রেবা না হয়ে, অন্য মেয়ে হলে কী করতো বল দেখি?'

পবিত্রী মায়ের সঙ্গে জগতের দৃষ্টি বিনিময় হলো, আর একবার জগতের আয়ত কালো চোখের তারায়ও যেন হাসি চিকচিক করে উঠলো, একটু ঝিলিক দিল ঠোঁটেও। কিন্তু পবিত্রী মা, সত্যি বলতে কি, প্রায় রঙ্গিণীর মতোই খিলখিল করে হেসে উঠলেন। রঙ্গিণী বলা বোধ হয় ভুল হলো, যেন একটি ছেউটি মেয়ে, যাকে বলে নওলকিশোরী। প্রাণে একবার ধারা নামলে যার বাঁধ মানে না। এ কেমন মা, সন্ন্যাসিনী সাধিকাই বা কেমনতরো! বুঝতে অসুবিধা হয় না, কথার মধ্যে, কোনো গূঢ় অর্থেই, দুই সাধিকার পরস্পরে কী একটা ইশারা ইঙ্গিত যেন খেলে যায়, তা-ই হাসির ঘটা। পবিত্রী মায়ের খিলখিল হাসি শুনে, জগতও তেমনি করে বাজেন না, তবে তাঁর হাসির বেগও যে প্রবল ভাবে আবর্তিত, বোঝা যায়, তাঁর শ্যাম মুখে

এবং চোখে উজ্জ্বল ছটা দেখে। পবিত্রী মায়ের সারা অঙ্গেই হাসির তরঙ্গ। জগত জননীর কম্পনও লক্ষণীয়।

এঁরা কি তাঁরা নাকি, সেই যিনি বিরহে কাঁদেন, 'আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি/আমি যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে, যেথায় নিঠুর হরি।'...সেই বিরহিণী অবিশ্যি বৃন্দাবনের নায়িকা নাগরী কৃষ্ণপ্রিয়া। রাধা নামেই অন্য সুরে বাজেন, কারণ তিনি যে ভিন্ রসের সুরে বাঁধা। কিন্তু সেই সাধিকা সন্ন্যাসিনীদের রঙ্গভঙ্গি, হাস্য-পরিহাস দেখে যে আমার সেই বৃন্দাবনের লীলাময়ীদের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। এঁরা কি তবে আসলে সেই বিহরিণী, যাঁরা অঙ্গেতে ধারণ করেছেন গেরুয়া? তা-ই বা বলা যায় কেমন করে। বিরহের কোনো লক্ষণ তো দেখছি না। তেমন বেশভূষাহীন যোগিনী রূপও দেখি না। অবিশ্যি যোগিনীদের সকল সাজসজ্জা আমার জানা আছে, তা বলতে পারি না। ইতিপূর্বে ভৈরবীদের এমন বিচিত্র নানা সাজে দেখেছি, তার বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। বলয়কুণ্ডল থেকে শুরু করে, আপাদমস্তক তামা লোহা পাথর রুদ্রাক্ষ প্রবাল তাবত ধাতু দিয়ে মোড়া। সেই তুলনায় পবিত্রী মায়ের সাজে, কোথায় যেন একটু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আধুনিকা সন্ন্যাসিনী কথাটা বলা যায় কী না জানি না, হয় তো সেটা শোনাবে 'স্বর্ণময় প্রস্তর ভাণ্ডের' মতো। কিন্তু পাপ পূণ্য যা-ই হোক—জননী জ্ঞানেই না হয় বলি, পবিত্রী মাকে আমার রীতিমত রাধিকা বলে মনে হচ্ছে। একবারের জন্যও মনে হচ্ছে না, কোনো ধর্মীয় আসরের মাঝখানে আছি। প্রায় তো যেন গৃহাঙ্গনেরই নানা কৌতুক হাস্যের পরিবেশ।

একবার ভিক্রুগড়ের ব্যবসায়ী কর্তাগিন্নীর দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালাম, উদ্দেশ্য, জননীদের হাস্য পরিহাস তাঁরা কী ভাবে গ্রহণ করছেন। জয় মানব। দেখছি, তাঁদের ভক্তি আপ্লুত মুখেও হাসির কী ছটা! যেন কোনো অনির্বচনীয় সুধায় তাঁদের প্রাণ পরিপূর্ণ।

কিন্তু যে বস্তু নিয়ে এত হাসি আর কথা, সেই বস্তু বিষয়টি কী? সুন্দর কারুকাজ করা কাশ্মীরী বাক্সের মাপ দেখে তো মনে হচ্ছে, আর যা-ই হোক, একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বস্ত্র ওই গর্ভে ধারণ অসম্ভব। অবিশ্যি বলাই বা যায় কী! চোখে দেখিনি, শুনেছি, আঙটির ভিতর দিয়ে গলে যায়, এমন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মসলিন বস্ত্র নাকি কোনো এককালে ছিল। তবে সে তো বাপ-পিতামহের ঘৃত পানের মতো, আমার হাতে তার গন্ধ লেগে আছে। কিন্তু পবিত্রী মায়ের বাক্সের মধ্যে বস্ত্র রহস্যটা ঠিক ধরতে পারছি না। রেবা

নাম্নী মহিলার কথা হয় তো বোঝা যায়, যিনি সুগৃহিণী, অতিথি সেবায় অতিশয় পারঙ্গম, এবং তাঁকে পবিত্রী মা কোনো এক বস্ত্র দিয়ে আসতে পারেননি বলে, তাঁর আক্ষেপ এবং বেদনা। অপরের কপাল গুণের থেকেও, তিনি যে নিজের বিস্মৃতির কারণে আপন দোষ স্বীকারে অকপট, তাঁর এই গুণটি যেন সন্ন্যাসিনীর অধিক, মহৎ মানবী বলে, আমার মনে হয়েছে। আমার মনে দাগটা সেখানেই। জানি না, সন্ন্যাসিনীকে মহৎ মানবী বললে, তাঁকে অসম্মান করা হয় কী না। আমার মনে অন্ততঃ অসম্মানের কোনো মালিন্য স্পর্শ করে না।

জগত বললেন, 'কেন মা, পরেশবাবুর স্ত্রী অর্চনার কথাই ভাবুন না। উনি পারলে তো বোধ হয় আপনার গায়ের কাপড়ই খানিকটা কেটে রেখে দিতেন।'

পবিত্রী মা তেমন প্রগল্‌ভ না হলেও, হেসে উঠে বললেন, 'যা বলেছিস। সংসারে কতো রকমের মানুষ যে আছে! একটু যে সহজ মন নিয়ে ঘরকন্না করে থাকবে, তার কোনো চিন্তা নেই। যতো আজেবাজে ভাবনা। ওই যে কথায় বলে না, যার যতো, তার ততো! ও কি হাড়াংকিলে মানুষ বাপু! কোনো অভাব নেই, তবু দাও দাও।'

সন্ন্যাসিনীর মুখে 'হাড়াংকিলে' শব্দ! এও শুনতে হলো? এ সব নিতান্ত আটপৌরে শব্দ তো, ঘর করতে ঘরণীরাই বলে থাকেন। ভদ্রমহিলা—থুড়ি, পবিত্রী মা ক্রমেই আমাকে যেন অবাক করছেন। এও আবার কোনোরকম তুকতাক না তো? আমার 'বিমুগ্ধ আত্মা' পড়ে থাকবে আমার হাতে, আর শ্রবণটি থাকবে তাঁর দখলে, এ কেমন কথা?

কথা কিছু না, না শুনলেই হয়? সে তো নিজেকে নিজে বাত দিয়ে, বাতেলা দেওয়া। জল যে মাটিতে চুঁইয়ে প্রবেশ করে! আবার বইয়ে মনোনিবেশ করতে গিয়েই দেখি, জগত পবিত্রী মায়ের পায়ের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে, একটু ঝুঁকে বললেন, 'অর্চনার আসল কথাটা আপনি জানেন তো?'

পবিত্রী মায়ের দৃষ্টি আবার নোটবুকের ওপর। চোখ না তুলেই বললেন, 'জানি বলতে পারি না, তবে ব্যাপারটা আঁচ করেছি।'

জগত কথা বললেন না, পবিত্রী মায়ের মুখের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টিতে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। পবিত্রী মা কোনো কথা বললেন না, মুখও তুললেন না, অথচ তাম্বূলরঞ্জিত ঠোঁটের কোণে হাসিটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেশ খানিকক্ষণ সেইভাবে থেকে হঠাৎ চোখের পাতা তুলে, জগতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বশীকরণ তো?'

জগতের চোখের তারায় যেন বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে গেল, মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। পবিত্রী মা আবার খিলখিল করে হেসে বাজলেন। হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো তাঁর অতি সূক্ষ্ম গেরুয়াবস্ত্রে আবৃত শরীরে। সেই সঙ্গে মিষ্টি গন্ধটিও। জগত অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে বলেছিল নাকি?'

পবিত্রী মা হাসতে হাসতেই, মাথা নেড়ে বললেন, 'ওরে, না রে না। বলতে হবে কেন? বুড়ি হয়ে মরতে চললাম, এটুকুও বুঝবো না?'

পবিত্রী মা বুড়ি! তবে যুবী কে? বুঝহ যেজন জানো, রহস্য সন্ধান। রস কথাটা বলতে পারি না, তবে দণ্ডবৎ করি পবিত্রী মাকে। যে ধনী ধনের সংকেত দেয় না, সে-ই ধনী। বুঝলাম, পবিত্রী মা লীলাময়ী। তিনি আবার বললেন, 'পরেশবাবুকে দেখলেই বোঝা যায়, লোকটির একটু এদিক ওদিক করার স্বভাব আছে। তা, অর্চনার মতো বউ নিয়ে ঘর করতে হলে, দোষই বা দেবো কেমন করে? বায়ুগ্রস্ত মানুষ বাপু আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তোকে আমি হলপ করে বলতে পারি, অর্চনা স্বামী বশ করার জন্য ঝাড়ফুঁক যাগযজ্ঞি অনেক কিছু করেছে।'

জগত আরো অবাক হয়ে, তাঁর আয়ত চোখ আরো ডাগর করে বললেন, 'হ্যাঁ, সে তো আমাকে নিজের মুখে স্বীকার করছে। চৌদ্দ দিন উপোস করে, সাবিত্রীব্রত পর্যন্ত করেছে।'

পবিত্রী মা বললেন, 'সে আমি জানি। ব্রত না করে, সাবিত্রীর মতো যদি ভালোবাসতে শিখতো, তা হলে বরং কল্যাণ হতো। ওর থেকে বড় বশীকরণ আর কিছু নেই। কিন্তু বলতে যাও বিশ্বাস করবে না, উলটে ভাববে, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো। সংসারের বেশির ভাগ মানুষই তা-ই।'

কথাগুলো বলে পবিত্রী মা একটু যেন করুণ ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু জগত গম্ভীর হয়ে উঠলেন, কেবল বললেন, 'ঠিক তা-ই।'

কিন্তু, আমি মনে মনে ভাবছি, সন্ন্যাসিনী সাধিকাদের মুখে কি এ সব কথা শোভা পায়? আমরা যারা সংসারের সীমায় বাস করি, যতো দূর জানি, যাগযজ্ঞ ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র ব্রত, এসব এঁদের নির্দেশ উপদেশে পরিচালনায় ঘটে। কিন্তু ভালোবাসাই সকল ব্রতের সার, বিশেষ করে বশীকরণের, এমন কথা শুনতে হলো কী না গেরুয়াবসনা, রুদ্রাক্ষমালিনীর মুখ থেকে? তাও আবার মাথার বাঁয়ে একটি কিঞ্চিৎ অলঙ্কার সজ্জিত জটাধারিণীর! এঁরা কি তবে সন্ন্যাসিনী নন, অশন-বসনের ছদ্মবেশ মাত্র? তার ওপরেও, আমার

আক্কেল যেন কেমন একটু চমক খেয়ে যাচ্ছে, জগত সন্ন্যাসিনীর ভাবান্তরে। ভালোবাসার কথা শোনার পরেই তাঁর মুখে কেমন ভাবান্তর ঘটে গেল। যাকে আমি গাম্ভীর্য ভেবেছিলাম, সম্ভবত তা না। তাঁর আয়ত চোখের গভীরে, কষ্টের ছায়া নামলো কী? অনুচিত, খুবই অনুচিত, বুঝতে পারছি, ভালোবাসা-টালোবাসা নিয়ে সন্ন্যাসিনীর চোখের গভীরে কষ্ট আবিষ্কার করা অন্যায় চিন্তা। কিন্তু আবিষ্কার আমি করিনি, দিব্যি গেলেই বলতে পারি, আমার চোখের নজর এখনো খারাপ হয়নি। অবিশ্যি বিভ্রমের দায় কে নেবে। আমার দৃষ্টির বিভ্রমও হতে পারে।

'এই যা হাচা কথা কইছেন মা।' হঠাৎ আমার ছেলের মা—ছি ছি, ভাবনাটা হলো, আমার কোল ধামসানো ছেলেটির মা, আমাকেও চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এদিকে তুমি টপটপ মালা জপ, ওইদিকে তোমার রক্তে দ, হেই রকম আর কী। মনে ভক্তি না থাকলে, পূজাপাইল দিয়া কী হইবে?'

যাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে, যাঁর উদ্দেশ্যে বলা, তিনি নোটবুকের দিকে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। ভুরু কুঁচকে উঠলো একটু জগত সন্ন্যাসিনীর। পবিত্রী মা মুখ না তুলেই বললেন, 'হ্যাঁ মা, সেটাই হলো কথা।'

জগতের দৃষ্টি ফিরলো পবিত্রী মায়ের দিকে। মা যেন তা জানতেন, জগত তাকালেন, তাই একবার দৃষ্টি বিনিময় করে, ঠোঁট টিপে তেমনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

এই মুহূর্তে, পবিত্রী মাকে, আমার কেমন একটু অহংকারী মনে হলো। কিংবা বলতে হয়, অতি উৎসাহীকে কেমন করে নিশ্চুপ করে দিতে হয়, তার কৌশল, ভাষার কারুমিতিটুকু তাঁর বেশ আয়ত্তে আছে। কারণ, ডিব্রুগড়ের ব্যবসায়ী গিন্নিকে দেখছি, কথা বলবার মতো ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, কিন্তু চোখমুখের অভিব্যক্তিতে একটি বিশেষ ব্যাকুলতা। পবিত্রী মায়ের সহযাত্রিণী হয়ে যেতে পারা পরম ভাগ্যের কথা, সেটা যে কেবল এই মহিলার মুখের কথা না, তাঁর ভক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস দেখেই বুঝতে পারছি। এবং পবিত্রী মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে হয়তো তিনি জীবন্তেই স্বর্গলাভের সুখ অনুভব করতে পারেন, তাঁর ভাবভঙ্গি সেই রকম। ভাবভঙ্গিটি অবিশ্যি কর্তারও। কিন্তু মায়ের তেমন সাড়া মোটেই নেই। বরং জগত সন্ন্যাসিনীর ভ্রূকুটিতে বিরক্তি চাপা থাকে না। যার অর্থ, তিনি চান না, অকারণ কথা বলে, পবিত্রী মাকে কেউ বিরক্ত করে।

আমি নিজের বিষয়েও একটু সাবধান হবার চেষ্টা করি। হয়তো সন্ন্যাসিনীদের প্রতি একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছি। কখন দেখবো জগত সন্ন্যাসিনী আমার দিকেও ভ্রূকুটি চোখে নজর করছেন।

'একটা পান দে তো জগত মা।' পবিত্রী মা নোটবুকের দিকে চোখ রেখেই বললেন। জগত মা। মাতা-কন্যা সম্পর্ক নাকি উভয়ের মধ্যে? বয়সের তফাত নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মা-মেয়ে রূপে ভাবাটা একটু মুশকিল। পবিত্রী মা যদি ত্রিশের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে যান, জগৎ মা বিশের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে হতে পারেন। যদিও আমার অনুমান মাত্র। তবে, জিজ্ঞাসু ভাবনা বাড়িয়ে লাভ কি? নিজের চোখেই একাদশ বয়স নিয়ে চিন্তা, বে-আক্কেল পুরুষ ছাড়া করে না। তথাপি, সেই সন্তানকে হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবানই লক্ষ্য করেছি। অতএব, জননীদের বয়স নিয়ে চিন্তা, বে-আক্কেল পুরুষ ছাড়া করে না। তথাপি, সেই মনেরই দোহাই। মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। পবিত্রী মা এবং জগত সন্ন্যাসিনীকে সাক্ষাৎ মাতা-কন্যা ভাবতে, মন অরাজী।

জগৎ তাঁর ঝোলার ভিতর থেকে বের করলেন ঝকঝকে, সুদৃশ্য একটি রূপোর কৌটো। একেবারে ছোটোখাটোটি না। অন্ততঃ একশো খিলি পান ধরতে পারে তার গর্ভে, মাপ দেখে তাই-ই মনে হয়। কিন্তু জগত কারুকাজ করা কৌটোর মুকুট টেনে যখন খুললেন, হরি হরি! পানের খিলি কোথায়। এ তো দেখছি, খোপে খোপে লবঙ্গ দারুচিনি এলাচ সুপুরি জর্দা, এবং চিনি না, এ রকম আরো কিছু মশলা। ধরে নিতে হবে, পানেরই মশলা। একটা খোশবুও ছড়াচ্ছে, কিন্তু প্রথম থেকেই যে গন্ধটি ছড়িয়ে আছে, তার থেকে আলাদা। তাহলে অনুমান করে নিতে হয়, আগের গন্ধটি সন্ন্যাসিনীর অশনে-বসনেই রয়েছে।

কিন্তু এবে দেখ কাণ্ড! জগত সন্ন্যাসিনী তাক লাগালেন আমাকে। আসলে, অনভিজ্ঞ বলেই বোধ হয় তাক্ লাগে। তিনি খোপের পাত্র টেনে তুলতেই, কৌটোর নীচে আর এক অন্দরমহলের প্রকাশ। ঢাকা দেওয়া একটি ভেজা কাপড়ের টুকরো যার রঙ প্রায় গেরুয়াই বলতে হয়। সম্ভবত পানের দাগেই ও রকম হয়ে থাকবে। জগত কাপড়ের টুকরোটি এক ভাঁজ খুললেন, সবুজ পানের খিলি চিকচিক করে উঠলো। জগত দুটি পানের খিলি হাতে নিয়ে, মশলার নানান্ খোপের কোনো এক খোপ থেকে, ঈষৎ রক্তিম একটি প্রায় সুপুরির মতো টুকরো তুলে, জিজ্ঞেস করলেন, 'দেবো নাকি এক টুকরো?'

পবিত্রী মা নোটবুক থেকে চোখ তুলে দেখলেন। হাসিটি লেগেই ছিল ঠোঁটের কোণে। জগতের চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কেবল ঘাড় নাড়লেন সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে। জগতও ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললেন, 'পারেনও! আমার তো এক টুকরোতেই যেন ঘাম বেরিয়ে যায়, মাথা ঘোরে।'

পবিত্রী মা কিছু বললেন না, হাসলেন মাত্র। কিন্তু হেসে বেজে উঠলেন ডিব্রুগড়ের ব্যবসায়ীর গিন্নি, বলে উঠলেন, 'কোয়াই তো? ঠাণ্ডায় খুব মজা লাগে খাইতে। শরীল গরম হয়। এই যাইতে আছি ডিব্রুগড়, রোজ, সব সময় খাম্।'

পবিত্রী মা বা জগত, কেউ যেন মহিলার কথা শুনতে পেলেন না। জগতের হাত থেকে পানের খিলি জোড়া নিয়ে, মুখে দেবার আগে বললেন, 'জগত, ওকে একটু কোয়াই দে।'

জগত কথাটা শুনতে পেলেন কী না, বোঝা গেল না। তিনি এক চিমটি জর্দা নিয়ে, পবিত্রী মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। পবিত্রী মা হাত পেতে নিলেন। পানের খিলি এখন তাঁর গালে। জগত মশলার পাত্রটি পানের খিলির ওপরে চাপা দিলেন। মুকুটওয়ালা ঢাকনাটা হাত তুলে, ঢাকা দেবার আগে, এক টুকরো কোয়াই না কোয়ই, যা-ই হোক, ডিব্রুগড়বাসিনীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

তবু ভালো! আমি ভেবেছিলাম জগত সন্ন্যাসিনী বোধ হয় পবিত্রী মায়ের কথা শুনতেই পাননি, বা দেবেন না। কিন্তু ডিব্রুগড়বাসিনীর কি আনন্দ! যেন হীরের টুকরো হাতে পেলেন। আগে ঠেকালেন কপালে, স্বামীর দিকে ফিরে আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললেন, যার মধ্যে 'করসাদ' শব্দটা বোধ হয় 'পরসাদ' অর্থাৎ প্রসাদ। তবে মহিলা অতি পতিভক্তিপরায়ণা নিঃসন্দেহে। স্বামী তাঁর জামার পকেট থেকে বের করলেন একটি পেন্সিল কাটা ধারালো ছুরি। তার গোটানো মুখ খুলে, জগতের দেওয়া সেই বস্তুটি কেটে দু টুকরো করে, দুজনে নিলেন। আবার কপাল ছুঁইয়ে নমস্কাব করে, আলগোছে মুখে ফেলে দিলেন।

আমি যেন নাটক দেখছি, এ কথা বলার আর দোষ কী। কিন্তু মুখে দিলেই হলো? আমার কোল থেকে শিশু চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের কোলে। তিন বছরেরটিও ছাড়লো না। ছোটটা মায়ের ঠোঁটের ওপর থাবা মেরে কান্না জুড়ে দিল। স্বাভাবিক! আত্মজদের ফাঁকি দিয়ে খাওয়া? অথচ 'স্বামী-স্ত্রীর কী হাসি! ছেলেদের কাণ্ড দেখে, দুজনে

হেসেই বাঁচেন না। শিশুদের চিৎকার, জনকজননীর হাসি, এ কি হাটের মাঝে বসে আছি নাকি? কান পাতা দায় হলো যে। কোলটা আমার মুক্ত হলো বটে, ব্যাটারা একেবারে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীতে কী যেন কথা হলো। তারপরে স্বামী নিজের একটি বোঁচকা থেকে বের করলেন দুটি চিঁড়ের মোয়া। দুজনের হাতে দিলেন। যদিও শিশুদের তেমন মনস্তুষ্টি হলো না। কারণ, ওদের ধারণা জন্মে গিয়েছে, বাবা মা ওদের ঠকিয়ে কিছু খেয়েছেন। যাই হোক, তবু দেখা গেল চিঁড়ে ভিজেছে। সত্যি বলতে কি, ব্যাপার-স্যাপার দেখে, একটা খারাপ গালাগালই মুখে এসে গিয়েছিল।

কিন্তু সন্ন্যাসিনীদের দেখ! কী গভীর প্রশান্তিতেই না আছেন। কানের কাছে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তাঁদের কিছু যায় আসে না।

পবিত্রী মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হয়েছে জগত।'

জগত অবাক্ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মা?'

পবিত্রী মা বললেন, 'দুর্গাপদ তো তিন চার দিন পরেই কলকাতা আসছে। তার হাত দিয়ে রেবার বস্ত্রখানি পাঠিয়ে দেবো।'

জগত আরো অবাক হয়ে বললেন, 'সেই থেকে আপনি রেবার বস্ত্রের কথা ভাবছেন?'

পবিত্রী মা হেসেই বললেন, 'ভাববো না? দেবো বলে দিতে পারলাম না। বড় আফসে মরছি। যাক, এখন মনে পড়ে গেল, দুর্গাপদ ক'দিন পরেই কলকাতা আসছে, তার হাত দিয়ে পাঠাতে পারবো। সেই সঙ্গে একটা চিঠিও লিখে দেবো।'

পবিত্রী মায়ের হাসিটি এখন আর মিটিমিটি ঢুলুঢুলু নেই, অনেকটা যেন বালিকার খুশি ঝলকানো। জগতের প্রাণের গতিধারা সহজে স্পষ্ট হয় না, আগেই দেখেছি। এই মুহূর্তে মনে হলো, পবিত্রী মায়ের দিকে নিবদ্ধ তাঁর আয়ত কালো চোখ দুটি যেন কী এক আবেগে ভরা। পবিত্রী মা আবার বললেন, 'মেয়েটি বড় ভালো। এতগুলো মেয়েকে তো দেখলাম, রেবার মতন কারোকে মনে হয়নি।'

বলতে বলতে তিনি আবার নোটবুকের দিকে তাকালেন। তাঁর একটি নিঃশ্বাস পড়লো, যেন বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস।

বুঝতে পারছি না। আমি দর্শক না নেপথ্যচারী! বুঝলাম না কিছুই। বস্ত্র ব্যাপারটিই বা কী, আর এই কোয়াই না কোয়ই বস্তুটিই বা কী। ডিব্রুগড়বাসিনীর কথায় বুঝেছি, ওটি খেলে, শরীর গরম হয়, মজা লাগে।

জগতের কথায় জেনেছি, তিনি ওটি খেলে, ঘর্মাক্ত হন, এবং শির চক্কর দেয়। কী বস্তু, কে জানে।

কিন্তু সত্যি কি কিছু জানবার আছে! তুমি থাকো তোমার মনে, চলো আপন বেগে। এঁড়ে বাছুরটা কোল ছেড়েছে। এবার 'বিমুগ্ধ আত্মা'য় ডুব দেওয়া যাক।'

ক'টা ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করিনি। বইয়ের অক্ষরমালা ঈষৎ অস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, পশ্চিমের জানালায় তাকিয়ে দেখলাম, পড়ন্ত বিকাল, রোদের রঙ গৌরী কন্যার লাজে লাজানো রাঙা। অথচ এই আসন্ন গোধূলির অপরাহ্ণের আলোয়, একটি বিষাদের ম্লানতাই থাকবার কথা। সবই মনের গুণ, সে যেমনটি যখন দেখে। আমি একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে, দেশলাইয়ের কাটি জ্বাললাম; কিন্তু ধরানো গেল না, তার আগেই, আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, ডিব্রুগড়বাসিনী মহিলা ফুঁ দিয়ে কাটি নিভিয়ে দিলেন। আমার ভ্রূকুটি বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখ দুটি উদ্বেগে বড় করে, প্রায় চুপিচুপি স্বরে বললেন, 'করেন কী, অ্যাঁ? পবিত্রী মায়ের সামনে বইস্যা আপনে ছিগার‍্যাট ধরাইতে আছেন? উনি যে সাইক্ষ্যাৎ দেবী! এমুন কামও কইরেন না।'

আমি হতচকিত বিস্ময়ে, মহিলার দিক থেকে পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। এ আবার কেমন কথা? তিনি সাক্ষাৎ দেবী কী না, আমি জানি না। আমি ধূমপান করবো না কেন? পবিত্রী মা যদি আমার সামনে পান জর্দা আরো কী সব গা গরম করার বস্তু খেতে পারেন, আমি সিগারেট খেতে পারি না?'

জগত সন্ন্যাসিনীর ভ্রূকুটি চোখে বিরক্তি ফুটে উঠলো।' পবিত্রী মাও মুখ তুলে, মহিলার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে বিরক্তি নেই, রাগবিরাগও নেই। তাঁর অধরও তেমনিই রক্তিম। কাজলকালো চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে, এদিকে তাকাও মা।'

মহিলা পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালেন। পবিত্রী মা শান্তভাবে বললেন, 'একটা কথা বলি, একটু নিজের মনে থাকো। সবাইকে নিজের মতন ভাবতে যাও কেন? কেন ওকে সিগারেট খেতে বাধা দিচ্ছ? সিগারেট খাওয়ায় দোষ কী আছে? আমার কোনো ক্ষতি হবে না।'

মহিলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনিও কয়েকবার পান চিবিয়েছেন, ঠোঁট দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অপ্রস্তুত হেসে বললেন, 'হেই কথা কই না মা। আপনার ক্ষতি কে করতে পারে? আপনে আমাগো বিমলা মা, সাইক্ষ্যাত দেবী, আমাগো মন য্যান কেমুন কেমুন করে, তাই কইছি।'

পবিত্রী মা বললেন, 'না, তুমি তা বলবে না। আর ওসব সাক্ষাৎ দেবী-টেবীই বা বলছ কেন। ওসব শুনতে আমি ভালোবাসি না। ওর সিগারেট খেতে ইচ্ছা করলে ও খাবে, তুমি ওসব কথা বলছ কেন? ও সব কথা কখনো বলো না।'

পবিত্রী মায়ের স্বর শান্ত, কিন্তু শান্ত স্বরেও যে দৃঢ়তা থাকতে পারে, এমন কি কঠিনতা, তাও অপ্রচ্ছন্ন থাকলো না। আমার অবস্থাটা, যাকে বলে, একেবারে বেয়াকুফ।

ডিব্রুগড়বাসিনী আমার দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ স্বরে বললেন, 'তাইলে খান।'

তাইলে খান তো বুঝলাম, কিন্তু এটাকেও একটা বিপাকে পড়া বলে না কী? কথাটা এখন আমার কাছে গোড়া কেটে, আগায় জল ঢালার মতো শোনাচ্ছে। প্রথমে আমার মনের দিক থেকে কোনো বাধাই ছিল না, থাকলে, অনায়াসে সিগারেট ধরাতে উদ্যত হতাম না। আমার মনে দ্বিধা প্রশ্ন কিছুই ছিল না। ভক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায়, ব্যাখ্যা করতে পারি না, অন্ততঃ এই মহিলার মতো কোনো মানসিকতা আমার নেই। পবিত্রী মা বা জগত কী রকমের সন্ন্যাসিনী, আমি জানি না। মানবীকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে কদাচ চিন্তা করিনি, কারণ দেবদেবী বিষয়েও আমার ধ্যানধারণা তেমন সাক্ষস্বরত না। তথাপি, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, কথাবার্তা শুনে, পবিত্রী মা মহিলাকে—না, সন্ন্যাসীনীকে, আমার ভালো লেগেছে। কখনো অজ্ঞাত অলৌকিক জগতের মানুষ মনে হয়নি। তারপরেও, যদি পাপ না হয়—একেবারে তো সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠতে পারিনি, তবে বলি, রূপে কে না ভোলে? সন্দেহ নেই, পবিত্রী মা আমার থেকে কিছু বয়োঃজ্যেষ্ঠ। সংসারের আঙিনায় দাঁড়িয়ে, তাঁর মতো নারীকে 'বউদি' ডেকে রঙ্গও করা যেতে পারতো।

কিন্তু একবার ঠেক খেলে, তারপরে আর সহজ হওয়া কঠিন। মুখের সিগারেট ইতিমধ্যেই আঙুলের ফাঁকে নেমে এসেছিল। এখন মনে হচ্ছে, ডিব্রুগড়দাদা যেন কয়েকবার আসন ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন। সেটা কি,

পবিত্রী মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে, ধূমপানের জন্য ? মনে হচ্ছে সেই রকম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো জগত সন্ন্যাসিনীর ওপর। তাঁর দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি। সে তো প্রথমাবধিই। বিরক্তি দেখাচ্ছেন নাকি ? তাহলে আমারও বিরক্ত হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু চোখে চোখ পড়া মাত্র, তাঁর কুঞ্চিত ভুরু সহজ হলো, একটু যেন অপ্রস্তুত লজ্জাতেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন। যদিও আমার সমস্যা ঘুচলো না। শেষ পর্যন্ত কি আমাকে আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ধূমপান করতে হবে নাকি ?

পারবো না। তবুও, হায় রে মন ! আমি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম, এবং অচিরাৎ তিনিও আমার দিকে চোখ তুলে দেখলেন। কাজলের যে বিভ্রম তাঁব কালো চোখে, তার রক্তিম ক্ষেত্রে ও তারা যুগলে কি হাসিটি আছে ? বললাম, 'আপনার আপত্তি না থাকলে—।'

তিনি আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, বলে উঠলেন, 'কোনো আপত্তি নেই বাবা, তুমি প্রাণ ভরে সিগারেট খাও। এ আবার কি কোনো কথা হলো, আমার সামনে সিগারেট খাবে না ?'

আমি ডিব্রুগড়দিদি- না, বউদি বলাই বোধ হয় সঙ্গত, তাঁব দিকে একবার তাকালাম। বিমর্ষ না, বেশ অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। তবু আমি সিগারেট ধরালাম। আর মনে মনে ভাবলাম, এতক্ষণে পবিত্রী মায়ের মধ্যে তাঁর সন্ন্যাসিনী বৈশিষ্ট্য যেন ফুটে উঠলো। তিনি আমাকে অনায়াসেই 'তুমি' এবং 'বাবা' বলে সম্বোধন করলেন। বয়সে যতো ছোটই হই, সাধারণ কোনো মহিলা হলে, আমার মতো একজন অপরিচিতকে নিশ্চয়ই 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারতেন না। 'বাবা'-র তো কোনো প্রশ্নই নেই।

'কিছু মনে করলে না তো ?' পবিত্রী মা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না না, কিসের কী মনে কববো ?'

তিনি হেসেই বললেন, 'তোমাকে তুমি করে বললাম বলে ?'

সত্যি বলতে কি, চমকটা লাগলো প্রায় মস্তিষ্কে তীর বেঁধার মতো। অলৌকিক কিছু ঘটেছে না'ক ? ইনি অন্তর্যামিনী নন তো ? আমার ভাবনাটাই, উচ্চারিত হলো ওঁর মুখে। আমি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না তো। মনে করবো কেন ?'

পবিত্রী মায়ের কাজল রক্তিম চোখে হাসি, যা ঠোঁটের কোণেও ঠিকরে পড়া ঝিলিকের মতো। বললেন, 'করলেও আশ্চর্যের কিছু না। সবাই তো

সব কিছু পছন্দ করে না। তবে, তুমি আমার থেকে ছোটই হবে, তাই না?'

আমি ঘাড় কাত করে বললাম, 'হ্যাঁ—মানে—।'

তাঁর হাসিটি আর একটু বিস্ফারিত হলো, যদিও খিলখিলিয়ে বেজে উঠলেন না। দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন জগতের দিকে। জগতের মুখে হাসি নেই, গম্ভীরও নন। তিনি মুখ নত করলেন। পবিত্রী মা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ, আমিই বলছি, তুমি আমার থেকে বয়সে ছোটই। কতো হলো, কুড়ি না একুশ?'

বললাম, 'না, চব্বিশে পড়েছি।'

বলেই নিজেকে কেমন বেয়াকুফ মনে হলো। উনি জিজ্ঞেস করলেই আমাকে বলতে হবে নাকি? সন্ন্যাসিনী হলেও তিনি মহিলা, সেই কারণেই, এক কথায় বলতে একটু দ্বিধা করেছিলাম, তিনি আমার থেকে বয়সে বড়। তিনি বলে উঠলেন, 'ব্যাটাছেলে মানুষ—, চব্বিশ বছরটা এমন কিছু না। ছেলেমানুষই বলতে হয়।'

চব্বিশ বছরে ছেলেমানুষ! প্রতিবাদের কোনো প্রশ্নই নেই। আমার কিছু বলবার দরকারও ছিল না, তার আগেই তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন অন্যত্র। কাশ্মীরী বাক্সোটি এখন তাঁর আর জগতের মাঝখানে। নোটবুকটি বাইরেই আছে। তা ছাড়াও দেখছি, আর একটি বড় বাঁধানো খাতা তাঁর কোলের ওপর। এটি কখন বেরিয়েছে, খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন একটি ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার, খাতা বা নোট বুকের কোনো কিছুই তিনি বাইরের কারোকে দেখতে দিতে চান না। সম্ভবত তিনি বেশ সচেতন, আমার নজর বিষয়ে। হয়তো কৌতূহল আমার আছে, কিন্তু অশালীন চোরা চোখে কিছু দেখে নিতে আমি নারাজ, ওটা ধাতে নেই।

গাড়িতে আলো জ্বলছে, যদিও দিনের শেষ আলো এখনও নিভে যায়নি। ধূমপানে কোনো অস্বস্তিও বোধ করছি না। অস্বস্তি যতো ডিব্রুগড়বাসিনীর। ইতিমধ্যে তাঁরা জায়গা বদল করেছেন। কর্তা এসেছেন আমার দিকে, গিন্নী গিয়েছেন অন্য পাশে। ছোটটা ঘুমিয়েছে, শোয়ানো হয়েছে প্রায় আমার পাতা শতরঞ্চি ঘেঁষেই। তবু ঘুমিয়েছে তো! গীতাখানি পড়ে আছে এখনো আমারই জায়গায়। মনটা একটু চা চা করছে। কোনো স্টেশন না এলে, তা সম্ভব হবে না। গাড়ির মধ্যে যাত্রীদের নানান্ কথাবার্তা চলেছে।

'কোথায় যাওয়া হবে?' পবিত্রী মায়ের স্বর শুনে, চোখ তুলে তাকালাম।

দেখলাম, তাঁর সেই চোখের দৃষ্টি আমার দিকেই। আবার বললেন, 'তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি।'

মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে বললাম, 'গৌহাটি।'

আবার জিজ্ঞসা করলেন, 'সেখানে কি চাকরি করো?'

বললাম, 'না, বেড়াতে যাচ্ছি।'

তিনি আবার বললেন, 'বাহ্, বেশ ভালো কথা। তা, কী করা হয়? পড়াশোনা, না চাকরি?'

মনে মনে অবাক না হয়ে পারছিলাম না। মনে করেছিলাম, অন্যের সঙ্গে কথাবার্তায়, তাঁর মোটেই উৎসাহ নেই। জগত সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আলাদা কথা, সেটা তাঁদের নিজেদের ব্যাপার। ডিব্রুগড়বাসিনীর বেলায় তাঁর উৎসাহহীন নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করেছি। আমার ক্ষেত্রে, তিনি এমন উদার হচ্ছেন কেন! অবিশ্যি, আমি কিঞ্চিৎ সংকোচ বোধ করলেও নিরুৎসাহ বোধ করছি না একটুও। তবে, সাধিকা সন্ন্যাসিনীর ব্যাপারে, মনটা সহজে যেন সহজ হতে পারে না। বললাম, 'চাকরি করি।'

পবিত্রী মা ঘাড় ঈষৎ বাঁকিয়ে বললেন, 'খুব ভালো কথা। বাবা-মা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন?'

কথাটা এমন জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন কেন? দরকার কী ভেবে, বললাম, 'হ্যাঁ।'

পবিত্রী মা তাঁর ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টি একটু যেন কাঁপিয়ে বললেন, 'এবার তো তাহলে নিজের একটি সংসার করতে হবে, না কী?'

নিজের একটি সংসার করতে হবে? কথাটার ধরতাই ধরতে পারলাম না —যাকে বলে প্রসঙ্গের মুখপাত।

সংসারে আবার করবো কী! যাকে বলে, জমপেশ সংসার, তাই নিয়েই তো আছি। আমি সংসারের আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। যেন, জিজ্ঞাসার জবাবের জন্যই, জগতের দিকে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তেই, তিনি কেবল লজ্জা পেলেন না, সারা মুখে একটা ছটাও লেগে গেল। কেন, এত লজ্জা পাবার মতো কী গূঢ় রহস্য আছে কথাটার মধ্যে? পবিত্রী মা বললেন, 'আমার কথাটা বোধ হয় ধরতে পারোনি। নিজের সংসার করা বলতে, বলছি, এবার নিশ্চয় বাবা-মা একটা বে'থা দেবেন?'

দেবেন? বে'থা! সে তো কবেই সেরে বসে আছি। দেবার অপেক্ষা আর করতে পারলাম কোথায়। তেমন সুবোধ বালক হবার অবকাশ কখনো

পাইনি, বরং সেই যে কথায় বলে, পিপুল-পাকা ছেলে, সেটা অব্যর্থ আমার ক্ষেত্রে। পিপুল-পাকা কথাটার যথার্থ মানে ঠিক জানি না, সম্ভবত অকালপক্ক। সেই হিসাবে আমি কৈশোর ছাড়াতে না ছাড়াতেই, যাকে বলে হরণ করে মালাবদল। তাই করে বসে আছি। সংসারের চোখে তো আমি কলঙ্কিত, বংশের খাতায় আমার স্থান খরচের হিসাবে। কিন্তু পবিত্রী মাকে কথাটা কবুল করতে গিয়ে, কেমন যেন ঠেক খেয়ে গেলাম। তাঁর সংসার করার অর্থ যে বিবাহ, তা বুঝতে পারিনি। লজ্জা পেয়ে হাসলাম, কিন্তু ঝটিতি মুখ খুলতে পারলাম না।

পবিত্রী মা তাঁর কাজলকালো ঈষৎ রক্তিম চোখে, অপলক আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বরং ক্রমে যেন তাঁর ঘাড় একটু কাত ফিরে, আমার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, কথাটা শুনে যে একেবারে শিমুল ফুল হয়ে উঠলে? বিয়ের কথায় ছেলেরা এত লজ্জা পায়, তা তো জানতাম না?'

শিমুল ফুল! তার মানে, লজ্জায় আমি শিমুল ফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছি? আমার মতো কালো ছেলে বড় জোর, বেগুনি হতে পারে, রাঙা কদাচ না। বললাম, 'না, ইয়ে, মানে, ওসব হয়ে গেছে।'

পবিত্রী মায়ের গলায় একটি বিস্ময়সূচক ধ্বনি শোনা গেল মাত্র, 'আঁ!'

তাঁর এই শব্দেই যেন আমি আরো বে-হাল হয়ে পড়লাম। কোনো রকমে তাঁর বিস্ময়োদ্দীপ্ত বিশাল চোখের দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিলাম। যেন কী এক অপকর্ম করে বসে আছি। শুনতে পেলাম, তাঁর সেই সুর-ঝংকৃত স্বর, 'ওরে জগত, শুনছিস? কেমন করে বললে, ও সব হয়ে গেছে! আমি তখন থেকে ভাবছি, কচিকাঁচাটি বসে বই পড়ছে। ও মা, এখন শুনছি, ছেলের তুলুক-সন্ধান সব জানা হয়ে গেছে!'

এ রকম করে বললে, তাও পবিত্রী মায়ের মতন একজন সাধিকা, ছেলে হয়েও কেমন যেন লাজিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তুলুক-সন্ধান জানা ব্যাপারটার মর্ম বুঝতে পারলাম না। সেটা আবার কী? চকিতেই আমি একবার জগত সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে দেখলাম। তিনি অধোমুখী। একটু হাসি তাঁর ঠোঁটের কোণে। ডিব্রুগড়দাদা আর তন্ত গিন্নিও দেখছি, হাসি মুখে সব ব্যাপারটি উপভোগ করছেন।

পবিত্রী মা আবার বললেন, 'তা হ্যাঁ বাবা, এখন তো আবার জিজ্ঞেস করতেও ভয় পাচ্ছি, মা ষষ্ঠির কৃপা-টৃপাও কিছু হয়েছে নাকি?'

মা ষষ্ঠির কৃপা কাকে বলে জানি। পবিত্রী মা যদি ভয় পান তাহলে সত্যি কথাটাই বা বলি কেমন করে? সংসারে, এমন কি অভিনব কাণ্ড করেছি? তবু তাঁর দিকে তাকাতে পারলাম না, মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, মেয়ে—।'

আমার উচ্চারণমাত্র পবিত্রী মায়ের গলায় প্রায় চিৎকারে বাজলো, 'হ্যাঁ?'

বলেই তিনি খিলখিল করে হেসে উঠলেন, তারপর হঠাৎ থেমে বললেন, 'না বাবা, তুমি আমাকে সত্যি অবাক করে দিয়েছ। তোমাকে দেখে ইস্তক একবারও বুঝতে পারিনি তুমি একেবারে পিতৃদেবটি হয়ে বসে আছ।'

দেখে ইস্তক বলতে, তিনি যে কখন থেকে আমাকে দেখছেন, সে ধ্যান আমার নেই। বরং, তিনি গাড়িতে আরোহণ করার পর থেকে, তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গিনীকে আমিই বারেবারে দেখেছি। নিজেদের প্রতি ছাড়া, অন্য কোনো দিকে যে তাঁদের তাকাবার অবকাশ ছিল, অন্ততঃ আমার লক্ষ্যে পড়েনি। তবে, নারী জাতি না, এক্ষেত্রে মাতৃজাতি বলে কথা! তাঁদের দৃষ্টি কখন কোন্ দিকে, শ্রবণ কোন্ শব্দের প্রতি, অনুভূতির—মানে মনের গতি-শীলতার রীতি-প্রকৃতি কখন কেমন, কহন না যায়।

জগত সন্ন্যাসিনীকে যদি বা এক রকম দেখেছি, পবিত্রী মায়ের ক্ষেত্রে বারেবারেই মনে হয়েছে, তাঁর চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে, কেমন একটা রহস্য ছোঁয়ানো। অবিচলিত, কিন্তু কেমন একটি অলস মন্থরতা তাঁর আচরণে, অথচ হাসিটি অনির্বাণ। প্রথম দর্শনে মনে হয়, মন আছে তাঁর মনের ভিতরে, যা কিছু সব মনে মনে। তার মধ্যে, কখন কোন্ দিকে প্রাণ হাট করে খোলা, সেই আঁচ পাবো তেমন গুমর আমি করি না। এখন আমার মনে মনে যতো ঠেক্ খাওয়া অবাক জিজ্ঞাসা, তা হলো আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টিদান, বাতপুছ করা।

পবিত্রী মা আবার বললেন, 'এর পরেও কী না তুমি জিজ্ঞেস করো, সিগারেট খাবে কী না?'

আমি বিনীত হেসে বললাম, 'কথাটা সেজন্য ওঠেনি। উনি আপনার সামনে সিগারেট খেতে বারণ করছিলেন তা-ই।'

বলে আমি ভিরুগড়বাসিনীর দিকে ইঙ্গিত করলাম। পবিত্রী মা হেসে বললেন, 'তা ঠিক, ও ভেবেছিল একরকম ভেবে ওর মতন করে। তুমি তা ভাবোনি। ও সব আমি পছন্দ করি না। কতো সময় কতো দাঁতাল মাতাল

গাঁজাখোর চণ্ডুচোরের সঙ্গে বসে থাকতে হয়, তুমি তো সিগারেট খাচ্ছো। কিন্তু বাবা, আমি যে অন্য জায়গায় ধোঁকা খেয়েছি, তোমাকে ভেবেছিলাম, ফুল কচিটি!'

বলে তাঁর উজ্জ্বল নখে ঝিলিক দিয়ে আঙুলের একটি মুদ্রা দেখালেন। তেমন শব্দ করে না, হাসির তরঙ্গ দেখা গেল তাঁর শরীরে। আবার বললেন, 'অবিশ্যি তোমাকে বুড়ো বলছি না, যাকে বলে পাকা ঝিকুটি, তুমি হলে তা-ই।'

এবার খিলখিলিয়ে হেসে বাজলেন ডিব্রুগড়বাসিনী, বললেন, 'ঠিক কইছেন মা। আমিও তো পোলাপান ছ্যামড়া মনে করছিলাম।'

পবিত্রী মা গম্ভীর হলেন, কিঞ্চিৎ গুটিয়ে নিলেন যেন, বললেন, 'তা মা ছেলেমানুষ ছাড়া, আর কী। তবে এগিয়েছে অনেক দূর, কিন্তু ওকে বখাটে চ্যাংড়া বলতে পারি না। মুখ দেখলে চেনা যায় তো। দাগ আছে ওর মুখে।'

কিসের দাগ, কী চেনা যায়? আমি অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম পবিত্রী মায়ের দিকে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আর আমার দিকে নেই। হাসি হাসি মুখ নিয়ে, তিনি তখন তাঁর কোলের ওপর রাখা খাতার পাতা দেখছেন। জগতের বাঁ গালে হাত, পাশ ফেরানো মুখ নত। আর আমি বেয়াকুফের মতো মুখ নিয়ে তাকালাম ডিব্রুগড়দাদা আর গিন্নির দিকে। তাঁরা দুজনেই এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, লজ্জা পেয়ে গেলাম। হাসি হাসি মুখ বটে, দৃষ্টিতে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা গভীর। যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এ আবার কী রকম ব্যাপার? অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছি। প্রায় চোরের মতো, চোরা চোখে, নজর আরো একটু বাড়িয়ে দেখলাম, আরো কেউ দেখছে কী না? দু-চারজন যে না দেখছে, তা না। কারণ, পবিত্রী মায়ের আকর্ষণটা কম না। তাঁর প্রতি লক্ষ্য অনেকের, অতএব, তাঁর বচনের প্রতিক্রিয়ায়, আমার দিকেও দু-চারজন তাকিয়ে দেখবে, সেটা তেমন আশ্চর্যের না। আশ্চর্যের ব্যাপার করলেন পবিত্রী মা। তিনি এমন একটি বয়ান দিলেন, আর দিয়ে এমন একটি নির্বিকার ভাব ধারণ করলেন, যেন তাঁর আর কোনো দায়-দায়িত্বই নেই। মুখ থেকে কথা আসবে, অথচ তার দায় নেবো না, এমনটি কেন হবে। আমাকে কেউ বখাটে চ্যাংড়া বললে, মেজাজ খারাপ করতে পারি, জবাব করি বা না করি। তার একটা মানে বোঝা যায়। পবিত্রী

মায়ের বয়ানের মানে কী? মুখ দেখে কী চিনলেন, দাগটাই বা কিসের দেখলেন?

শেষ পর্যন্ত দেখছি, তিনি সেই সাধিকা সন্ন্যাসিনীর বচনই দিলেন। গৃহ-প্রাঙ্গণের আটপৌরে ভাষা যতোই বলুন, জীবন-যাপন ভাবনা-চিন্তার ছাপটা যাবে কোথায়?

'জগত এক টুকরো কোয়ই দে তো মা।' পবিত্রী মা মুখ না তুলেই বললেন।

জগত নত মুখ তুলে, ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার?'

পবিত্রী মা বললেন, 'দে একটু, কেমন যেন শীত শীত করছে।'

জগতের দৃষ্টিভঙ্গী দেখে মনে হলো না, শীতের কথাটা তাঁর বিশ্বাস হয়েছে। তবু ঝোলা থেকে টেনে বের করলেন রুপোর সেই ঝকমকানো বাহারে কৌটোটি।

এমন সময় গাড়ির গতি এল কমে। সামনে নিশ্চয়ই কোনো স্টেশন। যাঁর যা খুশি বলুন, আর আমার মুখে যা-ই আবিষ্কার করুন, আমি যাই, আগে চায়ের তৃষ্ণা মেটাই।

'মায়রে এই পরথম ত্থাখলেন?'

চায়ের পাত্র মুখে তুলতে গিয়ে থমকে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। ডিব্রুগড়দাদা। জিজ্ঞাসার লক্ষ্য আমি, দৃষ্টি ও হাসিতে প্রমাণ। আর মা নিশ্চয় বিমলা পবিত্রী মা। চা খাচ্ছিলাম, গাড়ির দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে। ওঠানামার ব্যস্ত ভিড় তেমন নেই। বললাম, 'হ্যাঁ।'

দাদা চায়ের পাত্রের কাছে কপাল নামিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি কবে বললেন, 'একেবারে সাইক্ষ্যাত দেবী, বোঝলেন। কামিখ্যা মায়ের অংশ আছে ওনার মধ্যে। নাম শোনছেন তো?'

বললাম, 'আগে কখনো শুনিনি, আজ শুনলাম।'

ডিব্রুগড়দাদা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আরে বাবারে বাবা, ত্রিভুবনে ওনারে সবাই চিনে।'

ত্রিভুবনের মধ্যেই আমার বাস, বিশ্বাস এই রকম। কিন্তু, আমি কখনো শুনিনি। তবে তিনি যে বিশেষ একজন, তা শেয়ালদাতেই অনুমান করেছিলাম। তথাপি, আপাতত ডিগব্রুগড়বাসীর সম্পর্কেই আমার কৌতূহল বেশি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি অসমীয়া?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'না তো। আমি তো বাঙ্গালী ?'

কিন্তু 'বাঙালী' উচ্চারিত হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় আপনার বাড়ি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সিলট।'

অর্থাৎ সিলেট ? স্বামী-স্ত্রীর বাক্যবিনিময় সেই ভাষাতেই হচ্ছিল। ভাষা বাংলাই, কিন্তু 'ডাহার পোলা' হয়েও কস্মিনকালে কয়েকটি জেলার ভাষা কোনোকালে বুঝতে পারি না। অথচ সিলেটের ভদ্রলোক দিব্যি ঢাকাই কথা বলতে পারেন। নিজে থেকেই বললেন 'আমার নাম রমেন দাস—কায়স্থ, ডিব্রুগড়ে বাপ-ঠাকুরদার ব্যবসাপাতি আছে। অম্বুবাচীর সময় আর মাঘ মাসে, দুইবার কামাখ্যায় আসি, পবিত্রী মায়ের দর্শন কইরা যাই। সাইক্ষাৎ ভগবতী, কী কমু আপনেরে! ওনার একটু কিরপা পাইলে জন্ম সার্থক।'

কথাগুলো ভক্তি থেকে উৎসারিত, অথবা সম্মোহিতের, বুঝতে পারি না। এ সব ব্যাপারে বাধা দেওয়া, বা বিতর্কে যাওয়া আমার কোষ্ঠিতে নেই। অতএব চা শেষ করে, সিগারেট ধরালাম। গাড়িও ছাড়লো। ডিব্রুগড়দাদা—না, এখন আর তা বলা যায় না—এখন শ্রীহট্টবাসী রমেন দাস—আবশ্যিক স্মর্তব্য, তিনি কায়স্থ। একটি বিড়ি ধরিয়ে, আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, একটু স্বর খাটো করে বললেন, 'মায়ের কিন্তু আপনের উপুর একটু কিরপা দৃষ্টি হইছে, বোঝলেন ? আরে ভাই, আমার বউ কি এম্‌নে এম্‌নেই আপনেরে সিগারেট খাইতে দিতে চাইছিল না ? কত জজ মেজিস্ট্র্যাট ওনার সামনে সিগারেট খাওন তো দূরের কথা, মুখেই লইতে পারে না। আর আপনার লগে কেমুন হাইস্যা হাইস্যা কথা কইলেন ?'

তা ঠিক, মা আমার সঙ্গে হাইস্যা ভাইষছেন। কিন্তু তার মধ্যে কৃপাদৃষ্টি কতোখানি আছে, তার মাপজোক আমি জানি না। কৃপাদৃষ্টির কোনো কারণও নেই। জজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিশালত্ব আমার নেই, আসলে তিনি হয়তো পাকা ঝিকুটে একটি ছেলেকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপই করছেন, বিরক্তি চেপে রেখেছেন মনে। তা না হলে, মনে একটা জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে, ও রকম হঠাৎ নিশ্চুপ নির্বিকার হয়ে গেলেন কেন ? কিন্তু সে কথা রমেন দাস মহাশয়কে জিজ্ঞেস করতে আমার বাধলো। অতএব চুপচাপ ধূমপানে রত থাকলাম। এটা শেষ করে জায়গায় ফিরে যাওয়াই ভালো।

আমি চুপ করে থাকলেই রমেন দাস চুপ করে থাকবেন, এমন কোনো

কথা নেই। বললেন 'আইচ্ছা, একটা কথা নি কইতে পারেন? মায় যে কইলেন আপনার মুখে দাগ আছে, হেইটা কী?'

হেইটা তো আমারো জিজ্ঞাস্য। বললাম, 'আমি তো জানি না।'

রমেন দাস যেন আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করলেন না, বললেন, 'জানেন না? কিছু বুঝতে পারলেন না?'

বললাম, 'না। উ ন তো কিছু বললেন না, কী করে বুঝবো, বলুন?'

রমেন দাস কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য কী না, সেটা ভাবলেন। সহসা আর কোনো কথা বললেন না, ধূমপানে ব্যস্ত থাকলেন। হঠাৎ একটা প্রসঙ্গ মনে পড়তেই, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ওই জিনিসটা কী বলুন তো, সুপুরির মতো দেখতে? আপনার স্ত্রীকেও দেখলাম, ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলেন?'

রমেন দাস তাঁর কৃষ্ণকালো মুখের, ততোধিক কৃষ্ণকালো ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটা?' বলেই, পান খাওয়া দাঁত হেসে বললেন 'আপনে কোয়াইয়ের কথা কন? ওইটা তো গুবাবি, কাঁচা গুবারি, খাইলে শরীল গরম থাকে। অভ্যাস না থাকলে মাথা ঘুরায়, নিশাও হয়। মায়ের ছাখলাম বেশ অভ্যাস আছে। আসামের তাবত লোকে খায়। আর যদি শিলং যান, ছাখ্‌বেন, ছাওয়াল বুড়ো যখন তখন চাবাইতে আছে। পাহাড়ের গরীব মানুষরা কোয়াই খাইয়াই শরীল গরম রাখে।'

এবে বার্তা জানিলাম, কোয়াই বা কোয়েই যা-ই হোক, বস্তুটি আদতে কাঁচা সুপারি। আমার রেলের চাকুরে বন্ধুটি ইতিমধ্যে কতোটা অসমীয়া হতে পেরেছে, ঠিক জানি না। বস্তুটির অভিজ্ঞতা তার কাছ থেকেই সঞ্চয় করতে হবে।

ইতিমধ্যে আমাব চা এবং ধূমপান শেষ, নিজের আসনের দিকে অগ্রসরের উদ্যোগ করলাম। পিছন থেকে রমেন দাসও আমার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে, গলা নামিয়ে বললেন, 'তবে ভাই কথাটা কিন্তু মনে রাইখ্যেন, পবিত্রা মায়েরে যদি একটু তুষ্ট করতে পারেন, তাইলে জীবনে কিছু পাইয়া যাইবেন। হিমালয় পাহাড় থেইক্যা অনেক বড় বড় যুগী সাধক ওনার কাছে আসেন।'

যুগী সম্ভবত যোগী-ই, কিন্তু পবিত্রা মাকে কী সূত্রে এবং কী কারণে, এবং কী প্রকারে তুষ্ট করতে হবে জানিনা। বেরিয়েছি পথে, গন্তব্য একটা আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য অবশ্যই বাইরের চির কৌতুক প্রবাহে ভেসে বেড়ানো। অকাজের যে একটি নিবিড় আনন্দ আছে, লক্ষ্য সেই আনন্দের সায়র। কোনো

কিছু গুছিয়ে নেবার তাল আমার নেই। এই না নেওয়াটাই আমার অভিলাষ। সাধক সাধিকার ব্যাপারে আমি মোটেই নেই। তবে, সেই মন গুণেরই কথা, পবিত্রী মা এবং জগত সন্ন্যাসিনীর প্রতি আমি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ বোধ করেছি, স্বীকার না করলে, নিজের কাছেই কপটাচারি হতে হয়। কিন্তু রমেন দাস যা বললেন, সাধিকার তুষ্টিবিধান, তার কোনো সূত্র সন্ধান আমার জানা নেই। অতএব তূষ্ণীম্ভাব ধাবণ করে, নিজেব জায়গায় গিয়ে বসলাম।

কিন্তু দুই কাবণে, একটু ঠেক খেতে হলো। এক: টান টান লম্বা হয়ে শোবাব জায়গা দখল কবিনি, দেওয়ালে হেলান দিয়ে, একটু এলিয়ে বসার মতো প্রশস্ত স্থান নিয়েছিলাম। দেখছি রমেন দাসেব ছোট্‌কাটা আমার অর্ধেক জায়গা জুড়ে শোয়ানো। বিছানা তো একটি শতরঞ্চি, একটি কম্বল। সেই শতরঞ্চিটি যদি ভেজে, এই শীতের রাত্রের দুর্গতিটা দূব করবেন কোন্ দুর্গা? ভেজাটা অসম্ভব কিছু না, শিশুর প্রাকৃতিক চেতন দমন তো বড়দের মতো না।

দুই: 'বিমুগ্ধ আত্মা।' ইংরেজীতে যার নাম 'এন্‌চেন্‌টেড সোল্‌।' কেতাবটি দেখছি পবিত্রী মায়ের হাতে। বইয়ের প্রথম পাতাটি খুলে দেখছেন। উনি কি ইংবেজিও জানেন নাকি?

আমি বসতে না বসতেই, বইটি তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'কিছু মনে করো না, কী বই তা-ই দেখছিলাম। ইংরেজি পড়তে টড়তে জানি নে, সামান্য নামধাম পড়তে পারি। জগত আমার থেকে বেশি জানে, ও ক্লাস টেন অবধি পড়েছে'

'আঃ, মা!' জগত সন্ন্যাসিনী বলে উঠলেন। নত মুখে তাঁর লজ্জাকুপিত ভাব।

পবিত্রী মা তাঁব দিকে ফিবে বললেন, 'অন্যায় তো কিছু বলিনি জগত, সত্যি বলতে লজ্জা আছে? তা বলে, এ কথা তো বলিনি, ক্লাস টেন অবধি পড়েছিস বলেই, তুই জ্যোতিষ্ময়ী হয়েছিস্। যাঁরা তোকে জ্যোতিষ্মতী জগদ্ধাত্রী বলেছেন, তাঁরা অনেক বড় মানুষ।'

জ্যোতিষ্মতী জগদ্ধাত্রী! কোন্ লক্ষণের দ্বারা নারীকে সেই রূপে চিহ্নিত করা যায়? আমি জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। দেখলাম তাঁর আয়ত কালো চোখের অপলক দৃষ্টি আমার চোখের প্রতি নিবদ্ধ। নিবদ্ধ বলার থেকে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ বলাই সঙ্গত, যেন আমার বুকের ভিতর অবধি দেখে নিতে চান। হাসি বা লজ্জার কোনো স্পর্শ সেখানে নেই। কেন, আমি কি কোনো অপরাধ করেছি?

কিন্তু এই দৃষ্টিপাত কয়েক পলকের জন্য। জগত সন্ন্যাসিনী দৃষ্টি ফিরিয়ে, পবিত্রী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা এ সব কথা থাক না।'

পবিত্রী মা ঝটিতি একবার আমার দিকে দেখলেন, তারপর একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, বলবো না। তবে তুই যা ভাবছিস্, তা না। যা বোঝবার আমি ঠিকই বুঝেছি।'

বলে, আমার দিকে আবার ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা, শুনেছি তোমার ওই বইয়ের লেখক সাহেব নাকি ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বই লিখেছেন। তুমি পড়েছ?'

তার মানে বইয়ের লেখক সাহেব যে রমঁ্যা রলঁ্যা তা উনি জানেন, তা না হলে এ কথা জিজ্ঞেস করতেন না। আমাকে বিনীত লজ্জায় কবুল করতে হলো, 'আজ্ঞে না আমার পড়া নেই।'

পবিত্রী মা একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'লেখাপড়া শিখলে দেশ-বিদেশের অনেক কিছু জানা যায়। মূলে কিছু না হোক, খবর তো মেলে।'

সেটি আবার কি ব্যাপার। পড়াশোনা করলে মূলে কিছু না হোক, কেবল খবরই মেলে। পবিত্রী মা একটু হেসে তাকালেন, যেন আমার সম্মতি পেতে চাইলেন। কিন্তু কোনো জবাবের প্রত্যাশা যে তাঁর নেই, বোঝা গেল, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে তিনি চোখ বুজলেন। বিভ্রম এখনো আমার চোখে, তিনি চোখে কাজল মেখেছেন কী না। অথচ কাজলের স্পষ্ট দাগ কিছু দেখা যায় না। নতুন কিছু না, সংসারে এমন নারী ও পুরুষের দর্শন কখনো কখনো মেলে, যাদের চোখের পাতা এবং রং স্বাভাবিক কাজলকালো। গালে তাঁর তেমনি রক্তাভা। যেভাবে চক্ষু মুদ্রিত করলেন, মনে হলো সহসা উন্মোচন ঘটবে না।

চমকে উঠলাম ফিসফিস স্বর শুনে, 'এই যে, শোনেন, একটা পান খাইবেন?'

শ্রীমতী রমেন দাস্যা। দাস্যা বলা ঠিক হলো কী না জানি না, দাসী বলতে আটকায়। ইদানিং তো দেখছি, ক্রমে সকলেই দেবী হয়ে উঠছেন। কিন্তু, হঠাৎ এই পান দান কেন? মহাশয়া এখন স্থানও পরিবর্তন করেছেন দেখছি, আবার তিনি কর্তাকে সরিয়ে নিজে এগিয়ে এসেছেন। সম্ভবত পুত্রের জন্য। পান না দিয়ে, পুত্রটিকে একটু টেনে নিলেই খুশি হতাম। এবং এ রকম, চুপিচুপি ফিসফিস করেই বা কথা বলছেন কেন? বললাম, 'আমি পান খাই না।'

রমেন পত্নী হেসে, তেমনি ফিসফিস করেই বললেন, 'হেইটা আপনের মুখ দেইখ্যাই বোঝা যায়। তবু যদি খান, তাই কইলাম।'

বলে তিনি নিজের মুখেই খিলিটি পুরলেন। রমেন দাসের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, তিনি হাসি হাসি মুখ নিয়ে এদিকেই দেখছেন। তাঁরও গাল ফোলানো টেপা পানের খিলিতে। আমি কর্তা-গিন্নির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই, তাঁদের ঘুমন্ত ছোটটিব দিকে তাকালাম। একটু নড়াচড়ার কসরতও করলাম। দায় কেঁদে গিয়েছে, তাঁদের দৃষ্টি তখন মুদ্রিত চক্ষু পবিত্রী মায়ের দিকে। নিতান্ত গাড়ির ঝাঁকানিতেই যাঁর শবীর কিঞ্চিৎ আন্দোলিত। জগত সন্ন্যাসিনী একভাবেই নতমুখে আসীন।

ইতিমধ্যে আঁচ করে নিয়েছিলাম, সন্ন্যাসিনীদের কথায় কিঞ্চিৎ রহস্য ছোঁয়ানো। সেটাই স্বাভাবিক। আমিই ববং গৃহাঙ্গনের আটপৌরে ভাব ও ভাষা ধাবণা করে নিয়েছিলাম।

বাইবে অন্ধকার ঘনীভূত, প্রায় দেখতে দেখতে। আমার হাতে ঘড়ি ছিল না। সময়টা জানতে হবে, রমেন দাস বা অন্য কাবোকে জিজ্ঞেস করতে হয়। তাব কোনো দরকার নেই। সময়কে নিয়ে আমার সমস্যা নেই। রাত্রে, কোনো এক সময়ে বড় স্টেশনে, কিছু খেয়ে নেবাব দরকার হবে। এখনও তার দেরি আছে।

বাইরেব কিছুই দেখা যায় না। শীত বাড়ছে। কিন্তু গাড়ির আলো যে এমন শত্রুতা কববে, আগে বুঝতে পারিনি। এমনিতেই আলোর ঔজ্জ্বল্য বই পড়াব পক্ষে যথেষ্ট না। তাব ওপবে বসেছি এমন জায়গায় আলো একটু দূরে। পড়তে হলে সামনে ঝুঁকতে হয়। আর সামনে ঝুঁকলে, বমেন দাসের শিশুর গায়েব ওপর বই বাখতে হয়। তবু কষ্ট করেই, বইয়ের পাতা মেলে ধরলাম। গাড়ি বেশ বেগে চলেছে।

'জগত, অমন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকিস না, একটু আবাম করে বোস্।'

পবিত্রী মায়ের গলা শুনে, আমার ডানদিকে তাকালাম। ঠিক কতোটা সময় অতিবাহিত হয়েছে জানি না, পবিত্রী মা চোখ খুলেছেন। জগত বললেন, 'আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না মা। আপনি বরং এবার পা দুটো মেলে দিন, অনেকক্ষণ একভাবে বসে আছেন।'

পবিত্রী মা প্রথমাবধিই জোড়াসনে বসে ছিলেন। পা জোড়া সামনের দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তা বসছি, তুইও পা তুলে একটু ভালো করে বোস্।'

জগত সন্ন্যাসিনী ভাঁজ করা একটি কম্বল খুলে, পবিত্রী মায়ের পায়ের ওপর ঢেকে দিলেন। নিজেও পা দুটি গুটিয়ে নিলেন পিছনে। আর একটি কম্বল দিয়ে ঢাকা দিলেন নিজের কোমর থেকে পা অবধি।

পবিত্রী মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কিছু খাবি ?'

জগত মাথা নেড়ে বললেন, 'কিছু না, একটুও খিদে নেই।'

পবিত্রী মা বললেন, 'যখন পাবে খাস। আমাকে এবার একটু পান দে।'

অতএব জগত সন্ন্যাসিনীর আবার সেই ঝোলার মধ্যে হাত। এদিকে রমেন দাস দেখছি সপরিবারেই নিদ্রামগ্ন। অবিশ্যি কর্তা-গিন্নি দুজনেই এখনো বসা অবস্থায়, কিন্তু গায়ে একজনের চাদর উঠেছে, আর একজনের লেপের অংশ-বিশেষ। অথচ তাঁদের দখলে জায়গা অনেকখানি। গায়ে একটু ঢাকাঢাকি ঢুলুনি, শিবনেত্র ভাব, কামরার অনেকেরই।

'তোমার দেখছি কারোকে ঘাঁটাঘাঁটি করা ধাতে নেই।' পবিত্রী মায়ের স্বর শুনে তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম তাঁর লক্ষ্য আমি। আবার বললেন, 'ভালো, কিন্তু লোকের তো খেয়াল থাকা উচিত। ছেলেটিকে সরিয়ে নিয়ে শোয়ালেই, তুমি একটু ভালোভাবে বসতে পারো।'

আমার দুর্গত অবস্থাটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি! অবিশ্যি দৃষ্টি পড়লেই যে সবাই অনুভব করতে পারেন, তা মনে করি না। তার জন্যও দৃষ্টির একটা ভঙ্গি বা অনুভূতি থাকা দরকার। জগতের প্রসারিত হাত থেকে, খোশবু ছড়ানো পানের খিলি নিয়ে আবার বললেন, 'আমি হলে এতক্ষণে বলে দিতাম।'

স্বভাবতঃই একটু কৃতজ্ঞবোধ না করে পারি না, বললাম, 'একটা তো রাত, কেটে যাবে।'

পবিত্রী মায়ের হাতে পানটি তখনো ধরা, 'সে সহ্য গুণ তোমার আছে। কিন্তু লম্বা রাত তো, কষ্ট পাবে। সে রকম বুঝলে, তুমি জগতের ওপাশটায় গিয়ে বসতে পারো।'

জগতের ওপাশে! জায়গার অভাব অবিশ্যি নেই। আমি জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকালাম। তিনি নির্বিকার ভাবে একটু জর্দা তুলে পবিত্রী মায়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। তাঁর এই নির্বিকার শান্ত ভাবের মধ্যে আমি যেন একটি জাতসাপকে দেখতে পেলাম। প্রথম থেকেই তাঁকে আমার কঠিন ও রুক্ষ মনে হয়েছিল। তাঁর হাসিও দেখেছি, কথাও দু-চারটি শুনেছি। কিন্তু তাঁর টানা টানা চোখে একটি বিশেষ শাণিত ধার আছে। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট আর সুগঠিত নাকে, কোথায় একটা শক্ত ভাব আছে। তা ছাড়া, শুনেছি তাঁকে অনেক বড় মানুষরা জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী বলেছেন। কী দরকার আমার এমন একজনের পাশে যাবার ?

কারোর পাশেই আমি যেতে চাই না। বরং দুঃখ এই, বড় তুষ্টি ও সুখ

বোধ করেছিলাম, এই কোণের জায়গাটি নিয়ে। তা যদি আমার ভোগে না লাগে, নিরুপায়। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললাম, 'দরকার হবে না।'

পবিত্রী মায়ের ঠোঁটে চোখে সেই হাসিটি আবার জেগে উঠেছে। তিনি পান মুখে দিলেন। দৃষ্টি জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে। জগত সন্ন্যাসিনী ঠিক তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন কী না, বুঝতে পারছি না, কিন্তু বসে আছেন মুখোমুখি। দুজনে তাঁরা সখী নন, এটা মনে হয়েছে আগেই, তবু পরস্পরের মধ্যে বিশেষ একটা নিঃশব্দ বার্তা বিনিময়ের সংকেত কি আছে? দৃষ্টি দেখে, সেই রকমই মনে হয়। আমার দিকে না তাকিয়েই পবিত্রী মা বললেন, 'দরকার নেই, তাও জানি। কথায় কথায় ঠাঁইনাড়া হতে চাও না। তবু না বলে পারলাম না। জগতের ওপাশে তোমার অসুবিধে কিছু হতো না।'

আমি, ব্যস্তভাবে কিছু বলতে যেতেই, হাত তুলে বললেন, 'বুঝেছি গো, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।'

বলে জগতের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জগতের ঠোঁটেও যেন একটু হাসি দেখা দিল। পবিত্রী মা আবার বললেন, 'তোমার অসুবিধে কোথায়, তা বুঝতে পেরেছি। মন গুণে ধন, বাবা। বুঝি গো সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।'

কী বা কথার বাহার, অতি চমৎকার। ঠাট্টা না, প্রাণের ঝংকারে কথাটা বাজলো। এই সেই আটপৌরে কথা, এবং আমার নিজেরও কথা, 'মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন।' বচনে তিনি এমনই যথার্থ, যেন মন্ত্রের গুণ দিয়ে, আমাকে তাঁর আরো নিকটবর্তী করলেন। পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তবতার যাথার্থ্যবোধে যিনি কথা কইতে পারেন, তাই মন্ত্র হয়ে ওঠে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবো নাকি?

না, ও রকম একটা নাটুকে কাণ্ড আমার দ্বারা সম্ভব না। একে গেরুয়া রুদ্রাক্ষ প্রবাল বিভূতি, তদুপরি জটা ও সিন্দুর। প্রণাম করলেই, যাকে বলে সব কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ! ওর মধ্যে নেই। কিন্তু আবেগ ছাড়াই, আমার গলার কাছে একটা জিজ্ঞাসা এসে ঠেকে আছে অনেকক্ষণ ধরে। কৌতূহলটা মন থেকে তাড়াতে পারিনি। এখন তা ওষ্ঠাগ্রে এসে, কেমন একটা আকুলি-বিকুলি জুড়ে দিল। কথা উচ্চারণের আগে, আশেপাশে একবার দেখে নিলাম। না, কারো তেমন নজর নেই এদিকে। পবিত্রী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

পবিত্রী মা আমার মুখের দিকে দেখে, মুখ ফিরিয়ে, ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে। জগতও ঝটিতি চোখের পাতা তুলে, আমার দিকে

একবার দেখে নিলেন। পবিত্রী মায়ের কি বিষম লেগেছে? তিনি ঠোঁট টিপে ঢোক গিললেন। আমি যেন তাঁর গলার ত্বকের ভিতর দিয়ে, লাল রক্তের প্রবাহ নেমে যেতে দেখলাম। তাঁর গালের রক্তাভাও যেন আরো বেশি ঝলক দিয়ে উঠলো, সঙ্গে চোখেরও। বোঝা গেল, আমার প্রশ্ন তাঁদের দুজনকেই কিঞ্চিৎ অবাক করেছে। কিন্তু বেকায়দায় কিছু ভেবে বসেননি তো?

পবিত্রী মা আবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন। ইতিমধ্যে, প্রশ্ন করেই আমার মধ্যে অস্বস্তিবোধ জেগে উঠেছে। তিনি বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছ কেন বাবা? কী জিজ্ঞেস করবে?'

ভয়? পবিত্রী মায়ের? উনিশশো সাতচল্লিশ সালের শেষ, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর দিয়ে তাঁর চেয়েও কমবয়সী এক তরুণীকে নিয়ে চলেছেন, হলেনই বা সন্ন্যাসিনী, তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে ভয় পান? এও কি তাঁর মুখের মেলায়, নয়নপুরের খেলা! চোখ মুখ দেখতে পাই, অন্তরের দরজা আমার অচেনা। অবাক হয়ে বললাম, 'আমি আপনাকে ভয় দেখাবো? তা কী করে হয়? আপনার কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম।'

পবিত্রী মা আবার তাকালেন জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে। জগত একটু হেসে বললেন, 'জর্দা কিন্তু আপনার হাতেই রয়েছে মা।'

পবিত্রী মা যেন চমকে উঠে বললেন, 'ও মা, তাও তো বটে!'

বলে জর্দাটুকু মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ঠোঁট টিপলেন। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থেকে, আমার দিকে ফিরে, চোখ মেললেন। নিতান্ত নিজের চোখে না দেখলে, কাজলবিভ্রম লাল চোখ দেখে অন্য দ্রব্যগুণের কথা ভাবতাম। ঘাড় ঝাঁকিয়ে, যেন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন 'আমার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবে? তার জবাব কি আমি দিতে পারবো বাবা?

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না না, আপনার কথা মানে, আপনার বিষয়ে কোনো কথা না।'

পবিত্রী মা যেন অতিশয় বিভ্রান্ত বিস্ময়ে, জগতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে আবার কেমন কথা? আমার কথা, অথচ আমার বিষয়ে না? তুই কিছু বুঝতে পারছিস জগত?'

জগত হ্যাঁ না, বলে, ঠোঁট টিপে হাসলেন মাত্র। আমি আরো অধিক মাত্রায় ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে বললাম, 'না না, আপনি যে সেই:তখন আমাকে বললেন—।'

পবিত্রী মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আমার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন,

'তাই বলো। সেই কথাটা তো, তখন যে বলেছিলাম, তোমাকে দেখলেই চেনা যায়, তোমার মুখে দাগ আছে?'

আমিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'হ্যাঁ।'

পবিত্রী মা আবার জগতের দিকে তাকালেন, দৃষ্টি বিনিময় হলো দুজনের মধ্যে। এবং তার সঙ্গে বিনিময় একটু হাসিরও। কিন্তু পবিত্রী মা কি জেনে-শুনেই কথাটা বলেছিলেন নাকি? জানতেন, এ কথা আমি জিজ্ঞেস করবোই? তা হলে বলবো, সে ক্ষেত্রে ভাষার কারুমিতি তাঁর যতোই থাকুক, ইচ্ছাকৃত একটি প্রচ্ছন্ন চমক দেবার মতিও ছিল। একটু গম্ভীর ভাবেই বললাম, 'হ্যাঁ, আমার মুখ দেখে কী চেনা গেল? কিসের দাগ দেখলেন আপনি আমার মুখে?'

পবিত্রী মা যেন করুণ ব্যাকুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দুঃখের, দুঃখের দাগ দেখেছি বাবা. তুমি দুঃখী, এটাই চিনেছি, আর কিছু না। এ কোনো মন্ত্রতন্ত্রর কথা না, আমার মন যা বলেছে, তাই বলেছি। রাগ করলে না তো?'

বলতে বলতেই দেখলাম, তাঁর চোখের তারা দুটি যেন চিকচিক করে উঠলো। আর আমি? আমার অবস্থা? মনে হলো, বুকের কাছে নিঃশ্বাস আটকে গিয়েছে। আবেগের বন্যায় আমি ভেসে যাচ্ছি, তা বলবো না, কিন্তু নিজের জীবনের পরম সত্য, এমন একজনের কাছে এমন করে শুনলে, একটা তীব্র কষ্ট বুকের মধ্যে টনটনিয়ে ওঠে। তার সঙ্গে একটা বিস্ময়ের ঝলকও যেন বিদ্যুতের মতোই বুকের মধ্যে চিরে দিয়ে যায়। এ তো গৃহাঙ্গনেরই পরমাত্মীয়ের কথা। আমি কয়েক মুহূর্ত পবিত্রী মায়ের মুখ থেকে চোখ ফেরাতে ভুলে গেলাম।

তিনি আবার বললেন, 'ভুল বলেছি বাবা?'

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে, মুখ নামিয়ে নিলাম। চেষ্টা করতে লাগলাম, আমার কষ্টের অনুভূতিকে সংবরণ করার। মুখ নামিয়ে নিলেও, আমার দৃষ্টি এড়ালো না, জগত সন্ন্যাসিনীর হাত আস্তে আস্তে পবিত্রী মায়ের পা চেপে ধরলো, এবং ধীরে ধীরে পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। রাত্রের গাড়ি বেগে ধাবমান। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। কাঁচের জানালা দিয়ে, চকিতে একটা আলোর বিন্দু দূরে জেগে উঠেই, জোনাকির মতো মিলিয়ে যায়। হঠাৎ আমার কানে, নিচু সুরের গুনগুনানি ভেসে এল। পবিত্রী মায়ের স্বর শুনতে পেলাম, 'বাহ্! গা না একটু।'

মাথা তুললাম না, কিন্তু উৎকর্ণ হলাম। নিঃসন্দেহে জগতকেই তিনি কথাটা বলেছেন, এবং জগত-ই গুন গুন করে সুর ধরেছেন। তারপরেই খুব নিচু স্বরে শুনতে পেলাম :

'কত আর দিবি ব্যথা, করবি অপমান
তুই আমার পরম স্বর্গ, সকল মানের মান।'…

মনে মনে আমিও বলি, বাহ্! জগত সন্ন্যাসিনীর গলা যে এত মিষ্টি হতে পারে, বিশেষত গানের সুরে, একবারের জন্যেও মনে হয়নি। এ গান যে কেবল মিষ্টি সুরের তা বলা যায় না। কেমন একটা বিশ্বাস আর উৎসর্গের আবেশ ভরা। মুখে আমি যতোই বলি, আবেগে ভাসবো না, কিন্তু জলের ধারা শুকনো মাটিতেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে চুঁইয়ে ঢোকে। নিশ্চিতই, জগত সন্ন্যাসিনী যে বিশ্বাসের উৎসর্গে গান করেন, আমার তা কোনোটাই নেই। কে তাঁর পরম গর্ব, সকল মানের মান, আমি জানি না। আমার অনুভূতিতেই তা অনুপস্থিত। কিন্তু সমাজ-সংসারের দেওয়া ব্যথা ও অপমানের দাগ যে আমার সর্বাঙ্গে, সেটা বড় নিষ্ঠুর সত্যি। সেই জন্যই বোধ হয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলের ধারা গভীরে নামে।

জগত সন্ন্যাসিনী তখনো নিচু স্বরে গাইছেন—

'যদি দুঃখ দিতে ভালোবাসো—দিও
সুখ যদি দিতে চাও তাহাও দিও
তবু তোমারে না ছেড়ে যাব, ত্যাজব পরাণ।
কত আর দিবি…'

সংসারে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা, জীবনের ক্ষেত্রে অতি নিষ্ঠুর সত্যি, তথাপি, জগত সন্ন্যাসিনী যেন কমলের দল মেলে দিলেন। তার মতো সুখ-দুঃখকে ছোট করে দেখার সাধ্য আমার নেই। সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করে, কাকে পাবার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতেও তিনি রাজী, তার কোনো উপলব্ধিও আমার নেই। তথাপি,এক বেদনাভরা মুগ্ধতায় আমার মন ভরে উঠলো। এ মুগ্ধতা অনেকটা যেন প্রকৃতির রহস্যকে চাক্ষুষ করার মতো, ফুলকে ফুটে উঠতে দেখা।

দেখছিও তো তা-ই। জগত সন্ন্যাসিনীর চুলের জটা চূড়া করে বাঁধা, কপালে বিভূতি চিহ্ন আঁকা, এ সবকিছু ছাপিয়ে আমার চোখের সামনে ফুটছে একটি শ্যামলী ফুল, ভোরের শিশির জমছে বড় বড় ফোঁটায় তাঁর চোখের কোলে। আপন ভারে নতফুলটি আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ে পবিত্রী মায়ের পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে দেন পবিত্রী মায়ের পায়ের ওপর। পবিত্রী

মায়ের ফরসা একটি হাত নেমে আসে তাঁর মাথার ওপরে, মাথার ওপর থেকে টেনে আঁচড়ে তোলা চূর্ণ চুল ছড়ানো ঘাড়ের কাছে। তাঁরও কাজলকালো চোখ বোজা, গাল বেয়ে নামছে জলের ধারা।

আমি নিতান্ত দর্শক, মুগ্ধপ্রাণ সত্যি, কিন্তু অবিশ্বাসী। যদি বলি, এঁরাও আত্মসম্মোহিত, মন ঘাড় বাঁকিয়ে উঠতে চায়। সম্মোহিতের দৃষ্টি কি মুখ দেখে দুঃখীকে চিনতে পারে, দুঃখের দাগ দেখতে পায়? তাও কী না, আমাব মতো একটি ফিটফাট গোছের ভদ্রস্থ চেহারার মধ্যে, হাতে যার ইংরেজি নভেল! কিন্তু বলতে হয়, অমোঘ তাঁর মন্তব্য। সত্যকে চিনিয়ে দেওয়ার সে রূপ এটা না, খঞ্জকে খঞ্জ বলা, অন্ধকে অন্ধ, অথচ সাড়ম্বর উন্মোচনও বলতে পারি না। যেন ঘর করতে, অনায়াসে, সরার ঢাকা খুলে চোখে দেখে, আপন মনে বলা। দুঃখীটার লেগেছে অব্যর্থ জায়গায়, তথাপি, তারপরে জগত সন্ন্যাসিনীর এই গান, এবং চোখের জলে দুজনের এই সমাহিত ভাব, এ কোন্ গভীর বিশ্বাসজাত? কী তাঁদের বিশ্বাস, জানি না, কিন্তু দুঃখ অপমানের মধ্যে, কোনো একটা বিশ্বাসের কাছেই, আমি এমন করে নিজেকে সঁপে দিতে পারিনি। বিশ্বাসই সন্ধানের সূত্র। বিশ্বাস থাকলে, সন্ধান আসে, সন্ধান থেকে উৎসর্গে, সম্ভবত বিশ্বাসের জগতের এটাই ধরন। কিংবা কে জানে, সন্ধান করেই হয়তো বিশ্বাসকে পেতে হয়। নিজের মধ্যে আমি তার কোনো অঙ্গীকার দেখি না। কথায় বলে, বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বাঁচে, তা সে যে-বিশ্বাসই হোক, জীবন দানে বা হননে, যে-কোনো ভালো বা মন্দে। এঁদের দেখে নিজের একটা করুণ আফসোস হচ্ছে, কারণ বিশ্বাসের মধ্যে একটা আনন্দ আছে।

দেখছি, আশেপাশে কারোরই তেমন এদিকে লক্ষ্য নেই। এমন যে ভক্ত দম্পতি রমেন দাস ও তার স্ত্রী, সকলেই দেখছি, গাড়ীর দোলায় দুলে দুলে ঘুমোচ্ছে। এখনো তেমন রাত্রি হয়নি। সম্ভবত দ্বিপ্রহরের যাত্রায়, ইতিমধ্যেই অনেকে ক্লান্ত। অবিশ্যি গাড়িও অনেককে ঘুম পাড়ায়, তার চলার ছন্দে একটা ঘুমপাড়ানি সুর আর তাল আছে। সেইদিক থেকে দুশ্চিন্তাটা আমার। সেই ছেলেবেলার মায়ের কোলে অবাধ্যতাটা গাড়িতে চড়লেই আরো বাড়ে। কারসাধ্য, দু চোখের পাতা এক করায়। এদিকে সন্ন্যাসিনীদের যা অবস্থা দেখছি, সহজে সমাহিত ভাব কাটবে বলে মনে হয় না।

পবিত্রী মায়ের একান্ত মানবিক কথা ও হাসির সঙ্গে, দুজনের এ ভাবটাকে ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। কিন্তু অলৌকিকতাও কিছু নেই। আমার বাবার গান শুনে, তাঁর গুরুদেবকে হাসতে কাঁদতে, নাচতেও দেখেছি। ছেলেবেলায়

একটা কথা শুনেছি, চোখেও দেখেছি, 'দশায় পাওয়া' বা 'দশাগ্রস্ত'। সেটা দেখেছি বৈষ্ণবদের মধ্যেই বেশি, কৃষ্ণ নাম শুনতে শুনতে, হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়া, তাকেই বলে 'দশায় পাওয়া'। সত্যি বলতে কি, খুবই কৌতুক বোধ করতাম। অথচ, 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রা দেখতে দেখতে চোখের জল গলেছে আমারও। সেটা ভক্তের সমাহিত অবস্থা না। কারণ চোখের জল তো অনেক বই পড়তে পড়তেও গলেছে। অনেক সামাজিক ঐতিহাসিক যাত্রা থিয়েটার দেখেও। কিন্তু হঠাৎ পবিত্রী মায়ের কথার পরেই, জগত সন্ন্যাসিনীর গান, আমার এই চব্বিশের চোখ দুটিকে প্রায় গলিয়ে দিয়েছিল। তার রেশটা সহজে কাটবার না।

বেগে ধাবিত গাড়ির গতি সহসা মন্দীভূত হলো দেখতে দেখতে, গাড়ি দাঁড়ালো এক বড় স্টেশনে। তখনই প্রায় আমার হাঁটুর কাছেই ছোট্‌কাটা ককিয়ে উঠলো চিৎকারে। আমি তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। শীতের রাত্রি দীর্ঘ সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাপ্রাণীটি ইতিমধ্যেই কাত হয়ে পড়েছে। পেটের আখায় কয়লার দরকার, আঁচটা দিয়ে রাখাই ভালো।

গাড়ী থেকে নেমে দেখলাম, মস্ত জংশন স্টেশন। যাত্রী ওঠা-নামার ধাক্কাধাক্কি চলছে। খাবারের সন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, গাড়ি এখানে আধঘণ্টা দাঁড়াবে। এঞ্জিনের অগ্নিভোজ, জলপানও চলবে। আমিনগাঁও অবধি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ধাক্কা। আগে নাকি এ গাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা ছিল। ইদানিং সবই গণ্ডগোল, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের ঝকমারি, এ গাড়ি এখন পিতৃমাতৃহীন। প্রচার মোতাবেক, শীঘ্রই নাকি আসাম যাত্রার পথঘাট বদল হবে। যার যার দেশের গাড়ি তার দেশের ওপর দিয়ে চলাচল করবে। এ গাড়িকে এখন রাম রহিম, কেউ আপন জ্ঞানে দেখে না। অতএব…।

ইস্তক ধূমপান শেষ করে যখন গাড়ীতে উঠলাম, গাড়ির গতর নাড়ানার তেমন উদ্যোগ দেখা গেল না। কিন্তু নিজের জায়গার দিকে যেতে গিয়ে, দূরেই থমকে দাঁড়াতে হলো। সন্ন্যাসিনীদেরও তাহলে, মহাপ্রাণীটি আছে, তার তুষ্টিবিধানও করতে হয়! দেখছি, তাঁরা দুজনেই কিছু খাচ্ছেন, একটু ঠেক লাগছে, তাঁদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোক দেখে। মাথার সামনের দিকে আঁচড়ানো ছোট সাদা কালো চুল মুখে গোঁফ-দাড়ি গায়ে গেরুয়া রঙের ফতুয়ার মতো একটি জামা, সেই রঙেরই ধুতি

প্রায় হাঁটুর কাছে উঠেছে। গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা। ইনি আবার কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন? খেতে খেতেই, পবিত্রী মা তাঁকে কিছু বলছেন। তিনি হেসে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন'।

জগত সন্ন্যাসিনী উঠলেন। ফতুয়া গায়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত হলেন। দেখলাম তিনিই তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে বসে, কুঁজো থেকে পাথরের গেলাসে জল গড়িয়ে দিলেন। এই সময়ে গাড়ির বাঁশি বেজে উঠলো। জগত সন্ন্যাসিনী ভদ্রলোকের দিকে দুটি পাত্র বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোক আগে সন্ন্যাসিনীদের প্রণাম করলেন, তারপরে পাত্র দুটি হাতে নিয়ে এদিকেই অগ্রসর হলেন। কৌতূহল বোধ করলাম, ব্যাপার কী?

গাড়ি দুলে উঠলো। ভদ্রলোক আমার পাশ দিয়েই, দ্রুত দরজা দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। গাড়ি ছাড়লো। আরো কয়েকজনের সঙ্গে, ভদ্রলোক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে হাতের পাথরের পাত্রসুদ্ধই একবার কপালে ছোঁয়ালেন। এর একটাই অর্থ, সন্ন্যাসিনীদের খাবার ব্যবস্থা এখানেই করে রাখা ছিল। যাঁর দায়িত্ব, তিনি পালন করে গেলেন। খানিকটা দূর থেকে দেখে মনে হলো, খাদ্যবস্তু তণ্ডুল জাতীয় কিছু না, বোধ হয় কিছু মিষ্টি আর ফল। বিপরীত দিকেও খাবার পালা চলেছে। রমেন দাস সপরিবারে রুটি তরকারি' ইত্যাদি খাদ্যবস্তু নিয়ে আহারে ব্যস্ত। ছোট্‌কাটা দু' হাতে খাবার নিয়ে ঘাঁটছে। খাওয়ার থেকে ছড়াচ্ছেই বেশি। কিন্তু বড়কাটা—অর্থাৎ বছর তিনেকেরটা বসে বসে, মায়ের কোলের কাছে ঝিমোচ্ছে, মা তার মুখে খাবার গুঁজে দিচ্ছেন, নিজেও খাচ্ছেন।

এগোতে ইচ্ছা করলো না। রমেন দাস পরিবারের খাবার পর্বটা মিটুক, তারপর জায়গায় যাওয়া যাবে। আপাতত আর একবার ধূমপান সেরে নেওয়া যাক। খাবার পরে একাধিক ন দোষায়ঃ! তারপরে একেবারে বাথরুমের কাজটাও···অতএব সিগারেট ধরালাম। জগত সন্ন্যাসিনীকে দেখেই বুঝতে পারছি, ঝোলা থেকে নিশ্চয় সেই বাহারি রুপোর পাত্রটি বের করে পবিত্রী মাকে পান দেবার কাজে ব্যস্ত। কামরায় কিছু কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া চললেও, শীত এবং নিদ্রায় অনেকে কাতর হয়ে পড়েছে। খুব স্বাভাবিক। রাত্রের সঙ্গে সঙ্গে শীতও বেশ বাড়ছে। জানালা দরজা একটিও খোলা নেই, তথাপি মনে হচ্ছে কনকনে বাতাস ছোবল দিয়ে যাচ্ছে। গোটা কামরাটা রাত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো ঠাণ্ডা হচ্ছে। উত্তর দিগন্তে শৈত্যমহিমা!

'খাওয়া-দাওয়া করলেন কিছু?'

আমার সামনেই রমেন দাস। এখনো এঁটো হাতের আঙুলে জিভ ছোঁয়াচ্ছে। হাত ধোবার জন্যই উঠে এসেছেন, গন্তব্য বাথরুম নিশ্চয়? বললাম, 'করেছি।'

রমেন দাস বাথরুমে এগোতে এগোতে বললেন, 'খাড়ান, হাত ধুইয়া আসতে আছি।'

আসেন, আমি খাড়াই আছি। লোকটি খারাপ না, হাত-মুখ ধুয়ে, ধুতির কোঁচা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এলেন। একটি বিড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের লগে আর কিছু কথাবার্তা হইল নাকি?'

আমি বললাম, 'বিশেষ কিছু না।'

রমেন দাস বললেন, 'তয় আপনারে কইতে আছি, আপনের উপর মায়ের একটু কিরপা হইছে। গোহাটি গিয়া সময় পাইলে, কামাখ্যায় মায়েরে দর্শন কইরেন, ভালো হইবে।'

যাত্রা আমার তীর্থে না, তবে গৌহাটি যখন যাচ্ছি, কামাখ্যা পাহাড়ে নিশ্চয়ই যাবো। সেই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে, একবার ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন না করলে, ফিরে যাবো কি নিয়ে। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি বুঝি খুব বড় সাধিকা?'

রমেন দাস যেন বিষম খেলেন, বললেন, 'সাধিকা? কন্ কী? ওনার কি সাধনার আর কিছু বাকী আছে নাকি? উনি সাইক্ষ্যাত কামাখ্যা দেবীর অংশ। সেই মূর্তি তো দেখেন নাই, গলায় সাপের মালা পইরা, ত্রিশূল লইয়া যখন বাঘছালের আসনে বসেন, গায়ের মধ্যে কাঁপ ধইরা যায়।'

কাঁপটা প্রায় আমাকেও ধরলো, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাপের মালা মানে সাপ নাকি?'

'সাপ! কন যে কালনাগিনী, সে ভাই মহাসর্প।' রমেন দাসের চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বললেন, 'কী কমু আপনেরে, এমন সোন্দর লাগে, কিন্তু ডরও লাগে। সাপের হেই কি ফোঁসফোঁসানি, মায়ের গলায় ব্যাড় দিয়া, মাথায় ফণা গোঁজে, জিভ্ দিয়া মায়ের মুখ চাটে!'

শুনতে শুনতে, আমার শিরদাঁড়ায় শিহরণ লাগে। ব্যাপারটা কল্পনা করতেই যেন সারা গায়ে অস্বস্তি লাগে।

বীরভূমের সাঁওতাল পরগণা সীমান্তে, মলুটি গ্রামে সাপুড়েদের সাপ নিয়ে নানা খেলা দেখেছি। গলায় জড়ানো, সাপের মুখ চুম্বন, বিস্ময়কর নানাবিধ খেলা। কিন্তু পবিত্রী মায়ের গলায় কালনাগিনী চিন্তা করতে গেলে ঠেক লেগে যায়।

রমেন দাস আবার বললেন, 'মায়ের আশ্রমে গেলেই বুঝতে পারবেন, আপনের অন্য রকম লাগব। কত বড় বড় সাধক পুরুষ ইস্তত পবিত্রী মায়ের পায়ে লুটাইয়া, মা মা কইরা ডাকে। উনি কি আর সাধিকা আছেন? উনি অখন দেবী।'

ইত্যবসরে রমেন দা ের স্ত্রীও এগিয়ে এলেন ছোট্‌কাটাকে কোলে নিয়ে। বড়কাটা লেপের তলায় ঢুকে পড়েছে। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্য করলেন, তারপরে কর্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মায়ের কথা কও বুঝি তোমরা?'

রমেন দাস বললেন, 'হ, ছোট ভাইটিরে কইতে আছি ওনার উপুর মায়ের একটু কিরপা হইয়াছে।'

স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে একমত, বললেন, 'সত্যই, মায় আপনেরে য্যান্ একটু অন্য নজরে দেখছেন তয় মায় অনুমতি করতেই, আপনের সিগারেট খাওনটা, ঠিক কাম করেন নাই। আমি আপনের দিদি বউদি হইলে, খাইতে দিতাম না।'

বলেই তিনি বাথরুমে ঢুকে গেলেন। রমেন দাস সশব্দে হাস্য করলেন, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'কথাখান বোঝলেন ত? সবই পবিত্রী মায়ের দয়া। আপনেরে যে মায় একটু সুনজরে দেখছে, তাতে আপনের বউদিরও আপনেরে ভালো লাগছে, হেইর লেইগাই মন খুইলা কথা কইল।'

আপনের বউদি! মানে, আমার? অবিশ্যি, ডিব্রুগড়দাদার সঙ্গে ডিব্রুগড়-বউদি, আমি আগেই মনে মনে বলেছিলাম। অখন দাদা নিজেই বাজেন। ক্ষতি কী! যেচে ভাব করাটা আসে না। দরকার হলে, এখন থেকে না হয় বউদি-ই বলবো।

বউদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে, স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'প্রাণতোষ ভৈরববাবার কথা ওনারে কইছ?'

রমেন দাস একটু সচকিত হয়ে বললেন, 'না, কই নাই ত!'

বউদি চলে যেতে যেতে বললেন, 'কও।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে রমেন দাসের দিকে তাকালাম। উনি বললেন, 'প্রাণতোষ ভৈরববাবা একেবারে সাইক্ষ্যাত শিব, কইতে পারেন কামাখ্যা মায়ের যেমুন উমানন্দ, পবিত্রী মায়ের তেমুন প্রাণতোষবাবা। আশ্রমের নামও প্রাণতোষ ভৈরব আশ্রম।'

নতুন কথা শুনছি! তাও আবার কামাখ্যা দেবীর যেমন উমানন্দ, পবিত্রী মায়ের তেমনি প্রাণতোষ ভৈরববাবা।

সাক্ষাৎ শিব! সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! ভৈরব-ভৈরবী বৃত্তান্ত অল্প-স্বল্প দেখা বা জানা নেই, তা না। কিন্তু পবিত্রী মায়ের ক্ষেত্রে, কোনো ভৈরবের কল্পনা আমার মাথায় আসেনি। এক তো, পবিত্রী মায়ের সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি, সুগন্ধি পান র্জদা, কোয়েই, এবং এই সব ব্যতিরেকেও, একটি বিশেষ সুগন্ধ তাঁর অঙ্গ থেকে সদাই প্রবাহিত। এক ফালি জটা, বিভূতি চিহ্ন, রুদ্রাক্ষের নানা আভরণ না থাকলে, তাঁকে সম্পন্ন গৃহের বিলাসিনী বধূ বলা যেতো। তাঁর কালো চোখে কাজলের বিভ্রম, কপালে সুগোল সিন্দুরের ফোঁটা, এবং আচরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলস্যের ভঙ্গি, হাসি, কথা সবই সেই রকম একটি ভাব এনে দেয়। যা বলে দিতে হয় না, অথচ অনুভব করা যায়, তাঁর কোথায় একটি কঠিন ব্যক্তিত্ব, খাপে ঢাকা ছুরির মতো গুপ্ত আছে, যার ছিটেফোঁটা টের পাওয়া গিয়েছিল, রমেন দাস ও তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর কথা ও আচরণে। তাঁর ধর্মাচরণের কিছুই প্রায় টের পাইনি, একমাত্র জগত সন্ন্যাসিনীর গান শুনতে শুনতে, তাঁর মুদ্রিত চক্ষু-তন্ময়তা, চোখের জলে ভেসে যাওয়া।

তথাপি, এই সবকিছু মিলিয়ে, তাঁকে আমি একজন ভৈরবী চিন্তা করিনি। কোনো ভৈরবের কল্পনাও আমার মনে আসেনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই প্রাণতোষ ভৈরববাবাও কি একই আশ্রমে থাকেন?'

রমেন দাসের চোখে বিস্ময়, কালো কুচকুচে মুখে পানের ছোপ ধরা লাল দাঁতের হাসি। বললেন, 'বাবায় আবার কই থাকবেন? বাবারই ত আশ্রম। তয় হ, বাবার দেখা আপনে কমই পাইবেন। মায়ের দেখাও যে সব সময় পাইবেন, তা না। বাবারে লোকে ক্ষ্যাপা বাবাও কয়, বাবায় নাকি মাঝে মাঝে ক্ষেইপ্যা যান। আমি কোনোদিন দেখি নাই ভাই। মিছা কথা কমু ক্যান, আমি বাবারে বেশ ঠাণ্ডা দেখছি। আপন মনে বইস্যা বইস্যা, চউখ বুইজা, খালি ঢোলেন, আর হাসেন।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঢোলেন?'

রমেন দাস বললেন, 'হ। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঢোলেন না, এমনেই ঢোলেন, কথাবার্তা বিশেষ কন না।'

আশ্চর্য! অন্য কারোর জন্য না, নিজেকে নিয়ে। মন কেমন খারাপ হয়ে গেল, প্রাণতোষ ভৈরবের কথা শুনে। অশ্চর্যটা সেইখানেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, উনি কে, আর একজন যিনি সঙ্গে রয়েছেন?'

রমেন দাস বললেন, 'চিনি না, ওনারে আগে কোনোদিন দেখি নাই। মনে লয় নতুন দীক্ষা লইছেন।'

রমেন দাস পকেট থেকে একটি সিগারেটের ডিবে বের করে, তার মুখ খুলে, পানের খিলি নিয়ে মুখে দিলেন। আবার একটি বিড়ি ধরালেন। আমার ধূমপান শেষ। বললাম, 'যাই, বসি গে।'

রমেন দাস বললেন, 'হ যান।'

আমি গাড়ির ঝাঁকানির টাল সামলে এগিয়ে গেলাম। বিরক্তিকর। আমার বই কম্বল প্রায় কোণে ঠাঁই নিয়েছে। রমেনবউদি প্রায় সবখানি জায়গাই দখল করেছেন। চেষ্টায় আছেন, ছোট্‌কাটাকে ঘুম পাড়াবার। ছোট্‌কা বলেই বোধ হয় টেটিয়া বেশি। লেপের ভিতর থেকেও হাত পা ছুঁড়ছে। আমি কম্বলটা হাতে তুলে নিয়ে, পাতা শতরঞ্চির ওপর বসলাম। পা মেলতে গেলে, বউদির গায়ে লাগার সম্ভাবনা। কম্বলটা কোলের ওপর রেখে, বইটা টেনে নিলাম।

'এই যে মা শুনছো। একটু সরে বসো, ছেলেটাকে বসতে দাও।'

পবিত্রী মায়ের স্বর, বলছেন বউদিকে। বউদি লজ্জা পেয়ে হাসলেন, বললেন, 'বড় পোলাটা এমুন জায়গায় শুইছে, লড়াইতে পারি না। অর বাবায় আসুক, সরাইয়া দিব।'

লড়াইতে মানে নড়াতে। বউদি আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন, এবং চেষ্টা করলেন একটু সরে যাবার। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো পবিত্রী মায়ের বসার ধরনটা। তিনি হাঁটু মুড়ে, পায়ের গোড়ালি জোড়ার ওপর শরীরের ভার রেখে সোজা হয়ে বসেছেন। দু'হাত দু'ই হাঁটুর ওপরে। মুখ একটু একটু নড়ছে, পান চিবোচ্ছেন। চুঁইয়ে আসা তাম্বুলের রসে, তাঁর ঠোঁট রীতিমত রক্তাভ দেখাচ্ছে। তাঁর বসার ভঙ্গিতেই বোধ হয়, শরীরের সম্মুখ ভাগ এখন যেন উদ্ধত দেখাচ্ছে। এ আসন আমার অপরিচিত না। আমার পিসেমশাইকে দেখেছি, খাবার পর তিনি এই রকম আসন করে কিছুক্ষণ বসেন।

পবিত্রী মা বউদিকে কথাটি বলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। জগতকে তখন বলছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি, নাম সবই লেখা হয়েছে। অবিশ্যি পুষ্পাবনের সময় যারা আসবে, তারা কেউ আশ্রমে উঠবে না, যে যার পাণ্ডার বাড়িতেই উঠবে। তবু আশ্রমে ভিড় থাকবেই। তবে তুই আসছিস, তারা আছে, রেবাও কলকাতা থেকে আসতে পারে, আমার ভাবনার কিছু নেই।'

জগত বললেন, 'শুধু শুধুই ভাবছেন। আজ পর্যন্ত আপনার কোনো কাজ কি পড়ে থেকেছে?

পবিত্রী মা বললেন, 'তা পড়ে থাকেনি, ওইটিই তাঁর দয়া। তা ছাড়া,

এখনতো আমি আরও ঝাড়া হাত-পা। আমার এখন জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী আছে।'

জগত সন্ন্যাসিনীর মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। তিনি চোখের তারা ঘুরিয়ে, ঝটিতি একবার আমাদের দিকে দেখে নিয়ে বললেন, 'আমি মোটেই আমার কথা বলতে চাইনি।'

পবিত্রী মা ঢোক গিলে বললেন, 'তুই বলবি কেন, আমিই তো বলছি।'

তথাপি জগতের মুখে লজ্জার ছটা লেগে রইল, অথচ তাঁকে যেন একটু গম্ভীরও দেখাচ্ছে। জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী যে জগত সন্ন্যাসিনীকেই বলা হয়েছে, তা আগেই শুনেছিলাম। অনেক মহাপুরুষ নাকি জগতকে এই নাম দিয়েছেন, আমি যার কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। জগদ্ধাত্রী বললে আমার মতো মানুষের চোখে সিংহবাহিনী প্রতিমা মূর্তি ফুটে ওঠে। অবিশ্যি জগত শ্যামলী হলেও, তাঁর চোখ, মুখ আর দৃষ্টির মধ্যে, কেমন একটি প্রতিমা ভাব আছে।

পবিত্রী মা আবার বললেন, 'তবে, তোর তো এখন অনেক কাজ। পুষ্পাবন পরব দেখতে দেখতে এসে যাবে। তোকে তো আমি ভিড়ের মধ্যে টানাটানি করতে পারবো না।'

বলতে বলতে তিনি, আসন বদল করে, সামনের দিকে পা মেলে দিয়ে বসলেন। দেখলাম, তাঁর পা দুটি অসম্ভব লাল দেখাচ্ছে। সম্ভবত এতক্ষণ চেপে বসার জন্য। তবু পায়ের তলার যতোটুকু অংশ চোখে পড়ছে, দেখে হঠাৎ ভ্রম হয়, আলতা লেপেছেন। কিন্তু আলতা তিনি পরেননি। তাঁর হাতের তালু, এবং হাত ও পায়ের আঙুলের নখের রক্তাভাও অসাধারণ, অথচ স্পষ্টতঃই লক্ষণীয়, রঙ দিয়ে নখ রঞ্জিত করেননি।

এদিকে দেখছি, রমেন দাস বেশ গুছিয়ে শুয়েছেন। বড় ছেলেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজের কাছে। দুজনের গায়েই লেপ। বউদি আধশোয়া, ছোট কাটা তাঁর কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে। লেপ জড়িয়েছেন তিনিও। আমি এখন ইচ্ছা করলে, পা দুটো অনেকখানি ছড়িয়ে দিতে পারি। দরকার হলে, গুটিয়ে শুতেও পারি। কিন্তু ইচ্ছা করছে না, গোটা কামরাটাই, লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এক-আধজন বসে আছে, একটু-আধটু কথাবার্তা বলছে।

জগত একটি মোলায়েম, সোনালী পাড়ে মোড়া কম্বল পবিত্রী মায়ের পায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেন।

পবিত্রী মা বললেন, 'তুইও কম্বল জড়িয়ে একটু শো। ক'দিন কম ধকল যায়নি।'

জগত বললেন, 'আমার চেয়ে আপনার ধকল বেশি হয়েছে। আপনি বরং একটু শোন। আমার ঘুম পেলে, শুয়ে পড়বো।'

পবিত্রী মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি ঘুমোব? সে কপাল কি করেছি!'

বলতে বলতেই একবার আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁদের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। একটু অপ্রস্তুত হয়ে, তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালাম। উনি যে হঠাৎ এদিকে ফিরবেন, ভাবিনি। বইটা তুলে নিলাম হাতে। কিন্তু পবিত্রী মা কিছু বললেন না। নত মুখেও টের পেলাম, তিনি পিছন দিকে সরে, কাঠের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখা নরম বালিশে হেলান দিলেন। তবে, কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। এমন কী তাঁর কপালের দোষ যে ঘুমোতেও পারবেন না! এমন সুন্দর নরম শয্যা, কোমল মোটা কম্বল, বালিশ, এবং তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে বরং এ রকম ধারণা হয়, তিনি আয়েশ করে একটি নিদ্রা দেবেন।

জগত পবিত্রী মায়ের কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। নিজের কম্বলটি সারা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলেন।

'কী গো, তোমার কি ঘুম টুম নেই? বই পড়েই রাত্রিটা কাটাবে?'

পবিত্রী মায়ের প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলছেন?'

পবিত্রী মায়ের রক্তিম দৃষ্টিতে তেমনি ঢুলুঢুলু ভাব, মুখে হাসির আভাস। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও দেখছি, আর দশটা ছেলের মতো ন্যাকা আছো। আর কারোর হাতে তো বই দেখছি না। তোমাকে না তো কাকে জিজ্ঞেস করছি?'

ন্যাকা! এতটা আশা করিনি। তা ছাড়া, আর দশটা ছেলের মতো না হয়ে, অন্য কী হওয়া যায়, আমার কোনো ধারণা নেই। তা বলে, আমি ন্যাকামি করেছি এটা ঠিক না। বুঝেছিলাম ঠিকই প্রশ্নটা আমাকে করেছেন তবু একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে, সেইজন্যই জিজ্ঞাসা। হেসেই বললাম, 'ন্যাকামো করিনি।'

পবিত্রী মা একটু ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন, বললেন, 'তবে? আমার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে নেই বুঝি?

আমি তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না তো?'

পবিত্রী মা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইচ্ছে আছে তাহলে?'

এ রকম করে বললে অস্বস্তি হয়, লজ্জাও পাই। বললাম, 'হ্যাঁ আছে।'

'জানি থাকবে।' বলে মুখ ফিরিয়ে জগতের দিকে তাকালেন, তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় হলো। পবিত্রী মা আবার আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে জবাব দাও আমার কথার।'

তাঁর 'জানি থাকবে' কথার অর্থ ঠিক বুঝলাম না। বললাম 'আমি ট্রেনে ঘুমোতে পারি না—মানে, ঘুম আসে না।'

পবিত্রী মা যেন ভারি খুশি হয়ে বললেন, 'খুব ভালো। তোমার সঙ্গে সারা রাত গল্প করা যাবে।'

তিনি গল্প করবেন আমার সঙ্গে? কী গল্প? আমিই বা তাঁর সঙ্গে কী গল্প করবো? যতোদূর মনে হয়, তাঁর আর আমার জগত আলাদা। কোনো গল্প দিয়েই, তাঁর আর আমার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভব না।

পবিত্রী মা আবার বলে উঠলেন, 'কথা কইতে জানলেই হয়। তোমাকে দেখে তো মনে হয়, কইয়ে-বলিয়ে আছো।'

আমি প্রায় সঙ্কটে পতিত অবস্থায় বললাম, 'না না, আমি মোটেই কইয়ে-বলিয়ে নই।'

পবিত্রী মা হেসে উঠে জগতের দিকে তাকালেন। জগতও হাসলেন, তাঁর গলার কাছে ঢাকা কম্বল ঠোঁটের ওপর উঠে এল। পবিত্রী মা আবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'নও? বেশ, তবে আমি তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নেবো। একটা কথার জবাব দাও তো, তুমি পিতৃভক্ত বেশি, না মাতৃভক্ত?'

অদ্ভুত জিজ্ঞাসা! ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই রকম প্রশ্ন, বাবাকে বেশি ভালোবাসো, না মাকে বেশি ভালোবাসো? এ কি পবিত্রী মায়ের রহস্য নাকি? বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বললাম, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

তিনি ভুরু একটু টান করে বললেন 'কেন বাবা, না বোঝবার মতন কথা তো জিজ্ঞেস করিনি? জিজ্ঞেস করেছি, তুমি পিতৃভক্ত বেশি, না মাতৃভক্ত বেশি? আর একটু বুঝিয়ে বলবো?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললাম, 'বলুন।'

পবিত্রী মা বললেন, 'এই ধরো, মনে দুঃখ হলে, বিপদে-আপদে পড়লে, কার কথা আগে মনে পড়ে? কাকে ডাকো? কাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে?'

এ প্রশ্নও আমার কাছে জটিল। কিন্তু এমুহূর্তে, আমার মায়ের মুখ-খানিই আগে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পর মুহূর্তেই বাবার। তারপরে মা-বাবার এক সঙ্গে তোলা ফটো আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। আমি বিভ্রান্ত চোখে পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি তাঁর তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটে টিপে টিপে হাসছেন, দৃষ্টি জগতের দিকে। এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে যেন তাঁরা কিছু নিঃশব্দে বলাবলি করছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতে, তিনিও তাকালেন, বললেন, 'তুমি যে বাবা বাঁদাড়ে ছুঁচ খুঁজে বেড়াচ্ছ। এই সামান্য কথাটার জবাব দিতে পারলে না?'

আমি অপ্রস্তুত হেসে বললাম, 'দেখুন, আমি আপনার কথার ঠিক জবাব খুঁজে পাচ্ছি না।'

পবিত্রী মা হেসে উঠলেন, তাঁর গলায় একটু বিষম লাগার শব্দ হলো। মুখে হাত চাপা দিয়ে, একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'কেন, তুমি তো বলতে পারতে, মা বাবা দুজনকেই তুমি সমান ভাবে স্মরণ করো?'

কথাটা আপাতত শুনতে জলের মতো সহজ, এবং স্বাভাবিক। তথাপি যেন কেমন অসহজ আর জটিল লাগছে, পরিষ্কার জবাব দিতে পারলাম না। তিনি আবার বললেন, 'তার মানেই, তোমার মনে কোথাও খটকা আছে, তাই না?'

এ কথাটাও স্বীকার করতে পারি না। মাতৃভক্তি বা পিতৃভক্তি নিয়ে সন্তানের মনে খটকা থাকবে কেন? বিশেষত যে-ক্ষেত্রে, চরিত্র বা আচরণের দিক থেকে, বাবা মা কারোকেই তফাত করতে পারি না। আমার কিছু বন্ধুর পিতাকে দেখেছি, সমাজে যাদের খারাপ বলে, তারা সেইরকম। তারা নানাভাবে, নানান্ কিছুতে আসক্ত, ব্যবহারে উগ্র এবং নির্দয়। আমার বাবা সেই রকম নন। সংসারে, তাঁর বিরুদ্ধে একটি মাত্র অভিযোগ শুনি, তিনি মোটেই সংসারী মানুষ নন। গান পাঁচালি আঁকা জোকা, আর বেড়িয়ে বেড়াতে পারলেই তিনি খুশি। অনেক মাকেও নির্বিকার এবং সংসারের ক্ষেত্রে অবহেলা করতে দেখেছি। কিন্তু আমার মা মোটেই সে রকম নন। বললাম, 'দেখুন খটকা আমার কিছু আছে বলে জানি না। তবু, আপনার কথার ঠিক জবাবটা আমি দিতে পারলাম না।'

পবিত্রী মা আস্তে আস্তে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'অথচ দেখ, কথাটা কতো সহজ। তুমি যাকে জিজ্ঞেস করবে, সে-ই ঝপ্ করে একটা জবাব দিয়ে দেবে। কচিকাঁচাদেরও দেখবে, যারা একটু চালাক, তারা বাপ মা দুজনকেই খুশি

করবার জন্যে বলে, দুজনকেই ভালোবাসে। আবার আড়াল হলে, যখন যার, তখন তার মন রাখে। তার মধ্যেই, দু-একটা পেয়ে যাবে, এক কথায় জবাব দিয়ে দেবে। তা, তোমার কথা শুনে, আমার বেশ ভালো লাগলো। তুমি যে প্রাণ খুলে বলতে পারলে না, সেটা স্বীকার করলে। তবে, আমি কিন্তু মনের কথাটা জানি।'

সেটা আবার কী? আমার মনের কথা তিনি কী করে জানবেন? এ কি পবিত্রী মায়ের ভেল্‌কি শুরু হচ্ছে নাকি? তাঁদের বৈশিষ্ট্যগত অলৌকিক ইন্দ্রজাল!

পবিত্রী মা বাঁ হাত তুলে হাতছানি দেবার মতো ভঙ্গি করে বললেন, 'শোন, একটু এদিকে এসো।'

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে, তাঁর দিকে ঈষৎ ঝুঁকলাম। তিনি যেমন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, তেমনি রইলেন, এমন কি স্বরও নামালেন না, বললেন, 'নারীজাতির ওপর তোমার আকর্ষণ একটু বেশি, তাই না?'

আমি বিস্ময়াহত চমকে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় যেন গুটিয়ে গেলাম। দেখলাম, পবিত্রী মা উজ্জ্বল রক্তিম অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

তিনি আবার বললেন, 'তুমি ভাবছো, এটা বুঝি খুব লজ্জার কথা। তা কিন্তু মোটেও না। আমি হাত দেখতে জানি না, জ্যোতিষীও না, তবু বাবা বলতে পারি, এ কথায় তোমার মনে কোনো খটকা নেই।'

আমি আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি হঠাৎ হেসে উঠে জ তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গ্যাখ্‌ জগত, ছেলেটার মুখের অবস্থা ছাখ্‌। যেন একেবারে কনে বউটির মতন লজ্জায় মরে যাচ্ছে।'

আমি একবার জগতের মুখের দিকে তাকালাম। কম্বলে তাঁর ঠোঁট এখনো ঢাকা। কিন্তু তাঁর নাসারন্ধ্রের স্ফীতি ও কম্পন, এবং প্রায় আকর্ণবিস্তৃত চোখের ঝিলিকে, হাসি গোপন নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী ভেবে কথাটা বললেন?'

পবিত্রী মা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বলেছি তো বাবা, খারাপ কিছু ভেবে বলিনি। তোমার লজ্জা পাবারও কিছু নেই। এর আসল কথাটা কি জানো? আসল কথাটা হলো, তোমার মাতৃধ্যানই বেশি। নারী জাতির ওপর আকর্ষণ মানে, লম্পট চরিত্রহীনয়ের কথা নয়, আকর্ষণটা মূলে মাতৃজাতির ওপর। আমার কথাটা বুঝেছ?'

সত্যি বলতে গেলে, সম্যক বুঝেছি, তা কোনো রকমেই বলতে পারবো না। নীতি উপদেশ বচনে অবিশ্যি শুনেছি, পরনারী মাতৃবৎ। কিংবা, এমন কথাও শুনি, নারী মানে মাতৃজাতি। সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই, মায়ের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রেই নারীর। শরীরে ও মনে, মা হবার যোগ্যতা একমাত্র তাঁদেরই, অপিচ, পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন পিতা। কিন্তু আকর্ষণ? নারীজাতির প্রতি? অস্বীকার করবো, এমন কপটচারী নিজের কাছে কেমন করে হই? তথাপি, নারী মাত্রকেই মাতৃবৎ দর্শন, এমন ভয়ংকর অসত্যকেই বা স্বীকার করি কেমন করে!

পবিত্রী মা ঠিক বিরক্ত নন, তবু ভ্রূকুটি করে বললেন, 'কী হলো? এমন সোজা কথা শুনেও তোমার এত আঁকপাঁক কিসের? কথাটা কি মিথ্যে বলেছি নাকি?'

আমি অপ্রস্তুত বিব্রত হেসে বললাম, 'না, মানে—ঠিক তা না—।'

'তবে কী? তুমি কী ভাবলে, আমি তোমাকে মেয়ে-ন্যাকরা বলেছি?' আমাকে বাধা দিয়ে পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'ওরা আমার চু' চক্ষের বিষ, মেয়ে ন্যাকরাদের আমি পুরুষ বলি না। চারের গন্ধে যেমন মাছরা ঘুরঘুর করে, ওরা হলো সেই রকম। তারপর এক সময়ে একটা টোপের শিকার হয়ে, ডাঙায় উঠে, সারা জীবন খাবি খায়। সে রকম কিছুই আমি তোমাকে বলিনি।'

কথাটা শুনে লজ্জা পেলাম, হাসিও পেল। সেটা পবিত্রী মায়ের সোজা সহজ অথচ নিতান্ত আটপৌরে কথার বাঁধুনিতেই। চকিতে আমার দৃষ্টি পড়লো অগত সন্ন্যাসিনীর দিকে। তিনি তাঁর আয়ত বিশাল চোখে, অপলক তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকেই। দৃষ্টিপাত মাত্র, তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

পবিত্রী মা'র তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁট কিঞ্চিৎ বঙ্কিম হলো, সেই সঙ্গে বাঁক লাগলো তাঁর গ্রীবায়।

দুলে উঠলে তাঁর শোভন জটার ফালি। বললেন, 'এখনো তোমার খটকাটা কোথায়, তা জানি, কিন্তু এটা ঠিক না। তাহলে তোমাকে আমি অন্য কথা বলতাম, একেবারে নির্যাস, তুমি ঘুটু ঘুটু করে মাথা নেড়ে বলতে, ঠিক। বলছি, তোমার মা একজন নারী তো?'

আমি কিছু বলার উদ্যোগ করতেই, তিনি বাঁ হাত তুলে, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বে-থা করেছো, বলছো সন্তানও হয়েছে, তোমার বউও একজন নারী। তবে আর নারীজাতিতে মাতৃজাতিতে তফাত কোথায়? মা বউয়ের ওপর তোমার আকর্ষণ আছে তো?'

আমি একটু দ্বিধা করে বললাম, 'আছে, তবে বিকর্ষণও আছে।'

পবিত্রী মা তাঁর কাজল বিভ্রম চোখের তারা ঘুরিয়ে, আমাকে অপাঙ্গে দেখে শব্দ করলেন, 'হুম্?'

তারপরে জগতের দিকে ফিরে বললেন, 'ওরে জগত, বাছার আমার এদিকে দেখছি জ্ঞান টনটনে! বলে বিকর্ষণও আছে।'

কেন ভুল ভাল অন্যায় কিছু বলেছি নাকি? আমি জগতের দিকে তাকালাম। তিনি তখন পবিত্রী মায়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করছেন। পবিত্রী মা মৃদু ঘাড় ঝাঁকাচ্ছেন। তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ওটা না থাকলে তোমাকে পোকা মনে করতাম।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'পোকা?'

তিনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ', একটা নোংরা পোকা। কিন্তু বিকর্ষণ বলতে তো তুমি ঘেন্নার কথা বলোনি?'

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'না না, ঘেন্না কেন?'

পবিত্রী মা বললেন, 'জানি গো জানি, তোমাকে আর বলতে হবে না। মন্তরে-তন্তরে মানুষ চেনা যায় না, আঁতের বাগে ধরা পড়ে।'

আঁতের বাগে! সে আবার কী কথা? আঁতের কথা, দাঁতের কথা বুঝি। অন্তরে— আঁত, কপটে—দাঁত। আঁতের বাগে ধরা পড়াটা কেমন? অথচ তাঁর মতো একজন বহুজনপূজ্য, কামাখ্যার অংশবতী (রমেন দাসের ভাষায়) দেবী তন্ত্রমন্ত্রকে মোটে পাত্তা দিতে চাইছেন না! তিনিই আবার বললেন, 'তা বলে আঁতের নজর কি আর সবার ওপরে পড়ে, না ধরা পড়ে। কেউ দুঃখী হলেই যে তাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি দুঃখী, তা কিন্তু মোটেই না। তারও রকমফের আছে। কী ভাবছো বলো তো? ধর্মজ্ঞান দিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে?'

অধর্মের কথা কিছু বলছেন বলেও মনে হলো না। বললাম, 'না, সে রকম কিছু তো মনে হচ্ছে না।'

পবিত্রী মা ঘাড় কাত করে, তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম মনে হচ্ছে বলো তো?'

এ তো আর এক কঠিন জিজ্ঞাসা। জবাব দেওয়ার ভয়ে, ছেলেবেলায় পাঠশালা ছেড়ে পালাতে পথ পাইনি। তারপরে দৌড় দিয়েছি তো দিয়েছি, আর ওই দিক মাড়াইনি। প্রশ্ন কঠিন হলেই দুর্বোধ্য লাগে। তাঁর কথার কী জবাব দেবো?

হেসে স্বীকার করলাম, 'দেখুন, ঠিক বলতে পারছি না।'

পবিত্রী মা এক ভঙ্গীতেই আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বললেন, 'পারেন, তালই জানো ও সব ধর্মজ্ঞান-ট্যান আমি দিচ্ছি না, তবু যে এত কথা বললাম, তার কারণ, আসলে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।'

থতিয়ে যাওয়াকে ভ্যাবাচাকা খাওয়া বলে কী না জানি না, অবুঝের মতো এক পলক তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর দৃষ্টিও অপলক বিদ্ধ আমার প্রতি। আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে মুখ নত করলাম। প্রায় বালকের মতো লজ্জায় গুটিয়ে গেলাম। তিনি আবার বললেন, 'কী, খুব লজ্জা পেলে তো?'

আমি মুখ তুলতে গিয়েও, তুলতে পারলাম না। জলতরঙ্গের মৃদু শব্দের মতো, তাঁর হাসি শুনতে পেলাম, যে-হাসিকে ঠিক খিলখিল বলা যায় না। আবার বললেন, 'আমি কিন্তু বাবা মিছে কথা বলতে জানি না। যা সত্যি, তা-ই বলে দিলাম।'

তা হয়তো দিলেন, কিন্তু এর দ্বারা তিনি আমার কাছে সুবোধ্য হলেন না। রহস্যকে আরো জটিল করলেন। তাঁকে দেখে কৌতূহলিত হয়েছিলাম, কৌতূহল থেকে আকর্ষণ, এবং একটি মুগ্ধতাও আমাকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছে। অন্ততঃ এ কথাটা তাঁর মতো আমিও বলতে পারি, 'আমিও মিছে কথা বলতে জানি না, যা সত্যি, তা-ই বলে দিলাম।' তা বলে প্রেম! তিনি আমার প্রেমে পড়েছেন, মানে কী?

তিনিই আবার বললেন, 'ভয় নেই গো, তোমার বউয়ের সতীন হয়ে তোমার ঘাড়ে চাপবো না।'

বলতে বলতেই তিনি বালিকার মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন। প্রায় ঘুমন্ত নিস্তব্ধ কামরায় সেই হাসি শোনালো যেন, দিগন্তব্যাপী নিরালার বুকে, এক অলৌকিক হাসির মতো, স্বপ্নের পরী যেমন অলক্ষ্যে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বললেন, 'তা বলে ভেবো না, আমার প্রেমটা হোল বুজরুকি। তা প্রেমে পড়লেই কি তোমার ঘর করতে যেতে হবে? এই যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছ, তা বলে কি আমার সঙ্গে ঘর করতে যাবে?'

আমি তাঁর প্রেমে পড়েছি? প্রায় নাবালকের মতো হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। এখন কিন্তু তিনি হাসিতে তেমন উচ্ছ্বসিত নন, কিন্তু অপলক দৃষ্টি আমার চোখে নিবদ্ধ। তিনি যেন মৃদু সুরের গানের মতো করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার প্রেমে পড়োনি তুমি?'

আমার দৃষ্টি পলকে একবার জগত সন্ন্যাসিনীকে লক্ষ্য করলো, তিনিও

আমার প্রতি অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন, যদিও রেশম মোড়া কোমল কম্বলে এখনো তাঁর নাকের নিচে ঠোঁট ঢাকা। পরিস্থিতি এমন, আমার জবাবটা যেন অনিবার্য হয়ে উঠলো, অথচ লজ্জায় আমার গলার স্বর রুদ্ধপ্রায়। কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে পারলাম না, বললাম, 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে—প্রথম থেকেই।'

পবিত্রী মা হুস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, সামান্য শব্দ করে একটু হেসে বললেন, 'বাঁচালে বাবা, এ কথাটি না শুনলে মরে যেতাম।'

কিন্তু আমি মনে মনে দুর্বল বলেই কী না জানি না, নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে ভাবলাম, আমি কি সম্মোহিত হয়ে পড়েছি নাকি? বললাম, 'কিন্তু দেখুন, কোনো ধর্মজ্ঞান থেকে আপনাকে আমার ভালো লাগেনি, আপনাকে—।'

'দূর মুখপোড়া ছেলে!' আমার কথার মাঝখানেই পবিত্রী মা ভ্রূকুটি চোখে, প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'আমি বলছি প্রেম ভালোবাসার কথা, উনি আবার ধর্মজ্ঞানের কথা বলছেন। প্রেম ভালোবাসাটা কি অধর্মের কথা নাকি? তাই যদি বলো, তা হলে ওতেও ধর্ম আছে। কিন্তু তুমি যে ধর্মের কথা বলছো, সে-ধর্মের কথা আমি মোটেও বলতে চাইনি। আগেই তো বললাম, মন্তর-তন্তরে মানুষ চেনা যায় না, আমি তোমাকে কোনো ধর্মজ্ঞান দিচ্ছি না! ও সব ধর্মের আমি কিছু জানি না। কিন্তু বলো না, তোমাকে আমি প্রথম থেকে যেচে যা যা বলেছি, একটা কথাও মিছে বলেছি?'

পবিত্রী মা যেন একটু শাসনের সুরেই কথাগুলো বললেন, এবং তা যুক্তিপূর্ণ ও অকাট্য।

আমি বিব্রত ভাবে বললাম, 'না, তা বলেননি।'

তিনি বললেন, 'তবে কেন এ রকম উলটো-পালটা কথা বলছো? আমার এসব ধড়াচূড়া দেখে তো?'

আমি সহসা তাঁর কথার কোনো জবাব দিতে পারলাম না, কিন্তু তাঁর সত্যি কথা শুনে, লজ্জা পেয়ে হাসলাম। তাঁর 'দূর মুখপোড়া ছেলে' আমার অনুভূতিতে যেন গানের মতো বাজছে। তিনি আবার বললেন, 'বলেছিই তো' আমার আঁতের বাগে তুমি ধরা পড়েছ। আমি বাপু বুঝি, আঁতের চোখে পড়লে, তাকে প্রেম বলে। তা যার নেই, সে আবার কেমন মানুষ? তোমারো ওটি পুরো মাত্রায় আছে, ভেবে দেখো'।

বলেই তিনি জগতের দিকে, যেন খুবই মিনতি করে বললেন, 'একটা পান খাওয়াবি মা?'

জগত এক মুহূর্ত নির্বাক এবং নিশ্চল রইলেন, তাঁর আয়ত চোখের দৃষ্টি পবিত্রী মায়ের 'দিকে। তারপরে কম্বল নামিয়ে, দু' হাত বের করে, ঝোলা থেকে পানের রুপোর কৌটা বের করলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। আমি বসে রইলাম নত মুখে। 'বিমুগ্ধ আত্মা'-র পাতায় মনোযোগ দিতে পারলাম না। আমি তথাকথিত ধর্মজ্ঞানরহিত, নির্বিকার, উৎসাহহীন। যাকে বলে বাস্তববাদী, আমি তাই। তার চেয়ে বেশি, বর্তমানে আমি বস্তুতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তথাপি, জগত সন্ন্যাসিনীর গান শুনে, আমি ব্যথা ও আনন্দের অনুভূতিতে মুগ্ধ হয়েছি, আমার মনে হয়েছে, আমি ফুল ফুটতে দেখেছি। এখন আমি পবিত্রী মায়ের সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা বোধ করছি। কিন্তু সে-কথা তাঁকে আমি মুখ ফুটে বলতে পারবো না। রমেন দাসের মুখে, তাঁর মহিমার কথা যা শুনেছি, এবং তাঁর ধড়াচূড়, এ সবই একটা ধারণা মনের মধ্যে এনে দেয়। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি, এটাও সত্যি, তাঁকে এই বেশে দেখতে আমার ভালো লাগছে।

'এই যে, শোনো।' পবিত্রী মা পান মুখে দিয়ে ডাকলেন।

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার জগতের গান তোমার কেমন লাগলো?'

অচিরাৎ আমার দৃষ্টি গেল জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে। তিনি পবিত্রী মায়ের দিকে একটু যেন বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, 'খুব সুন্দর, অপূর্ব!'

পবিত্রী মায়ের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। তিনি একবার আমাকে, আর একবার জগতের দিকে তাকালেন। সন্ন্যাসিনী জগতের নাসারন্ধ্র স্ফীত, মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি পবিত্রী মায়ের দিকেই। পবিত্রী মা ফিক করে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কী রকম?'

আবেগ যে কখন আমার অনুভূতিকে ছুঁয়েছে, নিজেও টের পাইনি, লজ্জিত হেসে বললাম, 'বলবো? কিছু মনে করবেন না তো?'

পবিত্রী মা অবাক স্বরে বললেন, 'রাগ করবো কেন?'

আমি বললাম, 'ওঁর গান শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন ফুল ফুটতে দেখছি!'

জগত আমার দিকে তাকালেন, তাঁর আয়ত প্রতিমা চোখের তারা দুটি যেন আমার চোখের গভীরে চকিতের জন্য বিদ্ধ হয়ে, অন্যদিকে ফিরে গেল।

পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'ফুল ফুটে উঠতে দেখলে? বাহ্! বাহ্ বাহ্। বাবা যদি শুনতেন, না জানি কী করতেন!'

বলতে বলতেই তিনি চোখ বুজলেন। ধাবমান গাড়ির দোলানি ছাড়া, তাঁর শরীর স্থির। জগত তাঁর দিকে, কিংবা কাঠের দেওয়ালের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। একটু পরে পবিত্রী মা বললেন, 'জগত মা একটা গান কর।'

জগত এই অবস্থায় খানিকক্ষণ রইলেন, তারপরে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন। মুখটা একটু ঘুরিয়ে, কোণের ওপর দিকে তাকিয়ে, খুবই আস্তে, গুন গুন করে গাইলেন:

'প্রেমধন বুকে নিয়ে রইলি বসে আত্মভোলা।

সে ধনে পূজবি যারে তুষবি যারে গ্যাখ, সে কেমন খেলছে খেলা॥'

গানটা আমার শোনা কী না, মনে করতে পারলাম না। যদি শুনেও থাকি, তবে তা এমন করুণ, মিষ্টি স্বরের পরিচ্ছন্ন কারুমিত্তি সম্পন্ন ছিল না। দুটি লাইন তিনি কয়েকবার গাইলেন। কী সুরে গাইছেন, আমি ঠিক জানি না। তারপরে গাইলেন:

'খেলা দেখেই মজে রইলি

প্রেম সঁপিতে ভুলে গেলি

এখন পাদপদ্মের চিহ্ন দেখে, কেন, মরিস কেঁদে প্রেম পাগলা।'...

শেষ কলিটি গাইবার সময়, ফুলের পাপড়িতে সেই টলটলে শিশির বিন্দু চিকচিক করে উঠলো। পবিত্রী মায়ের বোজা চোখে, জল গলেছিল, প্রথম দুই কলি শুনেই।

এ ক্ষেত্রেও পূজা, পাদপদ্ম বিষয় আমার অনুভূতির গোচরীভূত না, কিন্তু স্বর সুর গায়কীতে কী না হয়। গান যেখানে প্রাণের উৎসর্গে বাজে, তখন অপর প্রাণেও বেজে উঠে তারই রেশ। কেন যেন মনে হলো, জগত সন্ন্যাসিনী গান গেয়ে আমাকেই কিছু বললেন। গানের মধ্যে যে একটা ব্যর্থ হাহাকার আছে, তা অতি নির্ঘাতরূপে ছড়িয়ে গেছে আমার বুকেও। আমার চোখ গলে না, কলকলিয়ে যায় ভিতরে।

ওদিকে তখন অন্য দৃশ্য। পবিত্রী মায়ের বুকে, দু'হাতে জড়ানো জগতের মুখ। জগত দু' হাত দিয়ে, পবিত্রী মায়ের হাঁটু ধরে আছেন। তাঁদের এই আলিঙ্গনের ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কোনো একটা গভীর আবেগজনিত, সন্দেহ নেই, যে-আবেগের তত্ত্ব আমি জানি না। কিন্তু আমি দেখছি, আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে গানের সুর বাজছে।

যাত্রের গাড়ি চলেছে বেগে, যাত্রীরা অধিকাংশই নিদ্রিত।

'কী হে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

পবিত্রী মায়ের গলা শুনে, তাঁর দিকে তাকালাম, আমার মুখ দু' হাতে ঢাকা ছিল। হাত নামিয়ে হেসে বললাম, 'না।'

দেখলাম, তারা দুজনেই আলিঙ্গনছিন্ন। জগত গায়ে কম্বল জড়িয়ে, পিছনের কাঠের ওপর ডানা মেলে, তার ওপর কাত করে মুখ রেখেছেন। মনে হয় চোখ বোজা। আসলে তাঁর চোখের পাতা নামানো। পবিত্রী মা গায়ে কম্বল জড়িয়ে, পিছনে হেলান দিয়ে, বসেছেন একটু এগিয়ে। বললেন, 'তবে মুখ ঢেকে কী ভাবছিলে? ফুল ফুটতে দেখছিলে নাকি?'

হেসে বললাম, 'তা বলতে পারেন।'

বলে ঝটিতি একবার জগত সন্ন্যাসিনীকে দেখলাম। কোনো ভাবান্তর নেই। পবিত্রী মা বললেন, 'এ রকম ফুল ফোটা আর দেখেছ?'

এই মুহূর্তে মনে হলো দেখিনি—অর্থাৎ শুনিনি। তবু বললাম, 'আমার বাবার এ রকম গান শুনেছি।'

পবিত্রী মা ভ্রূকুটি কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বটে! রক্তে আছে তাহলে। তা, তোমার বাবা শাক্ত না শৈব?'

বললাম, 'তা তো ঠিক বলতে পারবো না, তবে তাঁর গুরুদেব বোধ হয় শাক্ত।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তোমার শাক্ত মনে হয়েছে?'

আমি বাবার গুরুদেবের বেশভূষা আচরণ ইত্যাদি বললাম। পবিত্রী মা মনোযোগ দিয়ে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম বলো তো গুরুদেবের? থাকেন কোথায়?'

বললাম, 'তাঁর নাম করুণাময় ভট্টাচার্য, থাকেন ঢাকার পোড়ামহলার গদিতে। দেশ ভাগের পরে এসেছেন কী না, জানি না।'

পবিত্রী মাকে চিন্তান্বিত দেখালো। একটু পরে বললেন, 'বোধ হয় কামাখ্যায় কখনো দেখে থাকবো। নামটি খুবই চেনা লাগছে।'

আমি সচরাচর যা করি না, হঠাৎ-ই যেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

পবিত্রী মা ভ্রূকুটি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকালেন, তারপরে জগতের দিকে। জগত তাঁর ভঙ্গি পরিবর্তন না করে, চোখের পাতা মেলে,

তাঁর দিকে তাকালেন। পবিত্রী মা আবার আমার দিকে তাকিয়ে যেন অনুমান করতে চাইলেন, কী আমার জিজ্ঞাস্য। বললেন, বলো শুনি, কী জিজ্ঞেস করছো? তবে আগেই বলে রাখছি বাপু, জবাব-টবাব দিতে পারবো কী না জানি না।'

আমি হেসে বললাম, 'এমন কিছু না, আমার একটা কৌতূহল মাত্র।'

তিনি বললেন, 'বলো।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি—মানে, আপনারা কী?'

''আমি জগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলাম। পবিত্রী মা জগতের দিকে তাকালেন। যেন খুবই বিভ্রান্ত আর বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু জগতের নাসারন্ধ্র কাঁপলো, স্ফীত হলো। আমার দিকে ফিরে যেন খুবই অবাক স্বরে বললেন, 'কী আবার? দেখতেই তো পাচ্ছো, আমরা দুজন রমণী! মেয়েমানুষ কথাটা বললাম না। এটুকু দেখবার চোখ তোমার নেই? এ আবার কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি?'

বটেই তো! এ তো দুয়ে আর দুয়ে, চারের মতো সত্যি! তবু, এমন সত্যিটা জেনেও, আমার অবস্থাটা যেন, চিলের ছোঁ মেরে হাত থেকে খাবারের ঠোঙা নিয়ে যাবার মতো। সম্যক উপলব্ধির পূর্ব মুহূর্তে, 'হাদ্যাখ্ মোর কলাটা'র মতো, একেবারে বেয়াকুফ্ বেহাল ছাওয়ালটা যেন! কিন্তু সত্যি কি এমন সহজ সরল একটি প্রশ্ন করেছি? নাকি পবিত্রী মা এবং জগত সন্ন্যাসিনী যে সর্বাংশে রমণী বা নারী, তা জলজ্যান্ত চাক্ষুষ করেও, আমার দৃষ্টিতে বিভ্রম? আমি অবাক চোখ মেলে, তাকিয়ে দেখি, পবিত্রী মায়ের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, তাঁর দৃষ্টি জগতের দিকে। জগতের মুখ নত। তাঁকে আগেও একটু-আধটু হাসতে দেখেছি, কিন্তু তাঁর মাথার চুলের চূড়া সুদ্ধ সমস্ত শরীরকে এমন ফুলে ফুলে কাঁপতে দেখিনি। এই কম্পন যে নিঃশব্দ অথচ হাসির উচ্ছ্বাসের কারণে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, এবং পবিত্রী মায়ের রক্তাভ মুখে, ঠোঁট টিপে টিপে রেখেও শরীরে যে একটি তরঙ্গের খেলা চলছে, সেটিও যে হাসির, তাও বুঝতে পারছি।

বুঝতে পারছি, আমার জিজ্ঞাসাটাই হয়তো অনভিজ্ঞের মতো হয়েছে, যাকে বলে বোকার মতো। এ ক্ষেত্রে বোধ হয়, জিজ্ঞাসার ভাষাটাই হওয়া উচিত ছিল আলাদা।

পবিত্রী মা আমার দিকে তাকিয়ে, এমন হঠাৎ একটা শব্দ করে হেসে উঠলেন, মনে হলো তাঁর গলার টাকরায় কিছু আটকে গিয়েছে। বলে উঠলেন, 'এই

ছেলেটা, মুখ ফেরাও তো। তোমার ওই মুখের দিকে তাকালে, আমার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে হাসতে হাসতে।'

কথা শুনে, জগতও এবার শব্দে বাজলেন, একেবারে সেতারের ঝংকারে। এবার আমিও কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলাম। মুখ নামিয়ে নিলাম। ছেলেরা শুনি, মেয়েদের পেছনে লেগে পর্যুদস্ত করে। কিন্তু ছেলেরাও যে কতোখানি পর্যুদস্ত হতে পারে, আমি তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। তাও কী না, বিভূতি রুদ্রাক্ষে অলংকৃতা গৈরিকবসনা দুই সন্ন্যাসিনীর কাছে। তা হোক, পবিত্রী মা নিজেই তো বলেছেন, তাঁরা একান্তই নারী, রমণী যাহারে কহে!

তথাপি যেন কোথায় একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ঠিক জবাবটি আমি পাইনি। ইতিমধ্যে পবিত্রী মা এবং জগত সাধিকা বোধ হয় নিজেদের সামলিয়ে নিতে পেরেছেন, কেন না, পবিত্রী মায়ের ডাক শুনতে পেলাম, 'এই যে, শোনো।'

সম্বোধন শুনেই বুঝতে পারছি, তিনি আমাকে ডাকছেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর গাল এমনিতেই রক্তাভ, অতিরিক্ত ছটার ঔজ্জ্বল্য এখনো একেবারে মুছে যায়নি। জগত আবার সোজা হয়ে বসেছেন, তাঁর আয়ত বিস্তৃত চক্ষে হাস্যময়ী প্রতিমার উজ্জ্বলতা। আমি অপ্রস্তুত কিন্তু সংযত ভাবে বললাম, 'দেখুন, ঠিক কীভাবে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তা আমি জানি না।'

পবিত্রী মা বললেন, 'কেন বাবা, তুমি তো ঠিক কথা, ঠিক ভাবেই জিজ্ঞেস করেছ।'

আমি তাঁর ঈষদারক্ত চোখের দিকে তাকালাম। তাঁর কালো চোখে আগের সেই হাসি, কিঞ্চিৎ ঢুলুঢুলু, অথচ যেন অতল গভীরে এক রহস্যের ইশারা। বললেন, 'তবে জবাবটা তোমাকে আমি ঠিক মতন দিইনি। দিতে পারিনি, কারণ, তুমি আবার কী বুঝতে কী বুঝবে তাই। সত্যি শুনতে চাও নাকি?'

বললাম, 'ঠিক বুঝবো কী না জানি না, তবে মিথ্যে মিথ্যে জিজ্ঞেস করিনি।'

'তবে শোনো, এসো, কাছে এসো।' পবিত্রী মা বাঁ হাত তুলে, আগের মতো হাতছানি দিলেন।

আমি তাঁর দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়লাম। তিনি বললেন, 'আর একটু এসো।'

গাড়ির ঝাঁকুনি বাঁচিয়ে, আমি আরো একটু ঝুঁকলাম। তিনিও আমার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে এলেন, তারপরে প্রায় ফিসফিস করে একটি কথা উচ্চারণ

করলেন। তাঁর তপ্ত নিঃশ্বাস, পান ও জর্দার সুগন্ধ, সব মিলিয়ে কথাটি যেন শব্দভেদী বাণের মতো আমার কানে বাজলো! আমি অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালাম, আর মনে মনে উচ্চারণ করলাম, 'ব্রহ্মাণ্ড!'

আমাকে তা-ই বললেন তিনি, অনেকটা গোপনে ফিসফিস করে বলার মতো, 'আমরা হলাম ব্রহ্মাণ্ড!'

অর্থ না বুঝে, আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর সেই চোখের দৃষ্টি আমার ওপর তেমনি নিবদ্ধ, কিন্তু মুখ সরিয়ে বসেছেন সোজা হয়ে। আমি অবুঝ দৃষ্টিতে তাকালাম জগত সন্ন্যাসিনীর দিকে। তিনি তাকিয়ে আছেন পবিত্রী মায়ের দিকে, দৃষ্টিতে সেই ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু এ রকম কথা আমি কখনো শুনিনি। ব্রহ্মাণ্ড! ব্রহ্মাণ্ড নামে কি ধর্মীয় পরিচয় হয়?

'বুঝলে না তো?' পবিত্রী মা নিজেই ঘাড় নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমিও ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না।'

তিনি ঘাড় কাত করে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললেন, 'তাহলে আর একটু সহজ করে বলি?'

আমার সম্মতির কোনো প্রশ্নই নেই। তিনি আবার আগের মতো হাতছানি দিয়ে, কাছে ডেকে, নিচু স্বরে বললেন, 'মানে, ভাণ্ড। বুঝেছ?'

ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভাণ্ড? গূঢ় ভাষা নামে নাকি একটি ভাষা আছে, যেমন গূঢ়পুরুষ। কৌটিল্যের শাস্ত্রে গূঢ়পুরুষ হলো, আধুনিক কালে যাদের বলে গোয়েন্দা—অর্থাৎ, গুপ্তচর। গূঢ়ভাষায়ও সেই রকম, ইংরেজিতে নাকি যাকে বলে, কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। যে বলে, আর যে শোনে, তারা পরস্পরেই কেবল তা বুঝতে পারে। কিন্তু আমি পবিত্রী মায়ের দলভুক্ত না, তাঁদের গূঢ় ভাষা বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার জিজ্ঞাসা ছিল, তাঁদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিচয়। সে পরিচয় যে ব্রহ্মাণ্ড বা ভাণ্ড হতে পারে, এ রকম কোনো কল্পনা আমার ছিল না। আমার বাবার সঙ্গে, তান্ত্রিক বিষয়ে কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা একদা হয়েছে, এ রকম কোনো কথা তাঁর মুখে শুনিনি।

পবিত্রী মা-ই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'পরিষ্কার হলো না তো?'

আমি অবুঝ শিশুর মতোই, নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম। তিনি হেসে তাকালেন জগতের দিকে। বললেন, এ সব ছেলেরা কেবল সাহেবদের লেখা মোটা মোটা বই পড়ে। সহজ কথা বোঝে না।'

জগতের ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেল, কিছু বললেন না। পবিত্রী মা

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'খুব একটা থিটকেল কথা তো বলিনি বাবা, বুঝলে না কেন?'

থিটকেল! সুন্দর কথাখানি। থিটকেল—জটিল, বিটকেল—বিকৃত, একে বলে ভাষার বাঁধুনি। কইতে জানলেই হয়। পবিত্রী মা আবার বললেন, 'এক হিসেবে, মানুষ সবাই এক। যেমন তুমি, তেমনি আমি, আমি এক ভাণ্ড।'

বলে তিনি ডান হাত তাঁর বক্ষে রাখলেন, বললেন, 'আর এ ভাণ্ডে যা নেই, তা ব্রহ্মাণ্ডেও নেই। তাই কথায় বলে, যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। এ তো মোদ্দা কথা। সেইজন্যই বলি, আমি ভাণ্ড, আমি ব্রহ্মাণ্ড! ব্রহ্মাণ্ড তো আমার তোমার মধ্যেই আছে।'

বোঝ এবার! বাতপুছ করেও ফ্যাসাদে পইল্লেম হে! এমন ভাণ্ডাভাণ্ডের কথা তো কদাপি শুনিনি। বলতে ইচ্ছে করছে, আমার জানা বোঝার ভাণ্ডাফোঁড়! বাবার সঙ্গে তান্ত্রিক আচার-বিচারের প্রসঙ্গ অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে এ জাতীয় উক্তি ছিল না। যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। মানে কী? এই মানব শরীরে যা নেই, তা বিশ্বেও নেই? এ কি কোনো প্রতীক, না সংকেত? ভারতের প্রাচীন বস্তুবাদী তাত্ত্বিকদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অজিত কেশকম্বলী বা নটপুত্তের ভাষায়, স্বর্গ নরক বলে কিছু নেই। মানুষের মৃত্যুর পরে, তার দেহস্থ জল, পৃথিবীর জলের মধ্যেই মিশে যায়। দেহস্থ বায়ু, পৃথিবীর বায়ুতে মেশে, ভস্মরাশি পৃথিবীর ধূলায় ও মৃত্তিকায় মেশে। একদিক থেকে, দেহভাণ্ড, সবই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মিশে যায়। পবিত্রী মা কি সেই রকম কিছু বলছেন? কিন্তু সেই সব বস্তুবাদীরা ছিলেন নিরীশ্বর-বাদী। কিন্তু এই গৈরিকবসনা, বিচিত্রবেশধারিণী সন্ন্যাসিনীসদৃশ মহিলারা কি তা-ই?

'এখনো বুঝতে পারলে না?' পবিত্রী মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

আমি একটু বিব্রত অস্বস্তিতে হেসে বললাম, 'কথাটা যা বলেছেন, তা বুঝতে পারছি, তবে এর মধ্যে বোধ হয় কোন তত্ত্ব-টত্ত্ব আছে, যা আমি জানি না। সেইজন্যই আপনাদের ঠিক চিনতেও পারলাম না।'

পবিত্রী মা হাসলেন, জগতের দিকে তাকিয়ে, কয়েক পলকের জন্য চোখ বুজে রইলেন, তারপর বললেন, 'তা, তত্ত্ব তো থাকবেই। সবেরই তত্ত্ব আছে। এই যে রেলগাড়ীটা চলছে, আগেকার দিনে লোকে বলতো, হাওয়ার গাড়ি। হাওয়ার গাড়ি কী গো? নিশ্চয় তবে তারও একটা তত্ত্ব আছে? তুমি গুচ্ছের কয়লা জেলে, আর জল ফুটিয়েই কি গাড়ি চালাতে পারো? পারো না,

তত্ত্বটা জানা থাকা চাই, জানলেই হাওয়ায় গাড়ি চলে। তেমনি ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরও একটা তত্ত্ব আছে।'

পবিত্রী মা আবার তাঁর বুকে একটি হাত রেখে বললেন, 'এই ভাণ্ডই যে ব্রহ্মাণ্ড, তা বোঝবার একটা তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব যে সাধে, সে তা বুঝতে পারে। সবাই পারে না।'

আমার মুখে জিজ্ঞাসা এসেও থমকে গেল, জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলাম না। পবিত্রী মা-ই বললেন, 'কী বলতে চাইছিলে, বলো?'

আমি সঙ্কোচ করে জিজ্ঞেস করলাম; 'আপনারা কি সেই তত্ত্ব সাধেন?'

পবিত্রী মা বললেন, 'আমি সাধি, জগতের এখনো শুরু হয়নি।' বলে তিনি জগতের দিকে স্নেহস্নিগ্ধ হাসি চোখে তাকালেন।

আমি প্রায় শিশুর মতো কৌতূহল নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'সাধলে কী হয়?'

পবিত্রী মা এবার যেন কেমন ঝটকা দিয়ে, বেগে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন, ভ্রূকুটি দৃষ্টি তাঁর চোখে। কয়েক পলক স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, হঠাৎ ফিক করে হাসলেন, যেন মেঘের বুকে চকিত চিকুর হানা ঝিলিক। ঘাড় কাত করে বললেন, 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয় হয়। বুঝলে?'

বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ঘাড় নাড়তেও পারলাম না। রয়ে গেলাম যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। অমাবস্যায় চাঁদের উদয়? উল্টা পুরাণটা আমার জানা নেই, কিন্তু অমাবস্যায় চাঁদের উদয় হয়, বিশ্বসংসারের এমন একটা বিপরীত নিয়মের কথা শুনিনি। এমনই সাধনা, যা সাধলে, অমাবস্যায় চাঁদের উদয় হয়?

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো জগতের দিকে। তাঁর গা থেকে খসে পড়েছে কম্বল। তিনি যেন কেমন ঋজু হয়ে, কোলের ওপর দু' হাত ছড়িয়ে বসেছেন। তাঁর চোখ বোজা। পবিত্রী মা স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। চলন্ত গাড়ির দোলানির মধ্যেও মনে হলো, জগতের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। পবিত্রী মা তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে, জগতের কাঁধে স্পর্শ করলেন। জগত যেন চমকে উঠে, চোখ মেললেন, তাঁর দৃষ্টিতে একটা আচ্ছন্নতার ঘোর। পবিত্রী মা মিনতির সুরে বললেন, 'সহজ থাক্ মা, আমি এমনি কথার কথা বলছি। ছেলেটার মনটা ভালো, তাই কথা কইছি বৈ তো না?'

জগত যেন একটু লজ্জিত হলেন, বললেন, 'তা নয় মা, আমি সহজই আছি। আপনার কথা শুনে, মনটা কেমন ভরে গেল।'

পবিত্রী মা মায়ের মতোই হাসলেন, যদ্যপি, মাতা ও কন্যার থেকে তাঁদের দুজনকে সখী বললেই বেশি মানায়, কিন্তু হাসিটা স্নিগ্ধ স্নেহে ভরা। আর যতো গেরো কী না আমার? যে-কথা শুনে একজনের মন ভরে যায়, সেই কথা শুনে, আমি অতল সিন্ধুতে হাবুডুবু খাই! পবিত্রী মা বললেন, 'মা, আমাকে এক খণ্ড কোয়েই দে।'

বলে আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ঢুলুঢুলু চোখে সেই অপার রহস্য। বললেন, 'কিছুই বুঝলে না তো?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

তিনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝবে না বাবা, এ বড় কঠিন সাধনা। সাহেবদের লেখা বই পড়ছো, সংস্কৃতের চর্চা আছে?'

অনায়াস সারল্যে স্বীকার করলাম,'যেটুকু জানি,তাকে চর্চা বলা চলে না।'

পবিত্রী মা বললেন, 'তবু বলি, সাধনটা কেমন কঠিন। কৃপাণধারাগমনা-দ্ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ/ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসেবনম্। বুঝলে?'

ভয়াবহ ব্যাপার! তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, হাত দিয়ে সাপ ধরা! মনে মনে বলি, ক্ষ্যামা দে মা। এ কি ভয়াবহ সাধন? সাপুড়েদের অবিশ্যি বিষধর সাপ ধরতে দেখেছি, মুখ না, ল্যাজ। কিন্তু ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটা, এবং বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা! পরমুহূর্তেই আর একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো, পবিত্রী মা এমন আশ্চর্য সুন্দর সংস্কৃত বলতে ও উচ্চারণ করতে জানেন? অবিশ্যিই বিচারটা আমার জ্ঞানগম্যি দিয়েই, কিন্তু এটাও এক পরমাশ্চর্য, এবং আমাকে মুগ্ধ না, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনেকটা ভক্তির মতো হয়ে উঠলো। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, জগতের হাত থেকে সেই কোয়েই খণ্ডটি নিয়ে মুখে পুরে, দুজনে নিঃশব্দে হাস্য বিনিময় করছেন।

তাঁদের প্রতি আমার দৃষ্টিপাত অনুমান করেই যেন, পবিত্রী মা আমার দিকে আস্তে আস্তে মুখ ফেরালেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হলো, বলো তো?'

'ভয়ংকর!' একটি কথাই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো।

শোনা মাত্রই পবিত্রী মা খিলখিল করে হেসে উঠতে গিয়ে, তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিলেন। তাকিয়ে দেখলেন এদিক-ওদিক। তিনি পরিপূর্ণ সচেতন, এখন অনেকেই নিদ্রামগ্ন। নিজেকে সামলিয়ে, মুখ থেকে হাত

সরিয়ে বললেন, 'তোমার চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, কতোখানি ভয়ংকর ভেবেছ। সত্যি ভয়ংকর, তবে ওটা নিয়ে বেশি ভেবো না।'

তাঁর এই নির্দেশের মধ্যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে, মনে হলো, এবং অচিরাৎ আমার মনে আবার প্রশ্ন জাগলো, কেন, বেশি ভাবলে কী হবে? ভাবতে ভাবতেও, তাঁর সংস্কৃত উক্তির একটা কথার যথার্থ উত্তর পাবার জন্ম কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি কুলসেবার কথা বললেন, সে ব্যাপারটা কী?'

তিনি একবার আমার ও আর একবার জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'যিনি কুলাচারী, তিনিই কুলসেবা করেন। এক কথায় তাঁকে কৌল বলতে পারো। তাঁকে তুমি বীরও বলতে পারো। যিনি প্রকৃত বীর, তিনিই সত্যিকারের কৌল। তন্ত্রের কথা শুনেছ তো?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম। তিনি বললেন, 'চলতি কথায় এঁদের তান্ত্রিক বলে। এবার নিশ্চয় সব বুঝে ফেলেছ?'

তাঁর জিজ্ঞাসায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হলো। এবং চোখের তারায়ও সেই বিদ্রূপের বক্রতা।

প্রায় ঘাড় কাত করে সম্মতি দিতে যাচ্ছিলাম, এবার বুঝেছি। কিন্তু থমকে গেলাম। ভঙ্গিতে বা কথায়, কোনো জবাব দিতে পারলাম না। বাবার সে থাপ্পড়টা এখনো ভুলিনি। কিছু বলতে গিয়ে, আবার একটা থাপ্পড়, বিশেষতঃ পবিত্রী মায়ের হাতে, খাবার সাধ একেবারেই নেই। কাজ কি আমার পরের কথায়। কী হবেই বা আমার এ সব জেনে। কিন্তু সেই যে, পবিত্রী মাও কথাটি বলেছিলেন, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। মন করে আমার থাজনা থাজনা, কে করবে আমার হরি ভজনা। নিদ্রা নেই, 'বিমুগ্ধ আত্মা'-র মন নেই। মন এখন এক অজানা দরিয়ার ওপরে সেতু পাততে ব্যস্ত। অথচ সাহস বা ভরসা পাই না। কিন্তু একটা বিষয় নির্ঘাত বুঝতে পেরেছি, 'তান্ত্রিক' কথাটি শোনা মাত্রই, আসলে আমি কিছুই বুঝিনি। একটা শোনা কথা, এবং অস্পষ্ট ধারণা থেকেই বলতে যাচ্ছিলাম, বুঝিছি। বুঝেনি কিছুই। তাও ব্রহ্মাণ্ড থেকে, ভয়ংকর সুকঠিন সাধনা, এবং কুলাচারী বীর, বা কৌল মানে তান্ত্রিক, ইত্যাদি সমগ্র বিষয়ই আমার কাছে যোগসূত্রহীন, অস্পষ্ট, ছায়াময়। বললাম, 'মিথ্যে কথা কেন বলবো, আমি বুঝিনি। তান্ত্রিক কথাটা শোনা আছে। হয়তো ও রকম আরো কিছু কিছু কথা শোনা আছে, কিন্তু বুঝেছি, এ কথা বলতে পারবো না।'

'বাহ., এই তো লক্ষী ছেলের মত কথা। সাধে কি আর তুমি আমার ভাঁতের নজরে পড়েছ?' পবিত্রী মা বললেন, এবং মুখ ফিরিয়ে জগতের দিকে তাকালেন, বললেন, 'জগত, এবার আমার কথাটা ভেবে গ্যাখ.। আমি কি মিছে বলেছিলাম? আবার তাকিয়ে গ্যাখ. ওর দিকে।'

জগত আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জিত চমকে মুখ ফিরিয়ে নেবার আগে, তিনিই ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু পবিত্রী মায়ের এ আবার কী রহস্য? কী বলেছেন তিনি, কী দেখতে বললেন আমার দিকে তাকিয়ে? দেখলাম, জগত হাত বাড়িয়ে পবিত্রী মায়ের পা ঢাকা কম্বলের ভিতরে ঢোকালেন। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, তিনি পবিত্রী মায়ের পা স্পর্শ করছেন। পবিত্রী মা বললেন, 'বারে বারে পায়ে হাত দিসনে, আমি কি তোর কথা বুঝিনে? তাহলেই গ্যাখ., দুঃখ মানুষকে নিচে নামাতে পারে, আবার কেউ কেউ ভাব আর ধ্যান পায়। শুনলি না, তোর গান শুনে, ও নাকি ফুল ফুটতে দেখেছে।'

জগত মুখ নত করলেন। এবং আমি আরো অস্বস্তি বোধ করলাম, কারণ অকাট্য জানা গেল, তাঁদের আপাত বচন আচরণ আমাকে নিয়েই। অতএব আমাকেও মুখ নামিয়ে নিতে হলো, যদিও মন হয়ে রইলো উচাটন।

'ওহে একটা কথা বলো তো?' পবিত্রী মা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালাম। তিনি বললেন, 'আমাদের দেখার পর থেকেই, আমাদের কথা চিন্তা করোনি তুমি?'

সহজেই বললাম, 'করেছি।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চিন্তা করছিলে?'

বললাম, 'চিন্তা করছিলাম, আপনারা বোধ হয় সন্ন্যাসিনী।'

'সন্ন্যাসিনী! তা এক রকম ভুল করোনি। এখন কী ভাবছো?' পবিত্রী মা জিজ্ঞেস করলেন।

বলতে গিয়েও, নিজের বক্তব্যটা যেন হারিয়ে গেল, হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। পবিত্রী মা তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন না। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, একটু ভেবে বললাম, 'আপনার ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তান্ত আমি ঠিক বুঝিনি। তাই, ঠিক কী, বুঝতে পারছি না। আপনারাও কি তান্ত্রিক?'

পবিত্রী মা হেসে উঠলেন, এবং শব্দকে আবার হাত চাপা দিয়ে থামালেন, কিন্তু তাঁর শরীরের তরঙ্গে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। আর প্রতিবারের মতোই,

সেই সুগন্ধও। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না গো, আমি তান্ত্রিক না, আমি তান্ত্রিকের সর্বসিদ্ধিদাত্রী।'

তাঁর শেষ কথাটি উচ্চারিত হলো যেন দৈববাণীর মতো। দেখলাম, তাঁর কাজলবিভ্রম ঈষদারক্ত চোখের তারা স্থির, এবং দৃষ্টি আমাকে ভেদ করে, যেন অন্যত্র নিবদ্ধ। তিনি কথা বলেন নিচু স্বরে, কিন্তু তা যেন, অতি দূরাগত স্পষ্ট এবং প্রতিজ্ঞাবাণীর মতো কঠিন ও গম্ভীর, 'অভেদজ্ঞান মায়াবীজের মন্ত্রে আমি শুদ্ধ, আমি শক্তি। আমিই বীরের শক্তি, আমিই শিব। আমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র সূর্য চন্দ্র, যা বলো, আমিই সেই শক্তি, আমিই জগতস্বরূপিণী, আমি ব্রহ্মাণ্ড।'

শব্দ ব্রহ্ম, এই অনুভূতি আমি প্রত্যক্ষ করলাম। অন্য সময়, অন্য ক্ষেত্রে, কোনো নারীর মুখ থেকে এ রকম কথা শুনলে, আমি কী করতাম, কী বলতাম, জানি না। কিন্তু পবিত্রী মায়ের তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটের হাসিটি উজ্জ্বল দেখে, তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যেই যেন একটি বিশেষ অর্থ বর্তমান মনে হচ্ছে। আমার কাছে তা অস্পষ্ট এবং অধরা, অতএব, এই কারণেই সব কিছু অনর্থক মনে করার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু পবিত্রী মা হঠাৎ হেসে উঠে, নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, 'কী যে মাথামুণ্ডু বলছি, তার ঠিক নেই। ও সব কিছু নয় বাবা, আসলে আমি প্রেমের শক্তি। তোমারো প্রেমে পড়েছি কি না, তাই মেলা কথা বলে ফেললাম।

আবার প্রেমে পড়ার কথা! যদিও আমি আগের মতো লজ্জায় গুটিয়ে গেলাম না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, পবিত্রী মা আর দশজন সাধিকার মতো, স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ে অজ্ঞ নন, বরং অনেক সচেতন। সেইজন্যই নিজের কথায় নিজেই বোধ হয় সংকোচ বোধ করছেন! আমি সংকুচিত হেসে বললাম, 'বললেন হয়তো কিছু, আমি সব কিছু বুঝতে পারিনি। আমার তো এসব তত্ত্বজ্ঞান-ট্যান নেই।'

পবিত্রী মা ঘাড় ফিরিয়ে, ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তত্ত্বজ্ঞান আবার কী? তুমিও তো শক্তি নিয়েই বাস করো। করো না?'

আমি অবাক স্বরে বললাম, 'কই না তো?'

পবিত্রী মা আবার সশব্দে হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিলেন, এবং চেষ্টাকৃত ভ্রূকুটি করেই বললেন, 'তুমি বউ নিয়ে ঘর করো না? পিপুল-পাকা ছেলে!'

যেন ধমকে দিলেন, শাসনের সুরে। তথাপি অবাক স্বরেই বললাম, 'সে তো বউ। বউ কি শক্তি হয় নাকি?'

পবিত্রী মা বললেন, 'হ্যাঁ হে বাপু, হ্যাঁ, স্ত্রী-ই শক্তি। তাকে যদি শক্তিরূপে জ্ঞান করতে পারো, তাহলে সে-ই শক্তি। সংসারের শক্তি বলতে স্ত্রীকেই বোঝায়। তা বলে ভেবো না, শক্তিরূপে জ্ঞান করা আর...

এই পর্যন্ত বলে, হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'আর বছর বছর বউকে পোয়াতি করা এক কথা! ওদিকে তোমার খুব খাঁই, আমি বেশ বুঝেছি।'

বলেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন। আমার শ্রবণে যেন গলিত আগুনের স্রোত নেমে গেল। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গেলাম। তার আগেই চকিতে একবার জগতকে দেখে নিলাম। তিনি চোখ বুজে নির্বিকার বসে আছেন। কিন্তু পবিত্রী মা যে এমন অনায়াসে এমন কথা বলবেন, ভাবতেও পারিনি। শেষের কথাটা মনে করে তো, মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। দেখছি, যেন-তেন রা কাড়তে মা একেবারে অদ্বিতীয়া! কথাটা নিজের স্ত্রীর মুখে শুনলে কতোটা আত্মগরিমা বোধ করতাম জানি না, কিন্তু লজ্জা পাবার অবকাশটাও আমার এখন তেমন কাটেনি। আর পবিত্রী মায়ের মতো একজন সাধিকা যদি এ কথা বলেন, মরমে মরে যেতে হয়। যেন জেনেশুনে ছুরি হেনে দিলেন। এ সব তো একটু রঙ্গিনী শালী-ভাজদের মুখেই ভালো মানায়।

চমকে উঠলাম, কাঁধের ওপর সহসা স্পর্শে। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পবিত্রী মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। হাতটা তুলে নিয়ে বললেন, 'প্রেমে পড়লে তার একটা দায় থাকে। তাই দু-একটা কথা বললে, গোঁসা করবে না তো?'

রাগ না, গোঁসা! কথাটি বেশ, কিন্তু আবার কী বলবেন উনি? গোঁসা করবার মতো, গোঁসা বাবা মনের ভাব এখন আর আমার নেই, তবু মায়ের মুখটি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। মুখ অর্থে, বুলি। আগের কথার লজ্জার ঝাঁজটা এখনো কাটেনি। বললাম, 'বলুন, কী বলবেন।'

তিনি বললেন, 'আমি জানি, তোমার মধ্যে সে-ভাবটি পুরোপুরি আছে, তবু একটু বলি। সংসারে সবাই সমান না। তোমার জীবনে একটা বিষয় বেশ প্রবল, কিন্তু তা নিয়ে হেলাফেলা করো না। মেয়েদের সব সময় সেবা করবে, এই জগত সংসারকে নারীরূপে দেখবে, সব সময় তার সঙ্গে থাকবে। তাকে ঘেন্না করা বা দুর্ব্যবহার করা, মারধোর করা তো দূরের কথা, মনে মনে প্রণাম করবে। এটা আমার ধর্মের কথা বটে, সংসারের কথাও। সুন্দর কুচ্ছিত

ছোট বড়, কোনো মেয়েমানুষকেই খারাপ চোখে দেখো না। অবিশ্যি আমি জানি, তোমার সে ধ্যান আছে। তবু বললাম! তোমার তাতে ভালো হবে।'

আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথা শুনলাম, কিন্তু সংশয়ও জাগলো। এ কি কখনো সম্ভব? তিনি আমার বিষয়ে কী জেনেছেন, বা বুঝেছেন আমি জানি না। প্রাণের মুগ্ধতা, মানুষের হৃদয়ের একটি বড় সম্বল। যে তা হারায়, সে দুর্ভাগা। কিন্তু মুগ্ধতা কি ধ্যানের বস্তু? আমার ধারণা, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে, তা আপনিই আবির্ভূত হয়। নারীর সতত সঙ্গ, সেবা, প্রণাম জ্ঞাপন, এসব চিন্তা আমার কখনো আসেনি। আমার জীবনে কোন্ বিষয়টি প্রবল, যা আমি হেলাফেলা করতে পারি, তারও কোনো সম্যক ধারণা নেই।

পবিত্রী মা বললেন, 'খুবই ভাবিয়ে তুললাম, না? ওই যে জিজ্ঞেস করছিলে আমরা কী? তার জবাবেই এ সব বলছি। শোনো, ন নারী সদৃশং ভাগ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি/ন নারী সদৃশং রাজ্যং ন নারী সদৃশং তপঃ/...ন নারী সদৃশং বিত্তং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি/তরুণীং সুন্দরীং রম্যাং যৌবনোদ্ভুত-মানসাম্। এসব শুনেছ বা পড়েছ কখনো?'

আমি প্রায় বিভ্রান্ত বিস্ময় অথচ মুগ্ধাচ্ছন্ন হয়ে, মাথা নেড়ে বললাম, 'না'।

'কথাগুলো মনে রেখো।' বলে পবিত্রী মা সামনের দিকে ফিরলেন। জগতের খসে পড়া-কম্বল, তাঁর গায়ের ওপর তুলে দিলেন।

জগত নিজেই তাড়াতাড়ি কম্বল গুছিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'ঠিক আছে মা, আমার তেমন শীত করছে না।'

আমার চিন্তায় এক ভাবনা, নারীকে এমন দৃষ্টিতে দেখার অনুভূতি আমার কখনো হয়নি। নিঃসন্দেহে, আমি অল্প বয়স থেকে—নারী সঙ্গকে অনিবার্য বলে বোধ করেছি, কিন্তু তা কোনো তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইনি। ওটা আমার স্ব-ভাবজাত। ছেলেবেলা থেকে, মা-কাকীমা-বউদি-দিদিদের সঙ্গেই আমার জীবন কেটেছে, তাঁদের শাসন-পালনেই বড় হয়েছি। সেখানে পুরুষের উপস্থিতি কমই ছিল। বাল্যের সঙ্গীদের মধ্যে, বালিকা সঙ্গিনীই আমার বেশি ছিল। তারা কেউ আত্মীয়া, অনাত্মীয়া প্রতিবেশিনী কেউ। কখনো তাদের শাসন করেছি, আবার মান ভাঙিয়ে ক্ষমাও চেয়েছি। নিজ স্ত্রীর পা ধরেও কি কখনো ওর কাছে অন্যায় স্বীকার করিনি? করেছি। কিন্তু জগতকে স্ত্রীময় চিন্তা করার তত্ত্ব, আমি কখনো লাভ করিনি। মায়ের মুখে শুনেছি, 'মায়ের বুকের অমৃতধারার ঋণ কখনো কোনো সন্তান শোধ করতে পারে না।'

জীবনে তা বেদবাক্যের মতোই বিশ্বাস করেছি। এখনো বেঁচে আছি যে! যদিও দায় নিজেরই এখন।

অবিশ্যি পবিত্রী মা আমাকে কোনো তত্ত্বজ্ঞান দিতে চাননি, সে কথা আগেই বলেছেন। তাঁর কথা শুনে, বিভ্রান্ত বিস্ময় ছাড়াও, মুগ্ধতার কারণ, তাঁর অনায়াস, সুচারু সংস্কৃত উচ্চারণ। শৈশব বা যৌবনের কথাই বা কী? আমি তো পবিত্রী মা এবং জগতকে দেখেও একটা মুগ্ধতা বোধ করেছি। পবিত্রী মায়ের সংস্কৃতের দখল বুঝিয়ে দিয়েছে, তিনি তাঁর তত্ত্বজ্ঞানে শুধু না, তিনি বিদুষী। আমি মনে মনে তাঁকে প্রণাম না জানিয়ে পারছি না।

কিন্তু মনে মনে প্রণাম জানাতে গিয়েই, আবেগবশতঃ প্রমাদ ঘটিয়ে বসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। ওই যে বললেন অমাবস্যায় চাঁদের উদয়, ওটা আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন?

'কী বললে?' যেন বাঘিনীর মতোই, নিচু স্বরে গর্জে উঠলেন পবিত্রী মা, ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর ঈষদারক্ত চোখ, আরো রক্তাভ এবং তীব্র—প্রায় জ্বলন্ত হয়ে উঠলো। রক্তাভ কপোল আর জ্বলজ্বলে, নাসারন্ধ্র কম্পিত স্ফীত। মনে হলো, তাঁর মাথার ঝোলানো জটার নানা রঙীন বস্তুসমূহ, সর্পচক্ষুর মতোই জ্বলজ্বল করে উঠলো। রমেন দাসের বর্ণিত সেই কালনাগিনী গলার মুর্তিকেই যেন আমি দেখতে পেলাম। একই রকম গর্জিত স্বরে বলে উঠলেন, 'তোমাকে আমি অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ব্যাখ্যা করবো? কেন হে? কে তুমি? কোন্ সাহসে এ কথা আমাকে বলছো?'

তাঁর ধিক্‌কৃত ভর্ৎসনার মধ্যে এমনই একটা তেজ বর্তমান, এবং তাঁর এবম্বিধ আচরণ এতই আকস্মিক, আমি লজ্জায় ও কুণ্ঠায় এতটুকু হয়ে গেলাম। কেবল তা-ই নয়, মনে হলো, না জেনে আমি একটি অতি গর্হিত কোনো অন্যায় করে ফেলেছি। লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে, একটা অন্যায় ও অনুশোচনাবোধ আমাকে যেন সর্বাংশে গ্রাস করলো। একথা ঠিক, আমি কখোনই যাজ্ঞা করে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইনি। সেই কপাট খুলে দিয়েছিলেন তিনিই। তারপরে যে দু-চারটি প্রশ্ন, তাঁর কথা শুনে মনে এসেছিল, তা নির্দ্বিধায় করেছি। জবাবও তিনি দিয়েছেন। এবারও সেই রকম নির্দ্বিধাতেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। হায়, তিনি না আমার প্রেমে পড়েছেন! প্রেমে না পড়লেও, অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছি, না জেনেই। অতএব, এখন কিংকর্তব্য?

আমি নত মুখেই, চোখের পাতা তুলে একবার জগতের মুখ দেখবার

চেষ্টা করলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর প্রতিমা-স্থির-চোখে, পবিত্রী মায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তিতে, কোনো রকম অসুখী কাঠিন্য নেই। আমি আমার সর্বাঙ্গে, পবিত্রী মায়ের ধিক্কৃত ভর্ৎসনার দৃষ্টি অনুভব করছি, এবং সেই অনুভূতির মধ্যে একটা অপমানও যেন আমাকে বিদ্ধ করছে। তথাপি, আমি বিরক্ত বা রুষ্ট হতে পারছি না। না পারার কারণ, তাঁর প্রথমাবধি আচরণ আর কথাবার্তাকে মনে করে। সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমার দেরি হোলো না, আমি আস্তে আস্তে পবিত্রী মায়ের দিকে ফিরে চকিতে একবার তাঁর চোখের দিকে দেখে নিয়ে বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন। অন্যায় যা করেছি, তা না জেনে করেছি, আশা করি আপনি তা বিশ্বাস করবেন।'

বলে, আমি আর একবার তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। আমার কথায় তাঁর কোনো পরিবর্তন হলো বলে অনুমিত হলো না, তিনি রইলেন একভাবেই তৎক্ষণাৎ কথা বললেন না একটিও। আমি কথাটা আর একবার ভাবলাম। কী বলেছিলাম? জিজ্ঞেস করেছিলাম, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের ব্যাখ্যা কী? আর জিজ্ঞেস করবো না। তিনি দয়া করে, এবারের মতো মার্জনা করলে, আমি আর একটি কথাও তাঁর সঙ্গে কইবো না। তাঁর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ না হোক, যথাসম্ভব ভুলে থাকা, আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে না। আপাতত ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমি আর কী করিতে পারি। পায়ে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা, সে রকম কোনো নাটকীয় ব্যাপার আমার দ্বারা সম্ভব না।

পবিত্রী মায়ের হঠাৎ একটি নিঃশ্বাস পড়লো, এবং আশ্চর্য শান্ত শোনালো তাঁর স্বর, 'তোমাকে অবিশ্বাস আমি কখনো করিনি, করবোও না। কিন্তু তুমি যে আমার বুকে পা বাড়িয়েছিলে!'

বুকে পা বাড়িয়েছিলাম! এমন কথা কল্পনায়ও আনতে পরি না। আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। এখন তাঁর মুখের ভাব অনেক শান্ত, চোখের আগুনে ছায়া। সেই হাসিটি ঠিক নেই, কালো চোখে ও তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটে। আবার বললেন, 'তুমি যা জিজ্ঞেস করেছ, তা হলো সাধনতত্ত্বের অতি গোপন কথা। জেনে রাখো, আমাদের একটা শপথ আছে, তা হলো, "আপন সাধন কথা/না কহিবে যথাতথা।" তা জানেন শুধু গুরু, যিনি তত্ত্বজ্ঞান শেখান, আর জানেন তিনি, যিনি সাধনসঙ্গী যিনি কৌল শক্তির পূজা করেন। সব কথা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা করেও বোঝানো যায় না। করতেও নেই, করলে, আমি পাতকী হবো। তুমিও পাতক হবে।'

পবিত্রী মা চুপ করলেন। তাঁর কথার মর্ম যেটুকু বুঝেছি আমার জিজ্ঞাসা

অতি গর্হিত অন্যায় হয়েছে। এবং এটাও অনুমান করছি, তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন—যার অর্থ ধরে নেওয়া যায়, আমাকে ক্ষমা করেছেন। মন! এবার গুটাও তোমার যতো বে-কবুল কৌতূহল আর বাতপুচ্ছ। থাকো আপন মনে। ন্যাড়া আর যাবে না বেলতলায়। বলেন কি না, আমি ওঁর বুকে পা বাড়াতে গিয়েছিলাম। যে জগতের ধ্যানজ্ঞান আমার নেই, যাবো না কস্মিনকালে, কী দরকার সে বিষয়ের ঘাঁটাঘাঁটিতে। এ যা ঘটলো, বাবার হাতের থাপ্পড়ের থেকে কোনো অংশে কম না।

আমি কম্বলটা ঘাড় অবধি তুলে পা থেকে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিলাম! কোণে হেলান দিয়ে বসলাম জুতসই করে!

'তা বলে ভেবো না যে, তুমি আমার সঙ্গে আড়ি করে সরে থাকবে।' পবিত্রী মা বলে উঠলেন তাঁর সেই আগের স্বরে, 'সেটি আমি হতে দিচ্ছি না। তুমি বলেছ, রাত্রে গাড়িতে ঘুমোতে পারো না। আমার তো ঘুম নেই। আমি বাপু চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না।'

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর চোখে এখন সেই ঢুলুঢুলু হাসি, রহস্যের স্পর্শ। হাসি ঠোঁটের কোণেও। অভিমান যে হয়নি, তা বলতে পারবো না। কিন্তু তাঁর হাসি আর কথাই যতো গোলমাল করে। বলছেন কী না, আড়ি করে সরে থাকতে দেবেন না। আড়ি কথাটাই মনকে অনেকখানি ভুলিয়ে দিল। ঘরোয়া আটপৌরে কথায় তাঁর জুড়ি নেই। আবার বললেন, 'এমন একটা ভাব করে বসছ, যেন সব পাট মিটিয়ে গুটিয়ে নিলে। কিন্তু আমাকে সত্যি কথা বলতে হবে তো? নাকি চাও, আমি মিছে তোমার সঙ্গে ভান করবো।'

আমি হাসবার চেষ্টা করে, নম্র স্বরে বললাম, 'কেন তা করবেন। আমিও কিন্তু আপনার সঙ্গে মিথ্যে ভান করিনি।'

'জানি হে!' আমার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলেন, 'চোখ দুটি দেখে তো মনে হচ্ছে, জীবনে বিস্তর গুঁতোগাতা খেয়েও অভয় প্রাণে চলছো, এটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো, আমি এমনি এমনি তোমাকে ও রকম করে বলিনি। তুমি যে বড্ড চোট দিয়েছ।'

তাঁর শেষের কথার সুরে যেন করুণ ধ্বনি বেজে উঠলো। আবার বললেন, 'আপন সাধনতত্ত্বের সঙ্গে যদি নিজের স্বামীর কোনো যোগ না থাকে, তা হলে তাঁকেও এমনি জবাবই দিতাম। সাধনের কথা তাঁকেও বলতে পারি না।

এমন গূঢ় সাধনা, স্বামীকে বলা যায় না? তবে কি, স্বামী ছাড়াও,

নারীর আপন তত্ত্বের সাধন হয়? কিন্তু সহজে আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না। আমি একবার জগতের মুখের দিকে তাকালাম। এখন তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, এবং এই প্রথম তাঁকে একটি একান্ত তরুণীর মতো, লজ্জায় হেসে মুখ ফেরাতে দেখলাম। যেন তিনি আমার সঙ্গে তাঁর দূরত্বকে অনেকটা নিকট করলেন। কেন? এ দয়া কিসের?

যারই হোক, মন, কোনো ফেরে পড়িস্ না, থাক্ আপনার মনে। পবিত্রী মা আবার বললেন, 'আমাদের সাধন যেমন কঠিন, তেমনিই গোপন। নিজেকে সঁপে না দিলে, গুরুর কাছে শিক্ষা না নিলে, এ সব জানা যায় না। ছেলেবেলায় হাতেখড়ি হয়েছিল তোমার?'

বললাম, 'হয়েছিল।'

তিনি বললেন, 'এ সব শিক্ষা তেমনি। শিশুকে কেউ বলে-কয়ে লেখা শেখাতে পারে না, হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে হয়। এও তেমনি অনেকটা হাতে কলমের শিক্ষা। ব্যাখ্যা করে তোমাকে কেমন করে বোঝাবো? অনেকে সারা জীবন ধরে গুরুর কাছে জেনে বা বুঝেও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুর তো এত কথা বলেছেন, অনেক অনেক বই লিখেছেন, অমাবস্যার চাঁদের উদয়ের কথা কখনো বলেছেন? বলেননি। কিন্তু সে সাধনটি তাঁকেও করতে হয়েছে। সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন,"কালীই তো ব্রহ্ম রে।" তা শক্তিই যে সব, সে কথা তো তোমাকে আমি বলেই দিয়েছি। আর শক্তি মানেই নারী। আরো একটু ভেঙে বলি, যে সত্যিকারের কৌল নিজেকে শিবজ্ঞানে, শক্তির পূজা করেন, তিনিই অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ঘটাতে পারেন। আর যারা পারে না, তারা লম্পট বদমাইস, মা-মাসীজ্ঞানহীন পাঁঠা। ধরাচূড়া পরা অমন পাঁঠাও এ সংসারে কম নেই।'

যতোই ভাবি, নিজের মনকে নির্বিকার অবিচলিত রাখবো, ততোই দেখি, ভিতরে ভিতরে নানা কথার আন্দোলন। কারণ, পবিত্রী মায়ের কথা। জিজ্ঞাসা জাগে আপনা থেকেই। কিন্তু সহজে আর তা করছি না। এখন তিনি নিজে যতোটুকু বলবেন, আমার অধিকার সেইটুকুই জ্ঞান করবো। তাঁর রুষ্ট মূর্তি আমি আর দেখতে চাই না। তবে, তাঁর শেষের দিকের কথাগুলো, অস্তরো ভাবে আমার কিছু কিছু যেন শোনা মনে হচ্ছে। বাবার গুরুদেব এবং বাবার মুখেও অতীতে আমি এই জাতীয় কথা অল্পবিস্তর শুনেছি। বলির তুল্য পশুরূপী সাধক বা মানুষের কথা, পবিত্রী মায়ের কথায়ও যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটা বিষয়ে আমার মোটামুটি অনুমান আছে, শক্তি সাধনা, নারী-পুরুষের একটি

গুহ্য সাধনতত্ত্ব। সেই বিষয়ের অসম্ভাব্যতার কথা বলতে গিয়েই, বাবার হাতের চপেটাঘাত জুটেছিল।

'কী গো, মনটা এখনো ভারি হয়ে আছে, মনে হচ্ছে?' পবিত্রী মা চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুম পাচ্ছে নাকি?'

আমি হেসে বললাম, 'সে পুণ্যিটাই করিনি।'

বলে আমি ঘুমন্ত কামরার চারদিকে একবার তাকালাম। পবিত্রী মা বললেন, 'বাঁচা গেছে। তবে বাপু, তোমার মনটা এখনো তেমন খোলতাই হচ্ছে না। আমাকে ও রকম কষ্ট দিচ্ছ কেন?'

কষ্ট? আমি চমকিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ভালোবাসার মানুষকে কি ও রকম কষ্ট দিতে আছে?'

প্রায় লজ্জা পেতে গিয়েও, আমি কৌতুকোচ্ছলে হাসলাম। তিনি ভ্রুকুটি করে বললেন, 'আমার ভালোবাসাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

বললাম, 'অবিশ্বাস করতে পারছি না, কিন্তু মুখ খুলতেই ভয় পাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'সেটা তোমার অন্যায়। যা পারবো না, তা পারবো না। কী করবো বলো। তবু তোমাকে আর একটু বলি। বলবো?'

আমি উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় কাত করে বললাম, 'বলুন।'

পবিত্রী মা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভোগ-মোক্ষ বলে কোনো কথা কখনো শুনেছ।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, 'না।'

'ভোগ-মোক্ষ মানে হলো, ভোগের মধ্য দিয়ে মোক্ষ লাভ।' পবিত্রী মা বললেন, 'আর সে ভোগটা কেমন জানো? শোনো, মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ/মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্।'

বলতে বলতেই হেসে উঠলেন, কিন্তু শব্দ না করে, কেবল শরীরে তরঙ্গ তুলে বললেন, 'অথচ, যে পঞ্চমকার মহাপাতক বিনাশ করে, কতো বাবুভেয়েরা তাই নিয়েই ফুর্তিতে মেতে আছে, ওই ভোগ-মোক্ষই হলো, অমাবস্যার চাঁদের উদয়। আর সেখানে আমি কে জানলে? শুনলে ঠিক বুঝবে। বাঙলায় ভেঙে বলি, আগমোক্ত পতি শিব-স্বরূপ, তিনিই গুরু, তিনিই কুলবধূদের প্রকৃত স্বামী, বিবাহিত স্বামী স্বামী নয়। কুলপূজায় বিবাহিত স্বামীকে ত্যাগ করলেও দোষ হয় না। কেবল বেদোক্ত কাজে বিবাহিত স্বামীকে ছাড়া চলবে

না। বলতে গেলে, অনেক কথা বলতে হয়, এক আধটুকুতে শেখা হয় না। এ কথার থেকে আমাকে কিছুটা বুঝলে তো ?'

পবিত্রী মা এমন ভাবে ঘাড় কাত করে, আমার চোখের দিকে তাকালেন, আমি যেন কিছুটা বিপন্ন বিস্ময়েই চোখ নামিয়ে নিলাম। শুনতে পেলাম, তিনি আবার বলছেন, 'একজন মস্তবড় নাম-করা সাধক, আমি তাঁর নাম তোমাকে বলবো না, তাঁর স্ত্রীকে অনেকে মা বলে খুব ভক্তি করে। কিন্তু সেই সাধক, তাঁর মোক্ষলাভের জন্য, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাধন করেননি, করেছিলেন একজন বিশেষ ব্রাহ্মণী উত্তরসাধিকার সঙ্গে। এ-কথা সেই সাধকের জীবনীতে লেখা নেই, হয় তিনি বলেননি, বা যে বই লিখেছে, সে জেনেশুনেই সে কথা লেখেনি। অবিশ্যি, সাধারণ লোকের তা জেনেই বা কী হবে। সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে আছে, পূজাকালং বিনা নান্যং পুরুষং মনসা স্পৃশেৎ পূজা-কালে চ দেবেশি বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ। বুঝলে ?'

পবিত্রী মা এমন ভাবে কথাগুলো বলছিলেন, যেন আপন মনেই, আমার দিকে তাকিয়ে, মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। তাঁর শেষের কথায় যেমন বিস্মিত হলাম, তেমনি, আবার সংস্কারবশতঃই দৃষ্টিও নত করলাম। কিন্তু এ কি কঠিন বিধান। পূজাকাল ভিন্ন পরপুরুষের কথা মনেও আনবে না, আর পূজাকালে বেশ্যার মতো পরিতোষ করতে হবে ? কেন, ঠিক বেশ্যার মতোই কেন, এবং তার স্বরূপই বা কী ? স্ত্রী বা প্রেমিকরূপে কি হয় না ?

জিজ্ঞাসা অবৈধের। করবোও না, কিন্তু পবিত্রী মা তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহলকে তীব্রতর করলেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে-ইচ্ছা মনে মনেই রাখতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো না, তাঁর কি বেদোক্ত পতি বর্তমান ? অথবা আগমোক্ত পতিই তাঁর একমাত্র স্বামী। দেখলাম, তিনি সোজা স্থির হয়ে বসেছেন। দোলানিটা গাড়ির ! তাঁর চোখ বোজা। আমার দৃষ্টি পড়লো জগতের দিকে। তিনি চোখ মেলে, কম্বলে গা জড়িয়ে বসে আছেন।

পবিত্রী মা চোখ খুললেন না, আমার দিকে তাকালেন না, হঠাৎ বললেন, 'প্রেমই শক্তির আধার।'

কথাটা শুনে আমি চমকে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি এক রকমই রইলেন। চোখ খুলে তাকালেন না। মনে হলো কথাটা তাঁর মুখে, আগেও একবার যেন শুনেছি। আমি জগতের দিকে তাকালাম। আবার সেই দৃষ্টি

বিনিময়, তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, এবং সেই একান্ত তরুণীর মতো লজ্জিত হেসে দৃষ্টি নত করলেন।

'রাত শেষ হতে আর একটু বাকী আছে। ঘড়িটা ত্বাখ্ তো জগত।' পবিত্রী মা বললেন, কিন্তু সেই একই অবস্থায়।

জগত তাঁর ঝোলার মধ্যে হাত দিয়ে, বের করলেন একটি বেশ বড় সোনার পকেট ঘড়ি। বোতাম টিপে ঢাকনা খুলে বললেন, 'রাত্রি তিনটে বেজে পাঁচ।'

শুনে আমিও থ। তিনটে বেজে গিয়েছে? গাড়ি কোথায় কোথায় দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করিনি।

পবিত্রী মা বললেন, 'তাহলে আর একটা পান দে মা খাই, পরে আর অনেকক্ষণ সময় পাবো না।'

এ কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারলাম না। সারা রাত্রি যখন জেগেই থাকবেন, পরে আর পান খেতে দোষ কী? দোষ যে কী, সে তো এক ঝাপটাতেই বুঝতে পেরেছি। আবার? কিন্তু শরীরের একটি প্রাকৃতিক বেগ যেন বসতে দিচ্ছে না। এবং একটা আশ্চর্য লাগছে, পবিত্রী মা বা জগতকে একবারও জায়গা ছেড়ে উঠতে দেখিনি। জগত ঝোলাতে ঘড়ি রেখে পানের কৌটা বের করলেন। আমি জায়গা ছেড়ে উঠে, ঘুমন্ত মানুষদের মাঝখান দিয়ে, বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। শীতটা যেন নখে নখে বিদ্ধ করলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে, কোনো রকমে জায়গায় এসে কম্বল জড়ালাম গায়ে।

এখন একটা আচ্ছন্নতা বোধ করছি, যদিও সেটা ঠিক নিদ্রার অনুভূতি না। পবিত্রী মায়ের মুখ টেপা, অর্থাৎ পান মুখে দিয়েছেন, কিন্তু চোখ খুলেছেন। আমার দিকে ফিরে, হেসে বললেন, 'তোমার চোখ তো ছোট হয়ে এসেছে দেখছি।'

বললাম, 'বুজতে পারলে ভালো হতো।'

তিনি বললেন, 'আর তো রাত কাবার হয়েই এল। তোমাকে নেমন্তন্ন করে রাখছি। গৌহাটিই যখন যাচ্ছো, একদিন কামাখ্যায় আমাদের আশ্রমে এসো। আশ্রমের নাম শ্রীশ্রীপ্রাণতোষ ভৈরববাবার আশ্রম। বাবার সঙ্গে কথা বললে, তোমার ভালো লাগবে।'

আশ্রমের নাম এবং প্রাণতোষ ভৈরববাবার কথা রমেন দাসের কাছে আগেই শুনেছি। বললাম, 'নিশ্চয়ই যাবো।'

মুহূর্তেই অন্য একটি কথা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি পুষ্পাবন পরবের কথা বলছিলেন। সেটা কী?'

জিজ্ঞেস করেও, বুকটা কেমন ধক্‌ধক্ করতে লাগলো। আবার ঝাপটা খেতে হবে না তো? পবিত্রী মা হেসে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'ওই দিন কামাখ্যা দেবীর সঙ্গে উমানন্দর বিয়ের উৎসব হয়। খুবই মন মজানো উৎসব। থাকলে, এসো, আমার কাছে এসো, নেমন্তন্ন খাবে। অবিশ্যি মনের মতন অনেক মানুষ হয়তো জুটে যাবে, আমাকে মনেই থাকবে না। থাকলে এসো।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মনের মতন আবার কে জুটবে যে, আপনাকেও ভুলে যাবো?'

পবিত্রী মা জগতের দিকে তাকালেন। দুজনের দৃষ্টি ও হাস্য বিনিময় হলো, রীতিমত ঈশারা-ইঙ্গিতময়।

পবিত্রী মা বললেন, 'কামরূপ কামাখ্যা বলে কথা, কিছু বলা যায় কী? সেখানে এখনো অনেক পুরুষ ভেড়া বনে যায়।'

বলেই, তিনি ভুরু তুলে ব্যস্ত ভাবে বললেন, 'অবিশ্যি তোমাকেও ভেড়া বানানো যাবে, তা বলছি না। তবে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বলে একটা কথা তো আছে, তাই বললাম।'

আমি হাসলাম, তারপরে মনের কথাটা একটু আগে-পিছে কয়েকবার চিন্তা করে বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলবো?'

পবিত্রী মা বললেন, 'বলো, তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছি কোথায়?'

আমি চকিতে একবার জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তিনি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি সংকোচে হেসে বললাম, 'আপনাদের আশ্রমে গেলে, ওঁর গান শুনতে পাবো?'

পবিত্রী মা আমার দিকে না, ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন জগতের দিকে। জগতের প্রতিমা মুখ যে লজ্জায় ও ব্রীড়ার এতটা ছটায় ঝলকে উঠতে পারে, আগে মনে হয়নি। তিনি ঠোঁট টিপে, মুখ নত করলেন।

পবিত্রী মা আবার আমার দিকে তাকালেন, তারপরে আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুম্, বুঝেছি। বড্ড ফুল ফোটা দেখার সখ জেগে উঠেছে প্রাণে?'

আমি ন্যাড়ার মতো, বেলতলার ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। আবার কিছু

বে-ভূত বাত বলেছি নাকি? পবিত্রী মা বললেন, [illegible] সাধনা দেখছি তোমার প্রাণেও সমান। আমার মেয়ের গান শোনবার জন্ত তুমিও পাগল।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, প্যাগল নই, মানে—।'

'চুপ! ও সব আমি শুনতে চাই না।' পবিত্রী মা প্রায় ধমক দিয়ে উঠে বললেন, 'তা গান শুনতে পাবে কি না পাবে, মেয়েকেই জিজ্ঞেস করো না। আমি কেন বলতে যাবো!'

বলতে বলতে তাঁর ঠোঁটের কোণের হাসিটি প্রথম রৌদ্রকিরণের মতো চিকচিক করে উঠলো। কিন্তু, জগতকে জিজ্ঞেস করবো? সর্বনাশ! প্রায় একটা গোটা দিন এবং রাত্রি যিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি, তাঁকে জিজ্ঞেস করবো আমি? তাকিয়ে রইলাম পবিত্রী মায়ের দিকেই। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাকে এ রকম মেনিমুখো ছেলে বলে মনে হয়নি তো? জিজ্ঞেস করতে পারছো না?'

আমি যেন আরো বিব্রত হয়ে, পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তাঁর স্থির দৃষ্টি নিবিড়তর হলো, এবং মনে হলো আমাকে যেন কিছু নির্দেশ করছেন। আমি জগতের নত মুখের দিকে তাকিয়ে, কোনো রকমে উচ্চারণ করলাম, 'শোনাবেন?'

জগত মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো, তাঁর চক্ষু যেন শিল্পীর আঁকা প্রতিমার মতো। লজ্জিত ব্রীড়াময়ীর হাসিটি ঠিক এখন আর নেই, স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আসবেন, শোনাবো।'

আমি যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। জগত আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলেন। অথচ তাঁরও চুলের জটা চূড়া করে বাঁধা, রুদ্রাক্ষের মালা বালা, কপালে বিভূতি আঁকা। এটা কি নিতান্ত তিনি বয়সে তরুণ বলে? পবিত্রী মা তাঁর বাঁ হাতে মায়ের ভঙ্গি করে বললেন, 'ভৈরববাবা তোমাকে ধরে পেটাবেন।'

জগত এবার শব্দ করেই হেসে উঠে, আবার মুখ নত করলেন। আমি কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললাম, 'কেন?'

পবিত্রী মা বললেন, 'কেন আবার? তাঁর পেয়ারের মেয়ের গান, তিনি একলা শুনতে ভালোবাসেন। তবে মা-ই যখন রাজী, তখন আর বলবার কি আছে?'

তাঁর ঠোঁটের কোণে বক্রতা, চোখের তারা যুগলেও, এবং দৃষ্টিপাত করলেন জগতের দিকে। জগত কম্বল থেকে হাত বের করে, পবিত্রী মায়ের কম্বলের তলায় বাড়াতে উদ্যত হলেন। পবিত্রী মা তাড়াতাড়ি জগতের হাতটি ধরে

...ে, তুই আর পাগলামি করিস্ না। আসলে কী বোঝা গেল জানিস্? এ ছেলেটা ভাবের ঘরের, ওকে কেউ ভেড়া বানাতে পারবে না। তা নইলে কি বলে—আর কোনো সাধ নেই, আশ্রমে যাবে তোর গান শুনতে?'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে একটু হেসে বললেন, 'আসিস্। অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের গান শুনবি আমার মেয়ের কাছে।'

হঠাৎ একেবারে 'তুই!' শুনতে কিন্তু খারাপ লাগলো না। নিতান্ত সখীর মতো বলবো না, কিন্তু তাঁর হাসি ও ভঙ্গির মধ্যে কোনো রকম, যাকে বলে গেরামভারি চাল ছিল না। আমি আবার আত্মভোলা হলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনার মাথার জটায়—।'

'এটি আমার নিজের জটা না। আমার গুরু এটি আমাকে দিয়েছেন।' পবিত্রী মা আমার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'শুনেছি, গঙ্গাগিরি অবধূতানীর মাথার জটার এটি এক টুকরো।'

গঙ্গাগিরি অবধূতানী! কস্মিনকালেও নাম শুনেছি বলে মনে হলো না। এবং সেটা বোধ হয় তেমন বিচিত্রও কিছু না। কিন্তু সে-কথা তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইনি, যদিও একটি অভিজ্ঞতা হলো। অবধূত বা অবধূতানী বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। পবিত্রী মা নিজেই আবার বললেন 'গঙ্গাগিরি অবধূতানী হিমালয়ে থাকতেন, শুনেছি অনেক কাল আগে দেহরক্ষা করেছেন।'

আমি বললাম, 'না, মানে, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার জটায় রুদ্রাক্ষ প্রবালগুলো চিনতে পারছি, কিন্তু শাদা শাদা ওগুলো কী? কোনো পাথর, না পুঁতি?'

পবিত্রী মা আবার সব ভুলে খিলখিল করে হেসে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিলেন। তারপরে আলগোছে জটার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এগুলোকে বলে ঠুম্‌রা। হিংলাজের নাম শুনেছ?'

আমি অবোধের মতো মাথা নাড়লাম। তিনি বললেন, 'আমি নামটাই শুনেছি যাইনি কখনো। অনেক দূরে, সেই কাবুল না আফগানিস্থানের কোথায়, হিংলাজেশ্বরীর মন্দির আছে। সেখানে এই ঠুম্‌রা পাওয়া যায়। শৈব শাক্ত, যারাই যায়, তারাই ঠুম্‌রা পরে। এও আমাকে আমার গুরুদেব দিয়েছেন। এক রকমের পাথর বলতে পারো।'

ঠুম্‌রা! অদ্ভুত নাম। কতোটুকু বা জানি বা শুনেছি। আমার কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা ক্রমে বাড়তে আরম্ভ করেছে, নিজেরই খেয়াল নেই। জিজ্ঞেস করলাম,

'দেখুন, পবিত্র শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পবিত্রা হয় বলে জানি, কিন্তু [illegible] অর্থটা ঠিক বুঝলাম না।'

পবিত্রী মা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, 'বুঝেছি, মনে মনে অনেক প্রশ্ন। পবিত্র পবিত্রা ঠিকই আছে। এক ধরনের শাঁখাকে পবিত্রী বলে, সন্ন্যাসীরা অনেকে তা ধারণ করেন। আমার গুরুর একটি শাঁখের মালা আছে, গলায় পরেন। তিনি আমাকে পবিত্রী মা বলে ডাকেন, এর বেশি কিছু বলতে পারছি না। আমার আসল নাম বিমলা।'

অর্থাৎ শংখবলয় বা মালাকে পবিত্রী বলে এবং পবিত্রী মায়ের গুরু একটি মালা গলায় ধারণ করেন, আর তাঁকে পবিত্রী মা বলে ডাকেন। অতএব শব্দের অর্থসন্ধান নিরর্থক। কিন্তু, সম্ভবত গুরুর দেওয়া পবিত্রী মা নামটি গভীর অর্থব্যঞ্জক।

হঠাৎ একটা চিৎকৃত আর্তনাদে চমকে উঠলাম। রমেন দাসের ছোট্কাটা ছিটকে বেরিয়ে পড়লো লেপের তলা থেকে। কাচের জানালা দিয়ে দেখলাম, বাইরে প্রদোষের আলোর ইশারা।

পবিত্রী মা বলেন, 'জগত, কমণ্ডলুটা দে তো মা।'

জগত কমণ্ডলু দিলেন। পবিত্রী মা উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন, 'জানালাটা একবারটি খোলো।'

আমি জানালা খুলে দিলাম। পবিত্রী মা মুখে জল নিয়ে কয়েকবার কুলকুচা করলেন। হাত ভিজিয়ে কপালে, কানের পিঠে, দু'ডানায় বোলালেন। তারপরে নিজের জায়গায় সোজা হয়ে বসলেন এবং চোখ বুজলেন। আমি জানালা বন্ধ করলাম। স্পষ্টতই: লক্ষণীয়, পবিত্রী মা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে বসলেন, যাকে যোগ বা তপ, যা-ই বলা যাক। অতএব এখন কথা নিষেধ। দেখলাম, জগত হাত-মুখে জল দিলেন না, কিন্তু চোখ বুজে বসলেন।

আমিনগাঁয়ে নেমে, রেল কোম্পানির স্টিমারে উঠতে উঠতে, পবিত্রী মাকে আর দেখতে পেলাম না। আমিনগাঁয়েই তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য অনেক বড় একটি ভিড় ছিল। যাঁদের মধ্যে, বাঙালী অসমীয়া মারোয়াড়ি কয়েকজনকেও দেখেছি। আমাকে তাঁর শেষ কথা ছিল, আমার কাঁধে হাত রেখে, 'ওহে বাবাজী, একবারটি এসো, নইলে প্রাণে কষ্ট পাবো।'

জগত বলেছিলেন একটি মাত্র কথা, 'আসবেন।'

তারপর থেকে, একটা কথা বারেবারেই মনে হয়েছে, প্রায় একটা জিজ্ঞাসার মতো, আমার কি উচিত ছিল পবিত্রী মাকে একটি প্রণাম করা? কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। যা আপনা থেকে ঘটেনি, তাকে ঘটিয়ে লাভ কী।

স্টিমার থেকে নেমে পাণ্ডুতে আবার ট্রেন। গৌহাটিতে পৌঁছে, সাইকেল রিকশায় চেপে, বন্ধুর কোয়ার্টারের সামনে এসে একটু ঠেক খেয়ে গেলাম। ছেঁচা বাঁশের দেওয়াল, মাটির ভিত, মাথায় টিনের চাল, এ রকম রেল কোয়ার্টার আগে কখনো দেখিনি। বেলা তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা, নম্বর মিলিয়ে, তাকিয়ে দেখলাম, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অবিবাহিত বন্ধু, অতএব কপাটে করাঘাতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই। সময়টা একটু অসময়, এই যা।

'কে? কাকে চাই?'

একটু শ্লেষ্মা জড়ানো পুরুষের বাঙলা কথা শুনে, ডানদিকে পাশে তাকিয়ে দেখলাম, একটি কৃশকায়, দীর্ঘদেহ ব্যক্তি। মাথায় চকচকে টাক, ভ্রূকুটি চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ, নাকটি টিয়ে পাখির মতো, করসা রঙ। গায়ে মোটা পশমী আলোয়ান, হাতের লাঠিটা বেতের, এবং সেটিও বেশ মোটা।

আমি বন্ধুর নাম করে বললাম, 'সত্যেন চ্যাটার্জির কোয়ার্টার এইটাই তো?'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

বিরক্তিকর! তুমি করেই বলুন না, ভাববাচ্য কেন? বললাম, 'কলকাতা থেকে

বৃদ্ধ বললেন, 'সত্যেনের তো রাত্রে ডিউটি ছিল। এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।'

বলে তিনি কয়েকটি গাছের আড়ালে আড়ালে অন্তর্ধান করলেন। আশ্চর্য! চেনেন, অথচ আর কিছুই বললেন না। ভাবখানা, যেন সারা রাত্রের ডিউটির পরে ঘুমন্ত বন্ধুকে আমার জাগানো উচিত না। আমি যে গতকাল দুপুরে গাড়িতে উঠেছি, সেটা যেন কিছুই না। আমি এগিয়ে গিয়ে, বন্ধুর দরজায় করাঘাত করার উদ্যোগ করতেই, নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। দেখলাম, উস্‌কোখুস্‌কো চেহারায়, আমার বন্ধুই দরজায় দাঁড়িয়ে কিন্তু ওর চোখে মুখে ঘুমের আভাস মাত্র নেই, বরং একটু চকিতগ্রস্ত ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, বাইরে একবার উঁকি দিল। তারপরে পিছন ফিরে, মাথা ঝাঁকিয়ে যেন কিছু ইশারা করলো। তৎক্ষণাৎ একটি তরুণী, বন্ধুর পাশ ঘেঁষে, তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং নিমেষেই অনেকগুলো সারি সারি কোয়ার্টারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যেন ভোজবাজী! আমি হাঁ করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বন্ধু এবার দরজার বাইরে এসে, আমার স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে, ঘাড়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে বললো, 'চলো, ভেতরে চলো। হঠাৎ চলে এলে, কোন খবর দাওনি তো?'

জবাব নিশ্চয়ই দেবো, কিন্তু তার আগে, আমারই জবাব পাওয়া দরকার বৃত্তান্তটা কী? আমার বগলে শতরঞ্চি আর কম্বল। বন্ধুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে, অন্ধ হয়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি ঘর এ রকম অন্ধকার হওয়ার কথা না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত অন্ধকার কেন?'

বন্ধু জবাব না দিয়ে, হাত থেকে স্যুটকেসটা নামিয়ে, দুটো জানালা পরপর খুলে দিল। ঘর ভরে উঠলো শীতের বিকালের আলোয়। দেখলাম, খাট চৌকি বলতে কিছু নেই, কাঠের খুটির ওপরে বাঁশের মাচানের খাট, তার ওপরে বিছানা পাতা। ঘরের মধ্যে সুগন্ধ তেল, হিমানী, নানা কিছুর গন্ধ ছড়ানো। বন্ধু বললো, 'বসো। কেমন আছো, খবর কী? মিত্তেনী (আমার স্ত্রী) ভালো আছে?'

কিন্তু আমার ঠেক্ যা লেগেছে, তারপরে এ সব জবাবের কোনো অর্থ হয় না। ভালো না থাকলে, এবং বন্ধুর মিত্রানীকে ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই আসিনি। আমি ওর উস্‌কোখুস্‌কো, লুঙ্গি পরা, পাঞ্জাবি গায়ে সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়েই রইলাম। ও হঠাৎ হেসে উঠে বললো, 'বাইরে তুমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলে, উনি হলেন গাঙ্গুলিমশাই, আমার ভাবী শ্বশুর। কয়েকটা কোয়ার্টার ছাড়িয়েই ওঁর কোয়ার্টার।'

আমি ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, গাঙ্গুলিমশাই বোধ হয় তারই পিতৃদেব?'

বন্ধু হেসে উঠে বললো, 'ঠিক ধরেছ।'

আমি বললাম, 'শালা!'...

অতঃপর বৃত্তান্ত সকলই অবগত হওয়া গেল। আমার আইবুড়ো বন্ধুটি, গাঙ্গুলিমশাইয়ের, যাকে বলে, পেয়িং গেস্ট। তবে কেবল খাওয়া, থাকা না। কিন্তু থাকার থেকে, নিজের কাছে পাকাপাকি এনে রাখারই পর্ব চলছে। অর্থাৎ স্বয়ং গাঙ্গুলি-কন্যাকেই। আমি মহাপাতক, অতি অসময়ে এসে পড়েছিলাম। খবর দেওয়া থাকলে, বন্ধুটি ওরকম ভাবে ধরা পড়তো না, সাবধান

থাকতে পারতো। বৃহৎ বাড়ির লুকোচুরির খেলার সময়টা, দ্বিপ্রহরেই জমে ভালো। সেটা যদি আবার প্রেমঘটিত লুকোচুরি হয়।

ভাবী বন্ধুপত্নীর নাম শ্যামলী, যদিও সে মোটেই শ্যামলী না। সুগৌরী কন্যার নাম যেমন কৃষ্ণা হয়, সেই রকম। ক্রমে ক্রমে আলাপ। বন্ধুর সঙ্গে, আমার খাবার বরাদ্দও গাঙ্গুলিমশাইয়ের বাড়িতেই। প্রস্তাব তাঁদের পক্ষ থেকেই এসেছে, আমার জন্য যেন আলাদা খাবার ব্যবস্থা করা না হয়। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, কিন্তু গাঙ্গুলিমশাই একাই একশো, অস্বস্তির তিনি কিছু রাখেননি। তার মানে এই না যে, তিনি হাসিখুশি, খোসগল্পের মানুষ। একেবারেই না। বন্ধুর ভাবী শ্বশুর হলেও বলতে বাধা নেই, একেবারে রামগড়ুরের ছানা। কিন্তু বচনে অতি দড়ো, এবং তা যদি হয় আবার রাজনীতি-বিষয়ক।

শ্যামলীরা চার ভাই তিন বোন। বোনদের মধ্যে শ্যামলী বড়। ওর ওপরে দুই দাদা, তাঁরাও রেলেই চাকরি করেন, এবং বিবাহিত। খাওয়াটা এক হাঁড়িতে, বাস তিনটি কোয়ার্টারে ছড়িয়ে।

বন্ধুকে দেখলাম, সে রাতের ডিউটি বেশি পছন্দ করে। কারণ দিনের বেলাও একটা ডিউটির বিষয় আছে। বন্ধুর দুটি ঘর থাকলেও, বুঝতে অসুবিধা হয় না, অভিসারিকার বিশেষ অসুবিধা। অতএব, বন্ধুকে রেহাই দিয়ে, আমি আপনার মনেই ঘুরে ফিরে বেড়াই। আমার অভিসারও যে ভিন্ দেশের নতুন প্রকৃতির কাছে।

গৌহাটি আসবার দিন চারেক পরে, পঞ্চম দিনে ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম। আকর্ষণ কামাখ্যা। যাত্রাটা খুব সহজ না। পাহাড়ের এক এক জায়গার রাস্তা রীতিমত খাড়াই। রেলিং ধরে না উঠলে, পতনের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এত শ্রীফল বৃক্ষ আর কুত্রাপি দেখিনি। আর গাছের ডালে ডালে ফলেরও যেন ছড়াছড়ি। এ পথ দিয়ে উঠতে উঠতে, বইয়ে পড়া কিংবদন্তী মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই কিংবদন্তী অনুযায়ী, এ রাস্তা নরকাসুরের দ্বারা তৈরি। নরকের সেই অসুর রাজামশাই, খুব দাপটে ছিলেন। ষোল হাজার রূপসী কন্যাকে নাকি তিনি এখানে আটক করে রেখেছিলেন, পরে যাঁরা কৃষ্ণর দ্বারা মুক্ত হয়ে, ষোড়শ সহস্র গোপিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। হয়তো কৃষ্ণ এবম্বিধ বীরত্বটি দেখাতে পারতেন না, যদি কামাখ্যা নরকাসুরের সহায় থাকতেন। অবিশ্যি হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেব যদি কামাখ্যা প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তাহলে নরকাসুরের কিংবদন্তীকে ঘ্যাচ করে দিতে হয়। যদি ধরে নিই,

নরকাসুরই কামাখ্যার রক্ষক ছিলেন, কিন্তু তাঁর কপাল পুড়েছিল কামাখ্যা দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়েই। তিনি চেয়েছিলেন, দেবীকে বিয়ে করবেন। নরকাসুর বলে কথা! দেবীর কামপীঠের সে রক্ষক! অতএব, তিনি বললেন, নরকাসুরের প্রস্তাবই সই, তবে একটা চুক্তি আছে। নরকাসুরকে এক রাত্রের মধ্যেই, একটি মন্দির গড়ে দিতে হবে, একটি পুকুর কাটিয়ে দিতে হবে, এবং সমতল থেকে একটি রাস্তা পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত তৈরি করে দিতে হবে।

নরকাসুরকে রাজী হতেই হলো। একে একে সবই প্রায় শেষ, মন্দির গড়া, পুকুর কাটা, রাস্তাও তৈরি হয়ে যায়, এমন সময় যামিনী শেষের ঘোষণা বেজে উঠলো মোরগের ডাকে, কুক্কুরে কু!...দেবী বললেন, আর তো হয় না। রাত্রিশেষের প্রহর ঘোষিত হয়েছে, রাস্তা তখনো তৈরি শেষ হয়নি। অতএব বিবাহ বাতিল। নরকাসুর রেগে গিয়ে, সেই কুক্কুটটাকেই কেটে ফেললো। সেই থেকে নাকি, এখান থেকে ন' মাইল দূরে কুকড়াকাটা বলে একটা জায়গারই নাম হয়ে গিয়েছে।

বেচারি নরকাসুর। সব অসুরেরই এক গোত্র। রাবণও মরেছিল সীতার রূপে মুগ্ধ হয়েই। কিন্তু আমার রোমাঞ্চ জাগছে, অন্য কারণে। সত্যি কি আমি চলেছি সেই পৌরাণিক যুগের, নরকাসুরের তৈরি পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে? কামাখ্যা যে প্রাচীনতম একটি পীঠস্থান, সেটা নানা পুরাণেই উক্ত হয়েছে। বিশেষত: কালিকা পুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্রে। তবে কামাখ্যা দেবীর আর এক প্রবাদ, কোচবিহারের রাজবংশকেও তাঁর দর্শন নিষিদ্ধ করেছে। কোন্ এক ঢাকী নাকি এমন সুন্দর ঢাক বাজাতো, কামাখ্যা দেবী একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে, সেই ঢাকের তালে তালে নাচতেন। ঢাকীর মুখে এ কথা শুনে, কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ একদিন সেই নাচ দেখে ফেলেন। কামাখ্যা দেবী ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলেন, কিন্তু রাগ করে, ঢাকীর মুণ্ডুটা দিলেন উড়িয়ে, আর বিশ্বসিংহকে দিলেন অভিসম্পাত, তাঁদের বংশের কেউ কামপীঠ দর্শন করলে, বংশই চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। সেই থেকে নাকি কোচবিহার রাজবংশের কেউ আর কামপীঠে আসেন না।

যাই হোক, কামপীঠের আকর্ষণের মধ্যে, সম্ভবত: মানুষের একটি অতি আদিম রিপুর অনুভূতি জড়িত। সে বিষয়ের কিংবদন্তী আর প্রবাদের ছাড়াছড়ি, নানান তুকতাকের তো কথাই নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা তীব্র দুর্গন্ধ নাকে ঢুকলো। আশেপাশে তাকিয়ে বাঁদিকের একটি কুয়োর মতো গর্তের মধ্যে দেখলাম, অনেকগুলো বাঁদরের মৃতদেহ। বাঁদরের মৃতদেহ! শুনেছিলাম,

এই সব রাম-বাহনরা হিন্দুদের অবধ্য। এখানে নিশ্চয়ই কোনো অহিন্দু এসে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। যাতনায় পড়লে, সবই হয়। কথায় বলে, বাঁদরের বাঁদরামি। গৃহস্থের ক্ষতি যখন শুরু করে, তখন উত্ত্যক্ত করে মারে। এ বোধ হয় তারই প্রতিকারার্থে। কিন্তু এ দুর্গন্ধের কী গতি হবে?

এ শীতেও আমার ঘাম দেখা দিয়েছে। তবু তাড়াতাড়ি উঠতে লাগলাম। আমি একা না, আরো কেউ কেউ উঠছিল, কিন্তু খুব কম। বরং নিরালাই বলতে হবে, তেমন ভিড় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ভেবেছিলাম, উঠতে উঠতেই অনেক ভিড় পাবো। বাঁদর বধ্যকূপ থেকে খানিকটা উঠতেই, গন্ধটা ঘ্রাণ ত্যাগ করে গেল। মন্দির দেখা দিচ্ছিল একটু আগেই, এখন ক্রমে স্পষ্ট। মন্দিরের চূড়া অনেকটা উলটানো ধামার মতো। তার প্রতিটি বেষ্টনীর খোপে খোপে পায়রার ভিড়। মন্দির-প্রাঙ্গণ তেমন ভিড় ভারাক্রান্ত দেখছি না।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখবার অবকাশেই, একজন আমার সামনে এগিয়ে এলেন। মধ্যবয়স্ক, ফরসা, বড় চোখ, একটু মোটা নাক। মাথার ছোট চুলের পিছন দিকে শিখা দ্রষ্টব্য। কপালে সিন্দুরের একটা চওড়া দাগ, ফোঁটা না। গায়ে মোটা মটকা জাতীয় বস্ত্রের চাদর। ধুতি উঠেছে বেশ উঁচুতে, খালি পা। আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম কী?'

তাঁর জিজ্ঞাসা ভদ্র এবং নম্র। আমি নাম বললাম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাবার নাম কী?'

তাও বললাম। ভদ্রলোক কেমন অন্যমনস্ক দৃষ্টি নিয়ে একটু ভাবলেন। ইতিমধ্যে আরো দু-একজন কৌতূহলিত দৃষ্টি নিয়ে, আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। প্রথম ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পিতামহর নাম বলতে পারেন?'

কিন্তু ব্যাপারটা কী? চৌদ্দপুরুষের হিসাবটার দাবী কেন? বিরক্ত হওয়া অবিশ্যি সম্ভব না, মহাশয়ের জিজ্ঞাসার ভঙ্গিটি বিশেষ বিনীত, এবং নম্র। ঠিক দাবী বলতে যা বোঝায়, তাঁর অভিব্যক্তিতে কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। অতএব পিতামহর নামটিও বললাম, অতঃপর প্রপিতামহর নামোচ্চারণের জন্যও প্রস্তুত হলাম। আরো দু-একজন যাঁরা কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজন আমার কাছে এগিয়ে এলেন। কিঞ্চিদধিক মধ্যবয়স্ক হতে পারেন, দীর্ঘ ঋজু শরীর, মাথার চুল অধিকাংশই সাদা, নাক চোখ মুখ বেশ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, গম্ভীর মোটা স্বরে বললেন, 'আপনাদের বাড়ি ঢাকা জেলায়, রাজানগর গ্রামে?'

উচ্চারণের অনেকখানি বঙ্গ-আল জাতীয়, তার মধ্যেও অন্য প্রান্তের কিছু মিশেল আছে। সেটা অসমীয় অথবা শ্রীহট্ট, ঠিক বলতে পারি না। আমি ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মহাশয় বললেন, 'আমার নাম গোপীনাথ চৌধুরী। আপনার বাবা আপনার মাকে নিয়ে, প্রায় আট বছর আগে এখানে ঘুরে গেছেন।'

অসম্ভব না, কিন্তু আমার ঠিক স্মরণ নেই, এবং আমি তখন ঢাকায় ছিলাম না, ছিলাম উত্তর চব্বিশ পরগণাবাসী। এখনো অবিশ্যি তা-ই। প্রথম বক্তা আমাকে হেসে বললেন, 'যাক, আপনাকে আর খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, আসল লোককেই পেয়ে গেছেন।'

আসল লোক! তার মানে কী? আমার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে, গোপীনাথ চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোথা থেকে এলেন? অন্য কোথাও উঠেছেন নাকি?'

প্রশ্নের সঠিক কারণ না বুঝেই বললাম, 'আমি গৌহাটিতে আমার এক বন্ধুর রেল কোয়ার্টারে উঠেছি।'

গোপীনাথ চৌধুরী হাস্য করলেন, দেখলাম, তাঁর সমস্ত দাঁতই প্রায় অটুট। বললেন, 'তাই ভাবি যে এত সকালে কী করে এলেন। এ সময়ে তো ঢাকার ইস্টিমার বা কলকাতার গাড়ি আসার কথা না।'

ঢাকার স্টিমার, কলকাতার গাড়ি! চৌধুরী মহাশয় অনেকটা ভেবে ফেলেছেন, যদিও স্টিমারের আগমন-নির্গমন সময় ইত্যাদি কিছুই আমার জানা নেই। এবং আমার মস্তিষ্কে দূর আকাশের বিদ্যুৎচমকের মতো, একটা সম্ভাবনার বিষয় ঝিলিক দিল। চৌধুরীমশাই কি পাণ্ডা? এইরূপ প্রচলিত আছে, সারা ভারতের তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে, একমাত্র কামাখ্যাপীঠের পাণ্ডারাই সর্বাপেক্ষা ভদ্র এবং অতিথিবৎসল। কিন্তু তীর্থ দর্শনের কোনো বাসনা নিয়ে তো আমি আসিনি। চৌধুরীমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আমাদের বাড়ি যাবেন?'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'বাড়ি?'

আমার কথা শুনে, চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অপর মহাশয়েরাও হাস্য করলেন। চৌধুরীমশাই বললেন, 'এখানে আর কোথায় উঠবেন। এখানে তো ধর্মশালা বলে কিছু নেই। যজমানরা এলে, আমাদের বাড়িতেই ওঠেন, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই।'

নতুন কথা শুনলাম। পাণ্ডার গৃহেই বাস এবং ভোজন। অবিশ্যি চৌধুরী

মহাশয়ের মোটাসোটা ধুতি-চাদরের পরিচ্ছন্নতা, তাঁর চেহারা ও বচন-বাচন আমার ভালো লাগলো, আর সেইজন্যই একটু কুণ্ঠিত লজ্জায় বললাম, 'দেখুন, আমি ঠিক সেইভাবে এখানে আসিনি। বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছি, তা-ই একবার এখানেও এলাম। ঘুরেফিরে দেখে আবার চলে যাবো।'

চৌধুরীমশাই যেন শিশুর বাক্য শ্রবণে হাস্য করে বললেন, 'তা যাবেন, তাতে কী? একটু ধীরে-সুস্থে ঘুরে-টুরে দেখবেন, একবার মাতৃপীঠ স্পর্শ করবেন, ভুবনেশ্বরী দর্শন করবেন, তাতেই দুপুর হয়ে যাবে। দুপুরে দুটি ডাল ভাত আমার ওখানেই সেবা করবেন। কামাখ্যায় এসেছেন, একবার আমার বাড়ি না ঘুরে গেলে কি চলে?'

মহাশয়ের কথার মধ্যে ব্যবসায়িক চিহ্ন মাত্র নেই, বরং যেন আত্মীয়কে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছেন। মনে হচ্ছে, কোনো বাক্যের আশ্রয় নিতেও, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তিনি আবার বললেন, 'আপনার প্রপিতামহ কালাচাঁদ-বাবু এসেছিলেন, আমার ঠাকুর্দার আমলে, এখনো তাঁর হাতের লেখা-টেখা আছে। কিন্তু তিনি রাজানগর থেকে আসেননি, কাওন থেকে এসেছিলেন। আপনার পিতামহই প্রথম রাজানগরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে চিরস্থায়ী হয়েছিলেন। এ সব কথা জানেন নিশ্চয়ই!'

যথার্থ জানি, তা বলতে পারবো না। মনে হয়, মায়ের কাছে এই রকম কিছু শুনে থাকবো। কিন্তু কামাখ্যা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে একজন পাণ্ডা মহাশয়ের কাছে যে নিজেদের বংশের এমন কাহিনী শুনতে পাবো, একেবারেই আশা করিনি। আমার থেকেও আমার চৌদ্দপুরুষের কথা ইনিই বোধ হয় ভালো বলতে পারবেন। বললাম, 'শুনেছি, আমাদের আদি বাড়ি ছিল কাওন গ্রামে।'

চৌধুরীমশাই ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, 'শুনবেনই তো। আর একটা কথা তা হলে বলি। আপনারা আজকালকার ছেলে, মানবেন কী না জানি না, কামাখ্যা-পীঠের বিষয়ে একটা শ্লোক আছে, "তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি / একাহঞ্চ বসেদত্র তয়োস্তুল্যং ফলং লভেৎ।" আজ না হোক, অন্য দিন, একটা রাত্রি বাবাকে এখানে থাকতে বলি।'

একে পরাজয় বলে কী না জানি না, গোপীনাথ চৌধুরীমশাই আমার মনোহরণ করলেন। সদ্য স্বাধীন ভারতের আমি একেলে ছেলেই বটে, এবং অন্যান্য তীর্থে কোটি গো দানের থেকে এখানে এক রাত্রিবাসে সেই পুণ্যাই লক্ষ আমার প্রকৃত লক্ষ্যের বিষয় না, তথাপি চৌধুরীমশাইকে কেমন যেন মনে ধরে গেল। আর মনে একবার ধরলে, ছাড়ানো কঠিন, সেটাকেই বোধ হয়

যায় বলে। বললাম, 'আজ হয়তো থাকতে পারবো না, তবে দুপুরে আপনার বাড়িতেই খাবো।'

চৌধুরীমশাইয়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হলো, বললেন, 'বেশ বেশ। এখন কি বাড়ি যাবেন, না আগে মন্দির দর্শন করবেন?'

বললাম, 'এখন তো খাবার অনেক দেরি। আমি চান করেই বেরিয়েছি। ঘুরে গিয়ে খাবো।'

চৌধুরীমশাই আপত্তি না করে বললেন, 'বেশ, তবে এখন মাতৃপীঠ স্পর্শ করে যান। তারপরে ঘুরেফিরে বেড়ান।'

আমরা তখনো মন্দিরের মূল চত্বরের বাইরে ছিলাম। আমাদের সমুখে, দু'পাশে দুটি প্রস্তরমূর্তি, প্রাচীনতার জীর্ণ ছাপ তাদের গায়ে। দেখে মনে হয়, মন্দিরের দ্বারপালরূপে এই মূর্তিদ্বয় দণ্ডায়মান। মন্দিরের চূড়া আগেই চোখে পড়েছে, এবং পায়রাদের ভিড়। চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে ভিতরের চত্বরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে প্রাণতোষ ভৈরববাবার আশ্রম কোথায়?'

চৌধুরীমশাই থমকে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে ভ্রূকুটিবিস্মিত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভৈরববাবার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?'

বললাম, 'না, নাম শুনেছি। কলকাতা থেকে আসবার সময়ে, পবিত্রী মা নামে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাঁর মুখে শুনেছি।'

চৌধুরীমশাই অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'পবিত্রী মা? তাই নাকি? উনি প্রাণতোষবাবারই ভৈরবী।'

'ভৈরবী?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

চৌধুরীমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, খুবই উচ্চমার্গের সাধিকা। তান্ত্রিক ভৈরবদেরই তো পীঠস্থান এটা। যাবেন নাকি সেই আশ্রমে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বেশ তো, পরে যাবেন।' চৌধুরীমশাই বললেন, 'একটু সাবধানে যাবেন। প্রাণতোষবাবার মন-মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না। ভালো থাকলে খুবই ভালো, খারাপ থাকলে, আর সামনে যাওয়া যায় না। আমাদেরই ভয় লাগে।'

সর্বনাশ! শুনেই আমার অর্ধেক ইচ্ছা কাটে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, মেজাজ খারাপ থাকলে কী করেন?'

চৌধুরীমশাই বললেন, 'ত্রিশূল নিয়ে নাচেন। মারতে ছুটে আসেন। হুংকার শুনলে বুক কাঁপে, মনে হয় একেবারে দক্ষযজ্ঞের শিব। ওটা একটা ভাবাবেশ,

খুব কমই হয়। ঢোকবার আগেই বুঝতে পারবেন। আপনাকে আমি নিয়ে যাবো।'

দক্ষযজ্ঞের শিব! সে তো ভয়াবহ ব্যাপার। বিশ্ববিধ্বংসীরূপ। তার ওপরে, আমার আশা, তাঁরই মেয়ে জগত মেয়ের গান শুনবো আমি। যাঁর গান তাঁর একান্ত প্রিয়।

'আসুন, এই সিঁড়ি দিয়ে, ওদিকে, সৌভাগ্যকুণ্ড আছে, ওখানে জলস্পর্শ করে আসুন।' চৌধুরীমশাই আমাকে নির্দেশ করলেন।

আমার দৃষ্টি তার আগেই পড়েছে, নাটমন্দিরের এক পাশে, রক্তমাখা বলির হাঁড়িকাঠে। কিন্তু এই সৌভাগ্যকুণ্ড কি সেই, নরকাসুরের প্রেমসাধের পুষ্করিণী? যা রাতারাতি কাটা হয়েছিল? কামদেব বা নরকাসুর, যারই হোক, এই সৌভাগ্যকুণ্ড নামে জলাশয় কি প্রাকৃতিক, না প্রকৃতই মানুষের সৃষ্টি? কৈলাসে যদি মানস সরোবর থাকতে পারে, কামাখ্যা পর্বতে একটি জলাশয় থাকাটা অসম্ভব না। পুস্তকপাঠে জ্ঞাত আছি, এই কুণ্ডের জল দেবগণের দ্বারা আনীত। পাথরের সিঁড়িতে পিছলে পড়ার আশংকা প্রবল, অতএব পা টিপে টিপে নামলাম। আর কয়েকজন নারী-পুরুষ ঘাটের জলে রয়েছেন। কাকচক্ষু জলে পাথরের গায়ে শ্যাওলা দেখা যায়। আমি মাথায় জল স্পর্শ করে, ওপরে উঠে এলাম। অবার নেমে গেলাম চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে, মূল মন্দিরের দরজার দিকে। দরজা খোলাই ছিল। কিন্তু সমুখে অন্ধকার সুড়ং, নিচের দিকে ক্ষীণ কম্পিত আলোর ইশারা। সিঁড়িগুলো ভেজা।

চৌধুরীমশাই ডাকলেন, 'নেমে আসুন।'

আমি আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেলাম। শেষ ধাপের নিচে, স্বল্প-পরিসরে দাঁড়িয়ে, কয়েকটি জ্বলন্ত প্রদীপ চোখে পড়লো, আর একটি জলের ক্ষীণ প্রস্রবণ। চৌধুরীমশাই বসে আমাকেও বসতে বললেন, এবং আমার দু' হাত টেনে, অস্পষ্ট লক্ষিত একটি পাথরের ওপর চেপে ধরলেন, বললেন, 'ইনিই হলেন মহামুদ্রা—কামপীঠ। ভালো করে তাঁকে স্পর্শ করুন।'

দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে, আমি অনুভব করলাম, একটি শিলাপট মাঝখানে দ্বিধাবিভক্ত। চৌধুরীমশাই আমাকে মন্ত্রপাঠ করে কী উচ্চারণ করতে বলেছিলেন, আমি এখন মনে করতে পারি না, কিন্তু সেই মহামুদ্রার ওপর হাত রেখে পবিত্রী মায়ের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এবং তৎক্ষণাৎ আমি একটা আড়ষ্টতাও বোধ করলাম, কেন, তা সঠিক ব্যাখ্যা

করতে পারি না। সেই মহামুদ্রার আশেপাশে কয়েকটি অষ্টধাতু নির্মিত দেব দেবীর মূর্তি রয়েছে।

আমি আবার চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, 'আপনি ঘুরে আসুন, এই পাশ দিয়ে সোজা গেলেই, আমাদের গ্রাম পাবেন। আমার নাম বললেই, বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

বলে তিনি মন্দিরের বাইরে এসে, পর্বতশীর্ষে ভুবেনেশ্বরী মন্দিরে যাবার পথ দেখিয়ে বিদায় নিলেন। আমি প্রথমেই একটি সিগারেট ধরালাম। ধরিয়ে, দু' পাশে অল্প গাছপালা ঘেরা নিরালা পথে কয়েক পা যেতেই, তিনটি দশ এগারো বছরের মেয়ে পিছন থেকে ছুটে এল। বেণী দোলানো, শাড়ি পরা, আলতা পায়ে, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, কিন্তু সিঁথি সাদা। তিন বালিকা আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে, হাত পাতলো, বললো, 'দর্শনী দাও।'

দর্শনী দেবো? এই বালিকাদের? হঠাৎ এরা এলই বা কোথা থেকে? এদের চোখ-মুখ দেখছি রীতিমত পাকানো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের দর্শনী?'

একটি বালিকা বললো, 'কামাখ্যা দেবীর। না দেবে তো শাপ লাগবে।'

বলে এমন চোখ পাকালো, ভস্মই না করে দেয়। আমার হাসি পাচ্ছিল। তবু পকেট থেকে দু-চারটে পয়সা নিয়ে, তিনজনের হাতেই দিতে গেলাম। এবার অন্য একটি বালিকা বলে উঠলো, 'ইস্, ভিক্ষে দিচ্ছে। টাকা দাও!'

বাব্বা! এ যে সব খুদে দেবীর দল? টাকা চায়। বললাম, 'টাকা নেই।' তৎক্ষণাৎ একটি বালিকা, নিচু হয়ে, তার বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে হাত দিয়ে মোচড় দিল। আর একটি বালিকা, অনেকটা সম্মোহনের ভঙ্গিতে আমার মুখের সামনে তার দু' হাত মেলে ধরলো। চোখ পাকানো। একেই বোধ হয় কামরূপ বলে। দিল বোধ হয় ভেড়া বানিয়ে। হাস্য সংবরণ দায় হয়ে উঠলো। অগত্যা পকেট থেকে আরো কিছু পয়সা বের করে, তাদের মনোতুষ্টির চেষ্টা করলাম। তিনজনেই একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো, 'না না, টাকা দিতে হবে।'

আমি পাশ কাটিয়ে চলতে উদ্যত হয়ে বললাম, 'তা হলে যা খুশি তাই করোগে, আমি টাকা দিতে পারবো না।'

ওরা এমন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন এমন মহাপাপী আর কখনো দেখেনি। আমি ইতিমধ্যে চলতে আরম্ভ করেছি। আমার হাতের মুঠিতে তখনো পয়সাগুলো আছে। হঠাৎ একটি মেয়ে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলো, আর প্রায় যেন কেড়েই পয়সাগুলো নিয়ে নিল। তারপরে আমাকে একেবারে চমকে দিয়ে, আমার হাতে ঠাস করে একটা চড় দিয়ে

ঘোড়ে চলে গেল। আমি একেবারে, 'হাড্ডাখ, ঘোর কলাটা' দেখার মতো হাঁ করে সেদিক তাকিয়ে রইলাম। বালিকাদের টিকিটিও তখন দেখা যাচ্ছে না। পরমুহূর্তেই নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লাম। হ্যাঁ, অন্তত: সিকি ভেড়া আমাকে ওরা বানিয়ে ছেড়েছে।

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে উঠতে উঠতে, শীতের রোদ্রেও ঘেমে উঠলাম। কিন্তু পৌঁছেই. চোখ জুড়িয়ে গেল। একদিকে নীল আকাশের প্রতিবিম্বিত নীল ব্রহ্মপুত্র নদ, আর এক পাশে গৌহাটি শহর। পূর্বদিকে উমানন্দ পাহাড়। ব্রহ্মপুত্রের বুকে একটি দ্বীপের মতো, অনেক নীচে। চারদিকে তাকিয়ে, আমার ঘরছাড়া ডাকটা যেন একটা খুশির সুরে বেজে উঠছে, এই প্রকৃতির সর্বস্তরে, আকাশে বাতাসে। নেমে আসবার আগে, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের দিকে গেলাম।

গোপীনাথ চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। পাহাড়ের ওপরে, উঁচু-নিচু ঘিঞ্জি পাড়া বলা যায়। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে নিরামিষ খাওয়াটাও মন্দ হলো না। তাঁর সংসারে আছেন স্ত্রী, দুই কন্যা, পুত্র এবং পুত্রবধূ। দু' তিনটি পৌত্রপৌত্রীও আছে। কন্যারা অবিবাহিত, কিন্তু বয়সে বিবাহযোগ্যা। আমার সামনে, সকলের আচরণই, অনায়াস এবং সহজ, কথাবার্তাও তেমনি।

বেলা একটু চলে যাওয়ার মুখে বিদায় নিতে গিয়ে, চৌধুরীমশাইকে প্রণামী দিতে যেতেই, তিনি হাত চেপে ধরে জিভ কেটে বললেন, 'করছেন কী? ছি ছি, ওটি করবেন না। যখন সবাইকে নিয়ে আসবেন, থাকবেন, তখন দেখা যাবে, এখন চলুন, আপনাকে প্রাণতোষবাবার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আমি এতটা আশা করিনি। চমৎকৃত তো বটেই, তাঁর কাছে নিজেকে কেমন ছোট মনে হলো। আমি আর দ্বিতীয়বার তাঁকে কিছু বলতে পারলাম না। তিনি তখন চলতে চলতে বলছেন, 'কামাখ্যা আসলে তান্ত্রিক অভিচারেরই জায়গা। পুরাণে তো এমনও বলে, শঙ্করাচার্য এখানেই তান্ত্রিকের তন্ত্রের মহাশক্তির আঘাতেই মারা যান। তবে সে রকম তান্ত্রিক এখন কমই আছে। প্রাণতোষবাবার অবিশ্যি গুণগান সবাই করে, তাঁর বিশেষ শক্তি আছে।'

এই সব কথাবার্তার মধ্যেই আমরা নীলাচলের কিছু নিচে, উত্তর-পূবদিকে

একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাঠের খুঁটির সঙ্গে, বাঁশের বেড়া ঘেরা, টিনের চালাবাড়ি। পলাশ গোলকচাঁপা আর শিমুল গাছ কয়েকটা আশেপাশে, নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা নিঝুম। বেড়ার গায়ে অপরাজিতা ফুলের ঘন লতাপাতার ঝাড়, কিন্তু এখন ফুল নেই। বেড়ার গায়ে একটি ভেজানো দরজার সামনে চৌধুরীমশাই দাঁড়ালেন, আমি তাঁর পাশে। তিনি যেন উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করছেন। অতএব আমিও সেই চেষ্টাই করলাম। কিন্তু ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

চৌধুরীমশাই দরজাটা ঠেলতেই, খুলে গেল। আর তৎক্ষণাৎ একটি সারমেয় প্রথমে গরগর্ করে উঠলো, তারপরেই আক্রমণের শব্দে ঘেউ ঘেউ করে সিমেন্ট বাঁধানো ঘরের দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এল। সে দরজা পর্যন্ত আসবার আগেই, ঘরের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, 'শঙ্করা, এই শঙ্করা!'

সারমেয় উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। স্বরটা কি আমার চেনা? ঠিক বুঝে ওঠার আগেই, ঘরের দরজায় জগতকে দেখতে পেলাম। তাঁর চুল খোলা, আলুলায়িত বলা যায়। ঘাড়ে পিঠে বটেই, রুক্ষ চুলের কয়েকটি গোছা, গালের পাশেও এসে পড়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লাল রঙের শাড়ির পাড় অধিকতর লাল। বললেন, 'কে?'

বলতে বলতে, দাওয়ার সামনের দিকে এসে, চিনতে পেরে, একটু হেসে বললেন, 'আপনি? আসুন, মাকে ডাকছি।'

চৌধুরীমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে ডাকছেন, যান। আমি এবার চলি। গৌহাটি থাকতে থাকতে আর একদিন আসুন।'

চৌধুরীমশাইকে বিদায় দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। তিনি আমার কাঁধে হাতের স্পর্শ করে বললেন, 'কোনো ভয় নেই, যান। আসবেন কিন্তু।'

বলে তিনি বিদায় নিলেন। আমি সামনে তাকিয়ে দেখি, কেউ নেই, দরজা খালি। কেবল শঙ্করা নামক সারমেয় উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। কিংকর্তব্য ভাবছি, তার মধ্যেই পবিত্রী মা দরজায় আবির্ভূত হলেন। তাঁর বেশবাসে আমি তেমন পরিবর্তন দেখলাম না, এবং ঠোঁট তেমনি তাম্বুল-রঞ্জিত। এগিয়ে এসে বললেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে, নাকি ভেতরে আসবে?'

একে বলে ডাক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, বললাম, 'এসে পড়লাম।'

'কেন, আমার কি চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছি না? ভেতরে এসো।' কথার ধরতাই যেন কতদিনের চেনা। তাঁর পিছনেই জগতও এসেছেন।

দাওয়ায় উঠতে উঠতে অনুমান করলাম, চারদিকে দাওয়া, এবং তার ওপরে একাধিক ঘর। পবিত্রী মায়ের সামনে গিয়ে বললাম, 'ভালো আছেন?'

[illegible] তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন এসেছ?'

বললাম সবই। তিনি ঘাড় কাত করে জগতের দিকে তাকিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'মহামুদ্রাটি ঠিক ছুঁয়ে এসেছে।'

বলেই ভ্রূকুটি করে, সেই কাজলবিভ্রম চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তা হ্যাঁ রে মুখপোড়া, তুই কী ভেবেছিস বল তো?'

আমি চমকিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাতেই, তিনি ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'গাড়িতেও দেখেছি, এখনো দেখছি, তুই আমার পায়ে হাত দিচ্ছিস্ না কেন? কী ভেবেছিস?'

আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে কপালে স্পর্শ করলাম। তিনি আমার ডান হাতটা চেপে ধরে হেসে উঠলেন, বললেন, 'আসলে তোকে না ছুঁলে ভালো লাগছিল না।'

আমি সেই সুগন্ধ পাচ্ছি আমার ঘ্রাণে। তাঁর কথা শুনে খুশি হলাম, লজ্জাও পেলাম।

জগতের দিকে ফিরে একবার দেখলাম, পবিত্রী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ওঁকেও প্রণাম করি!'

পবিত্রী মা বললেন, 'কর না, মেয়েদের পায়ে ধরবি, এর আবার বলাবলির কী আছে?'

'না না না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না।' জগত বলতে বলতে কয়েক পা সরে গেলেন।

আমি তথাপি এগিয়ে গেলাম। জগত দু'হাত সামান্য প্রসারিত করে বললেন, 'থাক, যাঁকে করবার, করেছেন, মা আপনার মঙ্গল করুন।'

'এসো, ঘরে এসো।' পবিত্রী মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

আবার তুই থেকে তুমি কেন? বললাম, 'বেশ তো তুই-তোকারি করছিলেন, আবার তুমি কেন?'

তিনি বললেন, 'যখন যে রকম ভাব আসে, সেই রকম বলি।'

ঘরের মধ্যে তখনো দিনের আলো কিছু বর্তমান। পূর্ববঙ্গের মতো কাঠের ফ্রেমে, ঘরের দেওয়ালও টিনেরই। একদিকে তক্তপোষের ওপর একটি গুল-বাঘের ছালের আসন পাতা। বিছানার চাদর লাল রঙের। নিচে এক পাশে, একটি মাদুর পাতা, তার পিছনের দেওয়ালে এক খণ্ড লাল কাপড়ের ওপর

একটি সিন্দুরচর্চিত নরকরোটি। অন্য ঘরে যাবার দরজার দিকে যেতে যেতে, পবিত্রী মা ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ভালো সময়েই এসেছ, বাবা ভেতরে উঠোনে এখন পায়চারি করছেন, দেখাটা করে নাও।'

বাবা! মানে সেই প্রাণতোষ ভৈরববাবা তো! কুণ্ঠিত ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর মন-মেজাজ এখন ভালো আছে তো?'

পবিত্রী মা আমার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন, এবং জগতের দিকে তাকালেন। দেখলাম জগতও নিঃশব্দে হাসছেন। পবিত্রী মা বললেন, 'এর মধ্যেই অনেক খবর মিলেছে বুঝি? আমি যখন ডাকছি, তখন কোনো ভয় নেই জানবে, এসো।'

আমি তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। পাশের ঘরে গিয়ে, বাঁদিকের একটি দরজা দিয়ে তিনি অন্য বারান্দায় গেলেন। আমি যেতে দ্বিধা করছি দেখে, পিছন থেকে জগত বললেন, 'চলুন।'

আমি বারান্দায় বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ির ভিতরের অংশের উঠোন আমার সামনে, সেখানে একজন কোনোদিকে দৃকপাত না করে পায়চারি করছেন। প্রথমে মনে হলো, সবই রক্তাভ দেখছি, ব্যক্তির গায়ের রঙ, চুল দাড়ি জটা, হাঁটুর ওপরে এক ফালি বস্ত্র জড়ানো, গায়েও সামান্য একটি লাল বস্ত্র জড়ানো, যদিও লোমশ বক্ষ ঢাকা পড়েনি। গলা থেকে নেমে আসা বুকের রুদ্রাক্ষের মালা দেখতে পাচ্ছি। উচ্চতায় প্রায় ছ' ফুট হবেন, শরীরটি রীতিমত শক্ত এবং চওড়া। কোনো মানুষের গা হাত পা এমন রক্তিম দেখাতে পারে, ধারণা ছিল না। তাঁর পা খালি, হাতের মুষ্টি খোলা। পবিত্রী মা নামতে নামতে ডাকলেন, 'বাবা!'

সর্বাংশে ও সর্বাঙ্গে রক্তাক্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'হ্যাঁ মা।'

পবিত্রী মা কাছে গিয়ে বললেন, 'সেই ছেলেটি এসেছে বাবা, সেই রেল-গাড়ির ছেলেটি।'

বাবা মানেই প্রাণতোষ ভৈরববাবা। তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। রক্তাভ চোখ, চোখের তারা দুটি পিঙ্গলবর্ণ বোধ হলো। জগত নিচু স্বরে পিছন থেকে বললেন, 'বাবার কাছে যান।'

যাবো? চোখের দিকে তাকানো প্রায় অসম্ভব। তবু দুরুদুরু বুকে, নিচে নেমে, তাঁর সামনে গেলাম। নিচু হয়ে পায়ে হাত দিলাম। ভয় আর কিছু না, এই বিশাল ব্যক্তি যদি কোনো কারণে আমাকে খালি হাতেই একটি আঘাত করেন, মারা যাবো। ত্রিশূলের আর দরকার হবে না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি কয়েক পলক আমার দিকে দেখে, হঠাৎ নিঃশব্দে হাসলেন, এবং আমার দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'মা, এ ব্যাটাই তো অমাবস্যার চাঁদের উদয়ের বাখান শুনতে চেয়েছিল?'

পবিত্রী মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা।'

প্রাণতোষবাবা আমার একটা হাত ধরলেন, বললেন, 'আয়।'

তিনি আমার হাত টেনে ধরে নিয়ে, উঠোনের এক প্রান্তের দিকে গেলেন। সেখানে কয়েক ধাপ পাথরের সিঁড়ি নেমে, একটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু প্রায়ান্ধকার। পায়ের তলায় সিমেন্টের মেঝের স্পর্শ পাচ্ছি। প্রাণতোষবাবা অনায়াসে, আমার ধুতির কোঁচা সরিয়ে, একেবারে আণ্ডারওয়্যারের ভিতরে হাত দিলেন। আমার নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ। অবে কয়েকবারই আমার নাভিমূলসহ শিরদাঁড়া কেঁপে কেঁপে উঠলো। তারপরে শিরদাঁড়ার নিচে শেষ প্রান্তে আমি তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। একটু পরে হাত বের করে, ঘাড়ের পিছনে, মাঝখানে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন, মনে হলো, আমার মস্তিষ্কের ঊর্ধ্ব শিরাগুলো ঝনঝনিয়ে উঠলো। তারপরে ঠিক মাথার পিছনে কনিষ্ঠ আঙুল রেখে, বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দিয়ে ভুরুর মাঝখানে রাখলেন, এবং একটি বিলম্বিত শব্দ করলেন, 'হু-ম!' আমাকে ছেড়ে দিয়ে ডাকলেন, 'মা!'

ঘরের বাইরে থেকে পবিত্রী মায়ের স্বর শোনা গেল, 'হ্যাঁ বাবা।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'আমার হাতে একটু জল দাও।'

বলতে বলতে তিনি দরজার কাছে গেলেন। আমি জীবন্মৃত অবস্থায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাপার কিছুই বুঝছি না। বলি টলি হবে না তো? বাইরে জল পড়ার শব্দ পেলাম। তারপরে বাবার স্বর, 'একটা বাতি নিয়ে, তুমি আর জগতও এসো। এ ব্যাটা লড়াকু আছে, লড়বে জীবনভর। তবে দমের ঘরটা ভালো না। মেলাই ঝুল পড়েছে।'

ঘরে ঢুকে বললেন, 'বোস্।'

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানেই বসতে যাচ্ছিলাম, বাবা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ওখানে কোথায় বসছিস? ওধারে কম্বলের ওপরে বোস, ঠাণ্ডা লাগবে না?'

আমি বাঁদিকে দেখলাম, লাল কম্বল পাতা। হাসপাতালের কম্বলের কথা মনে করিয়ে দেয়। বসলাম, এবং প্রদীপের দিকে লক্ষ্য পড়তে দেখলাম, সেখানে একটি ত্রিশূল পোঁতা আছে। তিনিও আমার কাছাকাছি, আলাদা একটি আসনে, হরিণের চামড়ার ওপর বসলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই রাজনীতি করিস, না?'

কথাটা তাঁর জানবার বিষয় না, একটু অবাক হয়েই বললাম, 'করি।'

'কী রাজনীতি করিস?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

তাঁর মুখ প্রসন্নই মনে হলো। বললাম, 'কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার আমি।'

তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'অনুমান করেছিলাম।'

কীভাবে, তা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। এ সময় পবিত্রী মা একটি উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলো হাতে নিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে জগত। ঘরের মাঝখানে হারিকেন রেখে, তাঁরা ঘরের অন্যদিকে গেলেন। প্রাণতোষবাবা বললেন, 'তোমরা বসো মা, তোমাদের সামনেই কথা বলি।'

পবিত্রী মা ঘরের অন্যদিকে গেলেন, সেদিকের দেওয়ালের কাছে লাল রঙের কাপড় দিয়ে পুরোটাই ঢাকা। মনে হয় যেন, পিছনে কিছু আছে। সেই লাল পর্দার সামনেই, একটি সরু ফালি লাল কাপড় বিছানো। পবিত্রী মা আর জগত সেখানে বসলেন। পবিত্রী মায়ের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, চোখেও।

প্রাণতোষবাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই সত্যি জানতে চেয়েছিলি, অমাবস্যায় চাঁদের উদয় বিষয়ে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'ব্যাপারটা শুনলে খুব অবাস্তব লাগে, তাই না?' বলে হাসলেন, যেন বিদ্যুৎ চমকালো। আমার জবাবের আগেই বললেন, 'লাগবেই। তা তুই তো বস্তুবাদী, কিছু পড়াশোনা আছে?'

আমি সংকুচিত হয়ে বললাম, 'সামান্য, বিশেষ কিছু না।'

তিনি বললেন, 'তোকে তোর কথাই বলি। তোকে যদি একটা পান পাতা চিবোতে দিই, তোর মুখ লাল হবে?'

শুধু পান পাতায় মুখ লাল হবে কেমন করে? বললাম, 'না।'

'শুধু পান পাতা, বা শুধু সুপুরি, বা খয়ের বা শুধু চুণ, কোনোটাই আলাদা করে মুখে দিলে, মুখ লাল হয় না, তাই না?' তিনি চোখ বুজে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'হ্যাঁ।' তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল, সরোজ আচার্য মহাশয়ের একটি বস্তুতন্ত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ের বইয়ে এ-কথা আমি পড়েছি। বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এ ব্যাখ্যাটা জানি।'

তিনি চোখ বুজেই বললেন, 'বেশ, তাহলে তো তুই জানিসই, সব এক-সঙ্গে করে চিবোলে, লাল রস হয়, তোদের ভাষায় একে বলে কোয়ালিটেটিভ

চেঞ্জ—গুণগত পরিবর্তন। এখন আমি যদি তোকে বলি, আলাদা আলাদা সব বস্তুগুলো, অমাবস্যা, আর তার মধ্যেই লাল রসের চাঁদটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে এদের মধ্যেই রয়েছে, তাহলে কেমন বুঝিস?'

বলেও তিনি কিন্তু চোখ মেলে তাকালেন না। আমি বিস্মিত চিন্তায় আচ্ছন্ন হলাম। তাঁর ব্যাখ্যা যে যুক্তিহীন না, তা আমি বুঝতে পারছি, তথাপি জবাবটা যেন নিজে তৈরি করতে পারছি না।

প্রাণতোষবাবাই আবার বললেন, 'এখন, ধর ওই সব পান খয়ের সুপুরি, ওগুলোকে আমি বস্তু বললাম। কিংবা ধর, মানুষের শরীর বা বস্তুসমূহের আধার আর শরীরের ভিতরের নানান নাড়ির কথা বললাম, যেগুলো এক-যোগে মিললে, একটা গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তফাতটা হচ্ছে এই, লাল রসের মতো, চাঁদের উদয়টা দেখবার বিষয় না, ওটা অনুভবের বিষয়। সেই অনুভবের জন্য, বস্তুর মেশামেশি করানোটা বড় কঠিন কাজ, শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা হয়। শরীরের মধ্যে বহু লক্ষ নাড়ীর ভিতর দিয়ে তা ঘটে। প্রধান তিনটি হলো, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। বস্তুসমূহ হলো শরীরের ভিতরের যাবতীয় নাড়ী। নাড়ীর সেই ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, তাদের মধ্যে যখন মিলন হয়, তখন যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে চাঁদের উদয়। মানুষ চোখ থাকতেও রঙ-কানা হয় জানিস তো?'

আমি প্রায় আচ্ছন্নের মতো বললাম, 'জানি।'

তিনি বললেন, 'চাঁদের উদয়ের যখন যোগ ঘটে, তার অনুভূতি অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব না, রঙ-কানার মতোই, চোখ থাকতেও সে এলোমেলো দেখবে। সেইজন্য, সাধক ছাড়া অন্যের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না। এর বেশি বোঝার দরকার নেই। গুণগত পরিবর্তনের কথাটা মানলি তো?'

আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'মানছি। আমি কিছুটা অনুমান করতে পারছি।'

'না। অনুমানের সবটা হয়নি, আর একটু শোন্।' তিনি চোখ বুজেই বললেন, 'তুই আমার জগত মায়ের গান শুনে বলেছিস, ফুল ফুটতে দেখেছিস। লোকে শুনলে কী বলবে বল তো? অবাস্তব না?'

আমি যেন নতুন দৃষ্টিতে জগতের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। জগতের চোখ বোজা। কিন্তু পবিত্রী মা তেমনি মিটিমিটি হাসছেন।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। প্রাণতোষবাবাই বললেন, 'তার মানে তোর ভেতরে যতো সুখদুঃখের বোধ আছে, জগতের গান শুনে সব আনন্দময় অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছিল। এটা একটা গভীর অনুভূতির ব্যাপার। তারই

এক মহান উচ্চ অনুভূতিময় অবস্থার নাম, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়! ওটা সাধনার দ্বারা ঘটে।'

বলে তিনি চোখ মেলে, প্রথমেই পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালেন। দুজনেই হাসলেন, যেন প্রেমের জ্যোৎস্নায় বিগলিত, উজ্জ্বল কিরণময় হাসি। এ হাসি নিতান্ত প্রেমিক-প্রেমিকা বা নিঃসংশয়-হৃদয় দম্পতির নিবিড় হাসিও যেন না, তার অধিক কিছু। তাঁদের চার চোখের দ্যুতির সঙ্গমে যেন এক অধরা রহস্যের ক্রীড়া, যার বোঝাবুঝিটা নিতান্ত এই ঘরে সীমাবদ্ধ না। কোনো এক দূরের সময় ও সীমার বাইরে স্থির দীপ্তিতে বিরাজ করছে। মানুষ কখনও এমন হাসি হাসতে পারেন, তা আমার অনুভূতির অগম্য। প্রাণতোষবাবার কথাই মনে পড়ছে, 'সাধক ছাড়া অন্যের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না।' এ হাসিও কি তাঁদের সাধনার অঙ্গ!

প্রাণতোষবাবার উজ্জ্বল রক্তিম শরীর সহ, মাথার সুদীর্ঘ জটা-চুল, গোঁফ-দাড়ি কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারলাম, ভিতরের রুদ্ধ হাসির উচ্ছ্বাসই এর কারণ। তিনি বলে উঠলেন, 'মা, তুমি আর আমি এখন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।'

বলতে বলতেই, তাঁর মুখের হাসিতে একটি ত্রস্ত ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো, বললেন, 'ওরে জগত, মাকে শীগ্‌গির ধর, পড়ে যাবে।'

জগত তৎক্ষণাৎ পবিত্রী মায়ের দু' কাঁধে হাত রাখলেন। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলাম, পবিত্রী মায়ের চোখ বোজা, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তিতে সেই হাসি। অথচ যেন সেই মানুষটি আর নেই। হাসির মধ্যেই কেমন একটি তদ্গত আচ্ছন্নতা, এবং বসার ভঙ্গিতে যে একটা অলসতা ছিল, তা নেই। যেন ধ্যানে বসেছেন, এমন ঋজু শক্ত ভাব। প্রাণতোষবাবা বললেন, 'ডাক জগত, মাকে একটু ডেকে নিয়ে আয়।'

সকলই যেন ধন্দ ধরানো রহস্যে ভরা। জলজ্যান্ত মানুষটি বসে আছেন, মুখে হাসি, চোখ বোজা, তাঁকে আবার ডেকে নিয়ে আসতে হবে কোথা থেকে? তোমার ভাবনা তোমার, জগত ইতিমধ্যে পবিত্রী মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতে আরম্ভ করেছেন, 'মা! মাগো! ও মা, মা।'

পবিত্রী মায়ের গলা থেকে একটি ক্ষীণ স্বরের সাড়া ফুটলো, যেন গভীর ঘুমে তিনি মগ্ন। জগত তেমনি ডাকলেন, 'মা, মাগো!'

পবিত্রী মা আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুললেন, দৃষ্টি প্রাণতোষবাবার প্রতি প্রথমে যেমন ছিল, এবং এবার হঠাৎ একটি দমকা নিঃশ্বাস ফেলে, স্পষ্ট আর সজাগ স্বরে বললেন, 'অ্যাঁ? কী রে জগৎ?'

বলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, তারপরে জগতের দিকে। তাঁর কাঁধে মাথা জগতের একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের দু' হাতে চেপে ধরলেন, আবার তাকালেন প্রাণতোষবাবার দিকে, এবং হাসলেন। এবারের হাসিটি একান্তই লৌকিক! একটু কি অপ্রস্তুত ব্রীড়া মিশ্রিত? আমি এ সব রহস্যের থই পাই না। ফিরে তাকালাম প্রাণতোষবাবার দিকে, আর তাকিয়েই চমকে উঠলাম। তাঁর রক্তাভ চোখের দৃষ্টি অপলক আমার দিকে। দাড়িগোঁফের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। বলে উঠলেন, 'সব ব্যাপারটাই ভারি নাটুকে মনে হচ্ছে, তাই না?'

যথার্থই, কিন্তু তা কবুল করবো কেমন করে। সাহস পাই না যে। তিনি আবার বলে উঠলেন, 'নাটকীয় ঠিকই, তবে ন্যাকামো ভেবে মনে মনে ঠোঁট বাঁকাস নে, তাহলেই ভুল করবি। কোনো কিছু না বুঝলেই, সেটা বুজরুকি, এ রকম যারা ভাবে, তারা হলো আর এক বুজরুক। তোদের ভাষায় সবারিও বলতে পারিস্।'

সবারি! জটাজূটধারী রক্তাম্বর যোগী ইংরেজি বলছেন! ক্ষ্যাপা বলে একটা ভয় আগেই ছিল। এর পরে যদি ইংরেজি শুরু করেন, তাহলে আমাকে এমনিতেই পালাতে হবে। আর যাদেরই হোক, সবারি আমার ভাষা না। আমার দৌড় বড় কম। কিন্তু প্রাণতোষবাবার থই যে ক্রমে অথৈ হয়ে পড়ছে। বললাম, 'আমি কিছু না বুঝে অবাক হচ্ছি, ন্যাকামোর কথা আমার একবারো মনে আসেনি।'

প্রাণতোষবাবা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তোর কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। খেয়াল আছে, মাকে তখন বলছিলাম, আমরা যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। মায়ের ভাব তার আগেই লেগে গেছে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বলতে আমি এই বোঝাতে চেয়েছিলাম, কথার মনে কথা হচ্ছে, আমাদের দুজনের মনে অন্য ভাবের খেলা চলছে, সেটা কেউ দেখতে বা জানতে পারছে না। ওকেই আবার ঠারে ঠারে বললে, এ রকম বলা যায়, বোবা কালায় কথা কয়, কানা পথ দেখে চলে যায়। বেবাক উল্টোপাল্টা, তাই না?'

আমি বললাম, 'ধাধার মতো।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'ঠিক ঠিক, তাই তো মনে হবে। তা, এখন যদি সেই কথাটা আমি বলি, গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়, তাহলে কী বুঝিস?'

বলবো? সাহস করে বলেই ফেললাম, 'প্রেম!'

প্রাণতোষবাবা হঠাৎ থমকে গিয়ে, পরমুহূর্তেই টিনের দেওয়াল আর চাল ঝনঝনিয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন, বললেন, 'বাহ্! বা রে ব্যাটা! ও মা, তুমি যে একটা খাসা ছেলে ধরে এনেছো গো! টুক করে কেমন কথাখানি খসালে, প্রেম!'

পবিত্রী মায়ের আবার সেই আগের মূর্তি। ভুরু তুলে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'ধরে আনবো কোন্ দুঃখে বাবা, জিজ্ঞেস করুন, ও নিজের থেকেই এসেছে কী না?'

প্রাণতোষবাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি হেসে বললাম, 'আমি না এসে পারলাম না।'

পবিত্রী মা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। জগত যেন তাঁর উচ্ছল হাসিকে একটু দমিত করতে চাইলেন, তাই হাসিমুখ ফিরিয়ে নিলেন।

প্রাণতোষবাবা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বুঝেছি। এবার বলি, ওই যে বললি, প্রেম, বোবা কালার কথা বলাটাও সেই রকম। আরো একটা কথা লোকে বলে—কানা, মনে মনে জানা। সেই রকমই, কানা মনের চোখ দিয়ে দেখে চলে যায়। কিসের টানে? প্রেমের। গাই-বাছুরের মতো, ভাবের ব্যাপার কেউ জানতে পারে না। সাধক সাধিকার ভাবের লেনদেনটা সেই রকম। আমরা তো বনে গিয়ে একজন দুধ দিচ্ছি, আর একজন খাচ্ছে, দেখবেটা কে? তা হলেই বোঝো, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই কেন বলেছি। ঠিক বলেছি মা?' তিনি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালেন।

পবিত্রী মা মোটেই সংকুচিত হলেন না, বললেন, 'যে প্রেম বোঝে, তাকে আর এর থেকে ঠিক করে কী বলবেন বাবা? তা ও ন্যাকার মতো তাকিয়ে আছে কেন? কিছু বলুক।'

আমার কথা বলছেন নাকি? আমি পবিত্রী মায়ের দিকে দেখলাম, যথার্থই তাঁর ভ্রূকুটি চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। অপ্রস্তুত ভাবে বললাম, 'আমাকে বলছেন?'

পবিত্রী মা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তবে আর কাকে? আসলে তোকে আমি ন্যাকা বললাম এই জন্য, তোকে ওপর ওপর যতটা ন্যাকা দেখাচ্ছে, তুই তা নোস্। এবার বাবার কথায় কী বুঝলে, তাই বলো।'

মনে মনে ভাবি, এক বর্গা হলেই ভালো হতো না? হয় তুই, না হয় তুমি, একটাতে থাকলেই ভালো শোনায়। কিন্তু ওই যে শুনিয়ে রেখেছেন, যখন যেমন ভাব আসে, তখন সেই রকম বলেন। একে ভাব, তায় (অন্যায় হলে, ক্ষমণীয়) রমণী। এক বর্গা কি চলা যায়, না আশা করা উচিত? কিন্তু এ যে

বেজায় মুশকিলে ফেললেন। আমার বোঝাবুঝির কী আছে, বলবোই বা কী? চকিতেই আমার দৃষ্টি পড়লো জগতের দিকে। তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকেই, দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। জগত চোখের তারা সরিয়ে নিলেন। আমি অস্বস্তিতে হাসলাম, দ্বিধা করে বললাম, 'বোঝা খুব সহজ না, তবে কথা শুনে আমার ধারণা হচ্ছে, প্রেমেই সব কিছু আছে, না থাকলে নেই।'

'আর একটু খোল্, খোল্তাই কর।' প্রাণতোষবাবা বললেন। তাঁর দুই রক্তিম চোখের অপলক দৃষ্টি আমার প্রতি।

আমি বললাম, 'আপনি তো কিছুই অস্পষ্ট রাখেননি। যাদের মধ্যে প্রেম আছে, ভাবের সংকেতও তাদেরই আছে। তাদের বলাবলি কে আটকাবে?' বলতে বলতেই, আরো কিছু বলতে গিয়ে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম।

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'বল্ বল্, থামলি কেন?'

আমি লজ্জিত হেসে বললাম, 'আমার একটা গানের কলি মনে পড়ছে।'

'তা সেটাই বল্ না।' প্রাণতোষবাবা বললেন।

আমি বললাম, 'গানটার একটা লাইন আছে—"চাঁদের মতো অলখ্ টানে, জোয়ারে ঢেউ তোলাবো।" আমি এই টানের কথা বলছি। চাঁদ অলক্ষ্যে থেকেও জোয়ারে কেমন করে ঢেউ তুলবে? মনে হয়, তাদের মধ্যে প্রেম আছে, আর সেই প্রেমের টানেই জোয়ার ওঠে।'

প্রাণতোষবাবার দৃষ্টি পবিত্রী মায়ের প্রতি নিবদ্ধ হলো, জিজ্ঞাসার স্বরে ডাকলেন, 'মা!'

পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'বাবা, এ মুখপোড়া কি আর এমনি এমনি এখানে ছুটে এসেছে? আমার প্রাণটা ভরে গেল বাবা, অথচ বলছিল, সবই ওর কাছে ধাঁধা!'

এ সব কথাও ধাঁধার মতোই লাগছে। আমি জগতের দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবং এবার আর দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন না, বলে উঠলেন, 'ভারী সুন্দর বলেছেন।'

জগতের সহসা এই প্রশংসা বাক্যে আমিই লজ্জা পেয়ে গেলাম। তাঁর এ রকম কথা এই প্রথম, এবং প্রশংসার মুগ্ধ দ্যুতি তাঁর আয়ত চোখের তারায় চিকচিক করছে।

পবিত্রী মা বললেন, 'ওকে প্রথম থেকে দেখেই আমার মনে হয়েছে, ব্যাটার কোথায় গড়বড় আছে, একেবারে নেহাত সোজা পথের ছেলে না। এখন বলে, প্রেমের টানে জোয়ার ওঠে। ওকে ধরুন তো বাবা ভালো করে।'

আমি চমকে উঠলাম। ধরুন মানে? প্রাণতোষবাবা হেসে উঠলেন, বললেন, 'ধরবো কী মা, ওতো নিজে থেকেই ধরা দিয়েছে।' বলে, আমার দিকে একটু ঝুঁকে স্বর নামিয়ে বললেন, 'তা হ্যাঁরে, তোর প্রেম-পিরীতি কিছু ঘটেছে নাকি?'

আমি ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বলে উঠলাম, 'আজ্ঞে না, না তো!'

আমার স্বর ডুবে গেল তিনজনের সমবেত হাসিতে। টিনের দেওয়ালে ও চালে বাজনার মতো তা বেজে উঠলো। পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'ও তো প্রেমে পোড়া, চোখ দেখুন না।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'সে তো মা, আমি ওর কথাতেই বুঝেছি, জগতের গান শুনে ও ফুল ফুটতে দেখেছে। ওর ভাবের ঘরখানি ভারি ঢলঢলে। ওখানে চালাকি নেই। তার জন্য, ওর দুঃখ কে ঘোচাবে মা? কেউ পারবে না। আপন মনে একলা বসে সারাটা জীবন কাঁদবে, কেউ দেখবে না, কেউ ভাগ নেবে না।'

তাঁর শান্ত গম্ভীর স্বরের কথাগুলো শুনতে শুনতে, আমার নিজের জন্যই মনটা টনটনিয়ে উঠলো। এ আমার কী ভবিতব্যের কথা শুনছি? অবিশ্যি বলতে পারবো না, আমার এ বয়সের মধ্যেই, জীবনের হাসির ভাগ বেশি আছে। অবিশ্যি কান্নায় অধিক, লাঞ্ছনা ও ব্যথাকে আমি অন্য চোখে দেখি। যে আমার নিত্য সঙ্গী, তাকে আমি আমার পথের বাধা হতে দিতে চাই না।

আমার কাঁধে স্পর্শ লাগতেই, চমকে প্রাণতোষবাবার দিকে তাকালাম। তিনি আমার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'কাঁদবি মানে কি তুই কপাল চাপড়াবি? তা বলিনি। আপন মনে একলা তুই এখনো কাঁদিস। কাঁদবিই তো। মায়ের কথা শুনলি না, তুই প্রেমে পোড়া? যে পোড়ে, সে-ই কাঁদে, তুইও কাঁদিস।' বলেই তিনি দরজার দিকে তাকিয়ে, গলার স্বর একটু তুলে বললেন, 'করালী নাকি রে?'

বাইরে থেকে জমাট মোটা সম্ভ্রমপূর্ণ স্বর ভেসে এল, 'আজ্ঞা বাবা।'

পবিত্রী মা বললেন, 'ছাখ্ জগত, অনেক দিন আমার এমন হয়নি, সব ভুলে কেমন বসে আছি। এ ছোঁড়া আজ আমাকে ডোবালে।'

বলে তিনি ওঠবার উদ্যোগ করলেন। প্রাণতোষবাবা বললেন, 'যাচ্ছো কেন মা, একটু বসো। ওদিকে এখন কী কাজ?'

পবিত্রী মা হেসে বললেন. 'সে কি বাবা, আপনিও দেখছি ছেলেটার

পাল্লায় পড়েছেন। আমার ওদিকে এখন কতো কাজ! ধীরু আর নরেন পূজায় বসবে, তার ব্যবস্থা ঠিক আছে কী না, একবার দেখতে হবে। পাঁচ-ছ'টি লোকের রান্না, কালানি একলা পারবে না, একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে হবে।'

জগত বলে উঠলেন, 'আমি ও সব দেখতে যাচ্ছি, আপনি বসুন।'

জগত ওঠবার উদ্যোগ করতেই, প্রাণতোষবাবা বাধা দিলেন, 'আহা, বোস্ না জগত, এক-আধদিন না হয় একটু অন্য রকমই হলো।'

প্রাণতোষবাবার এ রকম কথার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল নেই। তিনি যে এমন নিতান্ত গৃহী সংসারীর মতো কথা বলতে পারেন, মনেই হয় না। যেন স্বামী বা পিতার মতো কথা বলছেন।

পবিত্রী মা জগতের দিকে তাকিয়ে, চোখের তারা কাঁপিয়ে বললেন, 'বাবার মজাটা দেখেছিস তো? এ সময়ে কোনোদিন একবারো ডাকেন না, আপন মনে একলা থাকেন। আর আজ দ্যাখ্।' বলে তিনি প্রাণতোষবাবার দিকে দেখে, ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার দিকে ভ্রূকুটি চোখে এমন ভাবে তাকালেন, যেন আমি দু' চোখের বিষ।

প্রাণতোষবাবা হেসেও একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আসলে কী ব্যাপার জানো মা? লোক তো কম দেখছি না। এমন কি তোমার ওই ধীরু, নরেনকেও দেখছি। বাইরের অনেকে যেমন আসে, একটা কোনো, মতলব নিয়ে, আমাদের বিষয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিছু জানবে, নয় তো ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু দেখবে, তোমার এ ছেলেটা সে রকম না। তবে হ্যাঁ, আমি একটা কাপালিকের মতো পুরুষ, আমি একলা থাকলে কি ও আসতো? ও ঠিক টানে টানেই এসেছে। ও টানটি তো মা তোমরা নিয়েই জন্মেছো।'

তাঁর রক্তিম চোখের তারা দুটি ঝকঝকিয়ে উঠলো, গোঁফদাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসি। এখন কথা আবার কোন্ দিকে যায়? কোন্ টানে আমার আগমন? আমি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। পবিত্রী মা বললেন, 'ওটা তো স্বধর্ম।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'ঠিক। কিন্তু ওর মনটা ভাবে ভরা, জানোয়ারের মতো গন্ধ শুঁকে আসেনি। তাহলে দেখ, শক্তিই যে সুন্দর, এটা তারও প্রমাণ। এ ছেলেটার একটা ব্যাপার দেখছি, ও কিছু নিতে চায় না, পেতে চায়। তুমি যতোটুকু দেবে। সেইজন্য পাবার জোর ওর আছে, কেননা নেবার মতলবে কোনো ফাঁকি ওর পোষাবে না। কী রে, ঠিক বলেছি?'

আমি কিছু না বলে হাসলাম, যার অর্থ সম্মতি, কারণ তাঁর কথার সত্যিটুকু আমি নিজের মধ্যে উপলব্ধি করছি।

পবিত্রী মা বললেন, 'বাবা, তবু আপনি আমাকে একবার উঠতে দিন। একেও তো একটু কিছু খেতে দিতে হবে, কতোক্ষণ এসেছে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার কথা বলছেন? না না, আমার একটুও খিদে পায়নি।'

'কিন্তু চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, তাই না?' প্রাণতোষবাবা যেন আমার অন্তরে হাত রেখে বলে উঠলেন।

আমি চমকে অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি হেসে আবার বললেন, 'তুই অনায়াসে আমার সামনে সিগারেট খেতে পারিস, খাচ্ছিস না কেন? জামার পকেটটা চেপে বসে তো সিগারেটের প্যাকেটটাই চেপ্টে ফেলেছিস্।'

দ্বিতীয় চমকের আকস্মিকতায় আমি তাড়াতাড়ি জামার পকেট টেনে তুললাম। কিন্তু এ তো দেখছি, সেই ম্যাজিকই তিনি দেখাচ্ছেন! আমার ভিতরের মহাপ্রাণীটি তো জানে, চায়ের তৃষ্ণা এখন কী গভীর! এবং সিগারেট? এই নতুন মানুষ ও পরিবেশে, ধূমপানের কথা মনে আসেনি, কিন্তু অবচেতনে যে নেশাটি রীতিমত থাবি খাচ্ছে, তা অস্বীকার করতে পারি না।

প্রাণতোষবাবা আমাকে বিস্ময় প্রকাশের একটুও সময় না দিয়ে বললেন, 'আমার গন্ধটা খুব চোখা, বুঝলি? তুই কাছে আসতেই, সিগারেটের গন্ধ আমি পেয়েছি। আর মদ-ভাং যখন এখনো খেতে শিখিসনি, সকাল সন্ধ্যের চা তো খাবিই, তার আবার যখন বই খাতাপত্তর নিয়ে বসিস।'

আমার মুখ দিয়ে সহসা জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হলো, 'মদ-ভাং খাই না, কেমন করে বুঝলেন?'

প্রাণতোষবাবার দৃষ্টি গেল পবিত্রী মায়ের দিকে। পবিত্রী মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মদ-ভাং খাওয়া চেহারার কতকগুলো রকম ফের আছে, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

আমি যেন লজ্জা পেয়েই প্রাণতোষবাবার দিকে একবার দেখলাম। অন্ততঃ জাদুবিদ্যা তিনি কিছুই দেখাচ্ছেন না, সবই তাঁর প্রত্যক্ষজ্ঞান আর অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। প্রাণতোষবাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তবে মা তোমাকে আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, এ ছেলেটা মদ-ভাং-গাঁজা শুধু না, গু মুত সব খাবে, ওকে খেতে হবে।'

আবার চমক! আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তারপরে পবিত্রী মা ও জগতের দিকে। তাঁরা দুজনেই প্রাণতোষবাবার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু পবিত্রী মা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন, তারপরে আবার প্রাণতোষবাবার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হিসেবে বাবা?'

প্রাণতোষবাবা যেন এক কৌতুকচ্ছটায় চোখে ঝিলিক দিয়ে বললেন, 'প্রেমের টানে। প্রেমের টানে সব ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখবে, কিছু বাদ দেবে না। তবে ওর রাস্তা আলাদা, কিন্তু মনে মনে ও রজঃ তমঃ-র মধ্যে ঘুরবে ফিরবে।

এ সব কথায় আবার একটু যেন কেমন আশ্রমিক গন্ধ। মদ্যপান করি না, কিন্তু বছর তিনেক পূর্বে তার স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম। অনায়াসেই কবুল করতে পারি, বস্তুটি মোটেই সুস্বাদু বোধ হয়নি, বরং বিস্বাদই লেগেছিল। ভবিষ্যতে সেই বিস্বাদ বস্তু যে আমি গলাধঃকরণ করবো, অন্ততঃ নিজের মধ্যে সে রকম কোনো বাসনার ইঙ্গিত নেই। তা ছাড়া আরো যে সব বস্তুর নাম করলেন, মানুষের পক্ষে কী তা গলাধঃকরণ সম্ভব? কেনই বা আমি তা করতে যাবো? পবিত্রী মা আমার দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ, দেখছি, যতো ধোয়া যায়, এ ছোঁড়ার রঙ ততো খোলে। বসো, তোমার জন্য আমিই চা করে নিয়ে আসছি।'

জগত বলে উঠলেন, 'আমি যাচ্ছি মা।'

পবিত্রী মা বললেন, 'না, তুই বোস, আমি একটু দেখে-শুনে, চা করে নিয়ে আসি।'

প্রাণতোষবাবা বলে উঠলেন. 'মা, তাহলে আমাকেও একপাত্র দিও।'

পবিত্রী মা তাকালেন জগতের দিকে। জগত হাসলেন। পবিত্রী মা দৃষ্টি ফেরালেন আমার দিকে। তাঁর কাজলবিভ্রম চোখের নিবিড় দৃষ্টিপাতে কী কথা লেখা, বুঝি না, কিন্তু তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটের হাসিটি স্নেহে কোমল, তা বুঝতে পারছি। বললেন, 'তুমি দেখছি, আমার আশ্রমের নিয়ম ভাঙতে এসেছো। ধরে রাখবো কিন্তু, আর কোনোদিন যেতে পারবে না।'

বলে, ঘাড়ে একটি শাসানির ভঙ্গিতে ঝাঁকুনি দিয়ে, দরজার বাইরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার মনে পড়ে গেল, ও বেলার সেই বালিকা ক'টির কথা। ওরা তো আমাকে এক রকমের ভেড়া বানিয়েই ছেড়েছে। এই কামাখ্যায় পবিত্রী মা কি তার ষোলআনা পূর্ণ করতে চান? আরো একটা বিষয়ে আমার অবাক কৌতূহল জেগেছে, প্রাণতোষবাবার মতো

একজন শক্তি-উপাসক কি চা পান করেন? অবিশ্যি তাঁকে দেখে, পবিত্রী মায়ের মুখ থেকে শোনা, কুলাচারী যে একজন বীর হন, সে কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই 'বীর'এর প্রকৃত সংজ্ঞা না জানলেও, প্রাণতোষবাবার মূর্তির মধ্যে একটি বীরত্বব্যঞ্জক ভাবও বর্তমান। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি চা খান?'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'কী খাই না, তা-ই জিজ্ঞেস কর। আমি হলাম সর্বভূক!'

সর্বভূক্ বলতে নিশ্চয়ই সকল খাদ্যবস্তু সমূহের বিধিনিষেধহীন ভোজনের কথাই তিনি বলছেন। অবিশ্যি আমি জানি না, তা সম্ভব কী না। আমি তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, তিনিও তাকিয়ে ছিলেন, এবং হঠাৎ হেসে বললেন, 'মিথ্যা বলিনি। সব জাতের সব খাবার কেবল না, জলের মত মাটি, গাছপালা, আগুন, সবই খেয়েছি। তবে, ওতে কোনো বাহাদুরি নেই। দেখিস বাপু, তুই যেন আবার আমাকে হ্যারিকেনটা খেয়ে ফেলতে বলিস্ না।'

তিনি ঠাট্টা করছেন কী না বুঝতে না পেরে, আমি জগতের দিকে একবার দেখলাম। দেখলাম, তাঁর দৃষ্টি মাটিতে পোঁতা ত্রিশূলের দিকে, ঠোঁটে হাসি মিটমিট করছে, দেখলেই মনে হয়, কেমন একটু রহস্য ছুঁয়ে আছে। কিন্তু প্রাণতোষবাবা নিজের মুখে বলেছেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেননি। তাঁর এই রক্তবস্ত্র, রক্তাভ শরীর এবং জটাজুট, তাঁর হৃদয়ভেদী দৃষ্টি, হঠাৎ দর্শনে মূর্তিমান ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়, অথচ হাসলেই তা ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সারা শরীরে, গোঁফদাড়িতে, চোখের তারায়, তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন, আমার বিশ্বাস হয় না। আর একটি কথাও আমার কানে লেগে আছে। তিনি বললেন, 'সবই খেয়েছি।' বলেননি, 'খাই।'

আমি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকবো, হঠাৎ প্রাণতোষবাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকেই যেন চিকুর হেনে গেল। দেখলাম, তিনি অপলক নিবিড় চোখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, এবং জিজ্ঞাসার সুরে উচ্চারণ করলেন, 'বল্।'

কী বলবো? তাঁকে জ্বলন্ত হ্যারিকেন খেতে? আমার একবারও সে কথা মনে হয়নি। এখনই হঠাৎ হলো, তাঁর কথা শুনে। তাঁর কথার মধ্যে কি চ্যালেঞ্জের সুর? আমার মধ্যে একটা দোদুল্যমানতা, উভয় সংকটের মতো, কিন্তু চোখ সরাতে পারছি না তাঁর দৃষ্টি থেকে। হ্যারিকেন খেতে বলাটা কেমন যেন ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে, অথচ একটা কৌতূহলিত উত্তেজনা বোধ করছি।

'তুই যা বলবি, আমি তা-ই করবো।' তিনি আমার চোখের গভীরে তাঁর দৃষ্টি বিদ্ধ রেখে বললেন।

আমার ভিতরটা যেন কেমন থরথর করছে। জগতের দিকে আমার তাকাতে ইচ্ছে করছে, চোখ সরাতে পারছি না। হঠাৎ হ্যারিকেনের সলতেটা দপ্‌দপ্‌ করতে আরম্ভ করলো, ঘরে আলোছায়া কাঁপতে লাগলো। আমি চকিতে একবার সেদিকে দেখেই, আবার তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি এখন হাসছেন, কিন্তু আমাকে প্রায় যেন শিউরে তুললো, ক্রমে বাইরে প্রকাশমান তাঁর লাল টকটকে জিহ্বা। হ্যারিকেনটা এখনো দপ্‌দপ্‌ করছে, এবং সহসা আমার মনে হলো, হ্যারিকেনটা নড়ে উঠলো। আমি ঝটিতি সেটাকে দেখলাম। সম্ভবতঃ আমার দৃষ্টির বিভ্রম, হ্যারিকেনটা প্রাণতোষবাবার দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে পড়েছে। এ সব আমার চিত্তবৃত্তির বাইরে, এখন আর কোনো কৌতূহলিত উত্তেজনাও বোধ করছি না। আমি বলে উঠলাম, 'আমি আপনাকে কিছু করতে বলিনি।'

মুহূর্তেই হ্যারিকেনের শিখার দপদপানি থেমে, স্থির হলো। প্রাণতোষ-বাবার জিহ্বা মুখের ভিতর অদৃশ্য, তিনি মুখ টিপে হাসছেন। বললেন, 'আমি জানতাম, ও সবে তোর তুষ্টি নেই। প্রথম জীবনে যখন যোগাযোগ শুরু করেছিলাম, ভোজবাজী দেখাতে তখন ভালো লাগতো। সে তুই অনেক যোগী ভিখিরির কাছেও দেখতে পাবি। মাটির মধ্যে গর্ত কেটে, মাথা ঢুকিয়ে চাপা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে আছে। বেচারি! পেটের দায়ে কী আর করবে! জিভ ফুটো করে, ঠোঁট ফুটো করে, কাঁচ ও লোহা চিবোয়। কাঁকড়াবিছে মুখে পোরে, দেখেছিস?'

তাঁর শেষ কথায়, আমার শরীরটা যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। কাঁকড়াবিছে মুখে পোরার ছবিটা কল্পনা করতেই, এ অবস্থা। দেখা তো দূরের কথা। প্রাণতোষবাবা হেসে উঠলেন, বললেন, 'কী, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে?'

আমি এতক্ষণ পরে জগতের দিকে তাকালাম। সহজ মানবী হাসি তাঁর মুখে, আমার দিকেই চোখ। বললাম, 'কাঁকড়াবিছে মুখে পোরা দেখিনি, তবে ও সব কিছু কিছু দেখেছি। এখন ও সবে অস্বস্তি হয়।'

'ওই জন্যই তোকে আমার ভালো লেগেছে।' প্রাণতোষবাবা বললেন, 'আর সেখানেই রয়েছে মায়ের দৃষ্টি, তা না হলে তো তিনি কারোকে যেচে আশ্রমে আসতে বলেন না। তা, তোর বয়স এখন বেশ কাঁচা। কিছুকাল যদি চেষ্টা করিস, তুইও কিছু যোগযাগ শিখে, ভোজবাজী দেখাতে পারিস। শিখবি?'

তাঁর চোখে কৌতুকের ছটা। দেখছি, ছটা জগতের আয়ত চোখেও। জিজ্ঞেস করলাম, 'শিখতে হলে কী করতে হবে?'

তিনি বললেন, 'পয়লা নম্বর, নাড়ি শোধন! বায়ুর ঘরটাকে তৈরি করতে হবে, যাকে বলে দমের ঘর।'

আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, আমার শরীরের অভ্যন্তরে হাত ঢুকিয়ে তাঁর প্রথম মন্তব্য, '...লড়বে জীবনভর। তবে দমের ঘরটা ভালো নেই!' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন আপনি আমার বিষয়ে বলছিলেন, আমার দমের ঘরটা ভালো নেই। তার মানে কী?'

তিনি বললেন, 'তার মানে, দম। দম মানে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস। আমাদের শরীরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ি আছে, আর তার সবগুলোর ভেতরেই বায়ু চলাচল করছে। ওটাকে কেউ বলে দম, কেউ বায়ু। ওটা করতে পারিলে, শরীর শোধন হয়, দেহে বল বাড়ে, সুস্থতা আসে, বয়স থমকে যায়, দীর্ঘায়ু হয়। বলতে গেলে, নিজের জীবনকেই নিজের অধীনে পাওয়া যায়, চালানো যায়। যোগীই বল্‌, আর তান্ত্রিকই বল, সবাইকেই বায়ুর দ্বারা নাড়ি শোধন করতে হয়, তা নইলে সব ফক্কিকার।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কেমন করে করতে হয়?'

তিনি স্বাভাবিক সহজ ভাবে বললেন, 'কেমন আবার? প্রাণায়ামের কথা শুনিসনি?'

'শুনেছি।'

'সেই প্রাণায়ামই আসল।' প্রাণতোষবাবা বললেন, 'কুম্ভক রেচক দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ির ভেতর দিয়ে যে বায়ু চলাচল করছে, ওটাকে আমরা বলি প্রাণবাহিনী। প্রাণকে সমস্ত দিক থেকে, নাড়ির ভেতরে বায়ুই বহন করছে। আমি প্রথমেই তোর শরীরের যেখানে হাত দিয়েছিলাম, ওটাকে কী বলে জানিস?'

'না।'

'মূলাধার। পুরুষাঙ্গের নিচেই, ও জায়গাটাও ত্রিকোণ। ওরই দু' পাশে, বাঁয়ে ইড়া, ডাইনে পিঙ্গলা, মাঝখানের গভীরে সুষুম্না, অনেকটা একত্র হয়ে আছে। ওই মূলাধার থেকে মাথা পর্যন্ত নাড়িগুলো ছড়িয়ে রয়েছে, আর বায়ু চলাচল করছে। রস রক্ত রূপ শব্দ মন, সবই নাড়িতে ছড়ানো, বায়ুতে চলছে। ওই বায়ুর স্পন্দনেই আমাদের ইন্দ্রিয় মন, এমন কি বুদ্ধিও কাজ করছে। কিন্তু এ বায়ু স্থূল, তাকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে তুলতে হয়,

সেটা সম্ভব যোগক্রিয়া, প্রাণায়াম ইত্যাদি দিয়ে। রামকৃষ্ণ যেমন বলেন, শক্তিই তো ব্রহ্ম, তেমনি বলতে হয়, বায়ুই শক্তি। সে শক্তি যে লাভ করে, তারই চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ হয়, তখন সে দ্বন্দ্বাতীত, ভেতরে পরম সাম্য ভাব। এবার তাকে সিন্দুকে পুরে, কবর দিয়ে রাখি না দশ মাস দশ দিন। তার মরণ নেই। এ ভোজবাজী ছুঁচো যোগীর কম্মো না। এ ছাড়া, তন্ত্রসাধনও হয় না। কী রকম মনে হচ্ছে?'

তাঁর নাড়ি ও বায়ু বিবরণের মধ্যে, জিজ্ঞাসাটা এতই আকস্মিক, কেবলী উচ্চারণ করতে পারলাম, 'অ্যাঁ?'

তিনি জগতের দিকে একবার দেখে, হেসে বললেন, 'অ্যাঁ ট্যাঁ নয়, নিজের প্রাণের ক্রিয়াটাকে এ রকম সূক্ষ্ম করে তুলতে পারবি? তাহলে তুইও যোগী হতে পারিস।'

আমি বিভ্রান্ত অসহায় ভাবে বললাম, 'আজ্ঞে না, পারবো না।'

'কেন পারবি না? তোকে যদি আমি পারাই?' তাঁর চোখে সেই কৌতুকের ছটা।

আমি জগতের দিকে তাকালাম। আশ্চর্য, তাঁর দুই চোখ মুদ্রিত, যেন ধ্যানাসনে বসে আছেন। প্রাণতোষবাবা আবার বললেন, 'এ সব নিজে নিজে করা যায় না, জানতে হয়, বুঝতে হয়, তার জন্যে গুরু ধরতে হয়, সে-ই তোকে সব বুঝিয়ে দেবে, অবিশ্যি তোর আঁতের গরজ থাকা চাই।'

আমি প্রায় করুণ ভাবেই বললাম, 'দেখুন আমি এভাবে জীবনের কথা কখনো ভাবিনি।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, পবিত্রী মা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে একজন, যেন স্থির সৌদামিনীর পিছনে, ঘন কৃষ্ণ মেঘ। মাথায় বড় বড় চুল, গায়ে কালো মোটা চাদর জড়ানো। চোখ দুটো জল্ জল্ করছে। এক হাতে একটি কাঁচের গেলাসে চা, অন্য হাতে কলাপাতা। পবিত্রী মা একটি বড় কুচকুচে কালো পাথরের গেলাস প্রাণতোষবাবার সামনে রাখলেন। তারপরে সেই লোকটির হাত থেকে আগে কলাপাতা নিয়ে আমার সামনে দিলেন, যার ওপরে রয়েছে কিছু কাটা ফল আর ছানা বা ক্ষীর জাতীয় মিষ্টি, স্পষ্টতঃ চিনি ছড়ানো। লোকটি নিজেই চায়ের গেলাস আমার সামনে রাখলো। পবিত্রী মা বললেন, 'জলের গেলাস দিয়ে যাও।'

প্রাণতোষবাবার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হলো, তিনি জগতের দিকে ফিরে তাকালেন। জগতের পাশে বসে, তার গায়ে হাত দিলেন। পবিত্রী

মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। প্রাণতোষবাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ ভালো লাগলো তোর কথা শুনে, সোজাসুজি স্বীকার—কোনোদিন জীবনের কথা এ রকম করে ভাবিসনি। সাধু-যোগীদের কাছে এলেই, সবাই যেন কেমন সাধু হয়ে উঠতে চায়—ভণ্ডামি যতো সব। বেশ, তবে তোকে একটা কথা বলে দিই, যোগী হবার দরকার নেই। তুই ভাবুক মানুষ, তোর মধ্যে একটা ডীপ্ ফিলিংস-এর ব্যাপার আছে, তোর চোখ সব সময় তা বলছে। বায়ুর ব্যাপারটা তো শুনলি? তোর শরীরে হাত দিয়ে বুঝেছি, ডন-বৈঠকের অভ্যাসও আছে। ভালো। বায়ু চালাচালিটা যদি কিছু কিঞ্চিৎ করিস, তবে শরীরটা ভালো থাকবে, সুখভোগের ক্ষমতা অনেক-কাল বজায় থাকবে। তোর বায়ুর গতি বেশ স্থূল, সেইজন্যই বলছিলাম, দমের ঘরটা ভালো না। কেবল বাহ্যে পেচ্ছাপে সব পরিষ্কার হয় না, একটু সূক্ষ্ম পরিষ্কারও করতে হয়, প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ রাখা। নে, এবার খা।'

পবিত্রী মা বললেন, 'বাবা, চা দিয়েছি খান।'

প্রাণতোষবাবা হাতে প্রকাণ্ড কালো পাথরের গেলাস তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মা।'

আমি কলাপাতার দিকে তাকালাম। পবিত্রী মা বললেন, 'এখনো দর্শন? এবার ভক্ষণ করো বাবা।'

আমি হেসে বললাম, 'তা করবো, আসলে চৌধুরীমশায়ের ওখানে অনেক বেলায় খেয়েছি তো, এখনো—।'

'তাহলে ভিতরের উঠোনে একটু লাফালাফি করে এসো, নেমে যাবে।' প্রাণতোষবাবা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

পবিত্রী মায়ের সঙ্গে জগৎও হাসির শব্দে বাজলেন। পবিত্রী মা তার ওপরে একটু উঠলেন, 'না হয় করালী তোকে নিয়ে একটু লোফালুফি করুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোফালুফি? সে আবার কী? আমি কি বল না পুতুল? আমি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি হাতের ভঙ্গিতে মার দেখিয়ে, তর্জনী দিয়ে কলাপাতার দিকে দেখালেন। খাবো তো বটেই। আর আমি কিছু বলতে যাচ্ছি? পুরো না বলতেই যা সব শুনতে হচ্ছে! তবে কেন যেন, মনটা এক রকমের খুশিতেও ভরে উঠছে। আমি ফল দিয়ে শুরু করলাম। মিষ্টি বস্তুটি পুরোটাই খাঁটি স্থূল দুধের সর। বস্তুত: এতটা শুদ্ধ খাঁটি দুধের সর কবে খেয়েছি, মনে করতে পারছি না।

খাওয়ার মধ্যেই করালী এসে কাঁসার ভারি গেলাসে জল দিয়ে গেল। আমি খাবার খেয়ে, জলের গেলাস নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে, একটু হাত ধুয়ে নিলাম। চায়ের গেলাসে হাত দিতেই, প্রাণতোষবাবা বললেন, 'নে, এবার তোর সিগারেট খা।'

বড় সুখের নির্দেশ, অন্তর্যামীর মতো। আমি একবার পবিত্রী মা এবং জগতের দিকে তাকালাম। আমি হাসছি, তাও জানি না। জানলাম পবিত্রী মায়ের কথায়, 'হাসছে ভাখ, গা জ্বালা করে।'

প্রাণতোষবাবা পিতার মতোই মৃদু হা হা স্বরে হাসলেন। আমি যেন স্বগৃহেই অতি আপনজনদের সঙ্গে, সুখী পরিবেশে বসে আছি। তবু আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করে, পবিত্রী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'খাচ্ছি।'

পবিত্রী মা ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন জগতের দিকে। জগতের ঠোঁট দুটি হাসিতে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। প্রাণতোষবাবা বললেন, 'দেখেছো মা, ও ঠিক মানুষকে চিনেছে। একবারটি মুখ ফুটে বলো।'

পবিত্রী মা বললেন, 'আর কতো বলবো বাবা। ওকে তো আমি রেল-গাড়িতেই বলেছি, আমি ওর প্রেমে পড়েছি।'

প্রাণতোষবাবা আবার হেসে উঠে বললেন, 'সেই তো কথা মা, আমিও তোমার প্রেমিকটির প্রেমে পড়েছি। আমার জগত মাও ওর প্রেমে পড়েছে, তাই না রে?'

জগত অনায়াসে বললেন, 'একটু একটু।'

তিনজনের সমবেত হাসি আবার টিনের দেওয়াল ও চাল ঝনঝনিয়ে দিল। আর আমিই কেমন বোকার মতো ঠেক্ খেয়ে গেলাম। জগতের এ রকম ছোট্ট একটি অসামান্য জবাব ভাবতেই পারিনি। প্রাণতোষবাবা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসলে কিন্তু সবই প্রেমের অধীন, বুঝলি? আঁতের গরজ মানেই প্রেম। ওটি থাকলে, সব করা যায়। নে, সিগারেট জ্বালা।'

আমি সিগারেট ধরালাম। ধরাতে গিয়েই, হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়লো। কাঁটায় কাঁটায় আটটা! আশ্চর্য, এত সময় কেটে গিয়েছে? আমি চিন্তিত ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'ইস্, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমাকে নিচে নেমে, গৌহাটি ফিরতে হবে। ট্রেন তো নিশ্চয়ই পাবো?'

'না পেলে, কি হবে?' পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'যাবে তো বন্ধুর কাছে। রাত্রিটা না হয় এখানেই থেকে যাবে।'

আমি বললাম, 'এমনিতে কোন অসুবিধা ছিল না। এ-দেশে প্রথম এসেছি, আমার বন্ধু খুব দুশ্চিন্তা করবে। ও ঠিক আমার মতো না।'

পবিত্রী মা ভ্রূকুটি চোখে, অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মতো নয় মানেটা কী?'

আমি সঙ্কুচিত হেসে বললাম, 'মানে ও খুব ভালো মানুষ—মানে খুবই দায়িত্বশীল এসব ব্যাপারে।'

প্রাণতোষবাবা বলে উঠলেন, 'এবার মা কী বলবে বলো। ও নিজেই বলছে, ও দায়িত্বশীল নয়। তবে বন্ধু দায়িত্বশীল বলেই ওকেও দায়িত্বশীল হতে হচ্ছে, তা বৈ তো নয়?'

ফিক করে হেসে ওঠার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখি, জগত এবার মুখে হাত চাপা দিয়েছেন। পবিত্রী মায়ের মুখেও হাসি, বললেন, 'সত্যি, মিথ্যে, কথাটি ছেলের কাছে পাবে না। দেখি, করালীকে ডাকি একবার।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'করালীকে এখন ডাকতে হবে না মা। গাড়ি আছে, আর একটু পরে উঠলেও হবে। তবে করালীকে দিয়ে ওকে নিচে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। একটা আলোও দিতে হবে।'

আমি প্রাণতোষবাবার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তিনি মাথা ঈষৎ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমি কিছু ভুল বলিনি, গাড়ি তুই পাবি, এখন দৌড়া-দৌড়ি করে লাভ নেই। গৌহাটি পৌঁছুতে তোর একটু রাত হবে। কিন্তু ভেতরের পাতলা জামার ওপরে কোট চাপিয়েছিস বটে, বাইরে বেরোলে তো শীত করবে।'

যিনি বলছেন, তাঁর গায়ে মাত্র একখানি রক্তবর্ণ পাতলা কাপাসি বস্ত্রখণ্ড মাত্র। তাও ভাল করে জড়ানো নেই। আমি কুণ্ঠিত ব্যস্তভাবে বললাম, 'শীত করবে না, এতেই হয়ে যাবে।'

'কিসে কী হয়ে যাবে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না।' পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'চ্যাংড়ামি দেখলে গা জ্বালা করে।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'তা বটে। তোমাকে পুরোটা চেনে না তো তাই। আমাকে দুটো কোয়েই দাও তো মা।'

পবিত্রী মায়ের আগে, জগতই উঠলেন এবং ঘরের কোণে, মিটসেফ জাতীয় একটি ছোট আলমারি খুলে, বড় কাঁসার বাটি বের করলেন। বাটিতে ঢাকা ভেজা কাপড়ের টুকরো খুলে, দুটি আস্ত সুপুরি প্রাণতোষবাবাকে দিলেন, এবং পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালেন। পবিত্রী মা বিনাবাক্যব্যয়ে হাত

বাড়িয়ে দিলেন। জগত তাঁকে একটি কোয়েই দিয়ে, আমার দিকে ফিরলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'নেবেন একটা?'

প্রাণতোষবাবা বলে উঠলেন, 'দে না। একটা কোয়েই থাবে, মুখশুদ্ধি তো। একটু-গা গরমও হবে।'

আমি জগতের দিকে তাকালাম। তিনি একটি ভেজা ঠাণ্ডা সুপুরি আমার হাতে তুলে দিলেন। আসাম মেলে, পবিত্রী মাকে এ বস্তু খেতে দেখেছিলাম। তিনি বললেন, 'নরম বলে কামড়ে চিবিয়ে খেও না। একটু একটু দাঁত বসিয়ে চুষে চুষে খাও।'

নির্দেশ যথাবিহিত পালন করলাম, এবং জিভে স্বাদ লাগলো তিক্ত ও কষায়। মনে হলো, মুখগহ্বরের ভিতরটা গরম হয়ে উঠছে। বুঝতে পারছি, আমি এখন মনে মনে বিদায় নিতে ব্যস্ত অথচ কিছু জিজ্ঞাসাও ঠোঁটের কপাটে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রাণতোষবাবার দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হলো, তাঁর মুখের বর্ণ অধিকতর লাল দেখাচ্ছে। বললেন, 'কিছু বলবি? যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিস? করালীকে ডাকবো?'

আমি বললাম, 'না, সে সময়মত আপনি বললেই আমি উঠবো। আমি বলছিলাম—।'

কথা শেষ করতে পারলাম না, ঠোঁট থেকে কথা গলায় ফিরে আটকে গেল। আমি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখেও যেন ঈষৎ রক্তিম ছটা লেগেছে। বললেন, 'আমার দিকে কী দেখছো! বাবার কাছ থেকে ভরসা তো পেয়েই গেছো, যা বলবার বলো।'

আমি আবার প্রাণতোষবাবার দিকে তাকিয়ে, কুণ্ঠিত ভাবে বললাম, 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়টা কিন্তু বুঝলাম না।'

'সে আমি জানি, চোরের মন বোঁচকার দিকে।' প্রাণতোষবাবা বললেন, 'কেন, তোকে তো আমি বস্তুর গুণগত পরিবর্তনের কথা বললাম, তাতে হলো না?'

আমি অধিকতর কুণ্ঠা নিয়ে বললাম, 'তাতে সম্যক্ কিছু—।'

'সম্যক্?' প্রাণতোষবাবা কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'সম্যক্ তুই কী করে বুঝবি? তুই কি সাধক? ওটা বুঝতে হয় সাধনার দ্বারা। বললামই তো, ওটা হল সাধকের এক মহান উচ্চ অনুভূতিময় অবস্থা। তার জন্য দীর্ঘকাল সাধনা করতে হয়, আর তাই আমি এই মায়ের পূজায় লেগে আছি। এই মা আমাকে সেই সিদ্ধি দিয়েছে। তুই কি করে জানবি? তুই কি এমন

করুণাময়ী মা পেয়েছিস, যে তোকে সাধনতত্ত্ব শেখাবে ? তুই কি সেই জগতের মানুষ, তত্ত্ব বুঝবি ? কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জের কথা তোকে বলেছি, কেবল মনে রাখিস, শক্তির উপাসনা, প্রেম সাধনা ছাড়া তা হয় না।'

প্রাণতোষবাবা যে এতগুলো কথা বলবেন, বুঝতে পারিনি। তিনি এখন হাসছেন না, তাঁর শরীর ঈষৎ দুলছে। আমি পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি চোখ বুজে আছেন। জগত তাকিয়ে রয়েছেন ত্রিশূলের দিকে। কেন ? প্রাণতোষবাবার মধ্যে কোনো গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে না তো ? তিনি হঠাৎ ডাকলেন, 'মা।'

পবিত্রী মা চোখ তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা।'

'করালীকে ডেকে এর যাবার ব্যবস্থা করো।' প্রাণতোষবাবা গম্ভীর স্বরে বললেন।

ইতিমধ্যে আমার কান, ঠোঁট সব গরম হয়ে উঠেছে, সেটা কোয়েরই গুণে। কিন্তু প্রাণতোষবাবার কথা শুনেই আমি উঠে দাঁড়ালাম, আর মনে হলো আমার মাথাটা যেন ঘুরে গেল। আবার তাড়াতাড়ি বসে পড়বার আগেই বলিষ্ঠ শক্ত গরম হাত আমার হাত চেপে ধরলো। প্রাণতোষবাবা বলে উঠলেন, 'ও কিছু না, বাইরে ঠাণ্ডায় গেলেই, ঠিক হয়ে যাবে। আবার কবে আসছিস্ বল্।'

মুহূর্তের মধ্যেই আমার কী হলো জানি না, আমার গলার কাছে যেন কান্না ঠেলে এল। আমি তা প্রাণপণ রোধ করার চেষ্টা করলাম। প্রাণতোষ-বাবা উঠে দাঁড়ালেন, আমার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিলেন, বললেন, 'তোর ভাবের ঘরটা সত্যি ভালো। তোকে আমি সন্ধান দিতে পারবো না, তবে একটা ধারণা দেবো, যা তুই জানতে চাস। সময় বুঝে আসিস, তাড়াতাড়ি আসিস একদিন।'

দেখলাম, পবিত্রী মা, জগত দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। পবিত্রী মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো।'

আমি নিচু হয়ে প্রাণতোষবাবার দুই পা স্পর্শ করলাম। তিনি কিছুই বললেন না। আমি পবিত্রী মা আর জগতের পিছনে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, অন্ধকার, কিন্তু উঠোনের ওপারে, ঘরের বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বলছে। কেবল কয়েক ধাপ উঠতেই যা অসুবিধা। ভাববার মুহূর্তেই, পবিত্রী মা তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে বললেন, 'সাবধানে এসো।'

তাঁর হাত রীতিমত উষ্ণ, এবং কোমল। এই মুহূর্তে, একটি সুগন্ধ

আমার ঘ্রাণে পেলাম, যা একান্ত তাঁরই। উঠোনে ওঠবার পরে, হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভয় পেয়েছো নাকি?'

আমি সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন?'

পবিত্রী মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর কাজল-বিভ্রম চোখ দুটি যে কতো বড়, তা সব সময়ে বোঝা যায় না, এখন যেমন বোঝা যাচ্ছে। বললেন, 'তোমার কি তা-ই মনে হলো? তাহলে কি বেরোবার আগে, তোমার ভাবের ঘরের কথা বলতেন? না কি তোমাকে আসতে বলতেন? তবে, মাঝে তাঁর কিছু মনে হয়েছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল, তুমি তা দেখনি। তাঁর বিরক্ত হওয়ার চেহারা দেখলে তুমি এ অবস্থায় থাকতে না।'

বাইরের শীতের প্রকোপেই কি না জানি না, শরীরটা যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, তাঁর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ মূর্তি যেন আমাকে দেখতে না হয়। পবিত্রী মা এগিয়ে গিয়ে জগতকে কিছু বললেন। জগত বারান্দায় উঠে, ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। পবিত্রী মা আমাকে ডাকলেন, 'এসো।'

আমি তাঁকে অনুসরণ করে বারান্দায় উঠতেই, বাঁদিক থেকে করালী এগিয়ে এল। পবিত্রী মা বললেন, 'বাবা করালী, তুই এ ছেলেকে নিচে নেমে, ইস্টিশনে পৌঁছে দে। সঙ্গে একটা বাতি নিস্।'

'আচ্ছা মা।' করালী একবার আমাকে দেখে, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পবিত্রী মায়ের সঙ্গে আমি সেই দরজা দিয়েই গেলাম। সামনের সেই বড় ঘরে একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। কোথায় লোকজনের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কোনো রকম নিরিমিষ তরকারির গন্ধ পাচ্ছি। জগত এসে ঢুকলেন, তাঁর হাতে একটি ছাই রঙের মোটা পশমী আলোয়ান, বাড়িয়ে দিলেন পবিত্রী মায়ের দিকে। পবিত্রী মা আলোয়ানটির পাট খুলে, আমার কাঁধের দু'পাশে ছড়িয়ে দিলেন। আমি সংকুচিত হয়ে বললাম, 'থাক্ না, আমি তো—।'

'এই, ছাখ্, ছোঁড়া, আমাকে মিছিমিছি রাগাস্‌নি।' পবিত্রী মা চপেটাঘাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, 'মরবি মার খেয়ে। তোকে যে রেলগাড়িতে নারীজাতিকে সেবা করার কথা বলেছিলাম, সেই কথাটা মনে রাখিস। মেলা বাজে কথা বলিস না।'

বলে তিনি জগতের দিকে তাকালেন। জগতের চোখ আমার দিকে, হাসি

তাঁর ঠোঁটে। আমি আর আলোয়ানের বিষয়ে কিছু বললাম না। কিন্তু তাঁর নারীসেবার কথা স্মরণ করানোর ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হলো না। আমি ঝটিতি নত হয়ে তাঁর দু' পা স্পর্শ করে, কপালে ঠেকালাম। তিনি আবার বললেন, 'ভুলে যাস্‌, কেন, আমরা কে, আমরা কী।'

আমি জগতের দিকে তাকালাম, তিনি বলে উঠলেন, 'যাকে প্রণাম করেছেন, ওতেই হবে।'

ইনিও দেখছি অন্তর্যামীর মতো কথা বলছেন, কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকেও প্রণাম করা। করালী ঘরে ঢুকে ডাকলো, 'মা।'

ফিরে তাকিয়ে দেখি, তার হাতে একটি হ্যারিকেন। পবিত্রী মা বললেন, 'হ্যাঁ, শোন্‌ বাবা করালী, নতুন মানুষ, একটু সাবধানে নিয়ে যাস বাবা। রাত্রে থাকলে কী এমন ক্ষতি হতো বুঝি না। এমন তো নয় যে, বউ ভাত বেড়ে বসে থাকবে? আইবুড়ো বন্ধু এক রাত ভাবলেই বা কী এসে যায়?'

শেষের কথাগুলোর লক্ষ্য আমি। আমি বললাম, 'যাচ্ছি।'

'এসো। কিন্তু আমার কথা হলো, কালকের দিন বাদ দিয়ে, পরশু সকালে চলে আসবে।' পবিত্রী মা বললেন, রীতিমত আদেশের সুরে, 'বন্ধুকে বলে এসো, দু'দিন থাকবে এখানে।'

আমি বিভ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম, এবং পবিত্রী মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, সোজাসুজি স্থির। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলবে?'

মাথা নেড়ে ঢোক গিলে বললাম, 'না। পরশু সকালে এখানে আসবো।'

পবিত্রী মা গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই আসবে। এমন কিছু রাজকার্য নিয়ে তুমি আসামে আসোনি, আমি তা জানি। সাবধানে যেও।'

আমি জগতের দিকে দেখলাম। তাঁর ঠোঁটের ওপর হাত চাপা, কিন্তু রুদ্ধ হাসির ছটা। বললাম, 'গান শোনা হলো না।'

'একদিন এসেই সব শোনা যায় না।' পবিত্রী মা বলে উঠলেন।

তা বটে। আমি আর বাক্য ব্যয় না করে বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কুকুরের গর গর গর্জন শোনা গেল।

ঠিক দিনটিতেই আবার প্রাণতোষবাবার আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হৃদয়ের নির্দেশ বলে একটা বিষয় সম্ভবতঃ আছে। আমি যে একান্ত আদেশ-

বশতঃ এসেছি, তা বলতে পারি না, একটা আকর্ষণ বোধই হৃদয়ের নির্দেশ হিসাবে কাজ করেছে। অন্যথায়, বন্ধু এবং তার প্রেমিকা বা ভাবী পত্নী, উভয়েই আমাকে বারণ করেছিল। বিশেষতঃ প্রাণতোষবাবার নামে যেন তাদেরই হৃৎকম্প হচ্ছিল। তিনি ওদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা। কিন্তু নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করতে পারি না। আমার কাছে এক সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি।

সকাল দশটা নাগাদ, আশ্রমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। ভিতর থেকে যেন কান্নাকাটি আর গর্জন একসঙ্গে ভেসে আসছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছি, হঠাৎ সামনের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে, হুড়মুড় করে তিন-চারজন মহিলা ও পুরুষ বেরিয়ে এলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই, তাঁদের পিছনে প্রাণতোষবাবাকে দেখলাম, রুদ্রমূর্তি। খালি গা, কোমরে জড়ানো সামান্য একটি লাল কাপড়ের ফালি। মাথার জটাজুট, গলার রুদ্রাক্ষের মালা যেন ছিটকে যাচ্ছে। একজন পুরুষকে পদাঘাত করে, বারান্দায় ধরাশায়ী করলেন, হুংকার দিয়ে বললেন, 'শালা পোকা, নপুংসক, মুতে মুতে গুচ্ছের বাচ্চার জন্ম দিচ্ছিস, আর এখানে এসে ধম্মের মাংটামি হচ্ছে?'

বলে আবার পদাঘাত, লোকটি বারান্দা থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়লেন। মহিলা দু'জন দৌড়ে নিচে নামলেন। আর একজন পুরুষ তখনো হাতজোড় করে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। তাঁকে একটি থাপ্পড় কষালেন, ধুতি-পাঞ্জাবি শাল নিয়ে ভদ্রলোক ছিটকে নিচে পড়লেন। মহিলারা চিৎকার করে কাঁদছেন, এবং পুরুষ দু'জনকে ধরে, দরজার দিকে ছুটে এলেন। প্রাণতোষবাবা প্রচণ্ড ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে এমন হুংকার দিলেন যে, আমার তলপেটের কাছটা চমকে উঠলো। মহিলা ও পুরুষরা দৌড় দিলেন। প্রাণতোষবাবা চিৎকার করে বললেন, 'কতগুলো ভেড়ার পাল, বেরো।'

বলে তিনি একবার কি চোখ তুলে আমাকে দেখলেন? দৌড় দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম, ও রকম প্রহার খাওয়া অসম্ভব! প্রাণতোষবাবা দক্ষযজ্ঞের ক্ষ্যাপা শিবের মতো ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মহিলা ও পুরুষরা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। পুরুষ দুজনের পোশাক যথেষ্ট ভদ্রস্থ, মহিলাদেরও। দুই মহিলাই আহত পুরুষদের শুশ্রূষা করতে আরম্ভ করলেন। একজনের নাক দিয়ে, আর একজনের ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। একজন পুরুষ

বললেন, 'ভাব কিয়ারে? বাবায় ধরিয়ে মারিলে পুইণ্য!' এবং আরো কিছু কথা বলতে বলতে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পুত্তলিকাবৎ। দেহে প্রাণ আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু আর এক পা-ও অগ্রসর হবার সাহস বা ক্ষমতা নেই। কোন্ দেশীয় বয়ান জানি না, 'বাবায় ধরিয়া মারিলে পুইণ্য।' কোনো দরকার নেই পুণ্যের। ত্রিশূল হাতে থাকলে তো নির্ঘাৎ খুন হয়ে যেতো। মার খেয়ে পুণ্যি? আর ওই সব গালাগাল? তার মধ্যে অশ্রাব্য কথাগুলো উচ্চারণ করাই সম্ভব না। আর ওই মানুষের কাছে দু'দিন আগে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি? কী করে তা সম্ভব হয়েছিল?

প্রাণতোষবাবার পরশু দিনের মূর্তি মনে করবার চেষ্টা করলাম। কী বিস্ময়কর বিপরীত! বচন-বাচন ব্যাখ্যা ভঙ্গি হাসি, সবই ভিন্ন। তাঁর এই রকম পরিবর্তন? তাহলে, লোকে তাঁর রুদ্রমূর্তি ধারণ বিষয়ে নিতান্ত মিথ্যা বলে না।

পায়ের শব্দে সামনে তাকিয়ে দেখি, করালী বারান্দা থেকে নেমে আসছে। ধরতে নাকি? সে কাছে এসে, শান্ত নিরীহ স্বরে বললো, 'মা আপনাকে ডাকছেন।'

মা? পবিত্রী মা? কোথায় তিনি? আমি বারান্দার ওপরে, ঘরের দরজার দিকে তাকালাম। কেউ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় তিনি?'

করালী জবাব দেবার আগেই, বারান্দার বাঁদিকে, লম্বা পাঁচিলের মাঝামাঝি, বেলগাছের নিচে, বন্ধ দরজা খুলে গেল। পবিত্রী মা উদয় হলেন। স্বর্ণচাঁপা বর্ণের লালপাড় শাড়ি তাঁর শরীরে, মাথার চুল খোলা, ডাকলেন, 'এদিক দিয়ে এসো।'

ওদিক দিয়ে কেন? সামনের ঘরে কি প্রাণতোষবাবা এখনো রয়েছেন? সর্বনাশ! কিন্তু কেনই বা যাবো ওরকম ভয়ংকর পরিবেশে? দরজার কাছ থেকেই বললাম, 'আমি কি একটু ঘুরে আসবো?'

পবিত্রী মায়ের ভুরু কুঁচকে উঠলো, তিনি মাথায় ঘোমটা টেনে বললেন, 'ঘুরে আসবে মানে? ঘুরে আসতে তোমাকে কে বলেছে? ভেতর বাড়িতে চলে এসো।'

আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। সামনের ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে, করালীর পাশ দিয়ে ভেতর বাড়িতে যাবার দরজার কাছে গেলাম। পবিত্রী মা আমাকে ভিতরে যাওয়ার পথ দিলেন। ঢুকলাম, কিন্তু অতি ভয়ে

চারিদিকে তাকালাম। নিস্তব্ধ, কেউ কোথাও নেই। শীতের নরম রোদ উঠোনের আশেপাশে, গাছের সবুজ পাতায় পাতায়, উঠোনে, এবং উত্তর দিকের পাহাড়ি ঢালুতে নেমে যাওয়া একক সেই টিনের মাথার চালে। পরিচ্ছন্ন গোবর লেপা উঠোন, শানবাঁধানো ঝকঝকে বারান্দা, শান্ত পরিবেশ। কী একটা পাখি যেন কোথায় শিস্ দিয়ে ডাকছে। বন-পাহাড়ের একটি প্রাকৃতিক গন্ধ ছাড়াও, পবিত্রী মায়ের জর্দা বা কোনো কিছুর একটা সুগন্ধও পাচ্ছি। কিন্তু এখন তাঁর ঠোঁট তাম্বুলরঞ্জিত না, অতএব এ গন্ধ কোনো অঙ্গরাগের কী না, জানি না।

পবিত্রী মা দরজা বন্ধ করে, আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যে এসে দাঁড়িয়ে আছো, সে-কথা তো আমি বাবার কাছে শুনলাম।'

'বাবা?' আমি বিস্ফারিত চোখে তাকালাম, অবিশ্বাস্য মনে হলো পবিত্রী মায়ের কথা।

পবিত্রী মা একটু ভুরু তুলে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ গো মশাই। বাবা আবার তোমার একটি নতুন নামও দিয়েছেন। আমাকে বললেন, মা, তোমার সেই ভাবের ভাবী ছেলে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তো কয়ালীকে পাঠালাম।'

বিস্ময়কর, এবং এখনো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। সেই ভয়ংকর রুদ্র ভৈরব-মূর্তি যে আমাকে সত্যই লক্ষ্য করেছেন, এবং আবার সে-কথা পবিত্রী মাকে জানিয়েছেন, কী করে তা সম্ভব? কোনো মানুষের পক্ষে তা সম্ভব বলে মনে হয় না, অথচ বাস্তবে তাই দেখছি। তথাপি দ্বিধা করে বললাম, 'তাঁর যে-মূর্তি দেখলাম একটু আগে, তাতে যে তিনি আমাকে খেয়াল করেছেন—।'

'কেন? বাবাকে তুমি কী ভাবো হে?' পবিত্রী মা'র ঘাড় বেঁকে উঠলো, বললেন, 'তুমি কি ভেবেছো, বাবা উন্মাদ পাগল হয়ে গেছলেন? চলো, দেখবে চলো, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে।'

আমি ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বললাম, 'না না, এখন থাক না, পরে ওঁর কাছে যাবো।'

পবিত্রী মা ঝটিতি হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলেন, তারপরে টেনে নিয়ে চললেন সেই নিচের ঢালুতে, বিচ্ছিন্ন ঘরটিতে। বাধা দেওয়া সম্ভব না, জোর করা তো চিন্তার অতীত। সুতরাং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কী? কয়েক ধাপ নেমে, বাঁদিকে গিয়ে, পবিত্রী মা সেই ঘরের দরজার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পূর্বদিকের ও উত্তরদিকের একটি

খোলা জানালা দিয়ে দিনের আলোয় ঘর ভরা। দেখলাম, প্রাণতোষবাবা বসে আছেন তাঁর সেই হরিণের চামড়ার ওপরে। বাঁ হাত দিয়ে ধরা, ঠোঁটে চেপে ধরা গড়গড়ার নল। সাবেক কালের বেশ বড় গড়গড়া, কল্কের মাপটিও মোটেই সাধারণ না। প্রাণতোষবাবা চোখ বুজে ছিলেন, শব্দে চোখ মেলে তাকালেন। আবার চোখ বুজে গম্ভীর শান্ত স্বরে বললেন, 'কী রে ভাবের ভাবী, পালাসনি ?'

পবিত্রী মা বললেন, 'আমি না ডাকলে, ও পালাতো বাবা। বিশ্বাস করতে চায় না যে, আপনি ওর কথা আমাকে বলেছেন।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'সেজন্য ওকে দোষ দেবো না মা, পোকাগুলো যে রকম জ্বালাচ্ছিল, আমার টিপে মারতে ইচ্ছা করছিল। খালি বলে, বাবা কিছু দিন। কী দেবো রে হারামজাদা, আমার দেবার কী আছে ? আয়, বোস্।'

গড়গড়ার নল দিয়ে মেঝেতে দেখিয়ে, আবার সেটি মুখে দিলেন। আমি এবার কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়ে, এগিয়ে তাঁর দু' পা স্পর্শ করলাম। পবিত্রী মা বললেন, 'বাবা ওকে এখন নিয়ে যাচ্ছি, একটু খাইয়ে দিই। আপনি একটু বিশ্রাম করুন।'

প্রাণতোষবাবা চোখ বুজে বললেন, 'আচ্ছা মা।'

পবিত্রী মা আমাকে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে আসবার ইঙ্গিত করলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এসে, উঠোনের ওপর উঠে বললাম, 'দেখুন, একটু আগের মানুষ আর এই মানুষের মধ্যে আমি কোনো মিল খুঁজে পেলাম না। তবে পরশু রাত্রের তুলনায়, ওঁকে একটু গম্ভীর আর চিন্তিত মনে হলো।'

পবিত্রী মা হাসলেন, এবং এই প্রথম তাঁর হাসির মধ্যে আমি একটি বিষণ্ণতার ছায়া দেখলাম। তিনি বললেন, 'হয়তো এখন একলা বসে কাঁদবেন। যাদের পছন্দ করেন না, তাদের গালাগাল দেন, মারেন, আবার তারপরে কান্নাকাটিও করেন। তুমি থাকলে হয়তো তোমার সঙ্গে গল্প করতেন, প্রাণ খুলে হাসতেন। তার চেয়ে যদি একটু কাঁদতে চান, বরং কাঁদুন, তাতে ওঁর প্রাণটা সুস্থ হবে। এসো।'

অভূতপূর্ব ব্যাপার। সংহার মূর্তি ধারণ করে মারবেন আবার কাঁদবেন। শুনলে মনে হয়, সহজ, কিন্তু অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের মতোই বিপরীত। কিন্তু পবিত্রী মায়ের হাসির বিষণ্ণতা, আমার মনেও ছায়াপাত করলো। তাঁকে আমার কিছু বলবার নেই, অনুভব করলাম, প্রাণতোষবাবা তাঁর হৃদয়ের কোন্ গভীরে অবস্থান করছেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে উঠোন পেরিয়ে

বারান্দায় উঠলাম। তিনি আবার বললেন, 'ধীরু নরেন, এরা যারা বাবার পূজার ব্যবস্থা করে, কোনো রকম ভুলচুক হলে, তাদেরও মারধোর খেতে হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পরশু রাত্রে যাঁদের পূজায় বসবার কথা শুনেছিলাম?'

পবিত্রী মা বললেন, 'পূজায় আর ওরা কী বসবে? বাবার পূজার ব্যবস্থা করে, সেখানেই ওরাও বসে। আমাকে দেখতে যেতেই হয়। তা নইলে পূজায় বসে আবার কী গোলমাল হবে কে জানে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তার মানে, বাবা কি পরশু রাত্রে পূজায় বসেছিলেন?'

'পরশু কেন, পূজায় রোজই বসেন, প্রত্যেক রাত্রেই।' পবিত্রী মা বললেন, 'ও সব কথা থাক, আমার ঘরে এসো।' বলে তিনি বারান্দার বাঁদিকে এগিয়ে চললেন. এবং যেতে যেতেই বললেন, 'খুব যে একটা শাস্ত্র মেনে, নিয়ম মেনে চলেন, তা না। কিন্তু মনে কোনো রকম খটকা লাগলেই হলো। তাছাড়া অতি ভক্তি বাবা মোটেই পছন্দ করেন না।'

পবিত্রী মায়ের কথা শুনতে শুনতে যে আমার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হচ্ছে না, তা অস্বীকার করতে পারি না। একজনের অনুপস্থিতি বড় বেশি চোখে লাগছে। কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে এ আশ্রমকে ভাবা যায় না।

'জগত!' পবিত্রী মা হঠাৎ ডেকে উঠলেন।

একটু দূরের কোনো ঘরের অদৃশ্য থেকে জবাব এল, 'যাচ্ছি মা।'

আমার বুকটা চমকেই উঠেছিল! পবিত্রী মাও কি অন্তর্যামী হয়ে গেলেন। তিনি আবার বললেন, 'তোকে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। হলে, আমার ঘরে আসিস। কে এসেছে, বুঝতে পেরেছিস?'

জবাব এল, 'পেরেছি।'

'ওকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, তুই একেবারে সব নিয়ে আয়।' বলতে বলতে পবিত্রী মা একটি খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডাকলেন, 'এসো।'

পায়ের স্যাণ্ডেল উঠোনেই খুলে রেখেছিলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকেই, একটি মিষ্টি মধুর গন্ধ পেলাম। জানি না, অগুরু চন্দন ধূপ বা সেই জাতীয় কিছু কী না। ঘরের পূর্ব দেওয়ালের কাছে শতরঞ্চির ওপর উঁচু গদি, গদির ওপরে, কাশ্মীরী গাব্‌বা জাতীয়, সুন্দর কাজ করা, সুগোল পশমী বস্ত্র পাতা, তার ওপরে একটি অতি জীবন্ত চিতাবাঘের ছাল। পশ্চিম দেওয়াল ঘেঁষে, সাবেক কালের বেশ উঁচু খাট, খাটে মোটা গদির ওপরে পরিচ্ছন্ন বিছানা, ওপরের

চাদরটির রঙ গেরুয়া। দু'টি বালিশ, একটার ওপরে আর একটা, এবং একটি পাশবালিশ, সবই সাদা ধবধবে, এবং মাথার বালিশের কোণে, লাল সুতোয়, ত্রিশূল ও ত্রিশূলের নিচে পদ্ম বা জবাফুলের এমব্রয়ডারি করা। ঢোকবার দরজার বিপরীত দেওয়ালের গায়ে একটি মানুষ সমান ডিম্বাকৃতি আয়না, কালো রঙের উজ্জ্বল কাঠের ফ্রেমে, ঘোরানো কব্জায় আটকানো। ঘরে ঢুকলেই, সর্বাগ্রে আত্মদর্শন, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব। আয়নার সামনে, সম্ভবতঃ চটের ওপর নানা রঙের সুতোর ফুল তোলা, বড় একটি আসন। বাঁদিকে একটি জলচৌকি, তার ওপরে প্রথমেই যা চোখে পড়ে, হাতীর দাঁতের একটি সুদৃশ্য কৌটা, মাথাটি মিনারের মতো উঁচু এবং সূচ্যগ্র। সম্ভবতঃ সিঁদুরের কৌটা। সেই রকমই আরো কয়েকটি, মহিষের শিং বা পিতলের নানা রকমারি কাজ করা ঝকঝকে কৌটা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, প্রায় একটি বিলাসকক্ষ। কিন্তু এ সব ছাড়াও, পুব দেওয়ালে গদি আসনের ওপরেই, এক বিচিত্র ছবি, যা আমি কখনো দেখিনি। শায়িত শিবের কোলে শ্যামা মূর্তি আসীনা। এ তাবৎকাল শিবের বুকে দণ্ডায়মান কালীকেই দেখেছি। এখানেও কালী দাঁত দিয়ে জিভ কেটেছেন, কিন্তু তিনি যথাবিধি চতুর্ভুজা নন, এবং শিবের নাভির নিচে জানু পেতে বসা মূর্তির ছবি এই প্রথম দেখলাম। সাদা-কালোর চিত্রটি অনেকটা প্রাচীন পটের মতো।

ঘরের মেঝে লাল, তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের মেঝেয় বেশ খানিকটা জায়গা চতুষ্কোণ কাটা, সেখানে মাটির ওপর এক পাশে কিছু ভস্ম। এর সামনেই একটি চতুষ্কোণ পাথর মেঝেয় গাঁথা, সাদা আর কালোয় নানা ছক। আমার চোখে ওটা অনেকটা অর্থহীন ষোল ঘুঁটি বাঘ-চালের ছকের মতোই প্রায়, তার বেশি কিছু নয়, কিন্তু স্বস্তিকা চিহ্নটি মনের মধ্যে একটা অন্য ভাবের সৃষ্টি করে। এ সবকে যদি ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বলা যায়, তাহলে, এইটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। তার মধ্যে, শিবকালীর চিত্রটিই আমার কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয়।

ঘরের অন্যান্য আসবাবের মধ্যে, আয়নার কাছ থেকে একটু সরানো, পাশাপাশি দুটি কাঠের আলমারি। পবিত্রী মা একটি আসন এনে, ঘরের প্রায় মাঝখানে পেতে দিয়ে বললেন, 'বসো। ঘরটা দেখে কি মনে হচ্ছে বলো তো?'

আমি বললাম, 'খুব সুন্দর।'

'কিন্তু সন্ন্যাসিনীর ঘর মনে হচ্ছে কী?' পবিত্রী মা ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জবাব দিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা করলাম। তিনি বললেন, 'আসলে আমি

তো সন্ন্যাসিনী নই। আমি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে থাকতে চাই। আবার যদি যোগিনী হয়ে ঘুরতে হয়, দরকার হলে ঘুরবো। কী রকম বুঝলে?'

বললাম, 'বোধ হয়, আপনি ঠিক আপনারই মতো।'

পবিত্রী মায়ের ঘাড় বাঁক খেল, ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন, বললেন, 'তুই যে ছোঁড়া আমার ওপর দিয়ে যাস্। কিছুই বলছিস না, আবার সবই বলছিস।'

সব বলেছি, বলতে পারবো না, তবে কিছু না বুঝে কিছু বলা যায় না, এটুকু বুঝি, অতএব, জবাবটা সেই রকমই হয়। বললাম, 'সব বলা আমার পক্ষে সম্ভব না, আপনি জানেন।'

'খুব হয়েছে, বসো।' নির্দেশ দিয়ে, স্খলিত ঘোমটা টেনে দিয়ে বললেন, 'না জেনেও তুমি ঠিকই বলেছ, আমি ঠিক আমার মতোই। যে-মন্ত্রে শক্তি শুদ্ধ, আমি সেই মন্ত্রে শুদ্ধ। শাস্তিতে আমার অধিষ্ঠান চাই। তাতে যদি লোকে আমাকে বড়লোক বলে, দেমাকী বলে, বলবে। কী করবো!'

তাঁকে বড়লোক বলা যায় কী না, জানি না, দেমাকীও তাঁকে আমি বলবো না। প্রাণতোষবাবার সান্নিধ্যে তাঁকে দেখে, এবং তার আগে কথা বলেও বুঝেছি, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ মহিলা, সাধারণ নন। কিন্তু তাঁর স্নেহ, হাসি, আচরণ বেশভূষার ঔজ্জ্বল্য, সবই যেন আমাকে গৃহাঙ্গনের এক অতি বকৃপটিয়সী হৃদয়বতী নারীর কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রথম আলাপের সময়েই আমার এ কথা মনে হয়েছিল। এখন তাঁর কথায় যেন একটি সূক্ষ্ম অভিমানের স্বর, সম্ভবতঃ এ রকম একটি প্রচ্ছন্ন প্রচার তাঁর সম্পর্কে আছে, তিনি বড়লোক এবং দেমাকী। কিংবা তাঁর এ-ঘর দেখে হয়তো কেউ কখনো বিরূপ মন্তব্য করে থাকবে। এমন পরিপাটি মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো একখানি ঘর আমার নিজেরও নেই, কিন্তু বিরূপ চিন্তা আমার ভাবনায় একটুও স্পর্শ করছে না। বরং নিজেকে বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত বোধ করছি।

আমি আসনে বসতে বসতে দেখলাম, তিনি পশ্চিম দিকে খাটের আড়ালে গেলেন। আমি পুব দেওয়ালের সেই শিবকালীর চিত্রটির দিকে তাকালাম। মনে কিন্তু একটা অস্বস্তি বোধ করছি। যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তার ঠিক ব্যাখ্যা করতে, নিজের কাছেই যেন ঠেক খেয়ে যাচ্ছি। মুখ না ফিরিয়েও মনে হলো, ঘরের দরজায় একটি ছায়া পড়লো। চিত্রটি আমাকে অধিকতর কৌতূহলিত করছে, শিবের বক্ষে কালীর দুই হাত প্রসারিত দেখে।

পবিত্রী মায়ের গলা শুনলাম, 'দে ওকে।'

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ঘরের ভিতরে দরজার পাশে জগত, তাঁর

দৃষ্টি খাটের কাছে পবিত্রী মায়ের প্রতি। এক হাতে একটি পেতলের মাঝারি আকারের রেকাবি, অন্য হাতে জলের গেলাস। তাঁরও লালপাড় শাড়ি পরা, জমি সাদা, কিন্তু জামা লাল। চুল খোলা, কপালে ছোট করে আঁকা ত্রিপুণ্ড্র নিচে সুগোল সিঁদুরের ফোঁটা। এগিয়ে এসে রেকাবিটি আমার সামনে রেখে, জলের গেলাস ডানদিকে বসিয়ে বললেন, 'খান।'

গৌহাটি রেল-কলোনীতে আমার বন্ধুর সঙ্গে একপ্রস্থ প্রাতরাশ হয়ে গিয়েছে। এবং তার কথা মনে পড়ছে, 'এখন যা পারো খাও, তারপরে প্রাণতোষবাবা তোমাকে বলি দেবেন, না কি পবিত্রী মা বা জগত সাধুনী ভেড়া বানাবেন, খাওয়া আর কপালে ঘটবে না।' কিন্তু সে কি আমার সামনে পরিবেশিত এই খাবারের কথা ভাবতে পারে? রেকাবিতে একটি কাঁসার বাটিতে মুড়ি, রেকাবির এক পাশে বড় বড় নারকেলের টুকরো দেওয়া কাবুলি মটরের শুকনো ঘুগনি, পাশে সবুজ একটি কাঁচালঙ্কা। একটি পাকা কলা, আর বেশ খানিকটা ছানার সারা গায়ে খেজুরি গুড়ের রস ছড়ানো। আমি জগতের দিকে তাকালাম।

জগত বেশ সহজ ভাবেই হেসে বললেন, 'বলবেন না যেন বেশি হয়েছে।'

আমি হেসে বললাম, 'যা খেয়ে এসেছিলাম, পাহাড়ে উঠতে উঠতেই তা হজম হয়ে গেছে।'

'আস্তে আস্তে কথা ফুটছে, বুঝলি জগত!' পবিত্রী মা বলতে বলতে খাটের ওপাশ থেকে এদিকে এগিয়ে এলেন, এবং প্রায় এক পোয়া ওজনের একটি পেথম তোলা ময়ূরের নারকেলের ছাঁচ-সন্দেশ ছানার পাশে দিলেন।

আমি এবার চমকে তাঁর দিকে তাকাতেই, তিনি বলে উঠলেন, 'এবারই বেশি হয়ে গেল, না? বলো তাহলে জগতই হাতে করে দিক।'

আমি কথাটা সম্যক বুঝে ওঠার আগেই, জগত হেসে উঠে বললেন, 'মা যে কী বলেন!'

'তবে, ভাবের ভাবীই বা মুখটা ও রকম করলো কেন, যেন ওকে বিষ দিয়েছি!' পবিত্রী মা বলেই, আমার পিছন দিকে চলে গেলেন।

আমি ব্যস্ত ভাবে বললাম, 'আমি কিন্তু তা বলিনি, আমি মানে—।'

'ন্যাকা।' পবিত্রী মা বললেন, 'জগত, তুই ওকে খাওয়া, আমি একটু তৈরী হয়ে নিই। ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাবে।'

জগত বললেন, 'হ্যাঁ মা, আপনি তৈরি হোন।'

পরশু অপরাহ্ণে জগতের কপালে কোনো চিহ্ন দেখিনি। এখন দেখছি, এঁরা দুজনেই স্নান করেছেন। অবিশ্যি পবিত্রী মা কপালে কিছুই আঁকেননি।

জগত আমার সামনে লাল মেঝের বসলেন। আমারই বা আসনের কী দরকার ছিল। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কোথাও যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, আমরা এখুনি বেরোবো।' জবাব দিলেন পবিত্রী মা, আমার পিছন থেকে।

আমি ঘাড় ফিরিয়েই দেখলাম, তিনি আয়নার সামনে পাতা আসনে বসেছেন, এবং কিছু করছেন। সামনে জগতের দিকে ফিরে তাকালাম, তাকিয়ে আছেন ঘরের পুব দক্ষিণ কোণে। আমি চুপচাপ খেতে লাগলাম, কিন্তু একটা অস্বস্তি হচ্ছে। তিনজন মানুষ ঘরে, একজন চুপ করে খাবো, রীতিমত অস্বস্তিকর।

'আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে।' জগত বললেন।

তাঁর আয়ত চোখের দৃষ্টি আমার প্রতি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবে।' পবিত্রী মা পিছন থেকে বলে উঠলেন।

জগত ঠোঁট টিপে হাসলেন। পবিত্রী মা আবার বললেন, 'সেখানে পূজা হবে।'

বন্ধুর বলির কথা আমার মনে পড়লো। এই চর্ব্যচোষ্য খাদ্যের পরেই, পূজায় গমন! আমি জগতের দিকে দেখলাম। তাঁর দৃষ্টি এখনো আমার প্রতি। পিছনে পবিত্রী মায়ের উঠে পড়ার শব্দ পেলাম। একটু পরেই তিনি সামনে এসে, জগতের ঘাড়ে গলায় হাতে কিছু বুলিয়ে দিলেন। মনে হলো, আবছা ছাইয়ের মতো। বললেন, 'জগত, তুই এখানে বোস, আমি একটু ওদিকে দেখি, মাঙ্গলিকের ব্যবস্থা কতো দূর।' তারপরে আমার দিকে ফিরে, 'খাও হে' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং আমি দেখতে পেলাম, তাঁর কপালে এখন জগতের মতো ত্রিপুণ্ড্র এবং সিঁদুরের ফোঁটা আঁকা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কী লাগিয়ে দিয়ে গেলেন আপনার গায়ে?'

জগত বললেন, 'ভস্ম।'

তাঁর দৃষ্টি ঘরের পুব-দক্ষিণ কোণের দিকে প্রসারিত হলো। আমিও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। সেই পাথরের ছকের সামনে, চতুষ্কোণ মৃত্তিকা, এবং খানিকটা ভস্ম। ওখান থেকেই ভস্ম নেওয়া হয়েছে, অনুমান করলাম। কিঞ্চিৎ দ্বিধা করেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের ভস্ম?'

জগৎ যেন একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হোমের। আপনি কী ভেবেছিলেন?'

জগতের দৃষ্টি অপলক, কিন্তু তীক্ষ্ণ না, গভীরগামিনী। বললাম, 'আমি

ঠিক কিছু ভাবিনি, তবে কেন যেন শ্মশানের চিতার ভস্মের কথা আমার মনে আসছিল।'

জগত বললেন, 'বাবার অবিশ্যি ঘরে শ্মশানে কোনো তফাত নেই, তবে এ ভস্ম হোমের।'

সেইজন্যই কি প্রাণতোষবাবা উঠোনের পাহাড়ি ঢালুর নিচে, সামান্য ঘরটিতে থাকেন? জগত হঠাৎ বলে উঠলেন, 'শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে, ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌল পরিকীর্তিতঃ। এ রকমই শুনেছি।'

জগত তাঁর নতুন পরিচয়ে আমার সামনে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হলেন। কিন্তু পবিত্রী মা যতোটা সহজ, তিনি তা নন, স্পষ্টতঃই তাঁর গালে আমি ঈষৎ লাল ছটা দেখতে পাচ্ছি, দৃষ্টিও অন্য দিকে। তথাপি তিনিও যে এমন অনায়াসে সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারেন, আমি ভাবিনি। আমার বিস্ময়-মুগ্ধতাকে গোপন করা দুঃসাধ্য। তারপরেই, তাঁর বক্তব্যটুকু আমি চিন্তা করলাম, 'সেই লোকই কৌল, যাঁর শ্মশানে গৃহে কাঞ্চনে তৃণে কোনো ভেদাভেদ নেই।' মধ্যে 'দেবি' সম্বোধন আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কাছে শুনেছেন?'

'বাবা মায়ের কাছেই শুনেছি।' জগত বললেন।

অতঃপর, কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, সেই বাবা মা কে? একটু যেন অনীহার ভাব তাঁর চোখে মুখে। হয়তো প্রাণতোষবাবা ও পবিত্রী মায়ের কথাই বলছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহল বর্ধিত হচ্ছে, এবং তা তিনিই করছেন। আমার খাওয়া ইতিমধ্যে শেষ। এর পরে সারাদিন পেটে কিছু না পড়লেও ক্ষতি নেই। ইংরেজিতে একেই বোধ হয় হেভি ব্রেকফাস্ট বলে। তাও আবার দু' প্রস্থ। ঘরে আমিষ, আশ্রমে নিরামিষ! জগত বললেন, 'আপনি রেকাবিতেই হাত ধুয়ে নিন, এখানে এঁটো কিছুই নয়।'

আমি তাই করলাম, এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কি আপনাদের বিশেষ কোনো পূজা আছে? পবিত্রী মা মাঙ্গলিকের কথা যেন কী বলছিলেন?'

জগত বললেন, 'হ্যাঁ, আজ তো শনিবার। প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবারই বিশেষ পূজা হয়। সকালে মাঙ্গলিক, রাত্রে মূল পূজা। বসুন, আসছি। মুখশুদ্ধি কিছু চলবে?'

আমি বললাম, 'চলবে, কোয়েই দেবেন না।'

জগত হেসে, রেকাবি আর গেলাস তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। আমি তাঁর সংস্কৃতে উচ্চারিত কথাগুলো আবার ভাবলাম, তাঁর রমণীয় স্বর

আমার কানে ঝংকৃত হলো। কী তাঁর ভূমিকা এই আশ্রমে, এবং তিনি প্রকৃত-পক্ষে কী, আমি জানি না। তাঁর গান শুনেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখন তাঁর সংস্কৃত শুনলাম, যা বুঝতে আমাকে ভাবতে হয়, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয়। তিনি যদি সাধিকা হন, তা হলেও, নিশ্চয়ই পবিত্রী মায়ের পর্য্যায়ে আসেননি। তাঁকে চোখে দেখে, স্বাস্থ্যবতী তরুণী কুমারী মনে হয়। তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর নেই, যেমন আছে পবিত্রী মায়ের। পুরুষ প্রকৃতির মিলনের কথা শুনেছি। এবং সেই মিলনের স্বরূপ কী, আমার অজ্ঞাত। তথাপি, কেন জানি না, প্রাণতোষবাবা এবং পবিত্রী মায়ের মধ্যে যে গভীর প্রেম, তা আমি কিঞ্চিৎ অনুভব করেছি, তাঁদেব সেই চারি চক্ষের মিলন ও হাসির মধ্যে, যাকে প্রাণতোষবাবা 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' বলেছিলেন। কী তাঁদের সেই মহান অনুভূতিময় অবস্থা, জানি না। জগতের কি সে রকম কোনো সাধনা লাভ হয়েছে? মনে হয় না। পবিত্রী মাও যেন সেই রকমই বলেছিলেন। তবে, জগত কে? কী তাঁর পরিচয়? তাঁর গার্হস্থ্য, বংশগত, পারিবারিক পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। সে-সব কি জানা যায় না?

জগত ঘরে এলেন, কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'নিন।'

হাত পেতে নিয়ে কালো রঙের কয়েকটি গুলি দেখলাম, তার গায়ে একটু সাদা দাগ। মুখে দিয়ে বুঝলাম, হরতুকী আমলকি ইত্যাদি মিশ্রিত, অম্ল স্বাদ, কিন্তু মুখের ভিতরটা রসে ভরে গেল।

জগত বললেন, 'মায়ের তৈরি হতে হতে, চলুন আশ্রমবাড়ি ঘুরে দেখবেন।'

আশ্রম আবার বাড়ি? দুইয়ের যোগ কোথায়? হয়তো এ আশ্রমকে তা-ই বলা যায়। আমি বললাম, 'চলুন।'

জগতকে অনুসরণ করে, আমি পবিত্রী মায়ের ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় গেলাম। পাথরের দেওয়ালের ওপর টিনের চারচালা মন্দির রয়েছে, সিংহ-বাহিনী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত। পবিত্রী মাকে, মন্দিরের পাশেই একটি ঘরে, কয়েকজন মহিলার সঙ্গে নানাভাবে ব্যস্ত দেখলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকালেন না। তারপরেই দেখলাম রন্ধনশালা, দক্ষিণে। রন্ধনশালায় ব্যস্ততাও কিছু কম না। একটু উৎরাইয়ে নেমে, গোয়ালবাড়ি, দুগ্ধবতী কয়েকটি গাভী রয়েছে। আমি বলে উঠলাম, 'দেখে মনে হয় সম্পন্ন গৃহস্থের আবাস।'

জগত প্রতিবাদ করলেন না, বললেন, 'এক রকম তাই। রোজ দুপুরে পঞ্চাশ-ষাট জনের খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়। বিশেষ তিথি হলে তো কথাই নেই।

তাছাড়া, বাইরের থেকেও অনেকে আসে। সেদিক দিয়ে দেখলে, আশ্রমকে গরীব বলতে হয়।

এ-কথা আমার মনে হয়নি, এত লোকজনের প্রত্যহ খাওয়ার কথা এই প্রথম শুনলাম। বললাম, 'রোজ এত লোকের খাওয়ার কথা আমি জানতাম না।'

জগত বললেন, 'কী করে জানবেন? আজ নিয়ে তো দু'দিন এলেন। বাবার ভক্ত-শিষ্যদের দান সবকিছু। আশ্রম তাঁরাই তৈরী করেছেন, ভোগ-যাগের ব্যবস্থাও তাঁরাই করেন। যাঁদের আছে, তাঁরা দেন; যাঁদের নেই, তাঁরা ভোগ করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন। তবে সবই বাবা মাকে ঘিরে।'

জগতের এই বচনে বোঝা গেল, বাবা মা বলতে তিনি কাদের কথা বলেন। কিন্তু তাঁর জন্মদাতা ও দাত্রী পিতা-মাতা কারা, কোথায় তাঁরা থাকেন। ঘুরে ফিরে, আমার কৌতূহল তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। গোয়ালটি পেরিয়ে খানিকটা যাবার পরে, অতি ঘন এবং বিস্তৃত মাধবীলতার বেড়া। বাঁশের কঞ্চির দরজা তার মাঝখানে। জগতের পিছনে, সেই দরজার ভিতরে ঢুকলাম। একটি ছোটখাটো বাগান, বলা যায় জবাফুল গাছের বাগান। প্রচুর জবা গাছ, পঞ্চমুখী, ঝুমকা, লঙ্কা এবং আরো নানারকম, আমি যার নাম জানি না। কোনো গাছে ফুল আছে, কোনো গাছে নেই। কোনো কোনো গাছ আমার মাথা ছাড়িয়ে বেশ উঁচু, আর ঝাড়ালো। আমার নিজের পিতার কথা মনে পড়ছে। জবা তাঁরও অতি প্রিয়। বলা বাহুল্য, সেটা ভক্তিসূচকও বটে।

এই মাধবীলতার ঝাড়, জবার বাগানের মাঝখানে, লালপাড় শাড়ি, লাল জামা জগত, যাঁর কপালে শ্বেত ত্রিপুণ্ড্র এবং তার নিচেই সিঁদুরের ফোঁটা, একটি আবির্ভাবের মতো অপরূপ মহিমময় মনে হচ্ছে। তাঁর স্বাস্থ্যের বর্ণনা যদি গর্হিত না হয়, তবে তাঁকে শিল্পীর তৈরি পীনবক্ষ, মেদবর্জিত বক্ষের তলদেশ থেকে নাভিস্থল, এবং ক্ষীণ কটির নিচেই সুঠাম একটি ঢেউয়ের মতো নিতম্ব, দাঁড়িয়ে আছেন বাঁ পা একটি পাথরের ওপর রেখে—অবিকল প্রতিমা বলে মনে হচ্ছে। বিশেষতঃ তাঁর আয়ত চোখ প্রকৃতই যেন আকর্ণবিস্তৃত দেখায়, এবং তাঁর নাক, ঠোঁট প্রতিমার মতোই উন্নত ও ঘন সংবদ্ধ। লক্ষণীয়, নাসারন্ধ্র সর্বদাই যেন কিঞ্চিৎ স্ফীত, যা একটি মানসিক ভাবের লক্ষণ। পবিত্রী মায়ের এ রকমই দেখেছি।

আমি জগতের বাঁদিকে ছিলাম। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন,

দৃষ্টি আমার দুই চোখের ওপর স্থির নিবদ্ধ। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলবেন?'

যা আমি ভাবিনি, অভাবিত সেই অনুমতি আমি প্রার্থনা করে বললাম, 'আপনাকে আমি কয়েকটি ফুল দেবো?'

জগত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন না, একটু পরে, সহসা একটু হাসলেন, যেন চিকুর হেনে গেল, বললেন, 'দিন।'

এই হাসি আমাকে যেন কেমন বিচলিত ও বিমর্ষ করে দিল। আমার ভিতরের চোরা আবেগ থিতিয়ে এল। তথাপি আমি আমার কাছের গাছ থেকে কয়েকটি ঝুমকা আর লঙ্কাজবা তুলে নিয়ে, তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ঠোঁটে তাঁর হাসি, যেন এক ছদ্মবেশী যোগিনী, দৃষ্টি আমার চোখের ওপরেই নিবদ্ধ। বললেন, 'ফুল দিন।'

ফুল দেবো? কিন্তু হাত না বাড়ালে কোথায় দেবো? তাঁর কথার সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় দেবো?'

'কোথায় আপনার দেবার ইচ্ছা?' জগত এক ভঙ্গিতে, অপলক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বিহ্বল চোখ নামিয়ে, তাঁর পায়ের দিকে তাকালাম, এবং আবার তাঁর চোখের দিকে। কিন্তু তাঁর সমস্ত শরীর বেয়ে, আমার দৃষ্টি আবার তাঁর পায়ের দিকেই নত হলো। তৎক্ষণাৎ তাঁর ডান হাত আমার সামনে প্রসারিত হলো, বললেন, 'দিন।'

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, হাসি তাঁর ঠোঁটে। ফুলগুলি দিলাম তাঁর হাতে। তিনি ফুলগুলোর দিকে দেখলেন। আমি বললাম, 'আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?'

জগত আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'বিরক্ত হবো কেন?'

আমি অকপটে বললাম, 'আপনাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।'

জগত চোখ তুলে বললেন, 'সেটা তো মানুষের ধর্ম। এখন কি আর মুগ্ধ হচ্ছেন না?'

আমি তাঁর সিঁদুরের ফোঁটার দিকে তাকালাম। এ জিজ্ঞাসার মধ্যে কি কোনো রহস্য আছে? বললাম, 'হচ্ছি।'

জগত শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, 'আপনাকেও আমার খুব ভালো লাগছে।'

ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করছেন কী না বুঝতে পারছি না, কিন্তু বললেন, খুব স্বাভাবিক সহজ ভাবে। এই সময়ে, পিছনের কক্ষির দরজা ঠেলে একটি

আট-ন' বছরের মেয়ে এসে, কিছুটা বঙ্গ-আলের ভাষায় বললো, 'জগদ্ধাত্রী গো, মা তোমাকে খোঁজে।' বলেই শুধু একটি শাড়ি পরা মেয়েটি চলে গেল।

জগত বললেন, 'চলুন।'

করালী আর ধীরু যোগী ছাড়াও, পবিত্রী মা ও জগতের সঙ্গে আর একজন সধবা মহিলা। সকলের সঙ্গে উঠে এলাম ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের সামনে। কামাখ্যার এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠতে উঠতে, এই মন্দিরের কথাই আমার মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যে জগতকে দেওয়া আমার জবাফুল কয়টি তিনি কেমন করে যেন বাঁদিকে কয়েকগাছি সরু দীর্ঘ কেশে, পর পর বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছেন। হয়তো পাহাড়ে উঠতে উঠতেই বেঁধেছেন, লক্ষ্য করিনি। একে যোগিনী মূর্তি বলবো, না এক বিবাগিনী বনবালা, বুঝতে পারছি না। মাথার ওপরে বিশাল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, আমার মন ভরে উঠছে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। এ অনুভূতিকে সুখও বলা চলে। যে ফুল দেওয়া নিয়ে গভীর সংকটে পড়েছিলাম, সেই ফুল জগত তাঁর কেশসজ্জায় লাগিয়েছেন। এই আনন্দই যেন, পর্বতশৃঙ্গের সমস্ত প্রকৃতিকে আরো অপরূপ করে তুললো আমার চোখে।

ভুবনেশ্বরীর চালাঘর নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে পবিত্রী মা এবং সবাই কিছু কথাবার্তা বলছেন। আমি দেখছি ব্রহ্মপুত্রকে, আমার বাঁয়ে, ডাইনে গৌহাটি শহর। ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকাগুলো অতি ক্ষুদ্র, একটি বিন্দু যেন রেখা টেনে চলেছে—ছোট স্টিমার; তার থেকে কিঞ্চিৎ বড় বিন্দু—তীরের কোল ঘেঁষে উমানন্দ ভৈরবের দ্বীপ।

'ওহে, ভাবের ভাবী, এদিকে শোনো।' পবিত্রী মা ডেকে উঠলেন।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, পূজার উপচার তাঁর হাতে নেই, তিনি আর জগত দাঁড়িয়ে আছেন কেবল। একটু দূরে করালী। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। জগত মিটি মিটি হাসছেন, কিন্তু পবিত্রী মায়ের ভুরু কোঁচকানো, ঘাড়ে ঈষৎ বক্রতা। কাছে যেতেই বললেন, 'আমার মেয়েকে তুই ফুল দিয়েছিস্? আবার বলেছিস্ মুগ্ধ হয়ে গেছিলি?'

আমি সংকুচিত বিব্রত চোখে জগতের দিকে তাকালাম। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে। পবিত্রী মা বলে উঠলেন, 'ওর দিকে কী দেখছিস্? আমার দিকে তাকিয়ে বল্।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ?' পবিত্রী মা যেন দাঁতে দাঁত চাপলেন, চোখ পাকিয়ে বললেন, 'মুগ্ধ? সখের প্রাণ—টকের আলু? দেখাচ্ছি আজ তোকে!'

বলে রীতিমতো মুষ্টি পাকিয়ে মার দেখালেন, আবার বললেন, 'আজ সকালে মার কাকে বলে দেখেছিস, তো? তোরও আজ হবে। এখন আয়, ভুবনেশ্বরীর কাছে, একবার দর্শন করে শাস্তির বোঝা একটু কমিয়ে নে। চল্।'

বলে তর্জনী দিয়ে, ভূগর্ভস্থ মন্দিরের প্রবেশ পথের দিকে নির্দেশ করলেন। আমি এগিয়ে গেলাম, তাঁদের পাশ কাটিয়ে। পিছনে হঠাৎ পবিত্রী মা'র রুদ্ধ হাসির স্ফুরিত নিক্কণ শুনতে পেলাম। এবং বচন, 'তুই আর আমাকে জ্বালাসনি, চল্। তোর গান শুনলে ও ফুল ফুটতে দেখে, এখন মুগ্ধ হয়ে ফুল দিচ্ছে, আর কী সাদাসিধে। তারপরে বলবে, তোকে পুজো করবে।'

আমি নিচের সিঁড়িতে পা দেবার আগে, ফিরে বললাম, 'আমি ওঁর পায়েই ফুল দিতে চেয়েছিলাম।'

'ওই শোন্ জগত, মুখপোড়া কী বলে!' পবিত্রী মা প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলেন।

জগত হেসে উঠলেন। পবিত্রী মা আমার দিকে ধেয়ে এসে বললেন, 'তোর কি যোগ্যতা আছে রে ওর পায়ে ফুল দিবি? দিলেই হলো? ফুল দেবার মর্ম, মন্ত্র কিছু জানিস?'

এখানেই আমার ঠেক। মর্ম বা মন্ত্রের কী বিষয় আছে, পায়ে ফুল দেবার মধ্যে, আমি জানি না। বললাম, 'সে-সব তো আমি জানি না।'

'কিন্তু পায়ে ফুল দেবার তো খুব সাধ আছে!' বলে ধমক দিলেন, 'চল নাম।'

আমি নিচে নামলাম। শরীরে অধিকতর ঠাণ্ডা অনুভূত হলো। প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। পায়ের নিচে কনকনে ঠাণ্ডা। পূজার উপচার সাজাচ্ছেন সেই সধবা মহিলা এবং ধীরু যোগী। পবিত্রী মা আমাকে বললেন, 'যা, নমস্কার করে ওপরে গিয়ে বোস্।'

এও এক রকমের অন্তর্যামীর মতোই নির্দেশ। আমার ওপরে যেতেই ইচ্ছা করছে। অতএব নমস্কার করে, আবার ওপরে উঠে এলাম। জানি না, কতোক্ষণ মন্দিরের পূজা চলবে। যতোক্ষণই চলুক, আমাকে থাকতেই হবে, কারণ

পবিত্রী মা আমাকে ওপরে থাকতেই বলেছেন। আজ আর আগামীকাল আমি তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথি।

বাইরে এসে মনটা যেন ঝরঝরিয়ে গেল। এমন একটি পর্বতশৃঙ্গে আমি দিনের পর দিন থাকতে পারি। বিশেষতঃ তার নিচেই যদি এমন একটি রৌদ্র-চকিত নীল নদ প্রবাহিত হতে থাকে। একটি সিগারেট ধরিয়ে, আমি নদীর দিকের পাহাড়ে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরের পাশ দিয়েই, স্বল্প পরিসর পায়ে-চলার এবড়োখেবড়ো রাস্তা, কিন্তু গাছের ছায়ায় ঢাকা। এখন ছায়ার ঠাণ্ডায় যেতে ইচ্ছা করছে না। আমি ব্রহ্মপুত্রের দিকে মুখ করে, একটা পাথরের ওপর বসলাম।

ব্রহ্মপুত্রের ওপারে শীতের ফসলের সবুজ মহিমা, আরো দূরান্তরে নিবিড় গাছপালা। সম্ভবতঃ ওদিকে গ্রাম। আশ্রমের পাট চুকলে, একদিন নদের ওপারে যেতে হবে। কিন্তু এখন আমার সমস্ত মন জুড়ে পবিত্রী মায়ের কথাগুলোই ঝংকৃত হচ্ছে। জগতের পায়ে ফুল দেওয়ার মধ্যে, পূজা রহস্য কী আছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সহসা আমার ডানদিকে, ছায়া পড়তে, চমকে মুখ ফেরালাম। জগত এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর দৃষ্টিও ব্রহ্মপুত্রের দিকে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করতেই, তিনি বললেন, 'উঠছেন কেন, বসুন।'

তথাপি আমি উঠে দাঁড়ালাম, কারণ মনে অস্বস্তি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি চলে এলেন?'

জগত বললেন, 'হ্যাঁ, মায়ের আদেশ। আপনার সঙ্গে গল্প করতে পাঠালেন।'

সকলই রহস্যময়, পবিত্রী মায়ের এই আদেশও। আমি জগতের চুলে জড়ানো জবাফুলের দিকে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'পবিত্রী মা কি আমার ওপর সত্যি বিরক্ত হয়েছেন?'

জগত তাঁর আয়ত চোখে বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

বললাম, 'আপনাকে ফুল দিয়েছি বলে?'

জগত হাসলেন, বললেন, 'মাকে আপনি চিনতে পারেননি দেখছি। তিনি আপনাকে খুব ভালোবাসেন। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। চলুন না, ওদিকে যাওয়া যাক।'

তিনি মন্দিরের গা ঘেঁষে, সামনের সরু পথের দিকে দেখিয়ে আবার বললেন, 'ওদিকে গেলে আরো ভালো করে সব দেখতে পাবেন। আসুন।'

জগত নিজেই এগিয়ে চললেন। দেখলাম, তাঁর খালি পা। অলতা পরেননি, কিন্তু গোড়ালি যেন রক্তিম। আমার পায়ে স্যাণ্ডেল। তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। ভুবনেশ্বরীর পিছন দিকে যেতেই, ব্রহ্মপুত্র আর শহর, সবই বাধাহীন ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আমাদের নিচে দিয়েই, একটি পায়ে-চলা চওড়া রাস্তা বাঁক নিয়েছে।

আমি জগতের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, পায়ে ফুল দেওয়ার বিষয়ে, পবিত্রী মা মর্ম আর মন্ত্রের কথা কী বলছিলেন?'

জগত আমার চোখের দিকে তাকালেন, একটু গম্ভীর হলেন, তারপরে বললেন, 'সেই অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের সংকেত দিচ্ছিলেন।'

বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন এই সংকেত?'

জগত আবার আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'মাকেই জিজ্ঞেস করবেন, সম্ভব হলে, তিনিই বলবেন। আমার কোনো অধিকার নেই!'

আমি সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

জগত বললেন, 'আমি এখনো শুদ্ধি সিদ্ধি—কিছুই পাইনি, তা-ই। বসা যাক।'

বলে তিনি একটি পাথরের ওপর বসলেন, এবং আমাকে বললেন, 'বসুন।'

আমি দেখলাম, তাঁর পায়ের কাছে একটি পাথর রয়েছে, আমি তার ওপরে বসলাম। একটা ব্যাকুলতা যে অনুভব করছি, কোনো সন্দেহ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'শুদ্ধি বা সিদ্ধিটা কী?'

জগত বললেন, 'শুদ্ধি হয় সিদ্ধপুরুষের দ্বারা, কানে মন্ত্র নিয়ে। সিদ্ধি সাধনায়।'

'কে আপনার কানে মন্ত্র দেবেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

জগত আবার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আমার চোখে, বললেন, 'যিনি আমাকে শক্তিরূপে পূজা করবেন।'

আমি এখন অনেকটা আত্মসম্মোহিত, জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তিনি?'

জগত একটু হাসলেন, এবং তাঁর দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা ফুটলো। বললেন, 'জানি না, এখনো তাঁর দেখা পাইনি। তখন আমার পূর্ণ সাধনা শুরু হবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কি অমাবস্যায় চাঁদের উদয়?'

'হ্যাঁ।' জগত চোখ বুজলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন আপনাকে কি কিছু করতে হয়, আপনার সাধনার জন্য ?'

জগত বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'কী করতে হয় ?'

'নাড়ির বায়ুকে সূক্ষ্ম করার সাধনা করতে হয়।' জগত বললেন।

আমি জগতের চোখের দিকে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলাম। তাঁর চোখ আমার প্রতি নিবদ্ধ। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তাঁর চোখ, দেহের ত্বক, সকলই সাধারণের অপেক্ষা অত্যুজ্জ্বল। বললাম, 'মহিলাদেরও যে এ সব করতে হয়, আমি ভাবিনি।'

জগত বললেন, 'প্রকৃত সাধক সাধিকা, সবাইকেই করতে হয়।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?'

জগত হেসে বললেন, 'করছেনই তো।'

আমি একটু বিব্রত হলাম। তিনি বললেন, 'কী জিজ্ঞেস করছেন ?'

বললাম, 'আচ্ছা, যে-সব নাড়ির কথা শুনি, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এ সব আমরা কিছুই টের পাই না। আপনি কি তা পান ?'

'পাই। তার জন্য গুরুর প্রয়োজন, তিনিই সব বুঝিয়ে দেন, শিখিয়ে দেন। একলা কিছুই হয় না।' জগত বললেন।

'কে আপনার গুরু ?'

'মা-ই এখন আমার গুরু।'

'পবিত্রী মা ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার গর্ভধারিণী মা কোথায় থাকেন, আর আপনার বাবা বা আর সবাই ?'

জগতের ভুরু একবার কোঁচকালো, বললেন, 'তাঁরা ফরিদপুরে আছেন। তাঁদের সঙ্গে এখন আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তাঁরা আপনাকে ছেড়ে দিলেন ?'

'ছাড়বেন কেন ? তাঁরা আমাকে সাধনার পথে যেতে দিয়েছেন।'

'কেন আপনি এ পথে এলেন ?'

জগত বললেন, 'তার কারণ, আমি এই সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি, তার বেশি কিছু বলতে পারি না।'

'আপনি কি কুমারী ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জগত যেন একটু অবাক হলেন, কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না, বললেন, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

বিব্রত হেসে বললাম, 'নিতান্ত কৌতূহল, অন্যায় করিনি তো?'

জগত মাথা নাড়লেন, কিছু বললেন না। আমি বললাম, 'পবিত্রী মাকে আমি ঠিক বুঝি না।'

'কী বুঝতে চান?'

'তিনি কী, কে?'

'তিনি একজন উত্তরসাধিকা।'

'উত্তরসাধিকা কাকে বলে।'

'যিনি সাধকের সিদ্ধিলাভের সহায়, তিনি উত্তরসাধিকা। কালী যেমন শিবের উত্তরসাধিকা।'

আমি সঠিক কিছু বুঝেত পারলাম না। জগত বললেন, 'এবার উঠবেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'পূজা হয়ে গেছে?'

জগত বললেন, 'এখনো একটু সময় লাগবে।'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনাকে একটা অনুরোধ করবো।'

জগত তাকালেন আমার দিকে। বললাম, 'আপনার একটা গান শুনতে ইচ্ছা করছে।'

জগত নিষ্পলক চোখে যেভাবে নিরুত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আমি মনে মনে উৎকণ্ঠিত হলাম। কিন্তু জগতের সেই মহিমময়ী স্বর এবার সুরে ধ্বনিত হলো—

'মুক্তকেশীর কেশপাশে
যে পড়েছে প্রেমের ফাঁসে।
তার সকল মুক্তি ঘুচে গিয়ে
বন্ধন হয় ওই চরণতলে।'

ভৈরবী সুর, প্রতিটি সূক্ষ্ম কাজ যেন দানা বাঁধা। আমার দৃষ্টি পড়লো তাঁর চুলের দিকে। জবাফুল দুলছে, সর-বিনুনীর লতায়। জগত গেয়ে চললেন,

'কেউ কি চুল দেয়নি বেঁধে?
কোথা যাও এমন বেশে?
না হয় থাকবো বন্দী হয়ে
তোমার ওই চরণতলে।

তবু আয় মা তোকে হৃদে রাখি
হৃদয় তাপে জ্বলে মরি
বক্ষ চাপি চরণতলে।'

দেখছি, জগতের চোখ মুদ্রিত, দুই কোণে জলের বিন্দু চিকচিক করছে। আমি কখনোই সাধন-ভজনের মানুষ না, বিপরীত আমার পরিচয়। তথাপি, গান শুনে কেবল মুগ্ধ হই না, জগতের চোখের জলের স্রোত যেন আমার বুকে বহে। আমি আত্মবিস্মৃত হই, না কি সম্মোহিত, একটা ঘোরের মধ্যেই যেন, আমার হাত তাঁর পা স্পর্শ করে। গান থেমে যায়, তথাপি, জগত চোখ খোলেন না, আমি কোনো কথা বলতে পারি না। একটা পাখি ডাকছে কোথা থেকে শিস দিয়ে।

আমিও চোখ বুজেছিলাম, কাঁধে স্পর্শ পেয়ে চোখ মেললাম। দেখলাম, জগতের হাত আমার কাঁধে। মুখে হাসি, বললেন, 'ভাবের ভাবী, চলুন এবার যাই, মায়ের পূজা বোধ হয় শেষ হলো।'

তিনি শিলাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রে প্রাণতোষবাবার সেই ঘরে ডাক পড়লো। সারাদিন সেখানে একবারও ডাক পড়েনি। পবিত্রী মা এবং জগত, সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। আমার খাওয়া বা আদর-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হয়নি। জগতের কাছে শুনেছি, প্রাণতোষবাবা আজ সারাদিন তাঁর ঘরে পূজায় ব্যস্ত। সেখানে পবিত্রী মা এবং জগত ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার ছিল না। দিনের বেলা কিছু নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমার সব থেকে ভালো লেগেছে করালীকে। মনে করেছিলাম, সে বুঝি বোবার তুল্য নির্বাক। আজ বিকেলে তাকে ভিতরের উঠোনে নাচতে গাইতেও দেখেছি। তবে, কিছু কিঞ্চিৎ দ্রব্যগুণ বোধ হয় ছিল, অর্থাৎ কারণবারি। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তা-ই বলে। আমাকে একবার বললো, 'আর ঘরে ফিরে গিয়ে কী করবেন? বাবা তো আপনাকে ছেলের থেকেও বেশি দেখছেন। এখানেই থেকে যান।'

আমি বললাম, 'কী হবে থেকে? তুমিও তো রয়েছো।'

করালী কপাল চাপড়ে বললো, 'আমার সঙ্গে আপনার কথা? আমি হলাম বাবার কুত্তা, তাতেই এ জীবনটা তরে যাবে।'

আমি আবার এতটা কখনোই ভাবতে পারি না। অন্ততঃ সারমেয় হয়ে থাকার কথা ভাবতে পারি না। আমার পথেই আমি যাবো।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে, কামাখ্যার মন্দিরে গেলাম। সেখানেও পূজা আরতির উদ্যোগটা আজ বেশি। জগত বলেছিলেন, আজ শনিবার, এবং অমাবস্যা। এদিনে বিশেষ পূজা হয়। মন্দির থেকে ফিরতেই, সামনের ঘরে পবিত্রী মায়ের সঙ্গে দেখা। প্রায় ঝাঁপিয়ে এসে আমার গালে একটি আলতো চড় বসিয়ে দিলেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'না বলে কোথায় যাওয়া হয়েছিল, শুনি?'

বললাম, 'একটু মন্দিরে গেছলাম।'

'ওদিকে বাবা ভাবের ভাবীর খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন।' পবিত্রী মা বললেন, 'চলো তাড়াতাড়ি। কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

আমার বুক কেঁপে উঠলো। সকালের সেই প্রহারের চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু অন্যায় করেছি?'

'করোনি?' পবিত্রী মা যেন ফুঁসে উঠে বললেন, 'আমার ঘরের সেই কালীমূর্তির মানে জিজ্ঞেস করেছিলে, মনে আছে?'

মনে পড়লো। ভুবনেশ্বরীর মন্দির থেকে ফেরার পথে, তাঁর ঘরের সেই শিব-কালী চিত্রের বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'সব কথা জানতে চাস কেন রে মুখপোড়া, আমি তোর কে? তুই বা আমার কে? বাপের ছেলে, বাপকে জিজ্ঞেস করিস।'

অর্থাৎ প্রাণতোষবাবাকে। পবিত্রী মা ডাকলেন, 'এখন এসো।'

আমি তাঁকে অনুসরণ করে প্রাণতোষবাবার ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। অবাক চোখে দেখলাম, জগত চোখ বুজে বসে আছে। প্রাণতোষবাবা বুকে হাত রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। পবিত্রী মা আস্তে আস্তে প্রাণতোষবাবার কাছে গিয়ে বসলেন, ডাকলেন, 'বাবা!'

প্রাণতোষবাবা তৎক্ষণাৎ স্থির হলেন, কান্না সংবৃত হলো, জবাব দিলেন, 'মা!'

জগত চোখ খুলে তাকালেন। প্রাণতোষবাবার খালি গা, কামাখ্যা পাহাড়ের এই দারুণ শীতে, এবং তাঁর সর্বাঙ্গ যেন অধিকতর লাল। তিনি চোখ খুলেই বললেন, 'জগতের গান শুনতে শুনতে আজ আমার প্রাণ যেন নেচে নেচে উঠছে।'

এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, জগতের দুই গালে অশ্রুর দাগ। পবিত্রী মা বললেন, 'তা আমি আগেই বুঝেছি। আপনার ভাবের ভাবীরও তো সেই অবস্থা।'

প্রাণতোষবাবা বললেন, 'সে কোথায় ?'

'এই তো এসেছে। কামাখ্যা দর্শনে গেছলো।' পবিত্রী মা বললেন।

প্রাণতোষবাবা চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। আরক্ত চোখ, তাঁর ঠোঁট দুটিও টকটকে লাল। এখন পবিত্রী মায়ের ঠোঁটেও তাম্বুলের রক্তাভা। প্রাণতোষবাবা হাত তুলে ডাকলেন, 'আয়, এদিকে আয়।'

আমি তাঁর কাছে যেতেই, এক হাত ধরে টেনে বসালেন। আমি একবার মাটিতে পোঁতা ত্রিশূলটার দিকে দেখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই মায়ের ঘরের কালীমূর্তির কথা জানতে চেয়েছিলি ?'

আমার গলায় স্বর ছিল না, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম। তিনি বললেন, 'কী মূর্তি কী ভাবে দেখেছিস ?'

আমি ভয়ে ভয়ে বর্ণনা দিলাম। তিনি বললেন, 'তারপরে আর জানবার কী আছে ? বিপরীত বিহার বুঝিস ?'

আমার কানে যেন তরল আগুনের স্রোত নামলো, বললাম, 'শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'তবে আর কী ? ঘোর শ্মশানে নাচছে শ্যামা, শব শিবাসনে। শিবের তখন নির্বাণাবস্থা, পরম সাম্য, সেই পরমপুরুষ, প্রকৃতির সঙ্গে মিলনে, অমাবস্যায় চাঁদের আলোর ঢেলখেল হচ্ছে। বুঝতে পারলি ?'

জবাব দিতে সাহস পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি না। তিনি নিজেই বললেন, 'বুঝতে পারিসনি। আচ্ছা শোন ভাবের ভাবী, তন্ত্রসাধনের মূলে আছে লতাসাধন। লতাসাধন কী ? প্রকৃতিসাধন। প্রকৃতি কে ? শক্তি। শক্তি কে ? নারী। মা। অনেকে বলে, এ সাধন বেদে নেই। মিথ্যা কথা। উপনিষদে লতাসাধনের কথা বলা হয়েছে, মূর্খেরা তা বোঝে না। আরো একটা কথা। আমার কপালের এই সিঁদুরের ফোঁটার নাম কী জানিস ?'

বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'বিন্দু। বিন্দুর আসল পরিচয় হলো পুরুষ বীর্য। তোর তো নাকি এর মধ্যেই ছেলেমেয়ে হয়েছে ?'

বললাম, 'হয়েছে।'

'তাহলে তো বীর্যের কী ফল তা জানিস।' প্রাণতোষবাবা বললেন, 'ওটাকে বলে বিন্দু পতন। আমার ধর্ম হলো বিন্দু সাধন, অটল স্থির বিন্দুর সাধন। অনেকে বলে, তন্ত্রে বিন্দুপাতের সমর্থন আছে। ওটাও ভুল। দেহ সাধনায় ওর স্থান নেই। তাহলে আর নাড়ির বায়ু শুদ্ধির কী দরকার ? ওই

শোধনের দ্বারাই, হাঁস যেমন জল শোষে, সাধক তেমনি মূলাধার থেকে উত্থিত যে দণ্ড, তা দিয়ে সব শোষণ করে। রজঃ বুঝিস?'

বললাম, 'রক্ত।'

'কিন্তু তোর আমার রক্ত না, পশুর রক্তও না।' প্রাণতোষবাবা বললেন, 'রজঃস্বলা স্ত্রীর রক্ত। আমরা অবিশ্যি তাকে পুষ্প বলি। তোকে তো আমি সব বোঝাতে পারবো না, তুইও বুঝবি না। সেদিন তোকে বস্তুর গুণগত পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম না?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'বস্তুর গুণগত পরিবর্তনের আর এক ব্যাপার হলো, কেমিক্যালের বিষয়। কেমিস্ট্রির কিছু জানা আছে?'

বললাম, 'না।'

'আমিও তোকে কেমিস্ট্রি বোঝাবো না।' তিনি বললেন, 'একটা তুলনা দেবো। কোনো একটা বস্তু তৈরি করতে হলে, একটা টোটাল বস্তু, তাতে অনেক কিছু মেশাতে হয়। যেমন ধর ওষুধ, কাগজ, এমন অনেক কিছু। তেমনি, আমাদের শরীরেও এমন অনেক কিছু নিতে হয়, যাকে কেমিক্যাল এ্যাকশন বলা যায়। যেমন ধর, মদ, মাংস। এ সব সাধারণ জিনিস। মূত্র বিষ্ঠা রজঃ বীর্য কোনো কিছুতেই আমাদের বিধিনিষেধ নেই। এতেও শরীর শোধন হয়। কিন্তু কী কারণে এ সব? অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের জন্য। বাউলদের বিষয় কিছু জানা আছে?'

বললাম, 'গান শুনেছি।'

'গান শুনে কিছু বুঝতে পেরেছিস?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে আর গান শুনে কী হবে? ওদের গানেই সব কথা আছে। ওদেরও প্রকৃতি সাধন আছে। ওরা দমের কথা বলে, গাঁজার নাম করে। আসলে প্রাণায়াম রেচক কুম্ভকের কথাই বলে। আর কী বলে জানিস?' বলেই তিনি অনেকটা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলেন, 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না। তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা?'

বলতে বলতেই তিনি চোখ বুজলেন, আর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। পবিত্রী মা তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ে হাত দিলেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মা।'

দেখলাম জগত মুদ্রিত চোখে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। আমি অনুভব করলাম, তিনি যা বলছেন, তা অনেকটা গভীর মন্ত্রের মতো। আমার অনুভূতি, শ্রুতি, সকলই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আবার বললেন, 'সেদিন তোকে মূলাধারের কথা বলেছিলাম। ওই মূলাধার থেকে সব কিছু নিয়ে আমি উজানে চলি। কে আমাকে নিয়ে যান? আমার এই মা। মৈথুন হলো একটি পন্থা। আমার কুণ্ডলিনী শক্তি, তাঁকে আমি জাগাই আমার নাড়ির ভেতরের আগুন দিয়ে। কিন্তু এ সব করতে হলে কী চাই? প্রেম। প্রেমের কথা আগেই বলেছি, সেজন্য মাকে পূজা করি। মায়ের সারা শরীর পূজা করি, তাঁর ইচ্ছা অনুমতি আর উল্লাস ছাড়া, কুণ্ডলিনী শক্তিকে আমি জাগাতে পারি না। এবার আমার বিন্দুকে আমি নাড়ির সাধনের দ্বারা উজানে তুলি। যখন তা আমার শিরে—আজ্ঞাচক্রে ওঠে, তখন ভাবোল্লাস হয়। ওই ভাবোল্লাসই অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। কিছু বুঝলি?'

আমিও চোখ বুজেছিলাম, বললাম, 'একটা অনুমান করছি।'

'ঠিক বলেছিস, ভাবের ভাবী, এর বেশি সাধক ছাড়া হয় না।' তিনি বললেন, 'তবু বলি, তোর চাঁদ বাইরে দেখা যায়, তারা তোর ছেলেমেয়ে। আমার চাঁদ অটলে ভাসে। সে অলক্ষ্যে জ্যোৎস্না ছড়ায়, দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।'

বলেই তিনি সামনে যে রূপার একটি ছোট কলসী ছিল, সেটি তুলে গলায় কিছু ঢাললেন। আমার ঘ্রাণে মদিরার গন্ধ পেলাম। রূপার কলসটি দেখে আগে কিছুই বুঝতে পারিনি। কলসী নামিয়ে রেখে আবার বললেন, 'ভাবের ভাবী, যদি কোনোদিন কোনো ভাব আসে, তাহলে এ সব কথা স্মরণ করিস।'

বলে চোখ বুজলেন। সকলের চোখই মুদ্রিত, এখন আমি ছাড়া। প্রাণতোষবাবা বললেন, 'মা জগত, একটু তাঁর কথা শোনা।'

জগত সেই মহিমময়ী স্বরে গেয়ে উঠলেন—

'বেদের সেই বেদের মেয়ে
তন্ত্রে মহাযন্ত্র মাঝে,
মহামন্ত্রে গান ধরিয়ে
তালে তালে নাচিতেছে।'

প্রাণতোষবাবা উল্লাসের ধ্বনিতে শব্দ করলেন, 'মা মা মা।'...

জগত আবার সুর বদলালেন, তাঁর গানের ভাষায় ছন্দেরও পরিবর্তন হলো। স্বর যেন সপ্তমে তুলে, কোকিলকণ্ঠে গাইলেন—

শ্যামা ত্রিভঙ্গিনী।
অলস আবেশে খল খল হাসে
একাকিনী তবু সমর-রঙ্গিনী।
প্রেমে টলমল অরুণ কমল
মদে ঢলঢল ত্রিনয়নী।

সকলের চোখের জল ও ভাবাবেগ যে আমার মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে, তা বলতে পারি না। কারণ জগতের গান শুনে, আমার ভাবান্তর আগেও হয়েছে, এখনো তেমনি হচ্ছে। কিন্তু জগতের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না, তাঁকে দেখে যেন ভাবোল্লাসে লীলাময়ী মনে হচ্ছে। তিনি হাত না নেড়ে, মাথা না দুলিয়ে, স্থির হয়ে গান করছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে, সুরের তরঙ্গ তাঁর সারা শরীরে। গাইছেন—

এ কি মত্ত মাতাল
উথাল-পাথাল
করলি আমায় উন্মাদিনী,
গলিত দশনে, দলিত বসনে
মধুর হসনে মন্মোহিনী।'…

প্রতিজ্ঞা ছিল যে মনে, যাবো নির্বাসনে। অরণ্যে না। বনের গভীরে নিবিড়ে, ছায়াঘন অন্ধকারে, ঝিঁঝি ডাকা নিঝুম প্রহরে না। যেখানে কোন্ আড়ালে থেকে, পাহাড়ী ঝরণা কুলুকুলু বহে, বাজে কোন্ এক অপ্রাকৃত অনাদিকালের ছর্বোধ্য গানের সুরে, নির্বাসনে যাবো না সেখানে।

নির্বাসন কি কেবল বনবাসেই হয়? অথবা নির্জন পাহাড়ে? কিংবা সমুদ্রের ছায়াহীন দূর বালুচরে? নির্বাসন যদি অনিবার্য হয়, সে কি পটলডাঙার অন্ধ গলির রুদ্ধ ঘরে সম্ভব না? অথবা শ্যাওলা ধরা, ঘিঞ্জি বাড়ি ঠাসা চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই-লেনে।

নির্বাসন তো মনেও সম্ভব। মন নিয়ে যাও বনে। মন চালান দাও পাহাড়ে সমুদ্রে, যে কোনো নির্জনে। মনকে বলো, মন চলো যাই নির্বাসনে। সব ছেড়ে, সমাজ সংসার বন্ধু, যতো ভালো লাগা ভালোবাসা, নিবিড় করে নিয়ে থাকা, আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছায় উদ্বেল পাওয়া না পাওয়া, সব কিছু ছেড়ে, মন নির্বাসনে থাকো। বধির হও, অন্ধ থাকো, অনুভূতিকে রাখো মুড়ে জড়ত্বের কাঁথায়। যা শোনবার জন্য শ্রবণ উন্মুখ, তা শুনি না। যা দেখবার জন্য চোখ ব্যাকুল, তা দেখি না। অনুভবের নাম হোক অচল নগর। সেখানে হাসি কান্না, সব খেলা বন্ধ। কাজ অকাজের সব পাট চোকানো।

এই হবে মনে মনে নির্বাসন। জলে থেকেও জল ছোঁয়া নেই। চার দেওয়ালের চারিদিকেই অরণ্য পর্বত সমুদ্র। মাথার আচ্ছাদন আকাশ। নির্জন নির্বান্ধব, আমি বসে আছি একাকী। মাইকেল এঞ্জেলোর সেই চিত্রটি ভাসছে চোখের সামনে। একাকী নগ্ন পুরুষ বসে আছে পাহাড়ের কোলে, নির্বাক গম্ভীর, গভীর দৃষ্টি বহু দূরে। কিন্তু সে কি নির্বাসিত? না। আমি

নির্বাসিত। কালকূট। নির্বাসিতের এই নাম ভালো। তীব্র বিষ, আমি গরল, আমি হলাহল। আমার সবই বিষে ভরা। আমার সারা জীবন কেবল, 'হা অমৃত!' করে ফেরা। এই যে নির্বাসনে যাওয়া, এই যাওয়াও তা-ই। নির্বাসন—অমৃতের তিরাষায়।

কিন্তু দেখছি, মন বে-বহাল। নিজের ওপরে তার ভরসা নেই। মন ভীরু। মন চলো যাই নির্বাসনে, এ কথায় বুকে জোর মিলছে না। জলে থেকেও জল না ছোঁয়ার, সাধকের সেই শক্তি আমার নেই। চার দেওয়ালে দেখছি, অরণ্য পর্বত সমুদ্রকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, সমাজ সংসার লীলা করতে চাইছে। ও সব আলগা বেড়ার যুক্তি, ছেঁদো কথার আঁটাসাঁটি। হলেও বা স্বেচ্ছা নির্বাসন, মনে মনে তা সম্ভব নয়। এমন কি পটলডাঙা, চাঁপাতলা ফার্স্ট-বাই লেনেও ভরসা নেই। মনে হচ্ছে, আমার নির্বাসনের সব বাঁধন চুরমার করে, অন্ধ-গলি কলকলিয়ে গোটা কলকাতা হয়ে উঠবে। যে-আমি, সে-ই আমি, আমার সকল কামনা বাসনায় ভেসে যাব।

অতএব যাকে বলে গতর নাড়ানো তাই করতে হবে। দেশান্তরী হতে হবে। মনে মনে হবে না। দেশে আর ঘরে বসে হবে না। এটা চোরা মনের সিঁদ কাটা। নির্বাসনের ভয়ে ফাঁক খোঁজা। একটু আধটু চিনি তো। নিজেকে ধরার জন্যে, নিজেরই ফাঁদ পাতা। একে বলে মনের কুহক। এই কুহকে না পড়াই ভালো। নিজের আসনটির বড় গুণ আছে। সহজে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। নিজের ঠাঁইয়ের একটা মোহ আছে। নেশাও বলা যায়। তাকে ঘিরে যে অনেক রাগরঙ্গ থাকে। সেই রাগরঙ্গের লিপ্সা ভারি টাটানো লিপ্সা। সহজে ঠাঁইনাড়া হতে ইচ্ছা করে না। তখন জোর করতে হয়। নিজেকে নিজেই ঠেলতে হয়, চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। চলো চলো চলো।

কোথায় যাবো। সেটা একটা ভাববার বিষয়। মেঘ যেমন দেশান্তরী হয়, আমি তো সে রকম ভাবে দেশান্তরী হতে পারবো না। মেঘের কথাটাই প্রথমে মনে এলো। এ বছরটা যেন মেঘেরই বছর। আকাশের দিকে যখনই তাকাই মেঘ আর মেঘ। কেবল ঝির ঝির ঝির ঝির। এ বছর যেন বৃষ্টির বছর। হয় বৃষ্টি নয় মেঘ। মেঘ দেখে দেখে মেঘের কথাই মনে এলো। মেঘ কোথাও বাসা বাঁধে না। সে চির দেশান্তরী। তার ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে, এক সময় হঠাৎ হুস করে একটা নিশ্বাস পড়ে। মন উদাস হয়ে যায়।

তার বুকের কাছ ঘেঁষে যখন ঘর-বিবাগী পাখিটাকে মন্থর পাখায় উড়তে দেখি, তখন তো কেমন যেন বুক টাটিয়ে ওঠে।

না, মেঘের মতো দেশান্তরী হতে পারবো না। দেশান্তরী নিজের মতো। দেশান্তর নির্বাসনের। চোখের সামনে ভাসছে একটি পাহাড়ের রেখা। আকাশের গায়ে ঠেকানো। সে পাহাড় কখনো কাছে, কখনো দূরে উধাও। ধুলোর মতো রঙ নিয়ে যেন চলে গিয়েছে কোন্ মরুভূমির বুকে। কখনো তার রঙ ধূসর। কখনো বা, কাছে থেকে, হঠাৎ সে সবুজ হয়ে উঠেছে। সেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক নগর। নগর সেই পাহাড়ের পায়ে পায়ে। নগরের একটা অংশ, সেই পাহাড়েই ঘেরা।

কী নাম সেই নগরের? মনে আসছে, মুখে আসছে না। রূপনগর নাকি? তা বললে তো, সব নগরই রূপনগর। সব নগরেই নানান রূপ। আমার চোখের সামনে যে নগর ভাসছে, তারও অনেক রূপ। তবে, সে নগরের ঠাট বাট, সবই আলাদা। সে নগর এমন নগর, নাম দেওয়া যায় তিলোত্তমা। আজ বলে না, কত শত বছর হয়ে গেল, তার হিসাব মিলবে ইতিহাসের পাতায়। সেই যবে থেকে, সারা দেশ থেকে তিল তিল রূপ নিয়ে সেই নগরকে তিলোত্তমা করা হয়েছে। শুধু বলতে পারবো না, সেই তিলোত্তমার মধ্যে কখনো প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে কী না।

মৌচাকের কি প্রাণ থাকে। যতক্ষণ চাকের মণিকোঠায় মক্ষীরাণীর বাস, মৌমাছিদের মধু চাষ, ততক্ষণ সে মধুভাণ্ড মাত্র। জিভে ছোঁয়ালে স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণের স্পর্শ? সে তো জিভ দিয়ে আস্বাদ করা যায় না। হাত দিয়ে ছুঁয়ে তাকে পাওয়া যায় না। প্রাণের স্পর্শ প্রাণে প্রাণেই পাওয়া যায়।

কে জানে, সেই নগরের প্রাণ আছে কী না। কে জানে, সেই নগর কেবল একটি মৌচাক কী না, সেখানে প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধা, নিয়মের দাস, মৌমাছিরা কেবল মধু সঞ্চয় করে চলেছে। প্রাণ আছে কী না, সেই খোঁজেই বা আমার দরকার কী। আমি যাবো নির্বাসনে। নিষ্প্রাণ পুরীই আমার ভালো। যেখানে রূপ আছে, কিন্তু রূপের উৎস যে অরূপ, তার জ্যোতি কি আছে। রঙ আছে, কিন্তু সৃষ্টির উল্লাসের যে ঝলক, তা কি আছে। চোখের এই ভেসে ওঠায় তা দেখতে পাচ্ছি না। কেবল দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের প্রাচীর টানা নগরের বুকে বহু সাম্রাজ্যের ভাঙা গড়ার ইতিহাস। অনেক সাক্ষী তার গোটা শরীর জুড়ে। সেই সব সাম্রাজ্যের

ইতিহাস পেরিয়ে, এখন সে নতুনতর রূপে সাজছে। সেজে উঠেছে অনেকখানি। ময়দানবের প্রকাণ্ড কাণ্ডের ছাপ যেমন আছে, তেমনি আছে বিশ্বকর্মার কলা কারুমিতির নিপুণ রেখা। মৌমাছিরা নিরলস। চাক দিনে দিনে বড় হচ্ছে।

এই ঠিক জায়গা। নির্বাসনের উপযুক্ত। নিরলস কর্মীদের স্রোতে, আমি অচিন শ্যাওলা, ভেসে যাবো, অথবা স্থির এক ধারে, নিঃশব্দ। মানুষ আছে, পরিচয় নেই। আলো থেকেও অন্ধকার। এই ঠিক নির্বাসিতের নগর।

নির্বাসনের যাত্রাটা মন-কেমন-করায় ভরা। জলের মাছ যেন ডাঙায় চলেছে। মনের এই বিষণ্ণতাকে বাড়তে না দিয়ে, একটু আশেপাশে ফিরে তাকানো ভালো। চলেছি তো রেলগাড়িতে। আকাশে ওড়া বিমানের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বন্ধ কামরা। দরজার মাথায় লাল অক্ষরে জ্বল-জ্বলানো: ধূমপান নিষেধ। যন্ত্রে ভেসে আসে পুরুষের গলা, 'শুভ বৈকাল।' এ কণ্ঠস্বরকে ঠিক যেন মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। এক অদ্ভুত সুরের সুরহীন যান্ত্রিক গলা। সে সুরে, আর যা-ই হোক, মানুষ তার নিজের মনের প্রাণের কথা বলতে পারে না। নিতান্ত যন্ত্রের কাজ ছাড়া। সেই কণ্ঠস্বরই জানিয়ে দিল, যাত্রীদের কর্তব্য, যেটা সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক, ধূমপান করতে হবে এই ঠাণ্ডা কুঠুরীর বাইরে। জানা গেল, যখন যা খাবার, তা পাওয়া যাবে নিজের আসনে বসেই। এ গাড়ি বন্ধ খাঁচা। যাত্রীদের একবারের তরেও বাইরে যাওয়া দরকার হবে না। গায়ে এতটুকু ধুলা লাগবে না। বাইরের বাতাস গায়ে মাখা চলবে না।

তবু রক্ষে, রঙীন পর্দা সরালে, বন্ধ কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। দেখতে পাচ্ছি, আমার সঙ্গে, উত্তরের সঙ্গী মেঘেরা আকাশে ভেসে চলেছে। পশ্চিমের গায়ে লাল রঙের ছটা। কামরার মধ্যে এখন চেনা গলায় গান বাজছে, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে…।' ভিতরে নিয়নের আলো, বাইরে মেঘ চাপা লাল ছায়া ছায়া আলো। পাখিরা বাসায় ফিরছে। এমন সময়ে, এ গানটা কার মনে দোলা দিচ্ছে বুঝতে পারছি না।

আমার পাশে যিনি বসে, তাঁর গালের এক দিক ফুলে আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে জর্দার সুগন্ধ থেকেই টের পাচ্ছি, ফোলাটা আঘাত না। গালের মধ্যে তাম্বুলের বসত। কোন্ প্রদেশের মানুষ, অনুমান করতে

পারছি না। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি ইংরেজি ম্যাগাজিনে চিত্রতারকাদের রঙীন ছবি দেখছেন। কোনো 'মণিহার' তাঁকে সাজে কী না, মনে হয় না, সে রকম কোনো চিন্তা তাঁর মাথায় আছে।

আমার বাঁ দিকের পিছনের সীটে, দুই মহিলা এক পুরুষ তাস পেড়ে নিয়ে বসে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে হাসি কথাবার্তাও চলেছে। একেবারে পাশাপাশি যাঁরা, তাঁরা বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী। নজর বলছে, নব বিবাহের রঙ দিয়ে যেন মোড়া। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের দিকে ফেরা। স্ত্রীর অগোছালো বেণীটি স্বামীর আসনের হাতলে রাখা হাতের ওপর পড়ে আছে। গায়ে গা ঠেকানো। কথার স্বর মৃদু, একজনের মুখে লাজে লাজানো হাসি আর একজন কেবল মুগ্ধ। কোন্ মণিহার কাকে সাজে, সে হিসাব নিকাশের কথা কেউ ভাবছে বলে মনে হয় না।

অনেক মহিলা, অনেক পুরুষ, নানা বয়সের। কেউ শিশু নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা অন্য কারোকে নিয়ে। কিংবা কেবলি কথা আর হাসি। গান বেজে যায় গানের মনে। কেবল আমি শুনছি নাকি। কিন্তু জানি, এ গান আমার মনে দোলে না। কারণ, কোনো মণিহারই আমাকে সাজে না।

গান বাজুক, কিন্তু মনটা একটা কারণে দু'বার চমকে উঠেছে। একটু বিমনাও হয়েছি। একটি চেনা মুখের চমক। সে আমার এই কামরার যাত্রী না। তাকে এই কামরার ভিতর দিয়ে একবার পিছন দিকে হেঁটে যেতে দেখেছি। দেখেও মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলুম। আমার এই নির্বাসনের যাত্রায় কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করেনি। তবু তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। কথা বলিনি, সেও বলেনি। মনে মনে লজ্জা করেছিল। পরে আবার সে এই কামরার ভিতর দিয়েই ফিরে গিয়েছে। সে আমার দিকে তাকায়নি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সে আমাকে দেখে গিয়েছে। তার সারা মুখে যেন একটা উৎপীড়নের চিহ্ন, চোখে দুশ্চিন্তা। অনেক দিন আগে, তার হাসি ঝলকানো মুখটা মনে পড়ে গেল। খুব মিষ্টি ছিল ওর হাসিটা। এখন যেন মুড়িয়ে গিয়েছে। যাকে বলে স্বব, ও তা-ই কী না, আমি জানি না। তবে পাণ্ডিত্য আছে।

মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার ঘনায়মান। আমি কামরার বাইরে গেলাম, ধূমপানের তৃষ্ণা পাচ্ছে। বাইরে এসে দেখলাম, আরো কয়েকজন একই কারণে। চার পাশে ধোঁয়া নিবিড়। সিগারেট ধরাতে

গিয়ে চোখে পড়ল, করিডরের ওপাশে, অন্য কামরার দরজার কাছে, সে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খাচ্ছে। আমার দিক থেকে সযত্নে চোখ ফিরিয়ে রাখলো।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

যেন নিরুৎসাহ, অনিচ্ছার স্বরে জানালো, 'শেষ পর্যন্ত যাবো।'

'একা?'

'না, ছেলে আছে সঙ্গে।'

'বেড়াতে?'

'পালাতে।'

একটু অবাক হলাম। ও কিন্তু রহস্য করে হাসছে না। মুখের চেহারাটা যেন আরো থমথমিয়ে উঠলো। তারপরে আশেপাশে একটু দেখে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললো, 'ঘাতকের তাড়া খেয়ে।'

'ঘাতক?'

'খুনী যাকে বলে। ওরা আমার ছেলেকে খুঁজছে।'

'তোমার ছেলে!'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে আছে, জানো না?'

আবার অবাক হতে হলো। জিজ্ঞেসা করলাম, 'কত বড় ছেলে?'

'ষোল সতেরো বছর হবে।'

সত্যি জানা ছিল না। এখনো, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে, এক বিকালে, ওর আর ওর প্রায় বালিকা বধূর ছবিটা ভাসছে। নিজেই বলেছিল, আটপৌরে কথায়, 'এই ছ্যাখ আমার বউ, কেমন হয়েছে?'

শ্যামলী মেয়েটির ডাগর চোখের দিকে দেখে বলেছিলাম, 'চমৎকার।' ইতিমধ্যে এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে, তা যেন মনে করতেই পারছি না। কিন্তু সে কথা যাক, মুহূর্তের মধ্যেই আজকের দেশ কালের পরিস্থিতি মনে জেগে উঠলো। হত্যা নিরবধি। খবরের কাগজে এখন আর হত্যা লেখে না। খুন লেখে। মন সরিয়ে রাখা যায় না। চোখ ফিরিয়ে রাখা যায় না। রাজনীতি আর খুন এত ব্যাপক, সকলের জীবনের এপাশে ওপাশে ফিরছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ছেলের অপরাধ?'

'রাজনীতি।'

'তোমার ছেলে রাজনীতি করে নাকি?'

'তেমন ভাবে না হলেও, একটু ছোঁয়াছুঁয়ি আছে।'

'সরিয়ে রাখা গেল না?'

'সংক্রামক রোগের মতো! সাবধান থাকলেও, সব সময়ে রক্ষা পাওয়া যায় না।'

মনে পড়লো, আমার এই বন্ধুটিও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন আছে কী না জানি না। সে কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলো না। আমি কেবল ওর ঘটনা আর পরিস্থিতির কথাই ভাবছি। এবং একই সঙ্গে দেশের কথাও বটে। এমনই অবস্থা খুনের ভয়ে, কিশোর ছেলেকে নিয়ে, হাজার মাইল দূরে পাড়ি দিতে হচ্ছে। সেই জন্যই ওর মুখে উৎপীড়নের ছাপ দেখেছি। চোখে দুশ্চিন্তা। ছেলেটির মনের অবস্থা কেমন, কে জানে।

ও আবার নিজেই বললো, 'হয়তো এভাবে যেতে হতো না। কিন্তু আমার ছেলের নামের সঙ্গে মিল আছে, এমন একটি ছেলেকে ওরা ভুল করে মেরে ফেলেছে। এর পরে আর কলকাতায় থাকতে ভরসা পেলাম না।'

এখন আর এ সব কথা শুনলে শিউরে উঠি না। কুম্ভকারের অলাতচক্রের ঘূর্ণী দেখে, যন্ত্রটাকে যেমন স্থির মনে হয়, মন এখন সেই রকম। প্রতিক্রিয়া এত তীব্র, তার কোনো কম্পন দেখা যায় না। এর সঙ্গে মিশে আছে, ক্ষোভ ঘৃণা লজ্জা। তবু বিস্ময় ঘোচে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেবল নামের মিলে?'

ও বললো, 'নামের সঙ্গে বয়সটাও মিলে গিয়েছিল। আর খুনটা আমাদের বাড়ির এলাকায় হয়নি, হয়েছিল আমার শ্বশুরবাড়ির এলাকায়। আমার ছেলে প্রায়ই ওর মামার বাড়ি যেতো। বোঝা যায়, ওকে মারার পরিকল্পনাটা হয়েছিল ওর মামার বাড়ির এলাকাতেই। ওরা যখন বুঝতে পেরেছিল, ভুল করে অন্য ছেলেকে মেরে ফেলেছে, তখন আমার শ্বশুরবাড়ি চড়াও হয়েছিল। আমার শাশুড়িকে ছুরি মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল। বাড়িতে তিনি তখন একলাই ছিলেন।'

আমার শঙ্কিত প্রশ্নের আগেই, ও গাড়ির দেওয়ালে লাগানো ছাইদানিতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে বললো, 'মারা যাননি, হাসপাতালে আছেন। তিনি অবিশ্যি রাজনীতিও করতেন।'

সর্ষের মধ্যে ভূতের সন্ধান মিললো। ওর শাশুড়ি মহাশয়া কোন্ রাজনীতি করতেন, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না। দলীয় ব্যাপার, সন্দেহ নেই। ওর কিশোর ছেলে যে তার সঙ্গে জড়িত ছিল, অনুমান করে নেওয়া যায়। কিন্তু কেন ছিল? ভেবে বিমর্ষ হয়ে উঠি। কিসের দীক্ষা, কোন্ প্রেরণা, এবং ওইটুকু

ছেলের ভবিষ্যৎ? থাক, সে প্রশ্নে যাবো না। রুচি নেই। বরং ওর উদ্বিগ্ন উৎপীড়িত অন্যমনস্ক মুখের দিকে চেয়ে, মনটা আরো ভার হয়ে উঠলো। এখন এই পলাতক পিতা পুত্রের বিড়ম্বনাটাই বড় কথা। ওকে দেখাচ্ছে উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ প্রৌঢ়ের মতো। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ভাবে কতদিন ছেলেকে বাইরে রাখবে?'

'আপাতত কয়েক বছর, এডুকেশনটা বাইরেই শেষ করবে। তার জন্য বছর পাঁচেক কেটে যাবে। তারপরে—।'

চুপ করে গেল। যেন, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ওর মুখে সংশয়ের ছায়া নেমে এলো। বললো, 'কী যে করবো, আর কী হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। চলি।'

বলেই পিছন ফিরে কামরার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। হয়তো আমাকে এত কথা ওর বলতে ইচ্ছে করেনি। তবু বলে ফেলেছে। কিন্তু ওর শেষ কথাগুলো যেন অন্ধকার পশ্চিম বাংলার ভ্রূকুটি কপালে সংশয়ের ছায়ায় লেখা রয়েছে। করিডরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার নির্বাসনের যাত্রাটাও যেন এই মুহূর্তে উদ্বেগ আর বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো।

গাড়ি দুলছে। আমিও দুলছি। করিডরে দাঁড়িয়ে আছি। কাছ ঘেঁষে অনেকেই যাতায়াত করছে। কারোর দিকেই তাকিয়ে দেখিনি। হঠাৎ একটা চমক লাগলো আমার ঘ্রাণের মধ্য দিয়ে। পাশ ফিরে চেয়ে দেখি যা ভেবেছি তা-ই। একজন দাঁড়িয়ে আছেন, প্রায় আমার পাশেই। কাঁধে একটি রঙচঙে বড় ফ্লাস্ক ঝুলছে। হাতে কাঁচের গেলাস। গেলাসে সোনারঙ পানীয় টলমল করছে। রঙ বলছে, জলের যোগটা কম। তাই গন্ধটাও একটু তীব্র, নাকে এসে লেগেছে। এই চার দিকের ঠাস বন্ধ গাড়িতে, বাতাস কিছুই উড়িয়ে নিতে পারে না।

পাশ ফিরে তাকাতে, গেলাসের পরে যা চোখে পড়লো, সেটি একটি ছাঁটা এবং চোখা গোঁফ, বিস্ফারিত হাসি। অমায়িক অথবা, একটু নিয়ন্ত্রণের ছোঁয়া লাগানো। চওড়া ফর্সা মুখে, গোঁফ জোড়া বেশ মানানসই দেখাচ্ছে। টিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো নাক। টেরি বাগানো কালো কুচকুচে চুল। চোখ দুটি বেশ বড়। কিন্তু ইতিমধ্যেই রক্তিম এবং ঈষৎ ঢুলু ঢুলু ভাব। তৃষ্ণা কতোখানি মেটানো হয়েছে, কে জানে। সেই চোখের কালো তারা দুটি এখন আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ। বাঘডোরা ছোট জামা, সর্ষেফুল রঙ ট্রাউজার। আমার মনে ইতস্তত ভাব। অপরিচিতের এমন একটি হাসির জবাবে কী করণীয় বুঝে উঠতে পারছি না। মহাশয় কোন্ দেশীয়, তা-ই বা কে জানে। মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো। তার আগেই তৃষ্ণার্ত ঠোঁট গেলাস স্পর্শ করলো। শুনতে পেলাম, 'দাদাকে চিনা চিনা মালুম হচ্ছে?'

চিনা! মানে চীনা নাকি? আমার এই বাংলা দেশের মেঠো চেহারা সম্পর্কে এমন কথা কোনোদিন শুনতে হয়নি। আসলে পানরসিক মহোদয়ের কথায় মালুম দিচ্ছে, উনি অবাঙালী। চেনা তাই চিনা—উচ্চারণে নির্ভুল। যদিও বাঙলার পূর্ব অংশে 'চিনা' আছে, 'চেনা' নেই। "তুমি কে পাগলিনী হে। বহুদিনের চিনা বলে মনে হতেছে।" গানের কলি মনে পড়ে যায়। কিন্তু এ মুখের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আবার ওঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। মুখে সেই হাসি। অতএব, জিজ্ঞাসা আমাকেই। কী জবাব দেব, বুঝে ওঠার আগেই, পুনর্বার জিজ্ঞাসা, 'দাদা অ্যাকটিং করেন, বহুত দফে দেখেছি।'

অ্যাকটিং! মানে অভিনয়? উনি যদি দার্শনিক হিসেবে কথাটা বলে থাকেন, তবে বলতেই হয়, জীবন রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই যে যার ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি। আমরা সবাই অভিনেতা। আর অভিনেত্রী। কিন্তু অন্য অর্থে যদি বলে থাকেন, তাহলে জবাব কী? জবাব কিছু নেই, বুঝে নিতে হবে, চোখে লেগেছে সোনালী জলের রঙ। এ সময়ে অনেককেই নাকি অনেক কিছু মনে হয়। শাদাকে কালো, লালকে হলুদ, হস্তিনীকে পদ্মিনী, শঙ্খিনীকে—কী জানি, মনে করতে পারছি না। কিন্তু মহাশয়টির দৃষ্টি কি এতটা রঙিন হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের অ্যাকটিং-এর কথা বলছেন, বলুন তো।'

পানরসিক ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'ফিল্‌ম।'

হুম, আর দেখতে হলো না। একেবারে যথার্থ সোনালী পানীয়ের রঙ লেগেছে চোখে। যাত্রার আসরে বললেও একটা কথা ছিল। অন্যথায় পাড়ার ক্লাবের থিয়েটার। তা-ও সে সব দিন তো অনেকদিন পার হয়ে এসেছি। যার স্মৃতি পড়ে আছে মফঃস্বলের ছোট শহরে। একেবারে ফিল্‌ম! যাকে বলে রুপোলী পর্দা। একটু আত্মগর্ব বোধ করতে ইচ্ছা করছে। আমার চেহারায় কি এমন জিনিসও আছে নাকি। কেউ কোনোদিন বলেনি তো। তাদের বোধ হয় দৃষ্টি ছিল না। তথাপি হাসিটা দমন করা গেল না। ভদ্রলোকের ভুল ভাঙা-বার জন্য বললাম, 'আজ্ঞে না, ও সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

ভদ্রলোকের চোখে ভ্রূকুটি-সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। আমার পায়জামা পাঞ্জাবী পরা ছোটখাটো শরীরের আপাদমস্তক দেখলেন। তারপরে একটি বিস্তৃত গোঁফ হাসি, 'ইউ আর লাফ্লিং দাদা।'

মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে, আমি যদি সত্যি অভিনেতা হতাম তাহলে লজ্জা মেশানো আত্মগর্বে, রহস্য করে একটু মিথ্যা বলা যেতো। অকারণ মিথ্যা বলে কী লাভ। হেসেই বললাম, 'শুধু শুধু আপনাকে মিথ্যা বলবো কেন। আমি ও সবের কিছুই জানি না।'

বোধ হয় একটু প্রত্যয় হলো। আবার ভ্রূকুটি-আরক্ত চোখে তাকালেন। ক্ষণ পরেই তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হাসিটা বিস্তৃততর। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'হোয় হোয়, আপনি রঞ্জিতের দাদা আছেন না?'

আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পানীয় এখন মনমস্তিষ্ক দৃষ্টিতে সঞ্চারিত কথা বাড়িয়ে লাভ আছে কি কিছু? কিন্তু ওঁর চোখে জিজ্ঞাসাটা এত তীব্র, জবাব না দেওয়াটা কেমন খারাপ দেখায়। জিজ্ঞেস করলাম 'কে রঞ্জিত?'

'বাগবাজারের···আপনার নামটা দাদা বেমালুম ভুলে গেছি।'

ভোলা মনের ব্যাপার, উনি আর কী করবেন। তা না হলে, কে রঞ্জিত, কোথায়ই বা বাগবাজার, যার সঙ্গে আমার বা যেখানে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। কিছু বলবার আগেই উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদার নামটা বলুন তো।'

বললাম, 'আপনি যার কথা ভাবছেন, আমি সে নই। বাগবাজারেও কোনোদিন থাকি নি।'

এবার রক্তিম চোখে বিস্ময়। বললেন, 'আপনার সঙ্গে সেদিন বাসে বসে মাল খেলাম না? ভুলে গেছেন? আপনি বাতাচ্ছেন, রঞ্জিতের দাদা না?'

ধন্য পানীয়, তোমার কি অসীম ক্ষমতা। অ্যাকটিং থেকে একেবারে শুঁড়িখানায় এবং যাকে বলে 'মাল' তাও একসঙ্গে বসে পান! বলতে ইচ্ছা করলো, 'চালিয়ে যান দাদা।' হাসি পেলেও একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, 'না, আপনার সঙ্গে কোথাও বসবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।' বলে আমার কামরার দিকে ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। ভদ্রলোক ডেকে উঠলেন, 'শুনেন দাদা, শুনেন, প্লিজ।'

ফিরে দাঁড়ালাম। দেখছি, ফর্সা মুখে গোঁফের ফাঁকে একটু বিব্রত হাসি। বললেন, 'একটা কি বাত হচ্ছে, আমার ভুল হতে পারে, রাগ করবেন না।'

গেলাস দু'হাতে ধরে, জোড় করলেন। বললাম, 'না না, রাগ করবো কেন।'

গলার স্বর একটু নামলো, হাসিটি ঝলকে উঠলো। বললেন, 'দাদার কি একটু চলবে?'

কাঁধ থেকে ফ্লাস্ক নামিয়ে নিলেন। কী চলার কথা বলছেন, বুঝতে অসুবিধা নেই। বললাম, 'ধন্যবাদ, আপনি চালিয়ে যান।'

মহাশয় আপ্যায়নে একটু নত হয়ে পড়লেন। ফ্লাস্ক দেখিয়ে বললেন, 'একটু নিন দাদা, আমার কাছে অনেক আছে। সুটকেশে এখানো ষ্টক আছে।'

বিনীত হেসে বললাম, 'মাপ করবেন, আমার ইচ্ছা করছে না।'

ভদ্রলোক বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন, 'তোবে আর কী বলবো দাদা।'

বললাম, 'কী আর বলবেন, আপনি খান।'

'তোবে একটা সিগ্রেট খান।'

পকেট থেকে রাজা মাপের বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন, গোড়ায় যার তুলো আঁটা। অগত্যা অন্ততঃ ধূমপানে যদি ওঁকে খুশি করা যায়, সেই ভালো। একটি সিগারেট নিয়ে ধরালাম। গোঁফ ছড়ানো হাসিটি উজ্জ্বল

হয়ে উঠলো। বললেন, 'তোবে স্‌স্‌ত্যি বলছি দাদা, আপনাকে আমার ফিল্মের অ্যাকটর মনে হয়েছিল। রঞ্জিতের দাদার স্‌সঙ্গে ভি আপনার খুব সিমিলারিটি আছে। কিন্তু আপনি যে বাঙালী, স্‌সেটা আমি ঠিক বুঝেছিলাম।'

মহাশয়ের আরক্ত চোখে মুখে একটি গর্বের ভাব। যদিও, আমাকে দেখে আর কোন্ দেশীয় ভাবা যেতে পারে, জানি না। এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার দেশ কোথায়?'

'গুজরাট, আমি গুজরাটি আছি। আমার নাম আছে অমৃতলাল ভাট। কিন্তু দেখেন দাদা, আমি বঙালী ভি আছি। আমার কথায় আপনি ভুল পাবেন না। একদম চাইল্ডহুড থেকে আমি কলকাতায় আছি। আমার দোস্ত ইয়ার সব বঙালী—অল্। কেমন কী না, আমার বাঙলা কথায় ভুল আছে, বলেন?'

মানতেই হবে, একজন গুজরাটি হিসাবে অমৃতলাল ভাটের বাঙলা ভাষা যথেষ্ট ভালো। প্রায় নির্ভুল বলা চলে। আমি এমন কি হিন্দীও এত নির্ভুল বলতে জানি না। বললাম, 'আপনি তো খুবই ভালো বাঙলা বলতে পারেন।'

অমৃতলাল দু'হাতে গেলাস ধরে কপালে ছুঁইয়ে আপ্যায়িতের ভঙ্গি করলেন, 'মেনি মেনি থ্যাংকস্‌ দাদা, আপনাদের আসিরবাদ। দাদা, আপনার কাছে বলতে স্‌সরম নেই—।'

অমৃতলাল আমার দিকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়লেন। ওঁর স্বর শোনালো যেন কানে কানে চুপি চুপি, 'আমার একটা বঙালী গার্লের স্‌সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, মানে কথাটা কী আছে, একটা বঙালী মেয়ের স্‌সঙ্গে, মানে, আমি লাভে পড়ে গিয়েছিলাম—তো—স্‌সে কথা আর কী বলব—।'

অমৃতলাল যুগপৎ লজ্জিত এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন। এক চুমুকে গেলাসের সবটুকু পানীয় শোষণ করে, চোখ বুজলেন। রাজা মাপের বিলিতি সিগারেটটি এখনো শেষ হতে বাকী। কিন্তু আমাকে কি এখন এই করিডরে দাঁড়িয়ে, গুজরাটি বাঙালীর ব্যর্থ প্রেমকাহিনী শুনতে হবে। গুজরাটি বাঙালীতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রক্তের শিরায়, সুধার অগ্নিস্রোত। এ ক্ষেত্রে শুরু আছে, শেষ কি হবে? বোধ হয় না। অশেষটাই বড় ভয়। অমৃতলাল চোখ খুললেন। 'বাবা মা অ্যাকসেপ্‌ট করলো না —তো খুব দুখ্‌ পেলাম দাদা। বাবা বিজনেসম্যান, আমেদাবাদের এক বিজনেসম্যানের ডটারের স্‌সঙ্গে বিবাহ্‌ দিয়ে দিল—তো—।'

কথা শেষ না করে, অমৃতলাল ফ্লাসকের ঢাকনা খুলে, গেলাসে পানীয়

ঢালছেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে, কাতর ভাবে অনুরোধ করলেন, 'একটা পেগ, চলবে না দাদা?'

চমকে উঠলাম। ব্যর্থ প্রেম আর বিবাহ থেকে, হঠাৎ পেগ। ভেবে উঠতে পারিনি। কিন্তু আবার এদিকে কেন। জানি, ইনি হলেন অমৃত—অমৃতলাল, অমৃতে টলটলানো। একটু দান করতে না পারলে মন মানে না। কিন্তু সব রস, সব সময়ে সকলের না। কালকূট জানে, কখনো কখনো অমৃতে গরল উপচায়। আমিও হাত জোড় করতে জানি। হাত জোড় করে বললাম, 'মাপ করবেন। আপনি চালান।'

বলা মাত্রই চুমুক দিলেন। অচিরাৎ ফিরে গেলেন আগের কথায়, 'তো কী বলব দাদা, আই কুড নট ম্যারি হার বাট স্টিল শী ইজ মাই ফ্রেণ্ড। উই মীট রেগুলার অ্যাণ্ড আমার ওয়াইফের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, দুজনের খুব দোস্তি! মাই ওয়াইফ—শী ইজ ট্র্যাভেলিং উইথ মী, কমপার্টমেণ্টে বস্‌সে আছে, শী ইজ ভেরি মডার্ন, আপ-টু-ডেট ওম্যান আছে। আপনার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করে দেব। রাত্রি দশটার সময় করিডরে আসবেন দাদা।'

শুনেছি, কথা অনেক ধারায় বহে। অমৃতলালের কথা কোন ধারায় বইছে, বুঝতে পারি না। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাত্রি দশটার সময়?' অমৃতলাল বিরক্ত ভাবে বললেন, 'হাঁ, রাত্রি দশটায় কামরার লাইট অফ্‌ করে দেয়। এত আর্লি কে ঘুমাবে বলেন। আর রেল কোম্পানির নিয়মটা ভি দেখেন, আট বাজে ডিনার দিয়ে দেবে। এত জলদি কেউ খায়? আমরা হলাম বিজনেসম্যান, সাতটার আগে অফিস বন্ধ হয় না। তারপরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কোথাও আড্ডা করি, ড্রিংকস্ চলে, এগারো বাজে ঘরে যাই, খেতে স্থতে বারো সাড়ে বারো।'

তা ঠিক। কিন্তু গাড়িতে অনেক শিশু আছে বৃদ্ধ আছেন। সে সব বাদ দিলেও, রেল কোম্পানি নিশ্চয়ই ব্যক্তির অভ্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। কারোর রাত আটটায় হয়, কারোর বারোটায় কিংবা রাত্রি দুটোতেও হয়তো অনেকের রাত্রিই হয় না, হয় তখন তাদের সবে সন্ধ্যে। তবে এ সম্বন্ধে এখন কোনো মন্তব্য না করাই ভালো। বিলিতি সিগারেটটি শেষ করে এনেছি। এবার বিদায়ের পালা। বললাম, 'তা তো বটেই। আচ্ছা মিস্টার ভাট, পরে আবার দেখা হবে চলি।'

অমৃতলাল বলে উঠলেন, 'দশ বাজে। আমার ওয়াইফ আর আমি তখন করিডরে থাকব। আপনি আসবেন দাদা।'

মনে মনে ভাবি, অমৃতলালের বয়স কত? ঘুম আসবে না বলে, কর্তা গিন্নি করিডরে দাঁড়িয়ে গল্প করে সময় কাটাবেন? অনভিজ্ঞ অরসিকের প্রশ্ন। বয়সে কি যায় আসে। বলো, মনে বয়স ধরেছে কী না। বেলা অবেলা, সব সেইখানে। অমৃতলালের এখনো কৃষ্ণ কেশ, অটুট দাঁত, নিটোল রক্তিম মুখ। বললাম, 'চেষ্টা করবো।'

পিছনে ফিরতে ফিরতে শুনলাম, 'চেসটা নয় দাদা, আসতে হবে।'

করিডরের অন্য প্রান্তে ফিরে, আমি হতবাক। অমৃতলালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, অনেক গলার অনেক কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন দেখছি এখানে একটি ছোটখাটো পানশালা মেতে উঠেছে। উর্দিপরা বেয়ারা হাতে হাতে গেলাস তুলে দিচ্ছে। ফটাস ফটাস সোডার বোতল খুলছে। পানীয়ের বোতল যার যার নিজের, সোনালী, রক্তিম শ্বেত। কলকল করে গেলাসে ঢালা, টলটলিয়ে ওঠা আর কলকলিয়ে কথা। শীততাপনিয়ন্ত্রিত রাজধানী একস-প্রেস! জিন্দাবাদ!...মহাশয়েরা সকলেই বেশ উচ্চ ভাবে আছেন। তড়িৎ গতি সকলের। যেন, জীবন বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়। সময় নাহি রে। সেই সত্যি, ডিনার যে রাত্রি আটটায়। সিগারেটের ধোঁয়ার ঘনঘটায়, সব প্রায় আবছায়া। বন্ধ করিডর সুরার গন্ধে ভরা। গন্ধই যেন রক্তে চারিয়ে যাচ্ছে, মস্তিষ্কে বিঁধছে। মুখে না ছুঁইয়েও পানের আর বাকী রইল কী।

সেই গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে। বাঙলা দেশেরই কোন এক নবাবের কীর্তি যেন। কতটা ইতিহাসসিদ্ধ তা জানি না। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অভিমত, সেই ঘটনাতেই নাকি বাঙলা দেশে, যাঁদের বলে পিরালী ব্রাহ্মণ, তাঁদের সৃষ্টি। নবাবের সভাসদদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নবাব নিজেও মূর্খ ছিলেন না। রসিকও ছিলেন। তিনি সভাসদ ব্রাহ্মণদের কাছে প্রস্তাব করলেন, সকলে মিলে গো-মাংস ভক্ষণ করা যাক।

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু। কানে শোনাও পাপ! জাত চলে যাবে যে!

নবাব মিটি-মিটি হাসলেন। মনে মনে ঘাড় নাড়লেন। ব্রাহ্মণদের একদিন, একটি বিশেষ সময়ে তাঁর প্রাসাদে আসতে বললেন। ব্রাহ্মণেরা এলেন। নবাব নিজেই তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। সাদরে ডেকে নিয়ে চললেন প্রাসাদের

অভ্যন্তরে। রসুইখানার পাশ দিয়ে যে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দ্বিতলে, সেইখানে এসে থামলেন। ভুরভুর করে মাংস রান্নার সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণদের নাসারন্ধ্র স্ফীত। নবাব জিজ্ঞেস করলেন, 'গন্ধ পাচ্ছেন?'

ব্রাহ্মণেরা মাথা নেড়ে বললেন, 'পাচ্ছি'।

'কিসের গন্ধ বলুন তো?'

'মনে হচ্ছে মাংসের।'

'কী মাংসের?'

'তা তো জানি না।'

নবাব খানসামাকে ডেকে হুকুম দিলেন, যে মাংস রান্না হচ্ছে, তা একটা পাত্রে এনে ব্রাহ্মণদের দেখানো হোক। খানসামা গরম মাংসের পাত্র নিয়ে এলো। তার মধ্যে বড় বড় মাংসের টুকরো।

নবাব বললেন, 'মহাশয়েরা ভালো করে দেখুন এ হলো গো-মাংস।'

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু! তাও আবার চোখে দেখতে হলো। সকলেই নাসিকায় উত্তরীয় চাপা দিলেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। নবাব বললেন, 'নজর ফিরিয়ে নিন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এখন আর নাকে কাপড় চাপা দিলে কী হবে! গন্ধ আপনারা আগেই পেয়েছেন। আপনাদের শাস্ত্রেই বলে ঘ্রাণেন অর্ধং ভোজনং। পুরোটা না হলেও গো-মাংস আপনারা অর্ধেক খেয়েছেন। আপনারা পণ্ডিত মানুষ, এখন আপনারাই বলুন, আপনাদের জাত আছে না গিয়েছে।'

পণ্ডিতেরা প্রস্তরবৎ। যুক্তিকে খণ্ডন করা যায় না। তা ছাড়া, সেয়ানা নবাব সেখানেই তাঁর এই জাত মারার ষড়যন্ত্রকে থামিয়ে রাখেননি। কয়েকজন আমীর ওমরাহকে কাছে পিঠেই থাকতে বলেছিলেন। তাঁদের ডেকে ঘটনার সাক্ষী রাখলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তারপরে নাকি সেই ব্রাহ্মণেরা চমৎকার জ্ঞান করিয়া. গো-মাংস ভক্ষণ জাত পাপে যবন দোষে পতিত: হইয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, সেই নবাবের নাম ছিল খান জাহান খাঁ। যার থেকে নাকি বে-নবাবের নবাবি দেখলে বলা হয়, 'নবাব খাঞ্জা খাঁ।'

যাক গিয়ে। ইতিহাসের খোঁজে যেতে চাই না। ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, এই সুরার গন্ধে ভরা করিডরে ঘ্রাণেন অর্ধং পানং হয়ে গেল। আর কেমন করে বলি, ও রস আমার ভিতরে যায়নি। ঘ্রাণেই তো দেখছি, আমার চোখ ঢুলুঢুলু, পা টলোমলো। গন্ধ নেওয়া তা অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ালে ব্যাপার জেয়াদা হয়ে যাবে। তা ছাড়া অ-রসিকের কী বা কাজ এই রসিক মহলে। দরজা ঠেলে, ঠাণ্ডা কামরায় ভিতর ঢুকলাম।

কিন্তু আমার দিব্য চক্ষু খোলার আর একটু বাকী ছিল। পানপাত্র টলটলানো কেবল করিডরে না। কামরার মধ্যেও আছে। তবে শান্তশিষ্ট চুপচাপ ভাবে। দিব্যচক্ষু খোলার কথা বললাম, যে ব্যক্তিটিকে পান করতে দেখছি, তাঁকে দেখে। হঠাৎ চেনা মুখখানি দেখে একটু চমকেই উঠেছিলাম। ইনি কখন উঠেছেন, আগের দিকে, গায়ে গা লাগানো তিন আসনের এক কোণে বসে আছেন, লক্ষ্যই করিনি। ইনি একজন খ্যাতনামা নট, মঞ্চে এবং পর্দায়, দুয়েতেই। নাম? থাক না। মানুষের কি একটু নিশ্চিন্তে চলাফেরা করার উপায় নেই? এটুকু বললেই হয়, আমি তার একজন ভক্ত দর্শক। ইনি আমার প্রিয় অভিনেতা। অমৃতলাল ভাটের দুর্ভাগ্য, সে হীরে ফেলে কাঁচ আঁচলে বাঁধতে চেয়েছিল। আসল মানুষটিকে দেখতে পায়নি, আমাকে দিয়ে অ্যাকটর দেখার সাধ মেটাতে চেয়েছিল।

দেখছি, সামনের আসনের পিঠে লাগানো, খাবার টেবিলের টানা টেনে, তার ওপরে গেলাস রেখেছেন। রঙ সোনালী। বাকী দুই আসনের যাত্রীরা তাঁরই সঙ্গী। কথা বলছেন। ছবিটা এত সহজ আর অনাড়ম্বর, একটু আধটু তাকিয়ে দেখলেও কারোর কিছু বলার নেই।

গাড়ির সমস্ত পরিবেশটি বেশ জমজমাট। আমার পাশের যাত্রী, তেমনি নিবিষ্ট হয়ে ছবির বই দেখছেন। আমাকে দেখে যেন হঠাৎ একটু চমকে উঠলেন। হাতের বইটি মুড়ে ফেললেন। একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। এখানেও কি আমি মূর্তিমান অরসিক নাকি। মনে হচ্ছে যেন, বিশেষ একটি আনন্দ-নিবিড় মুহূর্তে বইটি তাঁকে বন্ধ করতে হলো। নির্বাসনের যাত্রা। এখানেও আমার ঠাঁই নেই। অতএব ঘাড় গুঁজে বসে পড়লাম। চোখ ফিরিয়ে রাখলাম অন্য দিকে। বইয়ের হাঁড়িতে যতো রস আছে, তিনি উদ্ধার করে পান করুন। আমি চেয়ে দেখবো না। আমার তো একটু বোধ বুদ্ধি ভদ্রতার দাবি আছে।

দেখলাম নবদম্পতী তেমনি নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কথাবার্তায় হাসিতে মগ্ন। দেহের নৈকট্য আরো ঘন। একটি পাতলা রঙীন সিল্কের চাদর, প্রায় দুজনের কাঁধেই ঢাকা পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগছে বোধ হয়। তাদের আড্ডা তেমনি সরগরম। কয়েকটি শিশু, যাতায়াতের পথে ছুটোছুটি খেলা করছে। সব দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি নিশ্বাস পড়ে। আমি চলেছি নির্বাসনে।

'হ্যালো মিস্টার।'

সম্বোধনটা বাজলো কানের কাছেই। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। আমার পার্শ্ববর্তী যাত্রী। আমার দিকে রঙীন সিনেমা ছবির দুটি ম্যাগাজিন বাড়িয়ে দিয়ে, ইংরেজিতে বললেন, 'দেখুন না।'

হঠাৎ? হাত বাড়িয়ে নিয়ে হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

খুশি মনেই পাতা উলটে গেলাম। কতো রূপসী রূপকুমারদের ছবি। কতো বিচিত্র নাম। এরা সকলেই তারকা। মনে মনে জিজ্ঞাসা, ভদ্রলোক এ রকম দয়া করলেন কেন? নিতান্ত চুপচাপ একলা বসে আছি বলেই কী? তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে। কিন্তু আহ্, নিজের চোরা-দৃষ্টির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিই। ওঁর বইয়ের ছবিতে সহসা চোখ পড়ে গেল। পলকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও হল। জগতের দিকে তাকিয়ে এমন আর কী দেখলাম। নগ্ন নরনারীর দেহভোগের আসন বিলাস। মনে মনে ভদ্রলোকের চেহারাটি ভাববার চেষ্টা করলাম। পঞ্চাশোর্ধ্ব নিশ্চয়ই। ছেলেবেলায় অসময়ে খাবার দেখে খেতে চাইলে মা বলতেন, 'ওটা খিদে নয়, চোখের খিদে।' এঁরও বোধ হয় তাই। এখন মনে হচ্ছে, উনি যে চিত্রতারকাদের ছবি আমাকে দেখতে দিয়েছেন, তা বোধ হয়, আমাকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখা।

তার কোনো দরকার ছিল না। আমি এমনিতেও দেখতাম না। বরং মাথা নিচু করে, চিত্রতারকাদের দেখতে গিয়েই, হঠাৎ ওঁর বইয়ের দিকে চোখ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর নেবো না, আর দেখবো না। উনি দেখুন, তৃপ্ত হোন। মানুষ কি সত্যি চিরদুর্জ্ঞেয়।

একটু পরেই খাবার এলো। সেটা একটা পর্ব বটে। বেয়ারাদের ছুটো-ছুটিতে, খাবারের গন্ধে, চামচের ঝনঝনানিতে কামরার রূপ বদলে গেল। খাবার শেষে, ধূমপানের জন্য একবার করিডরে যেতেই হলো। ফিরে আবার উপ-বেশন। হাত পা ছড়িয়ে নিপাট শয়নের উপায় নেই। এ ব্যবস্থার নাম চেয়ার কার। তবু মনে করি, যথেষ্ট আরাম। জুন মাসের গরমে শিরশিরোনো ঠাণ্ডা। ধুলোবালি নেই। পা ছড়িয়ে অনেকখানি টান টান হওয়া যায়।

রাত্রি দশটায় যান্ত্রিক স্বরে 'শুভরাত্রি' শোনা গেল। বাতি গেল নিভে। কেবল একপ্রান্তে একটি মাত্র ছোট আলো। নিতান্ত রাত্রে উঠে ব্যথরুমে যাতায়াতের জন্য। ভেবেছিলাম, এখন আর কিছু নয়, চোখ বুজে নিদ্রার চেষ্টা। কিন্তু নিজেকে ঠিক এতটা ফাঁকি দেওয়া যায় না। নিজের ভিতরেই শুনতে পাচ্ছি অমৃতলাল ভাট আমাকে ডাকছেন। যাওয়াটা নৈতিক দায়িত্ব কী না বুঝতে পারছি না। অথবা ভদ্রতাবোধ। নির্বাসনের যাত্রায়, যতোই মন ফিরিয়ে রাখি, চোখ ফিরিয়ে রাখি, মন থেকে সামান্য বৃত্তিগুলো এত সহজে নড়ে না। কর্তা-গিন্নিকে একসঙ্গে দেখবার জন্য মনে মনে বেশ কৌতূহল।

দরজা ঠেলে করিডরে এলাম। অন্যদিকের কামরার বন্ধ দরজার পাশে

দেখতে পেলাম ভাট মশাই ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রাউজারের বদলে একটি রঙীন লুঙ্গি পরেছেন। গায়ের জামাটা ঠিক আছে। বাঁদিকে পাশ ফিরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন! কিন্তু অমৃতলালের তৃষ্ণা কি এখনো মেটেনি। দেখছি হাতে এখনো সোনালী পানীয়ের গ্লাস।

করিডরে কেউ নেই। এমন কি বেয়ারাও নেই। কনডাক্টর গার্ড কোথায়, কে জানে। অমৃতলালের দিকে একেবারে সোজাসুজি যেতে পারলাম না। একটি সিগারেট ধরালাম। ওঁর নজরে পড়বার জন্যই। উনিও তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, 'আসেন দাদা, আসেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে হাত তুলে কিছু যেন বললেন। আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি হাতের গেলাসটি জানালার গায়ে নামিয়ে রাখছেন। গেলাসের পানীয়ের রঙ সোনালী। পতিরই পথে নাকি!

অমৃতলাল বললেন, 'দাদা মীট ওয়াইফ গীতা।' গীতাকে বললেন, 'গীতা, হি ইজ মাই দাদা'।

কেন, কী করে, সে প্রশ্নে গিয়ে বোধ হয় কোনো লাভ নেই। হাত তুলে নমস্কার করলাম। গীতাও তাই করলেন। মহিলাদের সৌন্দর্য বুঝি, এমন কথা ঝট করে বলতে পারবো না। বয়স তো আরোই না। তবু মনে মনে একটা খাড়া করে নিতে হয়। গীতা ভাটের বয়স বোধ হয় তিরিশের একটু বেশিই। একটু রোগা, ফরসা, এমন কিছু উঁচু নাক না, চোখ বড়, শাড়ির বন্ধন নাভির নিচে, জামাটিও ছোট। ঘাড় অবধি ফোলানো চুল। নখে রঙ, ভুরু আঁকা, চোখে কাজল। ঠোঁটেই যা রঙ নেই। চোখ দুটি স্বামীর মতো না হলেও ঈষৎ রক্তিম। চোখের কোল একটু ফোলা। অমৃতলালের কথা ঠিক। অন্তত পোশাকে-আশাকে ওঁর 'ওয়াইফ ইজ মর্ডান, আপ-টু-ডেট।' গীতা আমাকে পরিষ্কার ইংরাজিতেই বললেন, তাঁর স্বামী তাঁকে আমার কথা বলেছেন, এবং এমন কি আমাকে দেখে, কী কী ভ্রম হয়েছিল তা-ও।

তবু অন্তত এ প্রসঙ্গে একটু হাসা গেল। আমি অমৃতলালকে জানালাম, আমাদের কামরায় একজন বিশিষ্ট অভিনেতা আছেন। তাঁর নামটাও বললাম। অমৃতলাল তেমন উৎসাহিত হলেন না, বললেন, 'হাঁ হাঁ, ওনার অ্যাকটিং ভি দেখেছি। আমার দাদা ভালো লাগে না।

স্বাভাবিক। এটা কোনো বিরোধ নয়, পার্থক্য। গীতা তাঁর স্বামীর দিকে ফিরে, ইংরেজিতেই বললেন, 'দাদাকে ড্রিংকস দিচ্ছ না?'

অমৃতলাল আমার দিকে চোখ তুললেন। দৃষ্টিতে অনুরোধ। আমি শ্রীমতীর দিকে ফিরে বললাম, 'আমাকে মাপ করবেন। আপনারা পান করুন।'

বলে আমি জানালায় রাখা গীতার গেলাসের দিকে তাকালাম। গীতা কি একটু লজ্জা পেলেন। হাসিটা সেই রকম। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ড্রিংক করেন না?'

কঠিন প্রশ্ন। আমার কাছে ওটা নিষিদ্ধ ফলের মতো না। এ ফলের স্বাদ বিস্বাদ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সবই জানা আছে। বললাম 'যখন ইচ্ছা হয়।'

গীতা একটু চোখে ঝিলিক দিয়ে হাসলেন। বললেন, 'বেশ বলেছেন।'

অমৃতলাল বাঙলায় বললেন, 'এখন কি দাদা একটু ইচ্ছা হয় না?'

বললাম, 'বিশ্বাস করুন, হচ্ছে না।'

গীতা ইতিমধ্যে গেলাসে চুমুক দিয়েছেন। ভুরু তুললেন, দৃষ্টি হানলেন, একটু ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, 'জানতে ইচ্ছা হয়, কখন কখন আপনার ইচ্ছা হয়?'

শ্রীমতীর কথায় আমার হাসি পেয়ে গেল। কর্তা গিন্নিও হেসে উঠলেন। অমৃতলালের আরক্ত দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ, দাদার জবাবটি কী হয়। খুবই সহজ। গীতা ভাটের দিকে চেয়ে বললাম, 'কখন যে ইচ্ছা হয়, নিজেও ঠিক জানি না।'

গীতা প্রায় বালিকার মতো খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, 'ওয়াণ্ডারফুল। য়ু আর রিয়্যালি ক্লেভার দাদা। আপনি কথা বলতে জানেন বটে। আপনাকে কব্‌জা করা যাবে না।'

অমৃতলাল গৃহিণীর কথায় চমৎকৃত। বললেন, 'ঠিক বলেছ গীতা। তুমি তো বাঙলা জানো না, বাঙলায় একটা কথা আছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানী। দাদা আমাদের সেই রকম।'

গীতা ভাটের চোখে, পানীয় এখন চিকুর হানা বিজলী হানছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটের কোণ টিপে হেসে বললেন, 'আসলে আমাদের ভালো লাগেনি, তা-ই দাদার ইচ্ছা হচ্ছে না।'

অমৃতলাল একেবারে স্ত্রীর কাঁধে হাত তুলে দিলেন। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।'

বেশ চলছিল। এখন অভিযোগের সুর বেজে উঠলো। নিজের পথে যেতে, একটু কথার কারচুপির দরকার হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যালিগেশন, তার পরে আর ঠিক কথার জাল বোনা যায় না। বললাম, 'কথাটা ঠিক হলো না।'

গীতা ভাট আমার দিকে চেয়েই, গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিলেন। ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

ওঁর গেলাসের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বললাম, 'একটা জিনিসে অক্ষমতা জানিয়েছি বলে আপনাদের ভালো লাগেনি, এটা সত্যি না।'

গীতা ভাট কয়েক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক।'

অমৃতলাল স্ত্রীকে বলে উঠলেন, 'তাহলে তুমি হেরে গেলে? দাদা কথা বলতে জানেন, তোমাকেই কব্জা করে দিলেন।'

গীতা হেসে বললেন, 'তা হতে পারে।'

আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার দাদাকে ঠিক ধরা যাচ্ছে না।'

তাই বোধ হয় নিয়ম। সহজকেই সময়ে অসহজ লাগে। অতএব আমি নিরুত্তর। কিন্তু শ্রীমতী মুখর। এখন তো কথা ফোটারই সময়। রক্তে সুধা, মুখে কথা, চোখের তারায় ঝিলিক। আমার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই আবার বললেন, 'আসলে দাদা একটু দুষ্টু আছেন।'

ওঁর বলার ভঙ্গিতে আমার হাসি পেল। অমৃতলালও হাসলেন। আমার কোনো প্রতিবাদ নেই। দুষ্টু হতে রাজী, মিথ্যাবাদীর চেয়ে।

অমৃতলাল বললেন, 'তাহলে সিগারেট খান দাদা।'

পকেট থেকে বের করলেন, সেই রাজা মাপের বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট। এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকেও একটা দিন।'

ওঁর এক হাতে গেলাস। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আগে ওঁকে দিলাম। নিজে নিয়ে, আগে ওঁকেই আগুন ছোঁয়ালাম। শ্রীমতী গীতা তৎক্ষণাৎ স্বামীর ঠোঁট থেকে সিগারেটটি নিয়ে, নিজের ঠোঁটে গুঁজে দিলেন। অমৃতলাল আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মহিলার ধূমপান দৃশ্য কিছু নতুন না। ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গে নৈকষ্যকুলীন হিন্দু মহিলাকে, ঘরের কোণে বসে হুঁকা টানতে দেখেছি। আর এখন? কোথায়ই বা না দেখছি। কোনোটাই চোখের দেখা না। সব দেখাটাই মনের। মন ঠিক আছে তো সবই ঠিক। সেখানে আমার কোনো গোলযোগ নেই।

অমৃতলাল যেন প্রগাঢ় স্নেহে, স্ত্রীর সিগারেট খাওয়া দেখছেন। আমি আর একটি সিগারেট তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। শ্রীমতী তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে, স্বামীর ঠোঁটে গুঁজে দিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখছেন না' আমার সিগারেটের দিকে কেমন সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন।'

কথাটা কোন্ হিসাবে বললেন, জানি না। অমৃতলাল কি গীতার প্রসাদভিক্ষু। কে যে কার প্রসাদভিক্ষু জানি না। দেখছি সতী পতি দুইয়ের পুণ্যেতেই আছেন। ভাবের ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেই মনে হচ্ছে। দুজনের একই ধারা।

এই মুহূর্তেই কামরার দরজা খুলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ছড়িয়ে পড়লো। এক বিশালবপু মহিলা বেরিয়ে এলেন। কোন্ দেশিনী জানি না, জড়ানো আছেন শাড়িতেই। বেরিয়ে, আগেই তাকিয়ে দেখলেন গীতার দিকে। গীতা তাড়াতাড়ি ওঁর গেলাসটা নামিয়ে নিয়ে একটু আড়াল করতে গেলেন। ফলে একটু পানীয় চলকে পড়ে গেল। বিশালবপু মহিলার ভুরু কুঁচকে গেল, মুখ যেন থমথমিয়ে উঠলো। দু-পা এগিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ করলেন। সজোরে অমৃতলাল সম্ভবত গুজরাটি ভাষাতেই কিছু বলে উঠলেন। শ্রীমতী গীতা একটু বিব্রত ভাবে হাসলেন।

ইংরেজিতে বললেন, 'অপরাধ করবো কেন? ভদ্রমহিলা হঠাৎ আসাতে একটু চমকে গিয়েছিলাম।'

অমৃতলাল বললেন, 'তোমার ভাবটা যেন চুরি করছিলে।'

গীতা আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। অমৃতলাল একটু জেদী গলায় বললেন, 'এবার তুমি ওই মহিলার সামনেই গেলাসে চুমুক দেবে।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, দরকারই বা কী। গীতার চমকানো দেখেই তো বুঝতে পারছি, তিনি অশ্বস্তিবোধ করবেন। কিন্তু আর যা-ই হোক, স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে, আমার কিছু বলা ঠিক হবে না। যদিও ক্ষতিই বা কী। শ্রীমতী গীতা কি আর কলকাতার অভিজাত পানশালায়, অনেকের সামনে কখনো খাননি? দেখে মনে হয়, খেয়েছেন। তবু দেখছি, এখনো একটু চমক ত্রস্ত ভাব আছে।

একটু পরেই মহিলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। গীতা স্বামীর নির্দেশ পালন করলেন অক্ষরে অক্ষরে। গেলাস তুলে চুমুক দিলেন। বিশালবপুনি (বাঙলা হল কীনা জানি না) কাজল মাখা চোখে একবার কটকটিয়ে দেখলেন। কামরার ভিতরে ঢুকে গেলেন। গীতা হাসলেন। অমৃতলাল ঠোঁট বাঁকিয়ে, গোঁফ জোড়া ধনুক করে তুললেন। বললেন, 'এত কটমটিয়ে দেখার কী আছে, বলুন তো দাদা।'

তবু আছে যে। কথাটা এখন অমৃতলালকে বোঝানো যাবে না। তাঁদের যেমন করিডরে দাঁড়িয়ে নির্বিরোধ পান চলে, তেমনি অনেকের চোখও

কটমটিয়ে ওঠে।' যে যার মতো। বলার কিছু নেই। সব চোখ কি এক। সব মন এক না।

আবার কামরার দরজা খুলে গেল, ঠাণ্ডা ঝলক এল। রোগা লম্বা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। জুন মাসে গলায় মাফলার জড়ানো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চেপেও শান্তি নেই। ভদ্রলোক বিশেষভাবে নজর করে গীতাকে দেখলেন। বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। গীতা বললেন, 'গিন্নী গিয়ে কর্তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কর্তা দেখে গেলেন।'

এভাবে আসতে থাকলেই তো হয়েছে। কৌতূহল যদি একবার মজা দেখার খুশিতে নির্লজ্জ হয়ে ওঠে, সেটা অনেক সময়েই বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। ভাট দম্পতির সে সাহস থাকতে পারে। কিন্তু আমার গায়ে জ্বর এসে যাবে।

অমৃতলাল বললেন, 'কোনোদিন দেখেনি, দেখবার সৌভাগ্য হল।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসলে কি জানেন দাদা, রাত্রি দশটার পরে, গীতার জন্যই করিডরে এলাম। ও আবার রোজই একটু পান করে কি না।'

শ্রীমতীর চোখের কোল ফোলা দেখে সেই রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে, কেন। অন্তত গীতা ভাটের ক্ষেত্রে, এটা প্রাত্যহিক না করে তুললেই কি চলতো না। যদিও, কাদের কিসে ঠিক, তা জানি না। ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। কোনোদিকে না তাকিয়েই সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেন। বোধ হয় পুরুষ মানুষ বলে। অমৃতলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা, আপনাকে তো জিজ্ঞেস করা হলো না, এ সব আপনি পছন্দ করেন কী না?'

'কী সব?'

'গীতার ড্রিংক করা?'

গীতা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। ওঁর চোখে ঠোঁটে হাসি। কী বলবো। আমি কি বলবো, পছন্দ করি না। বলতে গেলে, আমার পছন্দ অপছন্দ, কোনোটাই নেই। কেউ যদি খেয়ে খুশি হন, আমি অখুশি হব কেন। সেই খুশির ধাক্কাটা, আমাকে অখুশি না করে তুললেই হলো। বললাম, 'অপছন্দ করবো কেন। যার যা ভালো লাগে।'

গীতা বললেন, 'দাদার সঙ্গে তুমি কথায় পারবে না। বলেছি তো, ওঁকে ঠিক ধরা যায় না।'

অমৃতলাল স্নেহমুগ্ধ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ফ্লাস্ক খুলে, দুজনের শূন্য পাত্র পূর্ণ করলেন। গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে। অমৃতলাল স্ত্রীর

দিকে চোখ রেখে বললেন, 'ওকে এটা আমিই ধরিয়েছি দাদা। আমাদের আর কী আছে বলুন, বুড়োবুড়ির জীবনটা ঠিক কেটে যাবে।'

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কিন্তু বুড়োবুড়ি। কোন্‌-খানটায়? দেখে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। দুজনকেই এখনো বেশ যুবক-যুবতী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই মুহূর্তে আমার মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জেগে উঠলো। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। দেখলাম, গীতার চোখের পাতা যেন একটু ভারি হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখের তারায় ঝিলিক আছে। অমৃতলালের নত মুখ। বললেন, 'সী ইজ থার্টি ফোর, আই অ্যাম ফরটি, ম্যারেজ লাইফ টুয়েল্‌ভ ইয়ারস্‌, বাট—।'

গেলাসে চুমুক দিলেন। অমৃতলালের গলা এখন মোটা শোনাচ্ছে, কথা মন্থর। বাঙলায় বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়ে নেই দাদা। হয়নি।'

কথাটা যেন হঠাৎ একটা বস্তাপচা পুরনো গল্পের মতো শোনালো। তবু, অমার মনটা বোধ হয় সেই আদ্যিকালের, তাই চমকে উঠলাম। এই প্রশ্নটাই মনে এলো। বিশেষ করে অমৃতলালের ব্যথাটা যেন সহজ সুরে গভীর ভাবে বেজে উঠলো। এখন এই লোককে দেখলে, মনে করা যায় না, বাঙালিনীর জন্য ব্যর্থ প্রেমের হাহুতাশ কিছু আছে।

অমৃতলাল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উই আর চাইল্ডলেস।'

গীতা আমার দিকে দেখলেন। গেলাসে চুমুক দিলেন। কিন্তু যতদূর জানি, নিঃসন্তান মহিলারা একটু শুচিবায়ুগ্রস্তা হন। তথাকথিত পবিত্রতার ব্যধিতে ভোগেন। মেজাজী হন। গীতা ভাটকে দেখে, সে কথা একবারও মনে হয় না। তিনি সুরাসক্তা, ধূমপানেও অভ্যস্ত দেখলাম। কথাবার্তায় যথেষ্ট হাসিখুশি। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তাররা কী বলেন?'

'নো হোপ।'

তারপরে বাঙলাতে বললেন, 'এটা দাদা ভগবানের মার আছে। কিছু করতে বাকী রাখিনি। কোথায় না গিয়েছি। তারকেশ্বর বলেন, বক্রেশ্বর বলেন, কোনো জায়গা বাদ রাখিনি। দুজনে গিয়ে হত্যো দিয়েছি। দাদা, ওর কোমরে অনেক জড়ি বুটি মাদুলি আছে। গলায় সোনার হারের লকেট দেখছেন, ওটা একটা মাদুলি।'

অমৃতলাল গীতার দিকে মুখ ফেরালেন। গীতা শূন্য গেলাস তুলে বললেন, 'দাও।'

অমৃতলাল বললেন, 'আর থাক গীতা।'

গীতা চোখের পাতা বুজিয়ে বললেন, 'একটুখানি দাও।'

অমৃতলাল আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ফ্লাস্ক থেকে সামান্য একটু পানি ঢেলে দিলেন। স্ত্রীর মাত্রার ব্যাপারে দেখছি সজ্ঞান। কিন্তু এই দুজনের এতক্ষণের সমস্ত ছবিটা আমার কাছে বদলে গিয়েছে। আমি আর একবার গীতা ভাটকে দেখলাম। নাভির নীচে শাড়ির বন্ধনী, ঘাড় অবধি চুল, পোশাকে আশাকে আধুনিকা। ইংরাজিতে অনায়াসে কথা বলেন। মদ্যপান করেন, সিগারেট খান। তারকেশ্বরে হত্যে দিয়েছিলেন। তখন ওঁকে কেমন দেখাচ্ছিল, জানি না। মানুষের পোশাক, মুখের ভাষা, কতগুলো অভ্যাস, কিছুই না। বাউলের গানের কথায় বলতে ইচ্ছা করে, 'এই মানুষে সে মানুষ আছে।' চিরমানুষের খেলাটা, চিরদিনই অন্যখানে।

গীতা ভাট আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি এখন দেওয়ালে হেলান দিয়েছেন। চোখ বোজা। পান পাত্র আবার শূন্য। অমৃতলাল স্ত্রীর কাঁধে হাত দিলেন। বললেন, 'চলো গীতা, এবার শুয়ে পড়বে।'

বলে গীতার হাত থেকে শূন্য গেলাসটা নিলেন। গীতা রক্তিম চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। হাত তুলে বললেন, 'গুডনাইট দাদা।'

অমৃতলাল বললেন, 'আবার কাল দেখা হবে।'

আমি দুজনকেই বললাম, 'শুভরাত্রি।'

ওঁরা দুজনে ভিতরে চলে গেলেন।

আমি করিডরের অন্য প্রান্তে কামরার দরজার কাছে গেলাম। তখনই ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। গাড়ি চলছে অবিরাম। যাত্রীরা নিদ্রিত। আমার নির্বাসনের যাত্রাটা ভরে উঠলো বিমর্ষ বিষণ্ণতায়। অথচ এমন কথা ছিল না। আমার তো শ্রবণ রুদ্ধ দৃষ্টি বন্ধ, অনুভূতি অন্ধ থাকার কথা ছিল। তখন জানতাম না, পুত্রের জীবন নিয়ে এক পলাতক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। অপুত্রক অমৃত-গীতার সঙ্গে চলতে চলতে পরিচয় হয়ে যাবে। অবাক লাগে, এবং এই মন নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে না। কোনো জবাবের প্রত্যাশা জাগে না। জীবনের দিকে তাকিয়ে, মাথা নত করে, চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। একজনের আছে, বুকে করে নিয়ে ছুটেছে। যাদের নেই, তারা না-থাকাটাকে বুকে চেপে নিয়ে ঘুরছে।

রাজধানী। স্টেশন নতুন দিল্লী। গাড়ি তার সময় রক্ষা করেছে, কথামতো কাঁটায় কাঁটায়। একেবারে খাঁটি রাজধানী এক্সপ্রেস। জায়গা অচেনা না। পুরনো পরিচয় আছে। তবু এবারের আসাটা, 'চলো দিল্লী পুকারকে'-র মতো না। এবার নিঃশব্দে, চোখের আড়াল দিয়ে, পুরনো পরিচয়ের সূত্র বাদ দিয়ে।

রাত্রিটা জাগরণেই প্রায় কেটেছে। তা কাটুক। দুঃখটা সেখানে না। যিনি নরনারীর লীলাবিধৃত রঙীন ছবি দেখে মুগ্ধ, তিনি যে নিদ্রিত অবস্থায় একটি ব্যাঘ্র, তা কে জানতো। প্রায় পাগল করে দিয়েছেন। নাক ডাকানোর জন্য কেন বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা রুজু হয়, কাল সারা রাত্রে তা বোঝা গিয়েছে। বাড়ি আর গাড়ি বলেও কি কোনো কথা নেই।

সকালবেলা প্রাতরাশের পরে, ধূমপানের সময় করিডরে ভাট দম্পতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সকালবেলা তাঁদের বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। চেয়ার আসনেই দুজনে বেশ ঘুমিয়েছিলেন, মনে হলো। গীতা ভাট বলেছেন, 'কাল রাত্রে কোনো অন্যায় আচরণ করিনি তো?'

বলেছি, 'একেবারেই না।'

অমৃতলাল জানতে চেয়েছিলেন, রাজধানীতে কোথায় বাস করবো। বলা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর সঙ্গে একটু মিথ্যাচার করতে হয়েছে। স্বেচ্ছা নির্বাসনের হদিশ বলা যায় না। কিন্তু তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন। বাসস্থান তাঁর শ্যালকের। আগমনের উদ্দেশ্যও জানিয়েছেন, একজনের ব্যবসা, আর একজনের ভ্রমণ। মাস খানেক থাকবেন। বলেছি, সময় পেলেই দেখা করবো।

ঠাণ্ডা কামরার বাইরে, রাজধানীর উত্তাপ নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে বেশ বেশি। তবু বাইরের এই উত্তাপ এবং বাতাসই যেন ভালো লাগছে। এটা প্রাকৃত, অন্যটা অপ্রাকৃত। গন্তব্য আগেই ঠিক করা ছিল। স্যুটকেশ নিয়ে, ট্যাক্সিতে চেপে, যাত্রা একেবারে নয়াদিল্লীর বুকের কাছাকাছি। বলেছিলাম আগেই, এ নগর তিলোত্তমা। সারা দেশের তিল তিল সম্পদ এনে সাজানো। শুধু সারা দেশ কেন। বিদেশের সম্ভারও কিছু কম আসেনি। বিশেষ করে বৃক্ষ। আরাবল্লীর পাহাড় সীমা দিয়ে ঘেরা, পাহাড় কেটে জনপদ গড়া, আর যে নগরের হাতায় মরুভূমি, তাকে সবুজ আর ছায়াস্নিগ্ধ করে তোলা হয়েছে। শুনেছি, তার জন্য বিদেশ

থেকেও বৃক্ষের আমদানি হয়েছে। সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের কলকাতা, এখন ভারতের রাজধানী এখন মরুভূমি। এমন নিবিড় গাছপালায় ঘেরা সবুজ হওয়া তার ভাগ্যে কোনোদিন ঘটবে কী না জানি না।

বাঙালী বলেই কি কথাটা মনে এল। জবাব মিলবে ভারতের অর্থনীতির বিচারে। সে বিচারে যাবো না। আপাতত এই নগরকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মন জুড়াবে কী না জানি না। ট্যাক্সি বাঁক নিয়ে ঢুকলো এক নিবিড় গাছপালা ছায়ায় ঘেরা রাস্তায়। নগরের রাস্তার ধারে শুনছি, পিক পিক পিউ পিউ। গাড়ি ঢুকে গেল খোলা গেটের ভিতর দিয়ে। দাঁড়ালো খসখসের বেড়া ঘেরা, মাথায় চালা ঘরের সামনে। তার দরজায় দাঁড়িয়ে, কোমরে কৃপাণ ঝোলানো শিখ। শাদা উর্দি, মাথায় পাগড়ি। মোম পালিশ চকচকে দাড়ি, গোঁফের দু পাশ দুটি বর্শার মতো তীক্ষ্ণ। আমাকে দরজা খোলার সময় দিল না। ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল, তার আগেই কপালে হাত ছুঁইয়েছে। সর্দারজীকে দেখতে যেমন ছবির মতো, কাজে তেমনি কেতাদুরস্ত। আঙুল তুলে ডাকলো পোর্টারকে। ড্রাইভার কেরিয়ার খুলে দিতে, পোর্টার সেটা তুলে নিল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। ভেজা খসখসের বেড়ার মাঝখান দিয়ে এগোতেই, সর্দারজী রিসেপশন-লাউঞ্জের কাঁচের দরজা খুলে দিল।

ভিতরে একেবারে অন্য চেহারা। কালা গোরার ছড়াছড়ি। কালার থেকে গোরা বেশি। তবে এ গোরা, সে গোরা না। অধিকাংশরই গালে দাড়ি, আকাটা চুল ঘাড়ে লতানো। কেউ আছেন শুরু পাঞ্জাবী পায়জামায়, এবং খালি পা। কেউ বা শার্ট প্যাণ্ট আর গেঞ্জিতেই নিজেকে পর্যাপ্ত মনে করেছে। গোরিরাও বিচিত্রবেশিনী। কেউ ঘাগরা পাঞ্জাবী, পায়জামা পাঞ্জাবী কিংবা চোস্তের ওপরে শার্ট। নিতান্ত হাফ প্যাণ্ট হাফ শার্টেও কেউ আছে। অনেকেরই পদযুগল পাদুকাবিহীন ধূলালাঞ্ছিত। কারোর প্রসাধন কেবল মাত্র চোখে কাজল, কপালে লাল ফোঁটা। একজন গোরি আবার পানও চিবোচ্ছে।

কলকাতায় এদের দেখা একেবারে পাইনি, তা না। চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রিট আর ময়দানের এলাকায়, কিছু কিছু দেখেছি। কেউ সিগারেট খাচ্ছে, কেউ পানে ব্যস্ত। নানা বর্ণের পানীয়। কিন্তু সুরা না। আগে থেকেই জানি, লাউঞ্জে, ডাইনিং হলে, ও বস্তু নিষিদ্ধ। এটা পান্থশালা বটে, হোটেল না হস্টেল। একটি ধর্মীয় সংস্থার যোগ আছে এর সঙ্গে, পরিচালনার ভার তাদেরই। একটা ছোট কথা হস্টেলের নামের সঙ্গে জোড়া আছে 'ট্যুরিস্ট'। এ আবাস ভ্রমণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট।

অধিকন্তু আমাদের বরাবরের দেখা গোরা গোরিও দু-চারজন আছে। যাদের পোশাক আশাক নিয়মমাফিক। কালোও কিছু আছেন আমার মতো। তবে সকলেই সাহেব এবং শাড়ি পরা থাকলেও, সবটুকুই মেম। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি সত্যি দড়ো কী না, জানি না। ছেলের মতো চুল ছাঁটা, তবু কপালে গোলাপি ফোঁটা দেখলে মনটা ছমছমিয়ে ওঠে। তাকিয়ে দেখলে অপরাধ নেবেন না তো। তবে নির্বাসনের আদর্শ জায়গা। এখানে কেউ 'দাদা কি··' ধরনের কথা বলে এগিয়ে আসবেন না। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমি যে দেশ থেকে এসেছি, সে দেশের কেউ এখানে নেই। একমাত্র এক কোণে, এক বর্ষিয়সী মহিলা এবং একটি তরুণীকে দেখে ধন্দ লাগছে। বাঙালী হলেও হতে পারেন।

কিছু যায় আসে না। এটি একটি আন্তর্জাতিক ভ্রাম্যমাণ আবাসিকদের আবাস। জনতার মধ্যেও আমি নির্জনবাসী। সকলেই পত্র-পত্রিকা ধুমপান ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি নিয়ে একটু আয়েসের মেজাজে। কেউ কেউ কথায় বার্তায় রত, নিচু স্বরে। বাঁদিকে ডাইনিং হল। যতো ব্যস্ততা, ডানদিকে রিসেপশন কাউণ্টারে, ক্লার্ক আর ক্যাশিয়ারের টেবিল ঘিরে। পোর্টার আমার স্যুটকেস সেখানেই রেখেছে। এগিয়ে গেলাম। কথাবার্তা যা কিছু, প্রাক্তন রাজভাষায়। 'সুপ্রভাত জানিয়ে নিজের নাম বললাম, বুকিং-এর তারিখটাও জানালাম। ক্লার্ক জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ব্লক?'

বললাম, 'ইকনমি।'

এই আবাসে দুই শ্রেণীর ব্লক আছে ইকনমি আর এয়ার কণ্ডিশণ্ড। ইকনমিটাই আমার কাছে সব দিক থেকে উপযুক্ত। বাঙলায় যাকে বলা যায়, সস্তা ব্যবস্থা। আমি বিলাস ভ্রমণে আসিনি। এসেছি অপরিচিত পরিবেশে, চুপচাপ একলা কাটাতে। দিল্লীর গরম? ভয়ের কথা বটে। কিন্তু এখনো তেমন কিছুই তো টের পাচ্ছি না। এই যদি জুনের গরম, তবে কুছ পরোয়া নেই। পাখার বাতাসই যথেষ্ট। দরজা জানালা বন্ধ করতে পারলে, সেখানেই শান্তি। তেমনি ঠাণ্ডা ব্লকের তুলনায় টাকার অংকটা অর্ধেক।

ক্লার্ক একটি স্লিপে আমার ঘরের নম্বর লিখে পাশের ক্লার্ককে দিলেন। পাশের ক্লার্ক রেজিস্টার খুলে এগিয়ে দিলেন নাম পরিচয় আগমনের সময় ইত্যাদি লিখতে। এ সব প্রয়োজন মিটিয়ে, এখানকার নিয়ম অনুযায়ী, আগাম টাকা জমা দিয়ে, পোর্টারের পিছু পিছু গেলাম। লিফ্টের খাঁচায় ঢুকে চারতলায়। বেয়ারা চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ছোট ঘর, ছোট খাট, কিন্তু ভালো। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আকাশছোঁয়া বাড়ি, ঘন

গাছপালা। একটি দরজা খুলে দেখলাম, ছোট একটি বারান্দা। সন্ধ্যের পরে পা ছড়িয়ে বসবার মতো।

ঘরের এক পাশে, দেওয়ালের সঙ্গে জোড়া টেবিল। দুটি লাল মলাটের ভারি বই। খুলে দেখলাম, একটি ফরাসী থেকে ইংরেজি অভিধান। আর একটি বাইবেল। আমার কাজে লাগবে কী না জানি না। বাইবেলটি হয়তো কখনো সঙ্গী হতে পারে। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, ছোট আলনায় শাদা বড় তোয়ালে। একটি জামাকাপড় রাখার আলমারি। বেয়ারা কাঁচের জাগে ঠাণ্ডা জল দিয়ে গেল। দেওয়ালে আঁটা আয়নার দিকে তাকালাম, বললাম, 'এই ভালো। থাকো নির্বাসিত।'

তথাপি কী যেন নেই ভেবে মনটা তুষ্ট হচ্ছে না। কী নেই, তা জানি। ঘর সংলগ্ন বাথরুম নেই। সেটা এজমালি। বাইরে বেরিয়ে বেয়ারাকে তার হদিশ জিজ্ঞেস করতে, লম্বা ব্লকের একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'জেণ্টস্' অন্যদিকে 'লেডিজ'। পুরুষদের উঁকি দিয়ে দেখে এলাম। সারি সারি তিনটি বেসিন। দুটো স্নানের ঘর। পাশে অন্যান্য প্রাতঃকৃত্যাদির ব্যবস্থা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দ কী। ভিড় কেমন হবে জানি না। এখন তো দেখছি দুজন স্নানে ব্যস্ত বন্ধ ঘরে।

ফিরে এসে, লম্বা করিডরের এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে গুটিকয় সোফা, টেলিফোন। জনা চারেক বিচিত্র বেশ গোরা গোরি বসে আছে। অর্থাৎ ইকনমির সবই এজমালি। টেলিফোনটা বাইরে এসে করতে হবে। আমার দরকার হবে না। আমি কারোকে ডাকবো না। আমাকেও কেউ ডাকবে না। আমার কোনো অসুবিধে নেই। তবু একটা অসুবিধের কথা শোনালো বেয়ারা। বাথরুমে যাবার সময় যেন ঘরে চাবি বন্ধ করে, চাবিটা সঙ্গে নিয়েই যাই। তাকে চা আনতে বলে, ঘরে ঢুকে, স্যুটকেশ খুলে আগে দাঁত মাজা দাড়ি কামানো আর স্নানের জিনিসপত্র বের করলাম। এ সব নিয়ে একবার যেতে হবে, আর একবার ফিরতে হবে। তাও কি এখানে নাকি। কম করে পঞ্চাশ গজ হেঁটে গিয়ে। নিরুপায়। ইকনমি যে। তা হোক, ক্ষতি নেই। কোটি কোটি মানুষের ক'জনাই বা এই সুবিধা ভোগ করে।

চায়ের পাত্র শেষ করে, ঘরে চাবি লাগিয়ে, প্রায় একটা স্টেশনারির বোঝা নিয়ে, কাঁধে তোয়ালে ফেলে, বাথরুমে গেলাম। ঢুকেই যার মুখটি দেখতে পেলাম, সে গোরা। মাথায় সোনালি বাবরি চুল, গালপাট্টা জুলপি। চোখের পিঙ্গল তারা কাঁপিয়ে, এক গাল হেসে বললো, 'হ্যালো, গুডমর্নিং।'

জবাবে আমার মুখ দিয়ে বেরুলো, 'মর্নিং।' কিন্তু হে ঈশ্বর, এ কী দেখছি আমি। কিংবা, সত্যিই দেখলাম নাকি আমি? এ জোয়ান গোরা কি উন্মাদ। এ এত নির্দয় কেন, অথবা এমন নিষ্ঠুর উদাসীন? ও কি এক চিল্‌তে কাপড়ও অঙ্গে ধারণ করতে পারেনি? অথচ বেসিনের সামনে, আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নির্বিকার ভাবে, ফিলিপিনো জুল্‌পি বাঁচিয়ে, গালে বুরুশ দিয়ে সাবান ঘষছে। ও তো দেখছি দাড়িও কামায়। ওকে দেখে, মাইকেল এঞ্জেলোর আদমের সৃষ্টি সেই নগ্ন পুরুষ বলে মনে হচ্ছে না। সেই চিত্র তো অন্য জিনিস। উদাসীন, বিষাদঘন দৃষ্টি মেলে যে বসে আছে পাহাড়ের কোলে। কিন্তু এ আমি কী দেখলাম? ও কি তোয়ালেটাও কোমরে জড়াতে পারেনি?

রাগ এখন আমার মাথায় উঠে গিয়েছে। অবাক আর অস্বস্তিতে, কয়েক মুহূর্ত প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠলাম। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, আমার পক্ষে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো তো অনেক দূরের কথা। ইকনমির কী ঝকমারি। ফিরতে যাবার আগেই শুনতে পেলাম, 'গুড্, আই হেল্প য়ু?'

কোনো রকমে বলতে পারলাম, 'থ্যাংক্যু।'

দরজার দিকে পা বাড়াতেই, একটি কৃষ্ণ কালো যুবককে ঢুকতে দেখলাম। সাদা শার্ট ট্রাউজার পরা, গম্ভীর মুখ। ঢুকেই ইংরেজিতে যা বললো, তার মানে হয়, 'আপনাকে কোমরে কিছু জড়াতে বললে, আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

সহাস্যে জবাব এলো, 'কিছুমাত্র না। তবে আপনাদের দেশে যা গরম।'

কালো যুবক গম্ভীর ভাবেই বললো, 'ঘরের দরজা বন্ধ করে আপনি সব স্বাধীনতা ভোগ করবেন।'

'ধন্যবাদ।'

কালো যুবক যাবার আগে, আমার দিকে চেয়ে, একটু ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'আপনি চান করুন।'

যুবকে কে, জানি না। বোধ হয় এখানকারই কেউ। তা না হলে বোধ হয়, এ ভাবে বলতে পারতো না। মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। আস্তে আস্তে মুখ ফেরালাম। পাগলটা কিছু জড়িয়েছে তো? জড়িয়েছে। দাড়ি কামাচ্ছে। পাগল ছাড়া একে আর কী বলবো। দিনে দুপুরে, লোকজনের সামনে অঙ্গে একেবারে কিছুটি না রেখে দাড়ি কামাবে, এ আবার কেমন কথা। কারণ কী?

গরম। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, এ কী গরম ভাই। বেহায়া, লজ্জা বলে কি কিছু নেই।

অবিশ্যি নগ্ন পুরুষ দেখিনি, এমন নয়। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় নগ্ন নাগা সাধু দেখেছি। জটাজুটধারী, খালি গায়ে ছাইভস্মমাখা আরক্ত চক্ষু সাধু, মাঘের প্রচণ্ড শীতে, খোলা আকাশের তলায় আসীন। কখনো কৃপাণ হাতে, নাগা সাধু অশ্বারূঢ় অথবা হস্তীপৃষ্ঠে। সেই নগ্নতাকে একেবারে আলাদা মনে হয়েছে। এমন কি নগ্ন সন্ন্যাসিনীও দেখেছি। ভোরের আবছায়ায়, গৃহাবধূতের সমগ্র পরিবারকে, সঙ্গমের জলে, নগ্ন হয়ে স্নান করে উঠতে দেখেছি। পুরীর সমুদ্রের নির্জন সৈকতে, ভোরবেলা নগ্ন হয়ে পুরুষকে জপ করতেও দেখেছি। অনভ্যস্ত চোখ হয়তো নত হয়েছে, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু চমক বা অস্বস্তি কিছুই হয়নি।

গোরা যুবক দাড়ি কামিয়ে দাঁত মাজবার উদ্যোগ করছে। আমার অস্বস্তিটা কেন তখনো কাটেনি। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি বিরক্তিবোধ করেছিলেন?'

বলালাম, 'না, অস্বস্তি বোধ করছিলাম।'

'কিন্তু গরমটা কি সত্যি খুব বেশি না?'

বললাম, 'আপনার পক্ষে হয়তো তাই। আমাদের পক্ষে ততোধিক নয়।'

ও দাঁত মাজতে আরম্ভ করলো। আমিও আমার কাজে মন দিলাম। কিন্তু মুখ ধুয়ে পাগলাটা স্নানের ঘরে ঢুকলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি এখানকারই অধিবাসী?'

বললাম, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

'ক্যালকাটা। আমরা—মানে আমাদের দলটা যাবো বলেই ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু সেখানে নাকি কী সব গোলমাল চলছে?'

'কী রকম গোলমাল বলুন তো?'

'রাজনৈতিক?'

বললাম, 'খানিকটা। একটা অস্থিরতা আর বিভ্রান্তি বলতে পারেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'ক্যালিফোর্নিয়া।'

আমৃরিকি। পৃথিবীর সব থেকে ঝলমলে চঞ্চল দেশ। বলতে ইচ্ছে করে। অথবা পাগলা দেশ। কেতাব আর ছবি দেখে তাই মনে হয়, এত পাগলামি আর কোথাও নেই। অবিশ্যি সব ক্ষেত্রে বলা যাবে না। কলকাতায় যে সব মহিলা পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাঁদের কারোর মধ্যেই পাগলামি দেখিনি।

ক্যালিফোর্নিয়ার যুবক আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি মনে হয়, আমরা ক্যালকাটায় যেতে পারব না ?'

বললাম, 'আমার তো মনে হয়, আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। বিদেশীদের কোনো রকম তাড়না করা হয়েছে বলে শুনিনি।'

'কিন্তু এখানে কেউ আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে না, বরং নিরুৎসাহিতই করছে।'

হেসে বললাম, 'এখন আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করুন।'

কিন্তু এখানেই শেষ না। ও বললো, 'আপনার সঙ্গে আবার কথা বলবো। আমার বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আপনার কাছে আসবো।'

ও স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। দেখছি, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এতটা কি আমার সইবে। বন্ধুদের নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবার কী থাকতে পারে। কলকাতায় যাওয়া না যাওয়ার বিষয় নিশ্চয় ওদের দিল্লীর দূতাবাসই ভালো বলতে পারবে। এই ক্ষ্যাপা যুবকের আসল কথা কী, তা-ই বা কে জানে। ক্ষ্যাপাদের আমি ভয় করি।

তিন দিন কাটলো, নির্বাসনের অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছনে ফিরছে। তার আগে ভালোটুকু বলাই ভালো। বৌ কথা কও বা চোখ গেল পাখিকে এ দেশে কী নামে ডাকে জানি না। পিউ কহাঁ ? সে নামটিও সুন্দর। নগরের বুকের ওপর বসে, সকালে বিকালে তাদের ডাক শুনি। অবাক লাগে। তার সঙ্গে যেটা শুনতে পাই, সেটা একটা অদ্ভুত ধাতব শব্দ। যেন বহুদূর থেকে, ঠং ঠং করে ময়দানবের ঘণ্টা বাজছে। কেননা তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই একটা ভারি যান্ত্রিক শব্দ বেজে ওঠে। বেয়ারার কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, একটা কুড়িতলা ইমারতের ভিত্ কাটা হচ্ছে পাশের জমিতেই। ময়দানবের কল্পনাটা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। আমার মনে হয়, শব্দটা যেন জাগতিক না। রক্তকরবীর রাজপুরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনিতে আকাশ নীল। কেন এ দেশকে গরম বলে বুঝি না। আমার অসহ্য মনে হচ্ছে না। গতকাল বৃষ্টি হয়ে যাবার পরে, আকাশের রঙ গাঢ় নীল। গাছপালায় সবুজের ঝিলিক বেড়েছে।

কিন্তু সব ভালো কালো হয়ে উঠেছে, ইকনমির এজমালি বাথরুম। সকাল-বেলা লাইন পড়ে যায়। অধিকাংশই গোরা। চুল দাড়ি থেকে শুরু করে সকলেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। কেউ কেউ (ছেলেরা) আবার বেণীও বাঁধে। গোরাদের

গায়ের গন্ধ এত খারাপ লাগতে পারে, আগে এতটা জানা ছিল না। তারপরে, নাগা হবার প্রবণতাটা অনেকেরই আছে। বাথরুমে এলে যেন আর অঙ্গে কিছু রাখতে পারে না।

গতকাল সন্ধ্যেয় তো 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' করে আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করেছিল। অপরাধের মধ্যে টেলিফোনের সামনে, সোফায় একটু চুপ করে বসে ছিলাম। কাছে কেউ ছিল না। হঠাৎ হাসির শব্দে চোখ তুলে দেখি, তিন শ্বেতাঙ্গিনী, অন্য প্রান্তের স্নানঘর থেকে ফিরছে। এই আবাসের দেওয়া শাদা তোয়ালে দিয়ে, সর্বাঙ্গ যত জড়ানো যায়, ততটা জড়ানো আছে। গা ভেজা, চুল বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরছে।

এ পর্যন্ত 'প্রায়' ঠিক ছিল। কিন্তু একজনের হঠাৎ কী খেয়াল হল, তরুণী অনায়াসে তোয়ালে খুলে গা মুছতে লাগলো। মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে গেল। আমার দিকে সে ফিরেও তাকায়নি। চোখ নামিয়ে নিয়ে যখন আবার চোখ তুললাম, তখন আমার মুখটা দেখতে কেমন হয়েছিল জানি না। দেখলাম, এক উর্দিপরা প্রৌঢ় বেয়ারা আপন মনেই হাসছে। তার দিকে তাকাতে আমার লজ্জা করছিল। পাছে চোখাচোখি হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম।

এও হয়তো পাগলামি। কিন্তু হজম করতে পারছি না। ইকনমি ব্লক না হলে নিশ্চয় এ সব দৃশ্যের সামনে পড়তে হোতো না। যতো গোলমাল, এজমালি স্নানঘর নিয়ে। ইতিমধ্যে গত পরশু দিন, ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রীমান, ওর বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে এসেছিল। সাকুল্যে জনা ছয়েক, তিন গোরা, তিন গোরি। একেবারে ভর দুপুরে, খাবার পরেই। সকলেই সকলের নাম বলেছিল, পদবী বাদ দিয়ে। ওদের বসতে দেবার জন্য ভাবতে হয়নি। সবাই অনায়াসে মেঝেতেই বসে গিয়েছিল। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি। আমার প্রথম পরিচিতি শ্রীমানের নাম গ্রেগরি। সে একটি মেয়েকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ও আমার স্বামী, জেনী।'

আমার প্রায় জিভ কামড়াবার অবস্থা। স্ত্রীলোক স্বামী! বলেছিলাম, 'তাই নাকি? তোমরা সবাই তাই?'

গ্রেগরি বলেছিল, 'হ্যাঁ। আমাকে অবিশ্যি জেনী বিয়ে করেছিল আগেই। এরা এখানে এসে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গিয়েছে।'

'হয়ে গিয়েছে মানে?'

'ওরা মনে করে, ওরা স্বামী স্ত্রী।'

আমি সকলের দিকে তাকিয়েছিলাম। সকলেই হেসে হেসে, গ্রেগরির কথায় ঘাড় নেড়ে সমর্থন করেছিল। একটি যুগল, সিগারেটের ভিতর থেকে তামাক ফেলে দিয়ে, টিপে টিপে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যা ভরছিল, তা যে গাঁজা, আগেই জানা ছিল। কলকাতায় দেখেছি। নেশায় তো আর বাধা দেওয়া যায় না। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে কিছু করছিল না। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, ওরা এই আবাসের ডাইনিং হলে লাঞ্চ ডিনার কিছুই খায় না। বাইরে ডাল তরকারি মাংস দিয়ে ভাত খায়। প্রাতরাশটা এখানেই খায়। কেননা, সেটা ঘরভাড়ার সঙ্গে পাওয়ানা। ওদের সারল্যটা ভালো লেগেছিল। কিন্তু হাত-পায়ের এমন শ্রী কেন। সকলের পায়ে জুতো ছিল না। হাতে পায়ে ধুলা। জামাকাপড়ের অবস্থাও সেই রকম। একটি মেয়ে ছেলেদের পাঞ্জাবী পরেছিল। পাঞ্জাবীর কাপড়টা ফিনফিনে আদ্দির থেকেও পাতলা। বোতাম খোলা। ভিতরে কোনো অন্তর্বাস ছিল না। স্ত্রী-ই যখন স্বামী, তখন এটাই বা চলবে না কেন। তবে একটা কথা বলতেই হবে, হাল আমলে যাকে বলা হয় সেক্‌স, ওদের আচরণে তার কোনো চিহ্নই ছিল না। অতএব, পোশাকটাও এক ধরনের বিদ্রোহই হবে। তবে পাগলকে সাঁকো নাড়া দেবার মতো কোনো কথাই আমি জিজ্ঞেস করিনি। কোনো কিছুর ব্যাখ্যা শুনতে আমার অনীহা।

একটি মেয়ে, গঞ্জিকাপূর্ণ সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলাম, 'ওটা আমি পারবো না।'

গ্রেগরি বলেছিল, 'কখনো স্বাদ নাওনি?'

নিইনি, তা কেমন করে বলবো? এখনও যে পরিষ্কার মনে আছে কেঁদুলির বাউল মেলায়, গোপাল বাউলের কল্‌কেয় মুখ ঠেকাতে হয়েছিল। সেটা এক রকম। এটা আর এক রকম। এই ভরদুপুরে খেয়ে এসে, ওদের সঙ্গে গঞ্জিকা সেবন, ইচ্ছা করছিল না। বলেছিলাম, 'কখনো নিইনি বললে ঠিক বলা হবে না। অভ্যাস বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই।'

'চেষ্টা করে দেখ।'

'মাপ কর। তোমরা চালাও।'

তা ওরা চালিয়েছিল। ভারতের কোনো কোনো সাধুনীকে গাঁজা সেবন করতে দেখেছি। এদের কথা শুনেছি, কোনো মেয়েকে চাক্ষুস খেতে দেখিনি। পরশুদিন দেখেছিলাম। স্বামীরা (মেয়ের) স্ত্রীদের থেকে কোনো অংশেই কম না। একটু বেশিই। কল্‌কে ধরে টান না, কিন্তু টানের বহর বেশী চড়া। কয়েকজন দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসেছিল। গ্রেগরি ওর পকেট

থেকে বের করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্টব্যুরোর রঙীন ছবি ছাপা বিবরণ। ও জানতে চেয়েছিল, ছবির জায়গাগুলো আমার দেখা আছে কী না। যতটা জানা ছিল, বলেছিলাম। ওরা চা খেয়ে বিদায় নিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলার কনট সার্কাসের কোন্ চায়ের দোকানে ওরা থাকবে, সেটাও জানিয়েছিল। বলেছিল যেতে। আমার সাহস হয়নি।

এদিকে এখন, সাহস না, ইকনমি ব্লকে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। চতুর্থ দিনে, সকালবেলায় ব্লক না বদলিয়ে পারলাম না। জানি, শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত ব্লকের সুখ আমার ঠিক সইবে না। কিন্তু স্বস্তি পাবো। ঘরটি বড় না। আসবাবপত্র প্রায় এক রকমই। শয্যায় প্রভেদ অনেক। ঘরে টেলিফোন আছে। সংলগ্ন বাথরুম। জানালা দরজা মোটা পর্দায় ঢাকা। এটা ঠিক সহ্য হলো না। কাঁচের জানালা বন্ধ থাক, আপত্তি নেই। আকাশটুকু যেন দেখতে পাই। পর্দা সরিয়ে দিয়ে, তা পাওয়া গেল। একটু বেশিই পাওয়া গেল, ব্যালকনির ধারেই প্রকাণ্ড এক বটগাছের ডাল এসে ঝুঁকে পড়েছে।

কিন্তু অন্য দিকের ক্ষতিটা অনেকখানি। পাখির ডাক আর ঢোকবার জায়গা পেল না এ ঘরে। ময়দানবের সেই শব্দটা খুবই স্তিমিত। এই ঠাণ্ডা ঘরে এসে মনে হলো 'একেবারেই লুকিয়ে পড়েছি। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চমকটা লাগলো সেখানেই, পঞ্চম দিনে যখন টেলিফোন বেজে উঠলো ঘরের মধ্যে। নিশ্চয়ই কেউ ভুল করেছে। টেলিফোন অপারেটর ভুল করে লাইন দিয়েছে। রিসিভারটা তুলতে হলো। ওপার থেকে প্রশ্ন এলো, এটা—নম্বরের ঘর কী না। বলতে হলো, 'হ্যাঁ।' তারপরে আমার নামটা বলে, ইংরেজিতেই প্রশ্ন এলো, 'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি?'

পুরুষ গলা, মোটেই চেনা চেনা ঠেকছে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে বলছেন?'

গলা ভেসে এলো, 'তার আগে আমি জানতে চাই, আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছি তো?'

বললাম, 'যদিও খুব আশ্চর্যের, তবু হ্যাঁ। কে আপনি?'

এবার বেশ হাসি জড়ানো, অবাক স্বরে পরিষ্কার বাঙলা বুলি শোনা গেল, 'কবে এলেন মশাই?'

এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিতে চাইলাম, কার গলা হতে পারে। চিনতে

পারলাম না। এবার আমাকেও স্ব-ভাষাতেই জিজ্ঞেস করতে হলো, 'আপনি কে, সেটা আগে শুনি।'

ওপারের গলায় এবার একটু রহস্যের ছোঁয়া লাগলো, 'নাম বললে চিনতে পারবেন না, আপনার স্মৃতিশক্তি এতটা কম নয়। আমি সুবন্ধু।'

চমকে উঠে বললাম, 'মানে সুবন্ধু চ্যাটার্জি ?'

একটু হাসি, 'আপনার চেনা আর কোনো সুবন্ধু আছে নাকি ?'

সে কথায় আর না গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জানলেন কী করে ?'

জবাবে আবার একটু হাসি, 'ভুলে যাচ্ছেন, আমি একটা নাম-করা সংবাদপত্রের রিপোর্টার।'

'তা বলিনি। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে গোয়েন্দাগিরির মতো মনে হচ্ছে।'

'রিপোর্টাররা গোয়েন্দাদের থেকে অনেক বেশি জানে। এখন ব্যাপার কী বলুন তো ? ও রকম একটা জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে আছেন কেন ? এলেনই বা কবে ?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তার আগে বলুন, জানলেন কী করে ?'

'জানবো কেন স্যার, নিজের চোখেই দেখেছি।'

'কবে কোথায় ?'

'আপনার আবাসে, ডাইনিং হলে, গতকাল লাঞ্চের সময়। স্পষ্টই দেখলাম, সেকেণ্ড কোর্সের প্লেট-ভরতি গরু শুয়োর ভ্যাড়া দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন।'

এবার না হেসে থাকতে পারলাম না। তবু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে খেতে এসেছিলেন নাকি ?'

সুবন্ধুর গলা শোনা গেল, 'একটু সাংবাদিকতা করার পরে, লাঞ্চের পার্টিটা ওখানেই ছিল। লাঞ্চ যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা মদ্যপানটা পছন্দ করেন না বলে, ওখানে যাওয়া হয়েছিল।'

মনে পড়ে গেল, ডাইনিং হলের একদিকে, টেবিল জোড়া দিয়ে প্রায় তিরিশ জন একসঙ্গে খেতে বসেছিল। শুধু দেখেইছিলাম, কারোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই বড় পার্টির সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ। খেতে খেতেই, চোখে পড়ে গেল আপনাকে। সাংবাদিকের চোখ তো। কিন্তু তখনই ডাকাডাকি করলাম না। দেখলাম, আমাদের আগেই খেয়ে উঠে গেলেন, হাতে কামরার চাবি। বুঝতে পারলাম, ওই আবাসেই আছেন। খেয়ে উঠে খোঁজ নিলাম। ঘরের নম্বর পেলাম। কাজে চলে গেলাম। মনে মনে অবাক হলাম, দিল্লিতে এসেছেন, কেউ জানে না, কিছুই শুনিনি।'

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'খবরটা ক'জনকে বলেছেন?'

'কেন, ক্ষতির কারণ আছে নাকি?'

'জানাতে চাই না।'

'তাহলে এটাও জানবেন, যাকে তাকে জানানোটাও সাংবাদিকের কাজ না। তবে সে হিসাবে তো আপনি ভি আই পি নন। একজনকে বলেছি। কিন্তু এ সব কথা থাক, টেলিফোনে এতক্ষণ ধরে কথা চলে না। আমি যাচ্ছি, আছেন তো?'

আমার কৌতূহল বাড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে বলেছেন?'

'মিসেসকে।'

'মিসেস! আপনার মিসেস হলো কবে?'

সুবন্ধুর হাসি শোনা গেল, 'কেন, আমার মিসেস থাকতে নেই?'

'নিশ্চয়ই থাকতে আছে। আপনার বিয়ের খবরটা ছিল না।'

'অনেকেই জানতো না। করে ফেলে। যা-ই হোক, পরে সব বলছি। ঘর থেকে বেরোবেন না। ছাড়লাম।'

সুবন্ধু নিজেই লাইন কেটে দিল। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। অবাক হলেও, মনে মনে নিজের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে না হেসে পারলাম না। গেল নির্বাসনের অজ্ঞাতবাস। সুবন্ধু মিথ্যা বলেনি। একে বলে দৈব। তা না হলে, এমন জায়গাতেই লাঞ্চের পার্টি হবে কেন। সাংবাদিক সুবন্ধুই বা এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে খেতে আসবে কেন। তারপরে একবার যখন আমাকে তার চোখে পড়েছে, তখন পাকা সাংবাদিকের মতোই, আমার ঘরের হদিস খুঁজে বের করে নিয়েছে। কথাটা মিথ্যা না, সাংবাদিকরা অনেক সময় ঝানু গোয়েন্দার থেকেও বেশি। সে অভিজ্ঞতা আমার কিছু কিছু আছে। এখন যেটা ভয়ের কথা, সংবাদটা রটবে কতখানি। আমি সংবাদপত্রের সংবাদ হব না। পরিচিত মহলে জানাজানি হলেই, এ যাত্রা নিষ্ফল। ভরসা একমাত্র সুবন্ধু।

এক ঘণ্টার মধ্যে সুবন্ধু এলো। বেশ কয়েক বছর পরে তাকে দেখলাম। একরকমই আছে। ডাগর চোখ, কোমল মুখ, ঠোঁটে হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। শুধু বুদ্ধিদীপ্ত বলা চলে না। দুষ্টামিদীপ্তও বলা চলে। দরজায় শব্দ করে, ঘরে ঢুকে আমার দিকে একবার দেখেই, ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল।

চেয়ারে বসে, আমার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কী বলুন তো। দিল্লীর কাকপক্ষীও আপনার আগমন বার্তা জানে না?'

'সব সময়ে কি আর এক রকম ভাবে আসতে ইচ্ছা করে?'

সুবন্ধু ভ্রূকুটি চোখে জিজ্ঞেস করলো, 'বাংলা দেশের (পূর্ববঙ্গ) ব্যাপারে নাকি?'

'রাজনীতির মধ্যে নেই।'

'তা-ই তো জানি। কয়েকজনকে সেই কারণেও আসতে দেখছি কী না। তবে কি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড নিতে এসেছেন নাকি?'

'কোনোদিন চিন্তা করিনি।'

সুবন্ধু চোখে ঝিলিক দিয়ে হাসলো। বললো, 'সেটাও বিশ্বাসযোগ্য, তা হলে তো জানিয়েই আসতেন। তবে—তবে কি—।'

সুবন্ধু দেওয়ালের আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে, আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'তবে কি সরকারী সংস্থার কোনো মনোনীত সদস্যপদ নেবার আমন্ত্রনে?'

মনে মনে হাসছিলাম। সুবন্ধু সম্ভাব্য সব জায়গাতেই ঢিল ছুঁড়ে চলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা আবার কী?'

সুবন্ধু বললো, 'নাট্যকার সাহিত্যিকদের প্রতি এক ধরনের সম্মানী খয়রাতি বলা যায়। ধরুন মাসে হাজার দুয়েক টাকা বছর দুয়েকের জন্য। কখনো কখনো মিনিস্টারের চায়ের নিমন্ত্রনের জন্য উড়ে আসতে হলো কলকাতা থেকে—।'

হেসে উঠে বললাম, 'ও সব নিয়ে জীবনে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। এখনো পর্যন্ত নিজেই ভালো বিকোচ্ছি।'

সুবন্ধু ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, নিজের উরতের ওপর ঘুষি মেরে বললো, 'সে কথাও সত্যি। তাহলে কী হতে পারে। রাজনীতি নয়, কোনো সরকারী দাঁও নয়। সভাসমিতি করতে তো নিশ্চয়ই না, তাহলে বাঙালী মহলে জানাজানি হয়ে যেতো। তবে কি শাস্ত্রী ভবনে কোনো কাজ আছে নাকি?'

'শাস্ত্রী ভবনে কী কাজ হতে পারে?'

'কাগজের কোটা-টোটা যদি দরকার হয়ে থাকে?'

আবার না হেসে পারলাম না। বললাম, 'না, কাগজের মালিক বা সম্পাদক, কোনোটাই হবার বাসনা নেই। এ সব ছাড়া কি বাঙালীরা রাজধানীতে আসে না?'

'আসে। কিন্তু আপনার মতো ব্যক্তি চুপচাপ জানাজানি করে না আসাতেই কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগছে। তাছাড়া, খট্‌কা লাগবার আরো কারণ আছে।'

'যথা।'

সুবন্ধু বললো, 'রকমারী বাঙালি রকমারি জায়গায় আশ্রয় নেয়। একদল নেয় অশোকা হোটেলে বা ওবেরয় ইণ্টার কণ্টিনেণ্টালে। কেউ কেউ নিতে পারে বা ওই স্ট্যাণ্ডার্ডের কোথাও, কনট সার্কাসের আশেপাশে। কেউ যায় সোজা কালীবাড়ি, নয়তো আজকাল যেটা হয়েছে করলবাগের বঙ্গীয় সংসদের বাড়িতে। আপনার অবিশ্যি বন্ধুবান্ধবের আস্তানা আছে। সে সব কোনো জায়গায় না গিয়ে, এ রকম একটা আবাসে, যেখানে বিদেশীদের ভিড়, হিপিতে ঠাসা, দেশী লোকের প্রায় চিহ্ন নেই, এর মানে কী?'

হাসি পেল, বললাম, 'অনেক ভেবে ফেলেছেন দেখছি।'

'আপনাকে গতকাল দেখার পর থেকেই। এ রকম একটি আস্তানার খোঁজ পেলেন কী করে?'

'ধরে নিন, কলকাতায় যে-পত্রিকার সঙ্গে আমার সব থেকে বেশি প্রীতির সম্পর্ক, তাঁরাই খোঁজ দিয়েছেন, ব্যবস্থা করেছেন।'

সুবন্ধুর ভুরু বেঁকে উঠলো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। বললো, 'তাহলে বলুন, নিষ্কণ্টক হয়ে লিখতে এসেছেন? পূজা সংখ্যার তাড়া?'

'ধরে নিন তা-ই।'

সুবন্ধু সিগারেট ধরিয়ে, চেয়ারে হেলান দিয়ে, অন্য দিকে তাকিয়ে বললো, 'সবই তো ধরে নিতে বলেছেন। তাহলে তো মুশকিল। খবরের কাগজে একটা ছোট সংবাদ দিতে হয়।'

'সেটা কী?'

'আপনি এখন রাজধানীতে এই ঠিকানায় আছেন।'

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'দোহাই সুবন্ধু, রক্ষে করুন।'

সুবন্ধু খুনীকে ফাঁদে ফেলা গোয়েন্দার মতো টেনে টেনে হাসলো। বললো, 'তা-হলে কালকূট মহাশয়, সত্য ভাষণ করুন। এ আগমন গোপন অভিসার নয় তো?'

হায়রে আমার নির্বাসন। উচ্চ হাসিটা আটকে রাখা গেল না। বললাম, 'এত বড় প্রেমিক কবে হলাম যে, দিল্লিতে আসবো গোপন অভিসারে?'

সুবন্ধু হাত তুলে বললো, অতো জোরে হাসবেন না, হতি পারে হতি পারে, তাও হতি পারে। ঘটনার পশ্চাৎপটে কোনো চকিতনয়না হেমাঙ্গিনী থাকতেও তো পারে। তা না হলে এত আটঘাট বেঁধে, রাখঢাক করা কেন?'

হাসিটা আমার তেমনি বাজছিল। বললাম, 'আমাকে দিয়ে কি সে রকম কোনো সম্ভাবনার কথা আপনি ভাবতে পারেন?'

সুবন্ধু দেওয়াল আয়নার দিকে চোখ রেখে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিঙ ছুঁড়ে দিল। বললো, 'অনীতা সিংহের কথা এখনো কেউ কেউ বলাবলি করে।'

চমকে ওঠার কথা না, বিচলিত বোধ করলাম। সেই সঙ্গে মনে পড়লো একটি মুখ, স্নিগ্ধ শান্ত উজ্জ্বল, কালো দুটি বড় বড় চোখে বন্ধুত্বের হাসি। সর্বাঙ্গে যেন একটি সকরুণ লজ্জা জড়ানো। জীবনটাই খুব সুখের ছিল না। আচরণটা ছিল সহজ আর অনায়াস, 'লোকেরা' যাকে অন্য রকম বোঝে। বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো অন্য রঙ ছিল না। খবর জানি, এখনো সে সুখী নয়। জীবনটা মাঝপথেই ঠেকে আছে। মনে মনে একটু বিমর্ষ হয়ে বললাম, 'আপনি নিশ্চয় সেই কেউ নন।'

সুবন্ধু বললো, 'বক্তা নই, শ্রোতা তো বটে।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ওটা প্রেম বিরহ মিলন ইত্যাদি বর্জিত সম্পর্ক ছিল।'

'হয়তো। সেইজন্যই তো সম্ভাবনার কথাটা মনে এসেছিল। ভ্রমণের জন্য নিশ্চয় আপনি আসেননি?'

'আদপেই না। সত্যি বলছি, বলতে পারেন, স্বেচ্ছা-নির্বাসনে এসেছি।'

'তাহলে কোনো যাতনা আছে।'

এবার স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে বললাম, 'আছে।'

সুবন্ধু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, হাসি হাসি ঠোঁটে ধোঁয়া ছড়িয়ে বললো, 'তাহলে আর কিছু বলা যায় না। তবে তার জন্য এই রাজধানীতে, এই হোটেলে?'

বলতে বলতে ওর চোখ একটু কুঁচকে উঠলো। নিজেই আবার বলে উঠলো, 'অবিশ্যি মন্দ নয়। আপনার চেনা মুখ আর কত আছে এখানে। আর এই বিল্ডিং-এ তো একেবারেই অচেনা। সেদিক থেকে ঠিক আছে। এখন আপনার দুর্ভাগ্য, আমার সৌভাগ্য, ড্রাই লাঞ্চের জন্য আমাকে এখানেই আসতে হয়েছিল। কিন্তু একটা তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।'

সুবন্ধু একটা নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'মুশকিলটা কী?'

ওর চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক। বললো, 'একবার যখন আমার চোখে পড়ে গেছেন এখন কী করা যায়। এতদিন বাদে দেখা, একেবারে গাপ্ খেয়ে থাকবো কেমন করে। অন্তত আমার সঙ্গে যোগাযোগটা তো রাখতেই হবে।'

সে বিষয়ে আমারও এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। সুবন্ধুর

চিকচিকে চোখের দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি সময় পেলে মাঝে মধ্যে আসবেন।'

'মাঝে মধ্যে কেন। আমি রোজই আসতে পারি। স্বেচ্ছা-নির্বাসনে সারা-দিন কাটবে। সন্ধেবেলা তো আর নির্বাসন থাকে না।'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'সে আবার কী! নির্বাসনের আবার সময় ভাগাভাগি করা যায় নাকি।'

সুবন্ধু বললো, 'করে নিতে হবে একটু। তা ছাড়া, রোজ রোজ এ ঘরেই বা কেন। মাঝে মাঝে প্রেস ক্লাবেও যাওয়া যেতে পারে।'

আমার আবার আঁতকে ওঠার অবস্থা। বললাম, 'মানে একেবারে হাটের মাঝখানে? অসম্ভব!'

সুবন্ধু বললো, 'সেটা আমার দায়িত্ব। চেনা লোকদের সামনে যাতে না পড়তে হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবো।'

অনুরোধ করে বললাম, 'এ ব্যবস্থাটা বাতিল করুন।'

সুবন্ধু বললো, 'আচ্ছা দেখা যাবে। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে?'

'সেটা সম্ভব হতে পারে।'

যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি, এইভাবে বলতে হল। তবু সুবন্ধুর ভুরু জোড়া যেন কেমন ওঠা নামা করছে। ওর মতলবটা খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। বললো, 'এমন দু-একজনের খবর জানি, যারা আপনার গুণগ্রাহী। আপনাকে চিঠি লিখেও জবাব পায়নি। তাদের সঙ্গে দেখা করতেও কি আপত্তি আছে?'

বললাম, 'বিলক্ষণ। যাদের চিঠিরই জবাব দেওয়া হয়নি, এ যাত্রায় তাদের সঙ্গে দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না।'

সুবন্ধু ঠোঁট টিপে হাসলো, 'হয়তো দেখা করলে, আপনার মনোভাব বদলাতে পারে।'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

'তাদের দু-একজনের নাম বলবো?'

'কী দরকার?'

'তবু বলি, শ্রীমতী প্রেমলতা—.'

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'জানি, লেখিকা। তাঁর স্বামী একজন প্রকাশক, আমার দুটি বই হিন্দী অনুবাদ ছাপিয়েছেন, কোনো রয়ালটি দেননি।'

'সেই দোষ কি প্রেমলতার?'

'না। প্রকাশকের সামর্থ্য নেই জানি। কিন্তু এ যাত্রায়, প্রেমলতার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা নেই।'

'একজন অবাঙালী লেখিকার সঙ্গে আলাপে আপত্তি কী। তিনি কোথাও কিছু বলবেন না।'

'এ যাত্রায় নয়।'

'তাহলে আর একজনের নাম বলি।'

'এ সব পত্রলেখিকারা কি আপনার সঙ্গে কথা বলে আমাকে পত্র লিখেছিলেন নাকি?'

'না। লেখবার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন ভদ্রলোক কেমন, চিঠির উত্তর দেন না কেন। আমি বলেছি, একটু উদাসী হাওয়ার মতো কোন্ দিকে বইছেন, ঠিক থাকে না।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজকাল কি দিল্লিতে বসে কবিতা লিখছেন নাকি? গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতেন বলেই তো জানতাম।'

সুবন্ধু বললো, 'মাঝে মাঝে কবি হতে ইচ্ছা করে। সেটা আলাদা কথা। তবে আপনার সম্পর্কে যা বলেছি, বোধ হয় ঠিকই বলেছি। তা না হলে এখানে দেখা হতো না। যা-ই হোক, আর একটি নাম করি, হেনা ঘোষ, একাদিক্রমে চার পাঁচখানা চিঠি দিয়েছে, এমন কি কলকাতায় গিয়েও চিঠি দিয়েছে, জবাব পায়নি। ছাত্রী এবং কবি—ইংরেজিতে লেখে। আমাদের জানাশোনা পরিবারের মেয়ে। মনে করতে পারছেন?'

এই মুহূর্তে তো একেবারেই পারছি না। বললাম, 'না তো।'

সুবন্ধু বললো, 'দিস ইজ ক্রুয়েলটি। কিন্তু আপনি যে অহংকারী এবং হৃদয়হীন নন, সেটা প্রমাণ করার জন্য ওর সঙ্গে দেখা করুন। হেনাকে আমি আপনার রুম নাম্বার আর টেলিফোন নাম্বারটা দেব।'

সুবন্ধু আমার চোখের দিকে তাকালো। আমিও ওর চোখের দিকে তাকালাম। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললাম না। তারপরে সুবন্ধু হঠাৎ উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো। হাসিটা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হলো, অন্যভাবে, অসহায় হয়ে। আমার এই নির্বাসন যাত্রার অলক্ষ্যে কেউ মুখ টিপে হেসেছিল কী না, দেখতে পাইনি। এখন মনে হচ্ছে, হেসে থাকলে, সেটাও সুবন্ধুই বোধ হয়। তা না হলে, ওর চোখেই পড়বো কেন।

বললো, 'খুব প্যাঁচে পড়ে গেছেন, মনে হচ্ছে।'

বললাম, 'সুবন্ধু, সব ব্যাপারটা আপনাতে আমাতে থাকলেই হতো না?'

সুবন্ধু বললো, 'হেনা বেচারি কিন্তু বড় ভালো মেয়ে, ওর সঙ্গে দেখা করুন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার চেনাদের মধ্যে পুরুষ কেউ নেই?'

'থাকলে খুশি হতেন?'

'হিসেবটা জানতে চাইছি।'

'এ ব্যাপারগুলোও, গতকাল আপনাকে দেখে ফেলার মতো, অ্যাকসিডেন্টাল। হেনাদের বাড়িতে যাতায়াত আছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে, সেটাও ও জানে আর প্রেমলতা গুপ্তে আমাদের কাগজে মাঝে মাঝে লেখেন, সেই সুবাদে পরিচয়। বাঙলা সাহিত্যের কথায় আপনার কথা উঠেছিল। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে জেনে বলেছিলেন, চিঠি দিয়ে জবাব পাননি। আমার দুর্ভাগ্য কোনো পুরুষ আমাকে এ রকম অভিযোগ করেনি।'.

বলতে বলতে সুবন্ধু উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'অফিসের তাড়া আছে, যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলায় তৈরি থাকবেন, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবেন। কলকাতার কথাবার্তা সেখানেই হবে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আজই আপনার বাড়ি যাব?'

সুবন্ধু দরজার হাতলে হাত রেখে বললো, 'আজই, মিসেসকে সেই রকম বলা আছে।'

আর একবার চোখের ঝিলিকে, দুষ্টু ঝিলিক ছুঁড়ে দিয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। ওর পিছনে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত আমি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী করবো, ভেবে উঠতে পারলাম না। একে কি দৈব দুর্বিপাক বলে। এক রকম ভাবা ছিল হয়ে গেল আর এক রকম। একমাত্র উপায়, পলাতক হওয়া। তাহলে আর রাজধানীতে থাকা সম্ভব না। সুবন্ধুকে আমার চেনা আছে।

কিন্তু এখন আবার কোথায় ছুটবো? ছোটবার জন্য আসিনি। একটি জায়গায় চুপচাপ থাকতে এসেছিলাম। আপনাতে আপনি, একা। সেটা কি একেবারে বিফলে যাবে? দেখা যাক, মানিয়ে নেওয়া যায় কী না। অন্ততঃ সুবন্ধুর বাড়িতে তো ঘুরে আসতেই হবে। আমি আয়নার দিকে তাকালাম। নিজের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। নির্বাসিত, তোমার আরশীনগরে পড়শী বাস করে, তাকে কি কোনো দিন দেখতে পেয়েছ। তার চেয়ে, নিজের দিকে তাকিয়ে, মনকে দূরে পাঠিয়ে সেই কলিটি বলি, 'তুমি মোর পাও নাই পাও নাই পরিচয়।'……

দরজায় শব্দ হলো ঠুক ঠুক ঠুক। চোখের সামনে থেকে বই সরিয়ে দিলাম। বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে মনে হলো বেলা চারটে হবে। তবু একবার টেবিলের ঘড়ির দিকে দেখলাম। সাড়ে চার। চা নিয়ে এসেছে বোধ হয়। ভেবে ওঠবার আগেই, দরজার হাতল একবার ঘুরলো। ভিতর থেকে ছিটকিনি আঁটা নেই। একটু যেন খুললো। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল, এবং আবার ঠুক ঠুক।

বেয়ারা নয় তাহলে। শব্দের মৃদুতাই অবিশ্যি তা জানিয়ে দিচ্ছে। তাদের হাতের আঘাত আরো জোরে, ঘুম ভাঙাবার মতো। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তাকিয়ে যাকে দেখলাম, সে একটি মেয়ে। রূপসী? বুঝতে পারছি না, সুশ্রী। কালো চোখ, উজ্জ্বল শ্যামলী, বহুবর্ণ ছাপা শাড়ি, ঘাড় অবধি খোলা চুল। হাতে একটি ব্যাগ। একটু লজ্জারুণ চকিত দৃষ্টিপাত, আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। বললো, 'আমি কি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছি?'

মুহূর্তের মধ্যেই সুবন্ধুর কথা আমার মনে পড়ে গেল, জিজ্ঞেস করলাম, 'হেনা ঘোষ?'

কালো চোখ দুটি চিকচিকিয়ে উঠলো, ঠোঁটে লজ্জা মাখানো হাসি, ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানালো, 'হ্যাঁ।'

আমি সরে গিয়ে, দরজাটা আরো খুলে দিয়ে বললাম, 'আসুন।'

হেনা ঘোষ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আমাকে আপনি করে বলবেন না।'

কথাটা আমার কানে গেল, তবু দরজা বন্ধ করে বললাম, 'বসুন।'

এই আবাসের একটি অসুবিধা, বসবার আসন মাত্র একটি। হেনা বললো, 'আপনি বসুন।'

আমি খাটের দিকে এগিয়ে বললাম, 'আমি বসছি, আপনি বসুন।'

আমি বসলাম। হেনা চেয়ারটাকে একটু ঘুরিয়ে নিল, যাতে আয়নার দিকে তাকাতে না হয়, অথচ আমার মুখোমুখি হওয়া যায়। বসে, আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলো। হেনা দেখছি লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। এখনো কেন মনে করতে পারছি না ওর চিঠিগুলোর কথা। বয়স ওর কতো। বাইশ তেইশ হতে পারে, জানি না, তার চেয়েও ছোট কী না। হতে পারে, সুবন্ধু বলেছিল, হেনা ছাত্রী। সত্যি সুশ্রী—শ্রীময়ী বলা যায়। আধুনিকতার ছোঁয়াটা আছে পোশাকে, চুলে, নিরলংকার হাতে, চওড়া ব্যাণ্ডের ওপরে বড় কালো রঙের ঘড়িতে। একটু

বোধ হয় ভুরু এঁকেছে, চোখে একটু কাজল, ঠোঁটে ঈষৎ গোলাপি স্পর্শ। হাতে পায়ে নখে কোনো রঙ নেই। অধিকাংশ ছাত্রীদের মতো, বকবকিয়ে না।

হেনা আবার চোখ তুলে তাকালো, হাসলো, বললো, 'ভাগ্যিস সুবন্ধুদা বলেছিলেন তা না হলে জানতেও পারতাম না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সুবন্ধু বললেন কখন ?'

হেনা বললো, 'আজ বেলা এগারোটা নাগাদ টেলিফোন করে বলেছেন।'

তার মানে আমার এখান থেকে বেরিয়ে, অফিসে গিয়েই টেলিফোন করেছে।

হেনা আবার বললো, 'সুবন্ধুদা বললেন, আজকেই বিকেলের দিকে চলে যাও, ভদ্রলোকের কথা বলা যায় না, হয়তো উধাও হয়ে যাবেন কোথাও।'

বললাম, 'তা কেন, আমি তো আপনাকে বলতে বলেছি।'

হেনা এবার একটু জোর দিয়ে, ঘাড় নেড়ে বললো, 'আপনি করে বলবেন না।'

'মনে মনে চেষ্টা করছি।'

হেনা ঝকঝকে দাঁতে হাসলো। আমি আবার বললাম, 'প্রথম সাক্ষাৎ, এবং মেয়ে—মানে মহিলা, কাটাতে একটু সময় লাগে।'

হেনা মুখ নিচু করে, ওর ব্যাগের গায়ে আঙুল ঘষে বললো, 'আমি মহিলা নই।'

বললাম, 'ছাত্রী।'

'হ্যাঁ, এই আমার শেষ বছর, ইংরেজিতে পড়ছি। বাংলাও ভালো পড়তে পারি। কলকাতায় স্কুল ফাইনাল পাশ করে এসেছি।'

'তারপরে দিল্লীতে ?'

'হ্যাঁ, বাবার চাকরির জন্য। আমার মা আপনার খুব ভক্ত।'

ভক্ত কথাটা শুনলে যেন কেমন লাগে, অর্থহীন, কথার কথা মতো। বললাম, 'আমার লেখা পড়তে ভালোবাসেন, তাই তো ?'

হেনা যেন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তাই তো বলছি।'

বললাম, 'ভক্ত মানে তো তাই।' বলে আমি হাসলাম।

এক মুহূর্ত হেনা আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপরে কী বুঝলো জানি না, হেসে বললো, 'হ্যাঁ, আপনার লেখার ভক্ত।'

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হলো। এবার নিশ্চয় বেয়ারা। গলা পাওয়া গেল, 'সাব।'

তারপরেই চায়ের ট্রে হাতে ঢুকে এলো। হেনাকে দেখে একটু থমকালো।
বললাম, 'অওর এক পট লানা, অওর —।'

হেনা বলে উঠলো, 'না না, থাক না।'

বললাম, 'একটু চা তো। কী খাবেন বলুন।'

হেনা এবার জোরে ঘাড় নাড়িয়ে বলে উঠলো, 'ওরে বাবা, আমি কিছু খাবো না। একটু চা খাবো শুধু।'

আপত্তির রকম দেখলেই বোঝা যায় জোর করার দরকার নেই। সেটা লজ্জাতেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক। বেয়ারা আমার হাতে বিল এগিয়ে দিল। বিল নিয়ে তাকে চা আনতে বললাম। সে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। সিঙ্গল পটের সঙ্গে একটি মাত্র কাপই দেয়। বললাম, 'আপনি ততক্ষণ চা খেতে থাকুন। আমি পরে খাচ্ছি।'

সে বিষয়ে কিছু না বলে হেনা বললো, 'আপনি কিন্তু এখনো আপনি আপনি করছেন।'

বলে টেবিলের দিকে ফিরে কাপে চা ঢাললো, দুধ মেশালো, চামচে করে সুগার কিউব তুলে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কটা?'

বললাম, 'ওটা তুমি নাও।'

হেনা বললো, 'না, এটা আপনার। আমার এলে আমি খাবো।'

ওকে এবার একটু সহজ লাগলো। বললাম, 'তাহলে দুটো।'

সুগার কিউব কাপে দিয়ে, আমার দিকে এগিয়ে দিল। বললো, 'আপনার দিল্লী আসাটা কি খুব সিক্রেট ব্যাপার?'

'কেন?'

'সুবন্ধুদা সেই রকম বলেছিলেন। এমন কি মাকেও বলতে বারণ করেছেন। আমি মাকে বলিনি। কিন্তু পরে মা যখন জানতে পারবে, ভীষণ দুঃখ পাবে।'

বললাম, 'সেটা পরে শোধ দেওয়া যাবে। এবারটা আমি কারোকে জানাতে চাই না।'

হেনার কালো চোখের তারায় সন্ধানী জিজ্ঞাসা। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে, কারণটা জিজ্ঞেস করলো না। বললো, 'ইস আমার কী ভাগ্য, সুবন্ধুদার কাছে আমি চিরদিন গ্রেটফুল থাকবো।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'এতে আর ভাগ্যের কী আছে।'

'নয় বলছেন? কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না তবু আমার দেখা হয়ে গেল। কতদিন ধরে যে আপনাকে দেখবার ইচ্ছে।'

বলতে বলতে মুখ নিচু করে নিল। কথাটা এ ভাবে শুনতে আমারও লজ্জা করে। আবার মুখ তুলে হেসে বললো, 'আপনাকে দরজায় দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম, তবু জিজ্ঞেস করতে হয়, তাই করেছি।'

কী করে চিনতে পেরেছিল, সে প্রশ্ন আর করতে ইচ্ছা করলো না। জবাবটা আমি জানি। হেনা হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠলো। বললো, 'সুবন্ধুদা এমন ভাবে বললেন, আমি প্রথমে কিছু বুঝতেই পারছিলাম না। সুবন্ধুদা খুব ফাজিল তো।'

কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবে বললো ?'

হেনা হেসে বললো, 'লজ্জা করছে বলতে।'

কৌতূহল বাড়লো, বললাম, 'তবু শুনি।'

হেনার হাসিটা আরো ঝলকালো, বললো, 'প্রথমেই বললেন, হেনা, পাঁকাল মাছ কট, তোমার সেই নিরুত্তর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি ? বললেন, কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না। টেলিফোন করারও দরকার নেই, এই ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। এত নম্বর ঘর, তিনতলায় সোজা লিফ্‌টে উঠে যাবে। আজ বিকেলেই চলে যাও। সুবন্ধুদার কথায় কিছুই বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, কে আছে সেখানে ? বললেন, গিয়ে দেখ। কিন্তু খবরদার, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে, বাড়ীতে তোমার মাকেও বলবে না। অনেক বলার পরে, আপনার নামটা বললেন, আর আবার বললেন, মনে রেখো, ব্যাপারটা সিক্রেট, কেউ যেন জানতে না পারে।'

হেনার কথার মধ্যেই বেয়ারা এসে চা আর একটা বিল দিল। আমি দুটো বিলই সই করে দিয়ে দিলাম। হাসতে হাসতে বললাম, 'সুবন্ধুর ব্যাপার তো। ওকে আমার ভয় করে।'

হেনা নিজের চা তৈরি করতে করতে বললো, 'কেন ?'

'হয়তো কালই দেখবো, আরো কাউকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

কথাটা বলেই থমকে গেলাম। হেনার মুখের ওপরেই কথাটা বলা উচিত হলো না। চিরদিনই আমার এমন দুর্ভাগ্য, তীর ছুঁড়ে দিয়ে হাত কচলেছি। সামান্য কথা, একটু ঘুরিয়ে বললেই মিটে যেতো। ওদিকে হেনার মুখ এদিকে ফিরছে না। কাপের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে ধীরে ধীরে নেড়ে চলেছে। একটি উজ্জ্বল মিষ্টি মেয়ে। পাশ ফেরানো মুখ দেখে মনে হলো, ছায়া পড়েছে। একটা কিছু বলা দরকার। তার আগেই হেনার নিষ্প্রভ গলা শোনা গেল, 'আমি আসাতে আপনি খুব বিরক্ত হয়েছেন, না ?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'মোটেই না। কথাটা আমি তোমার উদ্দেশে বলি নি, সুবন্ধুকে ভয় পেয়ে বলেছি। তোমার আসার কথা তো আমি তাকে বলেছি, তুমি আসাতে খুশিও হয়েছি।'

হেনা আমার দিকে ফিরে তাকালো। চোখে সন্ধানী জিজ্ঞাসা। হাসি থাকলেও একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে, প্রায় ছেলেমানুষের মতো লাগছে। আমার কথাটা মন ভুলানো কী না, সেটা বুঝতে চাইছে। আমি একটু বিব্রত ভাবে হেসে বললাম, 'সত্যি। চা খাও।'

মুখের আকাশ থেকে মেঘ যেন একটু সরলো। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'আমার কী আনন্দ হচ্ছে, সে-কথা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। শোনার পর থেকে আসবো আসবো করে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। মা বারে বারেই জিজ্ঞেস করছিল, কোথায় যাচ্ছি। কিছুই বলিনি।'

বললাম, 'বেশ করেছ।'

হেনা সাবধানে কাপে চুমুক দিল। জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমি কি আপনার ঠিকানাটা ভুল জানি?'

'কেন?'

'তা না হলে অন্ততঃ একটা চিঠিরও জবাব পাওয়া উচিত ছিল।'

এ প্রসঙ্গটা উঠবেই জানতাম। তবু খুব নিরীহ ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম 'কী ঠিকানায় লিখতে মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। একটা নয়, দুটো। দুই ঠিকানাতেই চিঠি দিয়েছি।'

বলে দুটো ঠিকানাই নির্ভুল বললো। বললাম, 'দুটো ঠিকানাই তো ঠিক আছে।'

'তবু কেন চিঠি পাননি, বুঝতে পারি না। একটা তো নয়, গোটা ছয়েক চিঠি লিখেছি।'

আমি সন্তর্পণে হেনার মুখের দিকে একবার দেখতে গেলাম। চোখাচোখি হয়ে গেল। অন্য দিকে চেয়ে বললাম, 'হয়তো পেয়েছি।'

হেনা যেন এবার একটু অবাক স্বরে বললো 'হয়তো। তার মানে পড়েননি বুঝি আমার চিঠিগুলো?'

প্রায় থতমত খেয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই পড়েছি, পড়বো না কেন?'

হেনা জিজ্ঞেস করলো, 'শেষ চিঠিটায় কী লিখেছিলাম বলুন তো?'

শেষ চিঠি, শেষ চিঠি। এখন আমার ঈশ্বরকে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিছুই মনে করতে পারছি না।

তবু হেনা ঘোষ নামটি যে একেবারেই অচেনা, তাও মনে হচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন আগে লিখেছিলে বল তো?'

'ধরুন মাস দুয়েক আগে।'

অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। বিব্রত হেসে আত্মসমর্পণ করলাম, 'সত্যি, মনে করতে পারছি না।'

হেনা একটু শুকনো হেসে বললো, 'তার মানে, অনেক ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছি।'

'তা কেন?'

'মনে হচ্ছে তা-ই। তা না হলে একটা চিঠিরও জবাব পেলাম না কেন? শেষ চিঠিতে খামের মধ্যে, স্ট্যাম্প আঁটা আর একটা খাম পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম, আপনি খুব ব্যস্ত জানি, জবাব কিছু দিতে হবে না, আপনার লেটার প্যাডে, আপনার নামটা সই করে পাঠিয়ে দেবেন।'

বললাম, 'খুব লজ্জা পাচ্ছি।'

হেনা সহজ ভাবে হেসে উঠলো। বললো, 'না আর জিজ্ঞেস করবো না, কেন জবাব দেননি।'

বললাম, 'আমি যখন কাছেই আছি, সামনাসামনিই সব কথা হয়ে যাক। তবে—।'

হেনা আমার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলাম, 'সাহিত্যের বিষয়ে কথা নাকি?'

হেনা বললো, 'সাহিত্য, জীবন, অনেক কিছু।'

ভয় পেয়ে বললাম, 'ওরে বাবা।'

'কেন বলুন তো?'

বললাম, 'আমি যে বলে কিছুই বোঝাতে পারি না। যেটুকু পারি, তা লিখেই।'

'তবু তারপরেও কিছু থেকে যায়, যা শুধু লেখাতে পাওয়া যায় না। যদি আপনার বলবার ইচ্ছা থাকে।'

আমি হেনার দিকে দেখলাম। হেনা বললো, 'আপনার লেখা পড়ে জীবন সম্পর্কে অনেক কথা মনে আসে, এমন কি আপনার জীবন সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে।'

হেসে বললাম, 'এর আর কী জবাব আছে। আমার জীবনটা তো আমার মতোই।'

হেনা বললো, 'তবু যেমন রবীন্দ্রনাথ—'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'ওঁর কথা থাক। এই পর্যন্ত জানি, ওঁর সমস্ত কিছুর মধ্যেই, শেষ কথা শুদ্ধি। জীবনের শুদ্ধি।'

হেনা একটু ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। বললো, 'কেমন শুদ্ধি? আমরা যাকে গঙ্গা জলের মতো শুদ্ধি বলি, সেই রকম?'

আমি হেনার চোখের দিকে তাকালাম। ওর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম আমার মনে হলো, সম্ভবত জীবনের জটিলতায় ও আক্রান্ত। ওর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে, কৌতূহলের থেকেও, আমরা যাকে 'চ্যালেঞ্জ' বলি, সেই ভাবটাই বেশি। বললাম, 'একদিক থেকে তো তা-ই গঙ্গা জলের স্পর্শে যদি কেউ নিজেকে শুদ্ধ মনে করে তাহলে সেটাই শুদ্ধি।'

হেনা ঠোঁট টিপে হাসলো। হাত বাড়িয়ে টেবিলে আঙুল ঘষলো, বললো, 'কিন্তু তার মধ্যে কি একটু ফাঁক থেকে যায় না?'

'কেন যাবে। শুদ্ধির বিশ্বাসটাই তো বড় কথা। শুদ্ধ হতে চাওয়াটাই তো বড় কথা।'

'সকলের শুদ্ধি কি এক রকম হয়?'

হেনার কালো চোখের তারা আমার প্রতি নিবদ্ধ হলো। বললাম, 'তা তো কখনোই না।'

হেনা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো, 'আপনি শুদ্ধিতে বিশ্বাস করেন?'

এক মুহূর্তের জন্য, আমি নিজের দিকে ফিরে তাকালাম। আর একটি মুহূর্তেই, আমার সমস্ত জীবন আবর্তিত হয়ে, একটি জবাব বেরিয়ে এলো, 'কার।'

হেনা হঠাৎ কিছু বললো না, আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপরে ওর চোখে ও ঠোঁটে হাসি চিকচিক করে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

বললাম 'আমি তো মানুষ।'

হেনার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কিন্তু অন্য মনে যাওয়ার অবকাশ হলো না। হেনার গলা আবার শুনতে পেলাম, 'তার জন্য কি কবি সাহিত্যিক হবার দরকার করে?'

বললাম, 'আমার তো সে কথা কখনো মনে হয়নি। ওটাতে কারোর একলার স্বত্ব নেই।' বলেই আমার মনে পড়ে গেল, হেনা কবি। কবিতা লেখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সব কথা থাক, তোমার কবিতার কথা বল।'

হেনা চমকে উঠে, প্রায় আর্তনাদের মতো করে, চোখ বড় করে বললো, 'আমার কবিতা!'

'কেন, তুমি কবিতা লেখ না?'

ঘাড় নাড়িয়ে, গালের এপাশে করে ওপাশে চুলের ঝাপটা দিয়ে প্রতিবাদ উঠলো, 'না না, মোটেই না। কে বলেছে এ কথা আপনাকে, সুবন্ধুদা?'

দেখলাম, ওর উজ্জ্বল, শ্যামলিমায় লালের ছটা লেগে গিয়েছে। বিপাকে পড়া লজ্জার ভাব। বললাম, 'যে-ই বলুক, সে আমাকে মিথ্যা কথা বলেনি।'

হেনা তবু মানতে চাইলো না। বারে বারে মাথা নেড়ে, মুখ নিচু করে বললো, 'না না, ছি ছি, এ কি! সুবন্ধুদা ভারি ইয়ে।'

হেনার অবস্থা দেখে ভারি কৌতুক বোধ করছি। ওর এই চেহারাটা ভালো লাগছে। বললাম, 'ক্ষতি কী?'

হেনা মুখ নামিয়ে রেখেই বললো, 'আমি কি লিখতে জানি নাকি।'

'সেটা আমাকে দেখালে আমি বলে দিতে পারতাম।'

হেনা কালো চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'অসম্ভব। ইংরেজিতে কি কবিতা লেখা যায় নাকি?'

এবার আমিই চোখ বড় করে বললাম, 'বল কী। বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা তো ইংরেজিতে লেখা হয়েছে।'

হেনা বললো, 'সে তো ইংরেজরা লিখেছেন। নিজের মাতৃভাষায় না লিখতে শিখলে হয় না।'

কথাটা মেনে নিয়ে চুপ করে গেলাম। মধুসূদনের কথা মনে পড়ে গেল। তথাপি, এখন সামনে হেনাকে দেখে, ওর কবিতার সম্পর্কে আমার মনে একটু কৌতূহল জাগছে। বললাম, 'তবু তোমার কবিতা পড়বার ইচ্ছা রইলো।'

সিগারেট ধরালাম, একটু চুপ করে রইলাম। হেনা বললো, 'অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে বিরক্ত করছি।'

বললাম, 'বিরক্ত আর কী।'

হেনা একটু আঙুল দিয়ে নখ খুঁটলো। একবার চোখ তুললো, আবার নামালো। আবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আবার আসবো তো?'

স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধে, সেটা তো আমারই বলা উচিত। কিন্তু চাইনি তো। ভাবিনি। বললাম, 'তোমার ইচ্ছে হলে এসো।'

'আপনার ইচ্ছার কথা বললেন না।'

হেসে বললাম, 'এসো।'

'আমার অনেক বন্ধু আপনার কথা বলে।'

বললাম, 'সেটা করো না।'

'একদিনও বোধ হয় আমাদের বাড়ী যাবেন না?'

'পরে দেখা যাবে।'

হেনা উঠে দাঁড়ালো বললো, 'সত্যি, আজকের দিনটার কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।'

বললাম, 'এতটা মনে করার কোনো কারণ নেই।'

হেনা হঠাৎ নিচু হয়ে পড়লো। ঝোঁকা দেখলেই বোঝা যায়, কী করতে চায়। কিন্তু হাতটা চেপে ধরতে সঙ্কোচ হলো। বললাম, 'এটা তোমাকে মানায় না।'

ও নমস্কার করে উঠে বললো, 'এর আবার মানামানি কী আছে। এটা আমি আমার মতো করলাম।'

ফিরতে উদ্যত হয়ে বললো, 'জানেন, আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আপনি আমার দিল্লীর বন্ধুদের দেখুন, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলুন।'

হেসে বললাম, 'এ যাত্রায় না হলেও, পরের যাত্রায় সেটা হতে পারবে। এ যাত্রাটা তোমাকেই দেখি।'

হেনা লজ্জা পেয়ে গেল। লজ্জারুণ মুখে বললো, 'আমাকে দেখলে তো সব দেখা হয় না আমাকে দেখার কিছু নেই।'

'তোমাকে দেখাটা, তোমাকেই দেখা। কিছু আছে কী না, সেটা তো, আমি ভাববো।'

হেনা আরো লজ্জা পেয়ে গেল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে, দু'পাশের ঘরের মাঝখানের করিডর দিয়ে হেঁটে গেল।

সব ঘরের দরজাগুলোই বন্ধ। করিডর একটু অন্ধকার। আলো জ্বালানো নেই। লিফটের দিকে বাঁক নেবার আগে, হেনা পিছন ফিরে তাকালো। আর সেই মুহূর্তেই ওর পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে এলো একদল বিচিত্র বেশধারী গোরা-গোরি। হেনা একটু চমকে পিছিয়ে এলো। গোরা-গোরির দল হেনার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপর করিডরের মাঝামাঝি, একটা ঘরে সবাই ঢুকে পড়লো। হেনা আবার তাকালো, হাসলো, মোড় ফিরলো।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে প্রথমেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। দীর্ঘশ্বাস পড়লো। হায় রে নির্বাসন! আবার সকলই বুঝি বিফলে গেল। সন্ধ্যার আকাশে যেন একটি একটি করে তারার উদয় হচ্ছে। প্রথমে সুবন্ধু।

তারপরেই হেনা? তারপরে? এ আকাশ কী তারপরেও নক্ষত্রহীন থাকবে? যতো সময় যাবে, আকাশ কালো হবে, ততোই তারায় তারায় ভরে উঠবে না কি?

আরাবল্লীর এই সীমায় বোধ হয় আর থাকা হলো না। দুটো দিন সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাক। তারপরে সিদ্ধান্ত। বাইরের জানালায় দেখছি, বটগাছের কোলে অন্ধকার জমছে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। তবু দুটো শালিক ব্যালকনির ধারে এসে বসেছে এখন। ভাগ্য ভালো, জোড়া শালিক দেখেছি। একা শালিক দেখলে নাকি কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়। হাসি পেল। আমার সঙ্গে এখানে কার ঝগড়া হবে।

হেনার কথা মনে পড়ে গেল। আমারও ইচ্ছা করে দিল্লীতে, ওদের ছাত্র-ছাত্রীদের জগৎটা একবার দেখে যাই। ইচ্ছা কবে পূরণ হবে কে জানে।

দরজায় ঠুক ঠুক, সঙ্গে সঙ্গে হাতল ঘুরে গেল। সুবন্ধুর গলা শোনা গেল, 'আসতে পারি ?'

হেনা গিয়েছে ঘণ্টা খানেক। চেয়ারে বসে থেকেই বললাম, 'নিশ্চয়ই। আমার ঘাড়ে তো একটাই মাথা।'

বলে পিছনে ফিরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হলো। সুবন্ধুর পিছনে একজন মহিলা। সুগৌরী এবং দীর্ঘাঙ্গী এবং সুন্দরীও বটে। বেশবাসে পুরোপুরিই আধুনিকা। দুজনের হাতেই দুটি বড় ব্যাগ। দেখলেই বোঝা যায়, দুজনেই কর্মক্লান্ত। সুবন্ধু একটু হেসে ইংরেজিতে বললো, 'বোধ হয় অনুমান করতে পারছেন, ইনি আমার স্ত্রী। নাম সুজাতা, অন্ধ্র দেশের মেয়ে।'

সুজাতা আমার দিকেই হাসি হাসি মুখে তাকিয়েছিল। নমস্কার বিনিময়ের পরে, আমাকেও ইংরেজিতে বলতে হলো, 'আপনি বসুন।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'বসবার সময় বিশেষ নেই স্যার। জানবেন, এর নাম দিল্লী। আপনি বসে আছেন শহরের প্রায় প্রাণকেন্দ্রে। আমাদের যেতে হবে এখন গেরস্থের পাড়ায়, এখান থেকে যার দূরত্ব কম করে ছয় মাইল। আট দশ বারো মাইলটা এখানে কিছু না, শহর এই রকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা গরীব স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে খাই। আমাদের গাড়ি নেই। হয় ট্যাক্সি না হয় স্কুটার ট্যাক্সি, অন্যথায় বাস—।'

আমি, সুবন্ধুকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বুঝেছি, মূল কথাটা হল আপনাদের এখন বসবার সময় নেই, এখুনি বেরোতে হবে, এই তো ?'

সুবন্ধু সুজাতার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'হ্যাঁ। আপনি তৈরি তো ?'

বললাম, 'গায়ে পাঞ্জাবীটা চাপাতে হবে।'

'তাহলে চাপান। ততক্ষণ একটা সিগারেট খাওয়া যাক। সুজাতা, সীট ডাউন কর এ ফিউ মিনিট্‌স। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, ইনি কে ?'

সুজাতা আমার দিকে একবার দেখে বললো, 'পারছি।'

সুবন্ধু হাতের ব্যাগ নামিয়ে, আমাকে সিগারেট দিয়ে, নিজে ধরালো। বললো, 'কিন্তু তুমি বাঙলা পড়তে পারো না, এর আসল পরিচয়টা তোমার—।'

সুজাতা বলে উঠলো, 'ভুল করলে। উনি লেখক জানি, এবং, তোমাকে

কাল রাত্রেই জানিয়েছি, আমি ওঁর দুটো হিন্দীতে অনূদিত উপন্যাস পড়েছি। প্রায় হাফ ডজন গল্প পড়েছি।'

সুবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'সরি সরি বেবী, মাই মেমারি ইজ টু-উ ইল্। তুমি কাল রাত্রে বলেছিলে বটে, আর এও বলেছিলে, গল্পগুলোই তোমার ভালো লেগেছে বেশি।'

সুজাতা একটু লজ্জা পেয়ে গেল। ফর্সা গালে একটু রক্তের ছটা লাগলো। চকিতেই একবার আমার দিকে দেখে নিয়ে বললো, 'উপন্যাস দুটোও খারাপ লাগেনি।'

সুবন্ধু আমার দিকে ফিরে বললো, 'তাহলে আর বলার কিছু রইলো না। ও আপনার পাঠিকা। কিন্তু কী যেন বলছিলেন ঢোকবার মুখে, একটাই যখন মাথা?'

হেসে বললাম, 'ভোলেননি দেখছি, সাংবাদিক তো। বলছিলাম, আপনি ঘরে ঢুকতে চাইলে কখনো নিষেধ করতে পারি? এখন আমার মাথা তো আপনার হাতেই।'

সুবন্ধু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'এর নাম দিল্লী, আর পড়েছেন মোগলের হাতে। খানা তো খেতেই হবে।'

সুজাতার দিকে তাকিয়ে হাসলো। কথাবার্তা সবই এখন ইংরেজীতে, সুজাতার জন্যই। বললো, 'ভদ্রলোককে খুব প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।'

সুজাতা বললো, 'তা বলে ওকে তুমি জ্বালাতন করো না।'

সুবন্ধু বললো, 'জ্বালাতন করবো না, তবে একটু আধটু সঙ্গ চাই।' বলেই আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'বিকেলে কেউ এসেছিল?'

বললাম, 'আপনি যেভাবে তাকে টেলিফোন করেছেন, না এসে পারে?'

সুবন্ধুর চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক। বললো, 'আমার টেলিফোনটা তো নিতান্ত সংবাদ, ছুটে আসাটা আপনার জন্যই। কিন্তু বলুন, মেয়েটি কেমন? জ্বালাতন করবার মতো কী?'

বললাম, 'জ্বালাতন করবে কেন। বেশ ভালো মেয়ে।'

সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, 'কে, হেনা?'

সুজাতাও জানে দেখছি। সুবন্ধু ঘাড় নাড়লো। সুজাতা বললো, 'ভারি মিষ্টি মেয়ে, এবং সত্যিকারের গুণী।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'হলে কী হবে। মেয়েটি এ ভদ্রলোককে নাকি প্রায় হাফ ডজন চিঠি দিয়েছেন, উনি তার একটিও জবাব দেননি।'

সুজাতা হাসিমুখে, কৌতূহলিত চোখে আমার দিকে দেখলো। আমি কিছু বলতে চাইলাম, সুবন্ধু তার আগেই বলে উঠলো, 'দুর মশাই, আপনাদের লেখা গল্পের মতোই আপনারা সব মিথ্যা। য়ু আর অল্ ক্রুয়েল হার্টেড। নিন, এখন জামাকাপড় পরে নিন। আমরা এখন বাজার-টাজার করে ফিরছি। আর দিল্লীর এই মেঘলা আবহাওয়ায় যে কি বিচ্ছিরি ঘাম হয়, বলা যায় না। আপনি তো এয়ার-কণ্ডিশণ্ড্ রুমে আছেন, বুঝতে পারবেন না।'

বললাম, 'এই খোঁটাটা দেবেন না। এখানে আসতে চাইনি, ইকনমি ব্লকেই উঠেছিলাম। কিন্তু কমন বাথরুমের জ্বালায় পালিয়ে আসতে হলো।'

সুবন্ধু বললো, 'সেটা অবিশ্যি ভালোই করেছেন। ওটা এমনি বললাম। চাকরির ক্ষেত্রে আমরা দুজনেই সারাদিন ঠাণ্ডা ঘরে কাটাই। যাই হোক, আমরা কি বাইরে যাবো, আপনাকে তো জামাকাপড় বদলাতে হবে।'

বললাম, 'কোনো দরকার নেই। বাথরুমটা যথেষ্ট বড়, ওখানেই সেরে নিচ্ছি।'

যেতে যখন হবেই, দেরি করে লাভ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তৈরি হয়ে নিলাম। বাথরুমের বাইরে আসতে দেখি দুজনেই আমার দিকে ফিরে তাকালো। আবার দুজনেই চোখাচোখি করে হাসলো। কেমন যেন একটু রহস্যের ছোঁয়া রয়েছে হাসিতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?'

সুবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ব্যাপার আর কী। আপনাকে দেখে মেয়েরা যা বলে, ও-ও তাই বলছে। আপনাকে দেখে নাকি খুব রোমান্টিক মনে হচ্ছে ওর। মানে লেডিকিলার।'

সুজাতাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'রোমান্টিক আর লেডিকিলারে অনেক তফাত।'

সুবন্ধু আমার খাটের ওপর অর্ধেক কাত হয়ে পড়ে বললো, 'শালা অল্ দ্য সেম। যার নাম লাউ, তার নামই কদু।'

সুবন্ধুর বলার ভঙ্গিতে আমি আর সুজাতা হেসে উঠলাম। এ ক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই। নিজে কোনোদিন এ বিচারটা করিনি। নতুন শুনলাম কী? আগেও শুনেছি। কিন্তু কোথায় যেন একটা দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে উঠতে চায়। আমার জীবনটা তো আমারই, তাকে আমি একটু একটু চিনি। সবাই কি দেখতে পায়, না চেনে? বললাম, 'বেরনো যাক।'

সুবন্ধু নিজেই ঠাণ্ডা করার মেশিনটা বন্ধ করে দিল। আলো নেভালো। দরজা বন্ধ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নিচের রিসেপশন লাউঞ্জ জুড়ে

বিদেশীদের ভিড়। রাস্তায় আলো ঝলমল করছে। বেরিয়েই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। এ ব্যাপারে কলকাতার তুলনায় দিল্লী স্বর্গ।

নগর তিলোত্তমা তো সত্যি তিলোত্তমা। চওড়া পরিচ্ছন্ন রাস্তা, সবুজ গাছপালা, রাস্তায় আলো ছাড়াও মাঝে মাঝেই আলো-রঙীন জলের ফোয়ারা। এ পথ চলায় ক্লান্তি আসে না।

সুবন্ধু বললো, 'দিনের বেলায় এলে দেখতে পেতেন, আমাদের এলাকায় মোগল আমলের কতো পুরনো স্মৃতি আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নতুন দিল্লী তাদের আস্তে আস্তে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।'

বললাম, 'চিরদিন বোধ হয় সব কিছু থাকে না।'

সুবন্ধু বললো, 'কিছুই থাকে না।'

সুবন্ধুর গলায় কি একটু বিষণ্ন হতাশার সুর বাজছে। সুজাতা বাইরের দিকে তাকিয়ে। আমি ড্রাইভারের পাশে। কথাটা অন্য দিকে নিয়ে যাবার জন্য আমি বললাম, 'মোগলের দিল্লী, তারপরে ইংরেজের দিল্লী, সে এখন নতুন ভারতের দিল্লীর সাজে সাজছে। আমি তো বলি, সারা দেশ থেকে তিল তিল রূপ এনে এ নগরকে তিলোত্তমা করা হচ্ছে।'

সুবন্ধু বললো, 'ঠিক বলেছেন, এ শহর তিলোত্তমা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মন প্রাণটা আছে তো?'

সুবন্ধু বললো, 'অনেকে বলে নেই। আমার মনে হয় আছে। সে প্রাণটা কিন্তু দুঃখিনীর। তাকে কেউ দেখতে পায় না।''

আমি মুখ ফিরিয়ে সুবন্ধুর দিকে দেখলাম। ও একটু হাসলো। সুজাতার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সেও নিঃশব্দে হাসলো, কিছু বললো না। সুবন্ধু কি একটু অন্য সুরে বাজছে। সকালের সুরের সঙ্গে কোথায় যেন একটু ব্যতিক্রম থাক, ভাবতে চাই না।

সুবন্ধুর বাড়ি। ঘণ্টা টিপতে একজন মাঝবয়সী লোক এসে দরজা খুলে দিল আগেই হাত বাড়িয়ে, ওদের দুজনের হাত থেকে ব্যাগ দুটো নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। সুজাতা তার মধ্যেই লেটার বক্সটা খুলে দেখে নিল। দুটো চিঠিও বের করে আনলো।

ওপরে উঠে সুবন্ধু বললো, 'কোথায় বসবেন। ঘরে না ছাদে। আমরা ছাদেই বসি। রাত্রেও ছাদেই শুই।'

আমি এক কথাতেই বললাম, 'ছাদেই তো ভালো। খোলা আকাশের নিচে বসা যাবে।'

যোগ করলো, 'এবং কোনো আলো থাকবে না। তারার আলোয় যতোটুকু দেখা যায়, ততোটুকুই।'

বলে উঠলাম, 'চমৎকার।'

সুজাতা তবু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

'একেবারেই না।'

সুবন্ধু বললো সুজাতাকে, 'সুজাতা, তুমি আগে বাথরুমে ঢোকো। আমি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বলি।'

সুজাতা বললো, 'তা হবে না। আমি দলীপকে কী রান্না হবে না হবে একটু বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিছু জিনিসপত্র ফ্রিজে তুলে দিয়ে আসি। তুমি আগে সেরে নাও।'

সুবন্ধু বললো, 'আর আমাদের অতিথি ততক্ষণ একলা বসে থাকবেন?'

আমি বললাম, 'কোনো ক্ষতি নেই। সে সময়টা আমি ঘরের আলোয় বসে কোনো পত্রপত্রিকা দেখি।'

সুজাতা বললো, 'অথবা আপনাকে নিয়েই রান্নাঘরে যেতে পারি। কিন্তু এ দিকটা তাড়াতাড়ি সারতে পারলে, আমরা একসঙ্গে বসবার সময়টা বেশি পাবো।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনার রান্নাঘরে কাজ আপান করুন গিয়ে। দুজনেই তাড়াতাড়ি করুন। সেটাই ভালো।'

সুবন্ধু বললো, 'ও কে।'

বাইরের ঘর থেকে ওরা দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেল। সুবন্ধুর টেবিল জুড়ে দেখছি, অধিকাংশই রাজনৈতিক জার্নাল। কলকাতার ইংরেজি বাংলা কাগজও কয়েকটা আছে। বিশেষ করে, বিপ্লবী বামপন্থী কাগজই বেশি। তার মধ্যে একটি কাগজ আমি তুলে নিলাম। এই ইংরেজি জার্নালটি নাকি পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে উগ্রপন্থীদের সমর্থক। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলোও তাই বলছে। বিপ্লবী অথচ নির্বাচনে বিশ্বাসীদের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ, এবং সমালোচনা রয়েছে। আমার সেই বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল, যে তার ছেলেকে নিয়ে দিল্লীতে ছুটে এসেছে। এই সব প্রশ্ন পড়তে গেলেই উগ্রপন্থার কারণে, বহু ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের কাহিনী আমার মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে একটি চিঠি। চিঠিটির ভাষ্য, একজন সম্পাদকের কাছে জানতে চেয়েছেন, তিনি নাকি তাঁর এক

বন্ধুর কাছে শুনেছেন, কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চল বর্তমানে উগ্রপন্থীদের দখলে। কয়েকটি অঞ্চলের নামও তিনি করেছেন। সেই সব জায়গায়, সরকারী শাসন বা পুলিসের কোনো ব্যাপারই নেই, যদিও সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা নাকি নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে শান্তিতেই আছেন। পত্রলেখক খুবই উৎসাহ করে জানতে চেয়েছেন, তিনি সত্য জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক।

চিঠিটা পড়লে মনে হয়, কলকাতায় সত্যি দখলের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও জানি, এ পত্রের সবই একেবারে অলীক না। প্রশাসন ব্যর্থ, পুলিস আত্মকলহে মগ্ন, রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক হানাহানি খুনোখুনি তুঙ্গে। বহু অঞ্চলেই সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারছে না। মানুষ নানাভাবে বিপর্যস্ত। কিন্তু পত্রলেখকের বন্ধুর উক্তিগুলোতে বোধ হয় একটু অতিশয়োক্তি আছে। সে রকম কোনো দখলের লড়াই বোধ হয় এখনো শুরু হয়নি।

সুবন্ধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পাউডারের গন্ধ ছড়িয়ে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে এলো। বললো, 'আসল কাগজটাই তুলে নিয়েছেন দেখছি। খুব মগ্ন হয়ে পড়ছেন।'

বললাম, 'পড়ছি, পড়িও মাঝে মাঝে। এ কাগজটির বিষয়ে আমার একটু বিশেষ কৌতূহল আছে।'

সুবন্ধু গম্ভীরভাবে বললো, 'খুব সুবিধার ব্যাপার না। আপনিও কি উগ্রপন্থী নাকি?'

হেসে বললাম, 'সে হিসাবে, আমি কোনো পন্থীই না। তবে অনেক কথা জানা যায়।'

সুবন্ধু বললো, 'আমার ইন্টারেস্ট তার চেয়ে বেশি। কিন্তু সে কথা থাক, চলুন ছাদে যাওয়া যাক। সুজাতারও হয়ে এলো। ও বাথরুমে ঢুকেছে।'

ওখান থেকেই চেঁচিয়ে, অন্যদিকে ফিরে বললো, 'দলীপ আমরা ছাদে যাচ্ছি।'

দূর থেকেই জবাব এল, 'হাঁ জী, ঠিক হ্যায়।'

সুবন্ধু আমার দিকে ফিরে বললো, 'কী চলবে বলুন। রাম, জিন অথবা হুইস্কি।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'ও সব আবার কেন?'

সুবন্ধু বললো, 'বলতে পারেন, সারাদিনের কাজের শেষে একটু ক্লান্তি অপনোদন, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম, বিটু অ্যাপিটাইজার।'

হেসে বললাম, 'অ্যাপিটাইজার তো বিলাসী কুঁড়ে লোকেদের জন্ত। আপনার তো এমনিতেই খিদে পাবার কথা।'

সুবন্ধু বললো, 'আরে মশাই আসলে একটু নেশা করা। নেশুড়েরা সব সময়েই একটা যুক্তি দেখাতে চায়। বলবার তো কিছুই নেই। কিন্তু আপনাকে একটু নিয়ে বসতেই হবে। কী নেবেন, হুইস্কি?'

একে বলে মোগলের হাতে পড়া। সেটা ও আগেই জানিয়ে দিয়েছে, খানা খেতেই হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'শ্রীমতী সুজাতাও বসবেন নাকি?'

সুবন্ধু বললো, 'বসবেন তো বটেই, তবে উনি হার্ড ড্রিঙ্কসে নেই। ধরাতে পারিনি। কেন, আপনার কি নারীর সুরা পান ছাড়া জমবে না?'

হেসে বললাম, 'আমার নারী এবং সুরা ছাড়াই জমে। মিসেসের কাছে হার মেনেছেন শুনে খুশিই হলাম।'

'হার না মেনে কোনো উপায় আছে। সত্যি যদি ধরতো, তাহলে দিল্লীর প্রবাসে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যেতো। যাই হোক, এখন বলুন তো আপনাকে কি দেব।'

ভবি ভোলবার নয়। বললাম, 'নেহাত যখন ছাড়বে না, একটু লিম্ব্ পানী দিন।'

সুবন্ধু চোখ কুঁচকে বললো, 'তার মানে জিন। কথা বেচে খান, কত ঘুরিয়ে যে বলতে পারেন। বসুন এক মিনিট, আসছি।'

এক মিনিটের আগেই সুবন্ধু এলো। হাতে দুটি বোতল, রাম আর জিন্। বাড়িতেই সব ব্যবস্থা। বললো, 'চলুন এবার ছাদে যাই।'

যেতে যেতে বললাম, 'ব্যবস্থা সব পাকাপাকি দেখছি।'

'কোনো উপায় নেই, এর নাম দিল্লী। ছাত্রছাত্রীদের জ্বালায় গভর্নমেণ্ট সব বার তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। ইচ্ছে করলেই কোথাও বসা যায় না আমাদের প্রেস ক্লাব অবিশ্যি আছে। সুজাতাকে ফেলে তো আর রোজ রোজ সেখানে বসা যায় না। তা ছাড়া এখানে সপ্তাহে দু'দিন ড্রাই ডে, দোকান বন্ধ, মাসের প্রথম দিন আর যে কোনো ছুটির দিনেও দোকান বন্ধ থাকে। খেয়াল থাকবে না, কখন বিপদে পড়ে যাবো, তারপরে হাই তুলে তুলে মুখ শুকিয়ে মরবো। সেই জন্ত বাড়িতেই পাকাপাকি ব্যবস্থা।'

সুধাপায়ীর ফিরিস্তি বটে। কাজ সব আটঘাট বেঁধে। ছাদটি বেশ ভালোই। গোটাকয়েক বেতের চেয়ার রয়েছে। একটি শোফা-কাম বেড অন্ত পাশে আর একটি নেওয়ারের খাট। কর্তা গিন্নির রাত্রে শোবার ব্যবস্থা।

একটি টেবিলও আছে। সুবন্ধু বললো, 'হোক আরাম করে। বসুন।'

একটি বেতের চেয়ারেই বসলাম। দলীপ এল, হাতে দুটি জলের বোতল দু'বোতল সোডা বগলে, আর এক হাতে একটি প্লেট চানাচুর আর কাজু বাদাম নিয়ে পিছনে পিছনেই সুজাতা এলো, খোলা চুল ছড়িয়ে, ঘাগরার মতো একটা কিছু পরে, ওর ওপরে জামা। তার এক হাতে তিনটি গেলাস, একটি কোকা-কোলা প্লেটে করে কিছু জাম টেবিলে রেখে আমাকে বললো, 'নুন জলে ভেজানো জাম, আপনার বোধ হয় খেতে ভালোই লাগবে। সারাদিন ফ্রিজে থেকে বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে।'

উপাদেয় নিঃসন্দেহে। ঘরে গৃহিণী না থাকলে এ সব হয় না। সামান্যের মধ্যে যেখানে অসামান্যের স্পর্শ। বললাম, 'নিশ্চয়ই, কোনো সন্দেহ নেই।'

বলে একটি জাম মুখে পুরে দিলাম। দলীপ এলো লাইমের বোতল নিয়ে। সুবন্ধু আগে স্ত্রীকে দিল কোকোকোলা। আমাকে লাইমের সঙ্গে জিন। নিজে রাম। সুজাতা নিজে একটি জাম মুখে পুরতে গিয়ে, আমার দিকে ফিরে বললো, 'বিচিগুলো ছাদেই ফেলুন, কাল পরিষ্কার করে দেবে।'

কোনো আলো নেই, তবু যেন সকলের মুখই সকলে দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট না একটু অস্পষ্ট, তবে সুজাতার ফর্সা মুখ যেন একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। সুবন্ধু আমার হাতে গেলাস তুলে দিয়ে নিজের গেলাস তুলে বললো, 'চিয়ার্স। আপনার অজ্ঞাতবাসের সার্থকতা কামনা করে—' বলে গেলাস ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

ক্রিং ক্রিং করে কলিং বেল বেজে উঠলো। আমিই চমকে উঠলাম আগে। এ কিসের ইঙ্গিত? শুভ না অশুভ? আমার অজ্ঞাতবাসের সার্থকতা কি টোস্টের মুখেই ঘুচলো।

সুবন্ধু ভুরু কুঁচকে বললো, 'কে হতে পারে এ সময়ে?'

সুজাতা বললো, 'যে কেউ হতে পারে।'

সুবন্ধু উঠে দাঁড়ালো আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি নিজেই যাই। আপনাকে চিনতে পারে এমন কেউ হলে, বেমালুম মিথ্যে কথা বলে বিদায় করে দেব।'

তাড়াতাড়ি নেমে গেল। সুজাতা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। বললো, 'আপনার দেখছি সত্যি মুশকিল।'

বিব্রত হেসে বললাম, এবারটা এখানে আমি চেনা মহলের বাইরে থাকতে চাই।'

সুজাতা বললো, 'শুনেছি।' কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না কেন। সিঁড়িতে

একাধিক পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং মহিলা পুরুষ, দুইয়ের গলা শোনা গেল। কথাবার্তা ইংরাজীতে। সিঁড়ির মুখেই মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল, 'সুজাতা কোথায়?'

সুবন্ধু বললো, 'এখানে, ছাদেই আছে।'

সুজাতা চকিতে একবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আহ্‌হা, রঞ্জিতা দেখছি। এসো।'

যার নাম রঞ্জিতা, সে এগিয়ে এলো। ছাদের আবছায়ায় যতটুকু দেখতে পেলাম, সেটাকে একটা ঝলক বলা যায়। ফর্সা সুজাতাও। কিন্তু রঞ্জিতা যেন অগ্নিশ্বরী। চুস্ত্ পায়জামার ওপরে বোধ হয় বেগুনি রঙের পাঞ্জাবী কিন্তু তার ওপরে কোনো উত্তরীয় নেই। বিকেলে দেখা হেনার মতোই অনেকটা চুলের ভাব। খোলা দোলানো চুল, ঘাড়ের একটু নীচে। কাঁধের পিঠে, হাতে ধরে রাখা একটি চামড়ার রঙচঙে ব্যাগ। হাতে ঘড়ি। কতো বড় চোখ তা বুঝতে পারছি না, ঝিলিকটা তবু যেন টের পাওয়া গেল। এক পলকের মধ্যেই, ঝটিতি একবার আমাকে আর টেবিলের দিকে দেখে, খুশি উপচানো সুরেলা গলায় বলে উঠলো, 'ওহ্, ঈশ্বর। খুব ভালো সময়েই এসেছি দেখছি।'

আমি উঠে দাঁড়াবো কী না ভাবছি। কেতায় তো তাই বলে, মহিলাকে সম্মান দিতে হয়। কিন্তু দাঁড়ালেই পরিচয় পাড়াটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুবন্ধু কী চায়।

সুজাতা রঞ্জিতাকে বললো, 'খুবই ভালো সময়, বসে পড়ো।'

সুবন্ধু এগিয়ে এলো। ওর পাশে আর একজন, শার্ট ট্রাউজার পরা বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। মুখে অল্প ছাঁটা গোঁফ দাড়ি। বয়স বেশি বলে মনে হলো না। সুবন্ধু রঞ্জিতার দিকে ফিরে আমাকে দেখিয়ে, শুধু আমার পদবীটা বলে, বন্ধু হিসাবে পরিচয় দিল। পাশের লোকটিকেও তা-ই বললো। আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। সুবন্ধু ওদের পরিচয় দিল, রঞ্জিতা রিজ্‌ভি, আর মিঃ অ্যান্টনি। যদিও অ্যান্টনিকে দেখে, ভারতের শ্যামবর্ণ দেখাচ্ছে। রঞ্জিতা নামটা হিন্দু মনে হয়, তার সঙ্গে রিজ্‌ভি কীভাবে যোগ হয়েছে, আন্দাজ করতে পারছি না।

অতিথিরা দুজনেই আমার দিকে ফিরে ঘাড় নাড়লো, হাসলো। রঞ্জিতার চোখে যেন সদাই ঝিলিক, এই আবছায়াতেও দেখতে পাচ্ছি। ভুরু কাঁপিয়ে, ঝিলিক হেনে বললো, 'হ্যালো। প্লীজ সীট ডাউন।'

বলতে বলতে সে নিজেও বসলো। বয়স কি আন্দাজ করা যায়? অন্ততঃ এই

খোলা অকাশের তলায় নক্ষত্রের আলোতে যে শরীরটিকে দেখতে পাচ্ছি, তার তুলনাটা যেন খাপ খোলা ধারালো তলোয়ারের ঝলকের সঙ্গেই লাগসই। যাকে বলে ছিপছিপে, ঠিক তা বলা যাবে না, অথচ স্থূলতার কোনো চিহ্ন নেই। একটু ঔদ্ধত্যের লক্ষণই বেশি।

অ্যান্টনিকে একটু চুপচাপ গম্ভীর গোছের মানুষ মনে হচ্ছে। সে সোফায় গিয়ে বসলো। সুবন্ধু বললো, 'রঞ্জিতা যখন এসেই পড়েছে, তখন একটু আলোর ব্যবস্থা করা যাক।'

রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, আমি আসা মানে তো অন্ধকার ঘন হয়ে আসা, আলোর দরকার আছে।'

সুবন্ধু হেসে বললো, 'সেজন্য না। তোমার আলোই যথেষ্ট। তবে আমি চাই, আমার বন্ধু তোমাকে আর একটু ভালো করে দেখুক।'

আমি বলে উঠলাম, উনি যথেষ্ট আলোকময়ী, আমার জন্য বাতির দরকার নেই।'

জবাব দিল রঞ্জিতা রিজ্‌ভি, 'সত্যি? আপনাকে ধন্যবাদ। আমিও আপনাকে ভালোই দেখতে পাচ্ছি, অন্ততঃ আপনার চোখ দুটো তো বটেই।'

সুবন্ধু বললো, 'আর সেই দেখাটা হলো, রঞ্জিতা রিজ্‌ভির দেখা। কী রকম চোখ দুটো বলো তো?'

রঞ্জিতা বললো, 'বাঙালীদের চোখ তো বরাবরই একটু মোহসঞ্চারী।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'কিন্তু সিন্ধি মেয়েদের মতো চিত্তাচাঞ্চল্য জাগায় না।'

রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে, ঘাড় বাঁকিয়ে চোখে ঝিলিক হেনে বললো, 'জেগেছে নাকি?'

সুবন্ধু বললো, 'জাগলেও আর কি বলবেন। তুমি নিজেই ওটা ভালো জানো।'

আমার চিত্তচাঞ্চল্য জেগেছে কী না জানি না। রঞ্জিতা রিজ্‌ভির চাঞ্চল্য জাগানোর ক্ষমতা আছে। নিঃসন্দেহে। সুবন্ধু অ্যান্টনির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী বক্তব্য অ্যান্টনি?'

অ্যান্টনি রঞ্জিতার দিকে একবার দেখে বললো, 'আমার চিত্ত তো চঞ্চল হয়েই আছে। আমি তো রঞ্জিতার পিছু পিছু ঘুরি।'

রঞ্জিতা বললো, 'অন্ততঃ সময় বিশেষে নিশ্চয়ই ঘোরো। যেমন আজ, যেই শুনলে আমি সুবন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, অমনি ছুটে এসে আমার ট্যাকসিতে উঠে পড়লে।'

সকলেই হেসে উঠলো। অ্যান্টনি রঞ্জিতাকে বললো, 'আর সেটা নিশ্চয়ই তোমার অনিচ্ছায়?'

রঞ্জিতা ঘাড় নেড়ে বললো, 'খানিকটা তো তাইই। তোমার কেরালার লোকেরা আর বাঙালীরা দেখা হলেই রাজনীতির কচকচি শুরু করে দাও, যা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।'

সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো, 'আমিও পারি না।'

সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো, 'আমিও পারি না।'

সুবন্ধু বললো, 'ঠিক আছে রঞ্জিতা, তুমি যদি তোমার কথাতে আমাদের টেনে রাখতে পারো, আমরা রাজনীতিকে গুলি মেরে দেব। এখন তোমার কী চলবে বলো।'

রঞ্জিতা চোখের কোণে আমাকে একবার দেখে নিল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে, ভাষাটা এক রকম শোনালো 'তুমাদের তো আবার পিয়েব না, খায়েব। নট ড্রিংকিং, ইটিং। তুমরা কী খায়?'

সুবন্ধু হেসে বললো, 'চমৎকার বাংলা বলেছ। আমি খাচ্ছি রাম, আমার বন্ধু লেবুর জল।'

'লিম্বুর জোল। ফানি।' রঞ্জিতা আমার দিকে তাকালো। নক্ষত্রের আলোতেই কী না জানি না, তার অনতিদীর্ঘ চোখের ঝিলিকে যেন আমার চোখ বিঁধিয়ে দিল ঘাড় হেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো 'ট্রু?'

হেসে বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই সুবন্ধুকে ভালোই চেনেন। উনি লেবুর জলেও জল মেশাতে জানেন।'

রঞ্জিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে চুলের গোছা দুলিয়ে বললো, 'বিউটিফুল। আপনি তাহলে ম্যাচিয়োরড লেবুর জল পান করছেন। আমি রাম পান করবো।'

সুবন্ধু বললো, 'ও, কে,। অ্যান্টনি?'

'সেম্।'

ডাকাডাকি করে হুকুম করতে হলো না, দলীপ দুটো গেলাস দিয়ে গেল।

সুবন্ধু তার অতিথিদের পানীয় ঢেলে, জল মিশিয়ে দিল। চিয়ার্স হলো। রঞ্জিতার তৃষ্ণাটাই যেন বেশি, এক চুমুকেই অনেকখানি শুষে নিল। শব্দ করলো. 'আহ্।' সুজাতা হেসে বললো, 'বাঁচলে মনে হচ্ছে।'

রঞ্জিতা বললো, 'চাতকের প্রায়।' বলে আমার দিকে একবার দৃষ্টি হানলো। আবার সুবন্ধুর দিকে ফিরে বললো, 'আমি অবিশ্যি জানি না, তোমার বন্ধু কী ভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছেন।'

অ্যান্টনি জিজ্ঞেস করে উঠলো, 'সেজন্য কি তোমার কোনো পরোয়া আছে ?'

রঞ্জিতা বললো, তুমি পছন্দ করো না জানি, সেজন্য তোমাকে আমার জবাব হচ্ছে, একেবারেই না। কিন্তু—।'

আমার দিকে ফিরে বললো, 'ক্ষেত্র বিশেষে আমি পরোয়া করি। আমি কারোকে দুঃখিত করতে চাই না।'

বললাম, 'আমি দুঃখিত হচ্ছি না। আপনি সহজ থাকুন।'

রঞ্জিতা ঘাড় নুইয়ে, চোখের পাতা কাঁপিয়ে বললো, 'ধন্যবাদ।'

সুবন্ধু আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমার বন্ধুদের একটু বিশদ পরিচয় দিই আপনার কাছে। আপনি হিন্দী সাহিত্য জগতের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। তাহলে রঞ্জিতা রিজ্‌ভির নামটা হয়তো শোনা থাকতো। ইনি গল্প এবং উপন্যাস লেখিকা, ইতিমধ্যে যথেষ্ট নাম করেছেন—'

রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'বেশি বাড়াবাড়ি করো না। সুবন্ধু।'

সুবন্ধু হেসে বললো, 'যা বলছি ঠিকই বলছি। দুটি বিতর্কমূলক নাটকও লিখেছেন, অবিশ্যি দিল্লীতে উনি এমনিতেই যথেষ্ট বিতর্কিত বালিকা—'

রঞ্জিতা আবার বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'মহিলা।'

'হ্যাঁ, বয়স যার হাতে গোনা যায়।'

'দু হাতে ?'

'না, এক হাতে।'

রঞ্জিতা ঠোঁট কুঁচকে হাসলো ঘাড় দুলিয়ে গেলাস তুলে নিল। সুবন্ধু আবার বললো, 'তা ছাড়া উনি হচ্ছেন সিন্ধু দেশের মেয়ে বিয়ে করেছেন এক প্রফেসর রিজ্‌ভিকে, আপাতত যিনি আমেরিকা প্রবাসে আছেন। ফিরবেন বোধ হয় শীগগিরই—তাই তো ?'

সুবন্ধু রঞ্জিতার দিকে তাকালো। রঞ্জিতা বললো, 'চিঠির খবরে, দু সপ্তাহ বাদে।'

সুবন্ধু বললো, 'এ ছাড়াও বলা দরকার। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে উনি রিসার্চ করছেন, সেজন্য এখন ওঁর ঘরবাড়ি সাপরু ভবনের লাইব্রেরি।'

সুবন্ধু থামতেই রঞ্জিতা ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, 'ফিনিস ?'

'আপাতত। এবার অ্যান্টনির পরিচয় করিয়ে দিই। ওর বয়স বেশি নয়। কেরালার ছেলে, পলেটিক্যাল সায়ান্সে এম-এ পাশ করেছে। এখন চীন সম্পর্কে রিসার্চের পড়াশোনা করছে। এরা সবাই সাপরু ভবনের লোক।'

অ্যান্টনি শুধরে দেবার জন্য বললো, 'লোকে মানে, ওটাই পড়াশোনার জায়গা।'

সাপরু ভবন পাঠাগার যে দিল্লীর একটি মূল্যবান অ্যাসেট, সেটা আমার আগেই জানা ছিল। কিন্তু সাংবাদিক হিসাবে, রঞ্জিতা রিজ্‌ভির সঙ্গে যদিও সুবন্ধুর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অ্যান্টনির সঙ্গে কিরূপে? তাকে তো এখনো ছাত্রের পর্যায়েই ফেলা চলে। প্রশ্নটা তুললে রাজনীতির দিকে মোড় ঘুরে যেতে পারে। রঞ্জিতা এবং সুজাতাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। ওরা আগেই শুনিয়ে দিয়েছে, রাজনীতিতে ওরা বীতরাগ।

কথা বললো রঞ্জিতা, 'সুবন্ধু এ পেগ অব রাম ফর এ থার্স্টি উয়োম্যান। তারপরে, তোমার এই বন্ধু সম্পর্কেও আমাদের কিছু বলো। কেবল আমাদের বিষয়ে গান করেই ক্ষান্ত হয়ো না।'

সুবন্ধু রঞ্জিতার গেলাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে, দুই চোখে একবার রঞ্জিতাকে দেখলো, তারপরে আমার দিকে। কথা বললো গেলাসের দিকে নজর রেখে,, 'য়ু আর টু-উ ফাস্ট ইন এভ্‌রি রেসপেক্‌ট। আগে তো তোমাদেরটাই গাইতে হবে।'

সুবন্ধু গেলাসে পানীয় ঢেলে, জল মিশিয়ে,, রঞ্জিতার হাতে তুলে দিল। সুজাতা তার জামের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার এই জিনিস কি কারো ভালো লাগছে না?'

রঞ্জিতাই আগে দুটি জাম তুলে নিয়ে বললো, 'কেন লাগবে ন'। তখন থেকে দেখছি, তুমিই জামের প্লেট আগলে বসে আছো, আর টপাটপ মুখে পুরে যাচ্ছ।'

সুজাতা বললো, 'কী করবো বলো। তোমরা দেখছি, ড্রিংকসের সঙ্গে চানাচুর আর কাজু খেয়ে যাচ্ছ। আমার গরমের সময় ও সব ভালো লাগে না।'

অ্যান্টনি জাম তুলে নিল। আমি নিলাম। রঞ্জিতা বললো, 'কিন্তু সুজাতা, হায়দ্রাবাদের মেয়েদের কি একটু ঠাণ্ডা লাইম জিনও চলতে পারে না?'

সুজাতা বললো, 'আমার দুর্ভাগ্য।'

রঞ্জিতা বললো, 'এ ব্যাপারে সব দুর্নামটা পাঞ্জাবী আর সিন্ধি মেয়েরাই নিল।'

আমার বলে উঠতে ইচ্ছা করলো রাজধানী এক্সপ্রেসের গীতা ভাটের কথা। অথবা অনেক বঙ্গ হিন্দু নারীর কথাও। যাদের সুধারসের—না সুরারসের প্রতি বেশ আসক্তি। পানীয়ের পাত্রে ঠোঁট ডোবালেই যারা ছলছলিয়ে ওঠে।

কিন্তু রঞ্জিতা জন্মসূত্রে সিন্ধুর হিন্দু মেয়ে। বিবাহসূত্রে, রঞ্জিতা রিজ্‌ভি মুসলমান বিবি। বোরখাওয়ালী নয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বরং অনেক বেশি আধুনিকা। তবু, এ চর্মচক্ষে এখনো কোনো মুসলমান বিবিকে পান করতে দেখিনি। আমাদের হিন্দু ভারতে তো শুণ্ডিনীও ছিল। এখনো বহু গ্রামেই আছে, দেখেছি, মেয়েরা মদ চোলাই করে লুকিয়ে। বিক্রি করে। পুরুষকে খাওয়ায়। শুণ্ডিনীর পাত্রও কি পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতে, এ ব্যাপারে বোধ হয়, আধুনিক কালের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ছিল না। সেইজন্য হিন্দু রমণীদের কথা থাক, মুসলমানের কাছে সুরা তো নিষিদ্ধ। তাও আবার বিবির পিয়াস।

নিষিদ্ধ? থাক্, আর নিজের ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে কী লাভ। নিষেধেরও কতগুলো নির্দেশ আছে, তাই মেনে সে চলে। অধ্যাপক রিজ্‌ভির অনুমোদনই তো বড় কথা।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো, সুবন্ধুর সঙ্গে রঞ্জিতার যেন চোখে চোখে কী কথা হচ্ছে। আর রঞ্জিতা, যাকে বলে, আঁখির ঠারে, সেইভাবে, চোখের কোণ দিয়ে আমাকে থেকে থেকে দেখছে। সুবন্ধুর চোখে ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। সুবন্ধুর চোখে চোখ পড়ল আমার। ও হেসে উঠলো। বললো, 'কী হলো?'

বললাম, 'কিছু না।'

'ওইটুকু লিম্‌পানী শেষ করতে এতক্ষণ লাগছে কেন। চুমুক দিন।'

'চলুক না।'

অ্যাণ্টনী আর সুবন্ধু আবার পানীয় নিতেই, রঞ্জিতা তার পাত্র শেষ করে এগিয়ে দিল বললো, 'আমাকেও দাও।'

সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, 'রঞ্জিতা কি আজ মাতাল হবে নাকি?'

রঞ্জিতা চোখে ঝিলিক হেনে বললো, 'আমি তো রোজই মাতাল।' বলে আমার দিকে একবার চকিত কটাক্ষ করে বললো, 'আয়াম বিট ফাস্ট।'

বললাম, 'ক্ষতি কী?'

সুবন্ধু রঞ্জিতার দিকে পূর্ণপাত্র এগিয়ে দিতে দিতে বললো, 'ক্ষতি যে কী, সে তো এখন বোঝা যাবে না, পরে বোঝা যাবে।'

রঞ্জিতা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।'

সুবন্ধু গেলাসসুদ্ধ হাত জোড় করে বললো, 'তাহলে কি আর বাঁচতাম।'

রঞ্জিতা এক মুহূর্তের জন্য, হঠাৎ যেন বিষণ্ন হয়ে উঠলো। বললো, 'আমি আজ পর্যন্ত কারোর কোনো ক্ষতি করিনি।'

রঞ্জিতা গেলাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে, মাথা নিচু করে রইলো। দেখলাম, সুবন্ধু একবার সুজাতার, তার পরে অ্যান্টনির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আমার সঙ্গেও হলো। রহস্য কী জানি না। মনে মনে একটু ত্রস্ত বোধ করছি। রঞ্জিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে, কপালের কাছে চুল সরিয়ে, মুখ তুলে, সুবন্ধুর দিকে ফিরে বললো, 'এ সব কথা থাক, তোমার বন্ধুর কথা বল তো এবার। কেমন যেন ইচ্ছে করেই ঠোঁট টিপে রয়েছে?'

বলে আমার দিকে ঘাড় কাত করে একটু যেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। নড়াচড়া করে উঠলেই অগ্নিশ্বরীর সারা গায়ে লেলিহান শিখা লকলকিয়ে উঠছে। ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা চোখে। সুবন্ধু হেসে বললো, 'ঠোঁট টিপে থাকবে কেন? পরিচয় তো দিয়েছি।'

রঞ্জিতা যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে, চোখে চোখ রাখা যায় না। মাথা নেড়ে বললো, 'ওটা কোনো পরিচয় দেওয়া না। শুধু পদবীটা বলেছ, পুরো নামটাও বলোনি। কোথায় যেন একটু লুকোচুরি খেলছো মনে হচ্ছে। চোখের ইসারায় জিজ্ঞেস করলে, কেবল ঠোঁট টিপে হাসছো।'

চোখের ইসারাতেও জিজ্ঞেস করা হয়ে গিয়েছে। তার প্রয়োজন কী। রঞ্জিতা রিজ্‌ভির মতো মেয়ে বা অ্যান্টনির মতো ছেলে নিশ্চয়ই আমার খবর রাখে না। তবু পরিচয় পেড়েই বা কী লাভ। এই দেখা জানাটা তো এখানেই ইতি। হঠাৎ হয়ে গিয়েছে। সুবন্ধু বললো, 'বলার মতো তেমন কিছু নেই।'

সুবন্ধু আমাব দিকে চেয়ে হাসলো। রঞ্জিতা বললো, 'মিথ্যা কথা। আমাদের জন্য যদি এত পরিচয় দেওয়ার থাকে, এঁরও নিশ্চয়ই আছে। উনি হয়তো একজন কলকাতার সাংবাদিক, কিম্বা সেন্ট্রাল গবর্নমেণ্টের এক কর্মচারীও হতে পাবেন।'

সুবন্ধু বললো, 'সেই রকমই ধরে নাও না।'

'না, ধরে নেব কেন? তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। জানো তো, জানতে না পারলেই কৌতূহল বাড়ে।'

সুবন্ধু আমার দিকে তাকালো। রঞ্জিতাও তাকালো। আমি হেসে একবার অ্যান্টনির দিকে দেখলাম। সে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। চোখ ফেরালাম সুজাতার দিকে। সে রঞ্জিতাকে দেখছে। আমি আবার রঞ্জিতার দিকে ফিরে বললাম, 'আপনাদের মতো দূরদেশীদের কাছে আমার সে রকম কোনো পরিচয় দেবার নেই।'

রঞ্জিতা সে কথার কোনো জবাব দিল না। তার ভুরু লতিয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আপনাকে কি আমি আগে কোথাও দেখেছি?'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'সেইটা জানতে পারলেই আমরা এখন খুশি।'

সুজাতাও হেসে উঠলো। রঞ্জিতা আবার বললো, 'কেন জানি না মনে হচ্ছে, এর আগে আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি। কলকাতায় কিংবা এই দিল্লীতেই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কলকাতায় গিয়েছেন নাকি ?'

'কয়েকবার। অনেক সাহিত্যিক নাট্যকারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

বুক কেঁপে ওঠার মতো কথা। তবে আমার সঙ্গে যে নেই, আমি নিঃসন্দেহ। বললাম, 'আপনার সঙ্গে আমার কোথাও দেখা হয়নি।'

তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন, 'আপনি কি ছবি আঁকেন ?'

'না।'

'কবি ?'

হেসে ঘাড় নাড়লাম। সুবন্ধু জোরে হেসে উঠলো। ওর সঙ্গে আমার চোখ মিললো। ও বললো, 'লাগ্ ভেল্কি লেগে যা।'

জানি না, রঞ্জিতার অগ্নিশ্বরী শরীরের রক্তে পানীয় কতোখানি রঙ ছড়িয়েছে। তার কালো চোখের ঝিলিক যেন বেড়েছে। বললো, 'তবে, আপনি যে একজন শিল্পী, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, আর—।'

রঞ্জিতা কথা থামিয়ে ঘাড় কাত করে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। চোখে চোখ রেখে, সেই অবস্থাতেই গেলাসে চুমুক দিল।

সুবন্ধু ঝুঁকে পড়ে বললো, 'আর ? কথাটা শেষ করো রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা চোখ না ফিরিয়ে বললো, 'এই অল্প আলোতে দেখে বলছি, ওঁর মধ্যে আরো এমন কিছু আছে, যা আমি স্পষ্ট করে এখন বলতে পারছি না।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'তবু—একটুখানি প্লিজ।'

রঞ্জিতা মুখ ফিরিয়ে গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'সেটা আর একটা মেয়ের মুখ থেকে না-ই শুনলে। তুমি কী বলো সুজাতা ?'

সুজাতা তাড়াতাড়ি বললো, 'তোমার মত চোখ আমার নেই।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'রঞ্জিতা, তোমার চোখ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা উচিত।'

রঞ্জিতা বললো, 'সোনার চোখ দেখতে পায় না সুবন্ধু, মন দেখতে পায়। এবার তুমি মুখ খোলো।'

সুবন্ধু আমার দিকে তাকালো। ওর চোখে সেই হাসি। হুঁ-হু, হাসিটাও মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। বললো, 'আপনাকে এরা কেউ বিব্রত করবে

না। এটা হলো দিল্লী, এরা অবাঙালী। কিন্তু রঞ্জিতাকে আপনার আসল পরিচয়টা দিয়ে দেওয়া উচিত।'

অ্যান্টনি বললো, 'যদি কোনো রাজনৈতিক বাধা না থাকে।'

রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'য়ু শাট আপ্ মার্কসিস্ট।'

সুবন্ধু আমার নামটা বললো। রঞ্জিতা হাত বাড়িয়ে ওর গেলাসটা নিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী হলো, একটু ধাক্কা লেগে পড়ে গেল, ভাঙলো, পানীয় গড়িয়ে গেল। রঞ্জিতা কী বলতে গিয়ে আগে বললো, 'ওহ্, আয়ম সরি—বাট ওহ্ গড। ইজ হি দ্যাট ম্যান! কয়েকদিন আগেই ওঁর একটা নতুন হিন্দী অনুবাদ বেরিয়েছে, আমার পড়া হয়ে গিয়েছে, কম করে আমি ওঁর পাঁচ-ছ'খানা হিন্দী অনুবাদ বই পড়েছি।'

সুবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এতগুলো বেরিয়েছে কী?'

আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে ঘাড় নাড়লাম, বললাম, 'তা বোধ হয় হয়েছে।'

রঞ্জিতা নিজেই পর পর চারটি বইয়ের নাম করে গেল। তারপরে ঠেক খেয়ে গেল। বললো, 'এখুনি ঠিক মনে করতে পারছি না, বিষয়বস্তু মনে আছে। কিন্তু—।'

রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে তাকালো। তার গালের একপাশে চুল এলিয়ে পড়েছে। বললো, 'কিন্তু আপনার লেখার সঙ্গে চেহারাটা যেন আমি একেবারেই মেলাতে পারছি না। ভেবেছিলাম, আপনি খুব লম্বা চওড়া ভ্রূকুটি চেহারার বিষণ্ণ ভাবের লোক হবেন।'

কেন তা হবো জানি না। অ্যান্টনি বললো, 'অনেকখানি ভেবেছ। কিন্তু বই পড়লে, এ ভাবনাটা আসে নাকি?'

রঞ্জিতা বললো, 'সেটা তুমি বুঝবে না পলেটিশিয়ান।'

সুবন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে, যেন উল্লাসে গুনগুনিয়ে উঠলো, 'মন যে আমার কেমন কেমন করে।'

গুনগুন করে, সিঁড়ির দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিল, 'দলীপ, একঠো গিলাস লে আও।'

তারপরেই দেওয়ালের গায়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। আবছায়ার সমস্ত চেহারাটা গেল বদলে। মঞ্চে যেন নতুন দৃশ্যের অবতারণা। প্রথমে রঞ্জিতার সঙ্গেই আমার চোখাচোখি হলো। অগ্নিশ্বরী তো বটেই, যেন একটা বিধ্বংসী দাবানলের মতো, শিখা বাড়ানো। এই রূপ দেখলে চোখ জ্বলে যায়, পুড়ে

মরার ভয় লাগে। স্বস্তি শান্তি স্নিগ্ধতা ধরা পড়ে না। টলটলিয়ে ওঠে না। দেখলাম, রঞ্জিতা ঠোঁটে রঙ মাখেনি, কিন্তু বিম্বোষ্ঠে টকটকে লাল। চোখে কিন্তু কাজল আছে। ইতিমধ্যেই চোখে লেগেছে রঙ, যদিও আলোয় দেখছি, তার চোখের তারা যেন তেমন কালো না।

দলীপ গেলাস নিয়ে এলো। সুজাতার কথায়, ভাঙা গেলাসের কাচের টুকরো সাবধানে তুলে নিয়ে গেল। সুবন্ধু গেলাস পূর্ণ করে রঞ্জিতার হাতে দিয়ে বললো, 'ভেবেছিলে এক রকম, এখন আমার বন্ধুকে কেমন দেখছ ?'

রঞ্জিতা ঠোঁটের ভঙ্গি করে, এক পলক আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'বলবো না।' আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কী বলেন ?'

আমি অনেকক্ষণ থেকেই বিব্রত বোধ করছি। অপ্রস্তুত হেসে বললাম, 'আপনার অভিরুচি। তবে বলতে ইচ্ছা না করলে, থাক না।'

রঞ্জিতা বললো, 'ঠিক বলেছেন, ওটা মনে মনেই থাক !'

সুবন্ধু বললো, 'যাক নিজেদের মধ্যেই ঠিক করে নিলে। পরিচয় পেয়ে খুশি হলে ?'

রঞ্জিতা বললো, 'পেয়ে এবং দেখেও। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ওঁকে নিয়ে কাল আমার বাড়ি এসো, তোমাদের আমি নিমন্ত্রণ করছি।'

আমি ভয় পাওয়া চোখে সুবন্ধুর দিকে তাকালাম, সুবন্ধুও তাকালো, বললো, 'দাঁড়াও রঞ্জিতা, এত তাড়াতাড়ি করো না।'

রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'অসুবিধা আছে ?

বললাম, 'একটু।'

রঞ্জিতা মুখ নামিয়ে গেলাসে চুমুক দিল। অ্যান্টনিকে এবার ভালো করে দেখলাম। বড় বড় চোখ, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, মাথার চুল পাতলা। সারা মুখে পাতলা গোঁফ দাড়ি, কাঁচি দিয়ে ছাটা। বয়স তিরিশের নিচেই। কেরালার ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের ছেলে। চীন নিয়ে সে কী রিসার্চ করছে, জানবার তেমন কৌতূহল নেই। দেখছি, সে রঞ্জিতাকে প্রায়ই দেখছে। আমিও ভাবছি, এই রঞ্জিতা রিজভির কোথায় যেন নানা রকমের আঁকাবাঁকা আলোছায়া লেগে রয়েছে। কতো ওর বয়স হতে পারে। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি কী ? মনে হয় না। এই রূপ দেখলে তাকে চারুকলার স্রষ্টা বলে ভাবতে ইচ্ছা করে না। কী লেখে রঞ্জিতা, কেমন ওর রচনা। সেই বিতর্কমূলক নাটক দুটিই বা কী, কিছুই জানি না। সুবন্ধু বলছিল, রঞ্জিতা নিজেও বিতর্কিত মেয়ে।

বললাম, 'কিন্তু হিন্দী পড়তে পারি না, আপনার লেখার পরিচয় জানতে পারলে সুখী হতাম।'

রঞ্জিতা বাঁ হাতের রক্তিম করতল ঘুরিয়ে বললো, 'ওহ্, কিছু না কিছু না, আপনার কাছে কিছুই না।'

বললাম, 'কোনো লেখক লেখিকার সম্পর্কেই আমি এ রকম ভাবতে পারি না।'

রঞ্জিতা বললো, 'কিন্তু কথাটা সত্যি। তবু বলি, আপনারা হলেন অহঙ্কারী বাঙালী লেখক, আপনারা হিন্দী শিখতে চান না, পড়তে চান না, জানতে চান না।'

বলেই ঘাড় কাত করে চোখ ঘুরিয়ে হাসলো। হঠাৎ এই অভিযোগের কোনো জবাব দিতে পারলাম। রঞ্জিতা-ই আবার জিজ্ঞেস করলো, 'খুব মিথ্যা বললাম কী?'

বললাম, 'মিথ্যা বলেছেন বলছি না, একটু ভুল বলেছেন। বাঙালী লেখকরা অহঙ্কারী নন। আমরা চাই না, সেটাও বোধ হয় সত্যি না। আমরা পারিনি, সেটা ঠিক।'

রঞ্জিতার চোখের ঝিলিকে, রক্তিম ঠোঁটের বক্রতায়, আক্রমণ নেই। একটু চটুল ভঙ্গিতে বললো, 'ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই পারতেন। আপনাদের সে ইচ্ছাও নেই।'

আমি সুবন্ধুর দিকে তাকালাম। সুবন্ধু বললো, 'এ ব্যাপারে আমি নেই বাবা। এ সব হচ্ছে সাহিত্যিকদের ব্যাপার। কী বলো অ্যান্টনি।'

অ্যান্টনি ঘাড় নেড়ে বললো, 'বটেই তো।'

রঞ্জিতা আমার হাতের খালি গেলাসটা টেনে নিয়ে সুবন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল, বললো, 'অতিথির দিকে তোমার নজর নেই।'

'সার সরি।' সুবন্ধু তাড়াতাড়ি আমার শূন্য গেলাসটা নিয়ে পানীয় ঢালতে লাগলো। আমি বলে উঠলাম, 'সুবন্ধু থাক। রাত্রিও তো হচ্ছে।'

রঞ্জিতা ওর হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বললো, 'রাত্রি? মাত্র সাড়ে ন'টা। আরো ঘন্টাখানেক অনায়াসে বসা যায়। কিন্তু আপনি কি আমার কথায় কিছু মনে করলেন?'

হেসে বললাম, 'কিছুই না।'

রঞ্জিতাও হেসে বললো, 'এত অনায়াসে এই কথাটা বললেন বলেই, আরো অহঙ্কারী মনে হয়। যদি কিছু মনে করতেন, তাহলে বুঝতাম আপনাকে একটু ভাবানো গিয়েছে। তবে—।'

গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে খালি গেলাস ঠক করে নামিয়ে দিয়ে আবার বললো, 'ভাববার কিছু নেই। আমি জানি, ওটা গরজের ব্যাপার। হিন্দীর জন্য যদি কখনো বাঙালীর গরজ হয়, তখন তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে। আমরা এখন যেমন আপনাদের নিচ্ছি।'

কথাটা শুনে খুব স্বস্তিবোধ করলাম। খুশি চোখে তাকালাম রঞ্জিতার দিকে। আমার হাতে গেলাস তুলে দিয়ে সুবন্ধু বললো, 'খুব ভালো বলেছ রঞ্জিতা। সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে এ ছাড়া কিছু বলবার নেই। গরজে পড়ে আমরা যদি সাগরপারের সাহিত্য নিয়ে টানাটানি করতে পারি, তাহলে ভারতের অন্য রাজ্যেরটা পাববো না কেন। গরজ বড় বালাই।'

রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে বললো, 'সাহিত্য সম্পর্কে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আপনাকে আছে, তবু বলে রাখা ভালো, এখন এই চোখে মুখে হাসি চুপচাপ মানুষটির বিষয়েই আমি বেশী কৌতূহলিত।'

সুবন্ধু বললো, 'উত্তম।'

সুবন্ধুর সঙ্গে তারপরে সুজাতা এবং অ্যান্টনির সঙ্গে আমাব দৃষ্টি বিনিময় হলো। ভাবছি, সেই লগ্নটা কখন, গতকাল ডাইনিং হলে, সুবন্ধু যখন আমাকে দেখতে পেয়েছিল। সেই লগ্নে গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান বা কেমন ছিল। যা-ই থাকুক, তার খারাপ-দশাটা যেন আজ রাত্রের মধ্যেই ইতি হয়। সুবন্ধু রঞ্জিতার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কৌতূহলটা কী বকম, সেটাই আমরা জানতে চাই।'

রঞ্জিতা ঘাড় বাঁকিয়ে একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো 'সবটা তোমাদের জানতে দিতে চাই না, কিন্তু উনি এত চুপচাপ কেন?'

সকলেই আমার দিকে তাকালো। হেসে বললাম, 'কী বলবো বলুন, আমি আপনাদের কথা শুনছি।'

রঞ্জিতা কালো ভুরু তুলে বললো, 'কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনার চোখে মুখে, অনেক কথা। পরিচয় তো পাওয়াই গেল। এবার দরজাটা একটু খুলুন না।'

মানতেই হবে, রঞ্জিতা দেহে রূপে অগ্নিশ্বরী না, কথাতেও বাকপটিয়সী। বললাম, 'দরজা আমার খোলাই আছে।'

রঞ্জিতা এক হাতে কপালের কাছে, চুলের গোছা মুঠিতে করে ধরে, চোখের তারা কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি?'

আমার জবাবের প্রত্যাশা না করেই, কপালে গালের ওপর চুলের গোছাটা

ছেড়ে দিয়ে, গেলাস টেনে নিয়ে চুমুক দিল। আমি সুবন্ধুকে একবার দেখে বললাম, 'আমি আপনাদের সান্নিধ্য উপভোগ করছি।'

রঞ্জিতা বললো, 'তিক্ত সান্নিধ্য।'

'তা কেন, প্রীতি আর আনন্দের সান্নিধ্য।'

'আমি তো একটি মাতাল মেয়ে, আমার সান্নিধ্য কেউ উপভোগ করে না।' অ্যান্টনি গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, 'আমি সব সময়েই করি।'

দেখলাম, তার মোটা ঠোঁট, বড় বড় রক্তিম চোখে হাসি। রঞ্জিতা বললো, 'সেটাই বিপদ। কিন্তু উপভোগ করার মতো অনুভূতি তোমার নেই।'

অ্যান্টনি সুবন্ধুর দিকে চেয়ে বললো, 'আমি দুর্ভাগা।'

বুঝতে পারলাম না, তার চোখের কোণে বিদ্রুপ রয়েছে কী না। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। সুবন্ধু ছাড়া সকলেই আমার একটু সময়ে পরিচিত। রঞ্জিতা শূন্য গেলাস আবার সুবন্ধুর দিকে বাড়িয়ে ধরলো। সুবন্ধু জিজ্ঞেস করলো, 'মোর?'

রঞ্জিতা বললো, 'ইয়েস মোর। কেন, ভয় পাচ্ছো?'

সুজাতা ডাকলো, 'রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা বললো, 'আমাকে তোমরা জানো, আমি অক্ষম নই। কিন্তু ড্রিংকসের জন্য না, আজ আমার মনটা এখানে এসে হঠাৎ যেন এমনিই মাতাল হচ্ছে।'

রঞ্জিতা কথাটা বলেই ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। এই মুহূর্তে, রঞ্জিতা রিজভির সুরা-ঝলক চোখে কী ছিল আমি বলতে পারি না। আবেগ? অনুরাগ? চোখের পাতার নিবিড়তার নিতান্ত দুষ্টুমি? ওকে কি আমি সহজ এবং অনায়াস বলবো, নাকি লজ্জাহীন বলবো। কিন্তু আমার যেন কেমন লজ্জা করলো, অস্বস্তি বোধ করলাম। সুবন্ধুর দিকে একবার দেখে আকাশের দিকে মুখ তুললাম। রঞ্জিতা কি মাতাল হয়েছে। নাকি এটা ওর জীবনের একটা খেলারই অঙ্গ। কিছুই জানি না। কতক্ষণেরই বা দেখা। কিন্তু ওর এই দৃষ্টি এই মুহূর্তে কী বলতে চাইলো। যেন স্পষ্ট ভাবেই কিছু বলতে চাইলো, আমার অপ্রস্তুত অনুভূতি তা ধরতে পারেনি।

কিন্তু কী হবে আমার এ সময়ে এ কথা ভেবে। এ সবই তো কিছুক্ষণের জন্য। রঞ্জিতাও। তারপরে আমি আমার মনে। সুবন্ধু রঞ্জিতার গেলাস পূর্ণ করতে করতে কী একটা চেনা গানের সুর যেন গুনগুন করছে। আমি চোখ নামিয়ে ওর দিকে দেখতে গেলাম। রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'আপনি আমার কাছে ফাঁকি দিতে পারলেন না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের ফাঁকি, কেন ?'

রঞ্জিতার চোখ ঘুরিয়ে বলা কথাটার বাঙলা মানে করলে এই রকম হয়, 'বুঝহ রসিক জন, যে জান সন্ধান। ধরা পড়ে গেছেন।'

আমি প্রায় অসহায় হাসি নিয়ে সকলের দিকেই তাকালাম। সুজাতা দেখলাম, পলকহীন চোখে, রঞ্জিতাকে দেখছে। সুবন্ধু আমার দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। ওর এই হাসিটা আর সহ্য করতে পারছি না। অ্যান্টনিও দেখছে রঞ্জিতাকেই। বললাম, 'আমি কি কিছু লুকিয়ে রেখেছি নাকি যে, ধরা পড়ে যাবো।'

রঞ্জিতা বললো, 'আপনি লুকিয়ে রাখেন না। সে আপনিই লুকিয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো তা ধরা পড়ে যায়।'

সুবন্ধু বললো, 'এ সব হলো স্রষ্টাদের কথা, আমরা এর ভাব বুঝবো না।'

রঞ্জিতা সঙ্গে সঙ্গে বললো 'তেমন সৃষ্টি হয়তো আজও করতে পারিনি, কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যা বলোনি।'

কিন্তু আমার তিমির ঘুচলো বলে মনে হলো না। আমি রঞ্জিতার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। রঞ্জিতা ঘাড় কাত করে তাকালো। পরমুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে গেলাসের দিকে চোখ রেখে বললো, 'বিধ্বংসী আগুন আর সমুদ্রের প্লাবন, দুই-ই মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। তবু তারা কতো বিপরীত।'

বলে রঞ্জিতা গেলাসে চুমুক দিল। আমি সুবন্ধুর দিকে দেখলাম। ও এবার রঞ্জিতাকে দেখছে। অ্যান্টনি আমার দিকে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হতে হাসলো। সুজাতাও যেন খানিকটা অবুঝের মতো হাসছে। কিন্তু রঞ্জিতার কথাগুলো যেন অর্থহীন, অথচ অর্থময়। ক্রমে ওকে জটিল লাগছে। অথচ বিপরীত কতকগুলো আবেগের ধাক্কায়, একটু যেন বেসামাল। কিংবা নেহাতই মাতাল।

হঠাৎ রঞ্জিতার গলায় একটি অতি চেনা গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠতে শুনে চমকে উঠলাম। সুবন্ধু বললো, 'রঞ্জিতা খুব ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারে। আর আশ্চর্য হচ্ছে এই, ও বাঙলা কথা বলতে গেলে উচ্চারণে গোলমাল করে, কিন্তু গাইবার সময় একেবারেই না।'

রঞ্জিতা একেবারে নিখুঁত সুরে গেয়ে উঠলো, 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না/পথের শুকনো ধুলো যত/কে জানিত আসবে তুমি গো/এমন অনাহূতের মতো/পার হয়ে এসেছ মরু নাই যে সেথা ছায়া তরু....

হঠাৎ গান বন্ধ করে দিল। গেলাসে চুমুক দিল। সুবন্ধু বলে উঠলো, 'চলুক চলুক রঞ্জিতা চলুক!'

রঞ্জিতা একবার আমার দিকে দেখে, যেন লজ্জা পেয়ে হাসলো। ঘাড় নাড়লো। একটা কাজু মুখে পুরে দিয়ে বললো, 'না থাক, গান থাক। আজকে রাত্রের মতো ওঠা যাক। তোমার অতিথির নিশ্চয় খিদে পাচ্ছে।'

সুজাতা বললো,. 'উঠবে কোথায়? তুমি আর অ্যান্টনিও এখান থেকেই খেয়ে যাবে। যা আছে, তা-ই সবাই ভাগ করে খাবো।'

সুজাতা বিরক্ত হচ্ছিল কী না, বুঝতে পারছিলাম না। এখন আবার কথা শুনে মনে হলো রঞ্জিতার জন্য হয়তো একটু ভয় পেয়েছে, বিরক্ত হয়নি। সুবন্ধু বললো, 'তাহলে গান চলুক।'

রঞ্জিতা এক ভাবেই ঘাড় নেড়ে বললো, 'না। আমি এখন মাতাল, গান জমবে না। একটু ভিতর থেকে আসছি।'

বলেই উঠে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একটু গিয়ে পিছন ফিরে সুবন্ধুকে আঙুলের ইসারায় ডাকলো। সুবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। সিঁড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজনে। আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওঁর কি শরীর খারাপ করেছে?'

সুজাতা কিছু বলবার আগেই অ্যান্টনি বললো, 'না, শরীর খারাপ করেনি। এর মধ্যেই ওর শরীর খারাপ করে না। ওর ভেতরে কিছু একটা গোলমাল চলছে।'

আমি আর সুজাতা দুজনেই অ্যান্টনির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। অ্যান্টনি সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। কোনো কথা বললো না। হয়তো বলতে চায় না, অথবা সেও ভাবছে, রঞ্জিতার ভিতরে কী গোলমাল চলছে। দেখলাম, অ্যান্টনির বড় বড় আরক্তিম চোখ দুটো স্থির, অন্যমনস্ক।'

রঞ্জিতা রিজ্‌ভির মুখে এ রকম স্পষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছি। কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশি। মেয়েটি যেন আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে দিল। ওকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি মনে করেছিলাম, দেখলাম, সেইখানে ও আর নেই। ওকে আমি একটা দুঃখী মেয়ে ভাববো কী না বুঝতে পারছি না। অথবা গায়ে লেগেছে যার আগুন, ছুটে চলেছে মাঠের বুকের বাতাসে। ওকে দেখে মনে হয়, আলোর ছটায় রঙে ঝলমল করছে। অথচ হঠাৎ যেন অন্ধকারের গ্রাসে ডুবে যাচ্ছে। সিন্ধুর মেয়ে, দিল্লীর রিজ্‌ভি বিবি, সাহিত্য করে, নাটক লেখে, হাসে মদ্যপান করে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। হিসাবে মেলাতে পারছি না যেন।

তবু—তবু, নির্বাসিত, মন রাখো মনের ভিতরে। জীবনে সহসা এক একটা মুহূর্ত আসে। চলে যায়। তার কোনো বিচার ব্যাখ্যা সারা জীবনেও মেলে না। গভীর জলাশয়ের বুকে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো দেখা যায়, এক জায়গায় চলকে উঠলো জল, কী যেন একটা রুপোলী রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। একটি আচমকা জল ছিটকে যাওয়ার শব্দ। মনের মধ্যে জেগে ওঠে একটি মীনের ছবি। ওই পর্যন্তই। আর কী খেলা সেখানে খেলা হয়েছে, কী আবেশে, কোন্ ভঙ্গিতে তার কোন ব্যাখ্যা হয় না। জেগে থাকে শুধু নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দ জলাশয়ের একটি চকিত রূপ।

অ্যাণ্টনিব মোটা স্বর হঠাৎ শোনা গেল, 'অদ্ভুত মেয়ে!'

আমি তার দিকে তাকালাম। সুজাতা বললো, 'বরাবরই। ওকে ঠিক বোঝা যায় না।'

অ্যাণ্টনি বললো, 'ও নিজেকে চেনে না, অন্যকে চিনে নিতে পারে।'

অ্যাণ্টনি নিঃশব্দে হেসে আমার দিকে তাকালো। তার মুখটা ফুলে বড় হয়ে উঠেছে কী না আমি বুঝতে পারছি না। সুজাতা বললো, 'কিন্তু তাই কি অ্যাণ্টনি, রঞ্জিতা নিজেকে একটুও চেনে না?'

অ্যাণ্টনি বললো, 'আমার তো তাই মনে হয়। কতগুলো সুখ দুঃখ রাগ কান্নার অনুভূতির তরঙ্গে ভাসছে, তার ভিতর দিয়ে, এক এক সময় এক এক দিকে ছুটে চলেছে। ভিতরে ওর অনেক কিছু আছে, আমি গুণের কথা বলছি। কিন্তু জানি, দিল্লীর বিদ্বদ্‌জনেরা তা বিশ্বাস করে না। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে, বিদ্রূপ করে, বলে, প্লে-গার্ল। আরো, অনেক অনেক কিছুই বলে। বলবাব অবিশ্যি অনেক কারণ আছে, তাও জানি।'

অ্যাণ্টনি চুপ করলো। সুজাতা আর আমি চোখাচোখি করে অ্যাণ্টনির দিকে তাকালাম। অ্যাণ্টনি তার গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'গতকাল নিশ্চয়ই আপনারা দিল্লীর খবরের কাগজে একটা মজার খবর পড়েছেন—কনট প্লেসে কিছু হিপি মেয়ে তাদের বুকের অন্তর্বাস জ্বালিয়ে বহ্ন্যুৎসব করেছে।'

সংবাদটা আমার পড়া ছিল। সুজাতা যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লো, বললো, 'হ্যাঁ, পড়েছি।'

অ্যাণ্টনি বললো, 'তার সঙ্গে নিশ্চয় এ কথাও পড়েছেন, সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, দিল্লীর একজন ভারতীয় যুবতী মহিলাও সেই বহ্ন্যুৎসবে অংশ নিয়েছিল। বোধ হয়, সংবাদদাতাদের লজ্জা করেছে, তাই নাম দেয়নি। সেই যুবতী মহিলাটি আমাদের রঞ্জিতা রিজ্‌ভি।'

সুজাতা অবাক হয়ে বললো, 'তাই নাকি ? পড়েছি তো। কিন্তু—।'

সুজাতা থেমে গেল। অ্যান্টনি একটু শব্দ করে হেসে বললো, 'রঞ্জিতা অবিশ্যি অনেক দিনই ওসব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ও যে কনট প্লেসে হিপিদের সঙ্গে ছুটে গিয়ে যোগ দেবে, ভাবতে পারিনি। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই বহ্ন্যুৎসব দেখছিলাম। ভেবেছিলাম, ও বুঝি একজন কৌতূহলী দর্শক মাত্র। কিন্তু হঠাৎ দেখি, একটি হিপি মেয়ের হাত থেকে জ্বলন্ত অন্তর্বাসের টুকরো নিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "বার্ন ইট টু অ্যাসেস, অল দিজ ব্যাগস্ অ্যাণ্ড ব্যাগেজস্।" ওর কথা শুনে হিপি মেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠলো।'

সুজাতা বলে উঠলো, 'ভাবা যায় না। সময়টা কখন ?'

অ্যান্টনি বললো, 'একেবারে ভর দুপুরে, লাঞ্চ আওয়ারে, যখন অফিসের লোকেরা চারদিকে ভিড় করে ছিল।'

অগ্নিশ্বরী রঞ্জিতার কনট প্লেসে হাতে করে অন্তর্বাস জ্বালানোর সেই ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। অ্যান্টনি নিজেই সেই বর্ণনা দিল, 'রঞ্জিতার মুখে হাসি ছিল, কিন্তু একটা রাগে আর ঘৃণায় যেন ওর চোখ মুখ জ্বলছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, হিপি মেয়েদের তুলনায় ও-ই বেশি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। আশেপাশের লোকেরা ওর সম্পর্কে যে সব কথা বলছিল, সেগুলো আমি আর কানে শুনতে পারছিলাম না, তাড়াতাড়ি সরে পড়েছিলাম।'

অন্তর্বাস পোড়ানো নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ভারতীয় মেয়েদের অন্তর্বাসের ইতিহাসও আমার সঠিক জানা নেই। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস পড়ে নারীর বসন ব্যসনের যে ছবি পেয়েছি, তার সঙ্গে আজকের কোনো মিল নেই। তাছাড়া, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অজন্তা গুহাগাত্রের ছবি, বিভিন্ন প্রাচীন পট, যা প্রায় হাজার বছরের অ-ভারতীয় বিদেশী প্রভাবিত নয়, তার নিজস্বতায় ভিন্ন। তবু মেয়েদের অন্তর্বাসের কথা উঠলেই, কোথায় যেন একটা নৈতিকতার প্রশ্ন জেগে ওঠে। বিশেষ করে আজকের এই জগতে। পোড়ানোটা হয়তো নিতান্তই একটা সাময়িক জোয়ার। আসে এবং চলে যায়। কিন্তু রঞ্জিতা রিজ্‌ভির এত বিরাগ রাগ ঘৃণা কেন ?

রমণীটিকে কোথাও মেপে ওঠা যাচ্ছে না। সাহিত্যিক, নাট্যকার, সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক বিষয় নিয়ে রিসার্চ করে, অধ্যাপকের পত্নী, রূপসী নাগরিকা, নাগরী বলবো না, কিন্তু স্পষ্টতরই সুরাসক্ত আবার রবীন্দ্র সংগীত গায়, অথচ রাজপথে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাস পোড়ায়, চিৎকার করে, 'এই সব থলি-

গুলো পুড়িয়ে দাও'—একজনের মধ্যে এতগুলো সমাবেশ, রীতিমতো মন ধাঁধিয়ে দেবার মতো। সুজাতা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আমেরিকা থেকে ফিরে, রিজ্‌ভি নিশ্চয় এ সব শুনবে। তখন কী হবে?'

অ্যান্টনি গেলাসে চুমুক দিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। বললো, 'কী আবার হবে। আপনি ভালোই জানেন মিসেস চ্যাটার্জি, ওরা কেউ কারোর জন্য পরোয়া করে না।'

সুজাতা বললো, 'তা জানি। সত্যি, আমি কিছু বুঝে উঠতে পারি না।'

বোধ হয়, বোঝবার মতো নয় বলেই। কেবল ঘর করতে স্বামী-স্ত্রী কেন, গৃহভৃত্য থেকে শুরু করে, সংসারে সর্বত্র মানুষকে একটা বোঝাপড়া মেনে নিতে হয়। সেটুকু পরোয়া না থাকলে কেমন করে চলে। এক ঘরে, এক জায়গায় থাকা যায় কেমন করে। জানি না, বুঝি না। কিন্তু জানবার বোঝবার দরকার আছে কী? শান্ত জলাশয়ের হঠাৎ চল্‌কানো জলের ঝাপটায়, একটা রুপোলী রেখার ঝিলিক থাক না। তার বেশি দরকার নেই।

অ্যান্টনি বললো, 'জীবনটা ওর ছেলেবেলা থেকেই গোলমেলে। নাইনটিন ফরটিএইটে, করাচি থেকে তিন বছর বয়সে, রিফ্যুজি হয়ে এসেছিল। ও বোধ হয় সব দিক থেকেই এখনো রিফ্যুজি হয়ে আছে।'

বলে, একটু হাসলো এবং আমার দিকে তাকালো। এই তাকানোটা একটু ভিন্ন রকম। যেন তার লোমশ ভুরুর নিচে, রক্তিম বড় বড় চোখ দুটো আমাকে কিছু বলছে। মোটা ঠোঁটের হাসিটাও সেই রকম। আমি কিছুই জানি না, অ্যান্টনির সঙ্গে রঞ্জিতার সম্পর্ক কেমন। কথা শুনে মনে হচ্ছিল, বোধহয় বন্ধুর পর্যায়ের। তবু কোথায় যেন আরো একটু রয়েছে, যেটা অ্যান্টনির চোখ মুখের অভিব্যক্তি, কথাবার্তায়, একটু ধন্ধ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু অ্যান্টনি আমার দিকে এ রকম করে তাকিয়ে রয়েছে কেন। আমি মুখ ফিরিয়ে নেবার আগেই, অ্যান্টনি বলে উঠলো, 'আজ বোধ হয় আপনাকে দেখেই রঞ্জিতার কিছু গোলমাল হয়ে থাকবে।'

আমি অবাক চোখে একবার সুজাতাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে দেখে? কেন বলুন তো?'

অ্যান্টনি তার মোটা ঠোঁট উল্টে ঘাড়ে দোলা দিয়ে হাত মেলে বললো, 'দেবা নঃ জানন্তি।'

কথাটা শুনে খুশি হতে পারছি না। কোথায় যেন জটিল অস্বস্তির ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া, অ্যান্টনি কী ভেবে বলছে, তাও বুঝতে পারছি না।

সে কি আমার ওপরে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছে। আমি সুজাতার দিকে তাকালাম, 'মহিলাকে আমি আজই প্রথম দেখলাম, এবং উনিও—।'

সুজাতা বললো, 'কিন্তু মনে হলো, আপনার বিষয়ে রঞ্জিতা কখনো কিছু ভেবেছে। কথাবার্তা তো সেই রকমই বলছিল।'

এ সময়ে সুবন্ধু এলো। কিন্তু একলা। আমার দিকে চকিতে একবার দেখলো। বললো, 'সুজাতা, তাহলে খাবার টেবিলে যাওয়া যাক। রাত্রি তো হলো।'

সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, 'রঞ্জিতা কোথায়?'

সুবন্ধু বললো, 'ও আমার কাছে, তোমার অনুমতি চেয়ে, একটু বিছানায় শুয়ে পড়েছে। বললো, পাঁচ মিনিটের জন্য।'

অ্যান্টনির মোটা স্বরে উদ্বেগ ধ্বনিত হলো, 'শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

সুবন্ধু হেসে বললো, 'না, বহাল তবিয়তে আছে।'

সুজাতা উঠলো। আমি আর অ্যান্টনি উঠলাম। সুবন্ধুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। ওর চোখে ঠোঁটে প্রায় সেই হাসিটাই লেগে আছে। আমার কাছে এসে বললো, 'আপনি একটু দাঁড়িয়ে যান, কথা আছে।'

সুজাতা একবার আমাদের দিকে দেখে চলে গেল। অ্যান্টনি তাকে অনুসরণ করলো। আমি এখন সুবন্ধুর দিকে চেয়ে প্রায় উৎকণ্ঠা বোধ করছি। ও ওর রেখে যাওয়া অবশিষ্ট পানীয়ের গেলাস তুলে, হেসে বললো, 'কী যে করেন মশাই আপনারা।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করেছি বলুন তো। আমার দিক থেকে কোনো রকম অশিষ্ট—।'

সুবন্ধু বাধা দিয়ে বললো, 'তাহলে তো চুকেই যেতো। একটা বোতল গেলাস ভাঙাভাঙির নাটক দেখা যেতো। এ ব্যাপার অন্য রকম। এ সব আবার আমি বুঝি না। আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বললো, সুবন্ধু, তোমার অতিথি আমার সব ওলটপালট করে দিল!'

অসহায় বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা আবার কী?'

সুবন্ধু হাত ঘুরিয়ে বললো, 'সে সব আপনারা বোঝেন মশাই। আমি তো আর শিল্পী-মানুষ নই, এবং মেয়ে তো নই-ই। আমাকে বললো, তোমার এই লেখক বন্ধুকে দেখে তোমার কখনো কিছু মনে হয়নি? বললাম, কী আবার হবে। ভদ্র, অমায়িক, হাসি খুশি। আমাকে বাধা দিয়ে বললো, ওসব তো অনেক বাজে লোকের ছদ্মবেশও হয়। আমি ও সব বলতে চাই না। তোমার

কি এ কথা কখনো মনে হয়নি, ওকে দেখলে, সমস্ত পাপবোধ যেন কোথায় ভেসে যায় ?'

কথার স্রোত কোন্ দিকে বয়ে চলেছে, বুঝতে পারি না। রঞ্জিতার এ কথার মানে কী। পাপবোধ ভেসে যাওয়ার মধ্যে, আলো জাগে না অন্ধকার জাগে ? বললাম, 'বুঝতে পারলাম না।'

সুবন্ধু বললো, 'আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে কী, ওকে দেখলে তুমি যে কোনো পাপই করতে পারো ? আমার গায়ে খোঁচা মেরে বললো, তুমি একটা বুদ্ধু, আমার কথা বুঝতে পারছো না। আমি বলছি, তোমার কি এ কথা মনে হয় না, ওঁর চোখের দিকে চেয়ে মনে হয়, আমাকে কোনো পাপই স্পর্শ করছে না। আম যেমন খুশি ভেসে যেতে পারি। বললাম, রঞ্জিতা, আমার এ সব কখনো মনে হয়নি, বোধ হয় আমি মেয়ে নই বলে, এবং শিল্পী নই বলে। তার মানে কি তুমি বলতে চাও, উনি তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বললো, এতক্ষণে কিছুটা বুঝতে পেরেছ দেখছি। ওঁকে প্রথম দেখেই, কেমন যেন চমকে উঠেছিলাম। সেই জন্যই বিশদ পরিচয়ের জন্য তোমাকে এতো করে ধরেছিলাম। ব্যাপারটা ভালো হলো কি মন্দ হলো জানি না। কিন্তু সুবন্ধু, এই মুহূর্তে তোমাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। আজ লাইব্রেরিতে পড়তে পড়তে হঠাৎ কেন তোমার বাড়িতে আসার কথা মনে হলো ? সেই মনে হওয়ার মধ্যে কোনো অলৌকিক ব্যাপার ছিল নাকি। এখন যেন আমার তা-ই মনে হচ্ছে।'

সুবন্ধু চুপ করলো, একটু হাসলো, গেলাসে চুমুক দিল। ভাবা ছাড়া, কথা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। আমি জানি না, রঞ্জিতা রিজ্ ভি সুস্থ মস্তিষ্কে আছে কী না। সুবন্ধু মিথ্যা বলছে না, সেটা বুঝতে পারি। এ মুহূর্তে, নিজেকে বিড়ম্বিত ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। সুবন্ধু বললো, 'কী ব্যাপার বলুন তো ? রঞ্জিতার এ সব কথার অর্থ কী ?'

বললাম, 'বুঝতে পারি না।'

'হয়তো পারেন, বলতে চান না।'

হেসে বললাম, 'সুবন্ধু, নিজের সম্পর্কে আমি এ ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই। আমি নিজেকে খুব সাধারণ বলে ভাবি।'

সুবন্ধুর চোখে হাসির ঝিলিক। কপাল থেকে চুল সরিয়ে বললো, 'আমরা আবার ঠিক তা ভাবি না। একটু-আধটু বুঝি তো।'

'কী বোঝেন ?'

সুবন্ধু হেসে বললো, 'সে কথা যাক। রঞ্জিতা আরো বললো, এ কথা নাকি ঠিক, মেয়ে বলেই ওর আরো এ রকম মনে হয়েছে, তবে আমি যেন সব মেয়ের সঙ্গে ওকে ঘুলিয়ে না ফেলি। আরো বললো, এই মুহূর্তে ওঁর কিছু লেখার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তাতে আমার কী মনে হচ্ছে জানো। লেখাগুলো যেন অনেকটা অ্যাকোরিয়ামের জলের বর্ণহীন মাছের মতো, আমাদের সামনে খেলা করেছে, আর সেই অ্যাকোরিয়ামের আড়াল দিয়ে, মিটিমিটি হেসে লেখক পালিয়ে যাচ্ছে। উনি মনে করেছেন, ওঁকে ধরা যাবে না। ওঁকে ধরতে হবে, ওকে আমি দেখে ফেলেছি।'

ভীরু বিপন্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ধবতে হবে মানে কী?'

সুবন্ধু খোলা ছাদের ওপর হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'তা আমি কী জানি বলুন। আমি তো আপনার সামনে রঞ্জিতাকে এই প্রথম দেখলাম।'

সুবন্ধু যেন বেশ উল্লাস বোধ করছে। আমি সুবন্ধুব দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সুবন্ধু, একটা কথা বলুন, রঞ্জিতা রিজ্‌ভিকে আপনাব কেমন মেয়ে মনে হয়?'

সুবন্ধু গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল। ভুরু কুঁচকে উঠলো, গম্ভীর মুখ অন্যমনস্ক, চোখের দৃষ্টি নিচে নিবদ্ধ। প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে রইলো। দেখা হবার পরে, সুবন্ধুকে এ রকম চিন্তিত এই প্রথম দেখলাম। বললো, 'এক কথায় কী বলা যায়, বুঝতে পারছি না। যদি ওকে ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে এক কথায় দুঃখী। একটি দুঃখী মেয়ে।'

আমি সুবন্ধুর দিকে তাকালাম। সুবন্ধুও তাকালো। কেউ কোনো কথা বললাম না। একটু পরে, সুবন্ধু বললো, 'তাছাড়া, রঞ্জিতা মিথ্যা কথা বলে না।'

সেটা আরো ভয়ের। আমাকে নিজের ভাবনাটাই ভাবতে হচ্ছে। ভাববার কী-ই বা আছে। এই রাত্রির পরে, আবার হারিয়ে যেতে কতক্ষণ। সংসারের কাছে আমি মাত্র একটি স্বাধীনতা চেয়েছি। সে কথাটা সংসারের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো দিন বলতে হয়নি। নিজেকে নিজে বলেছি, যেন আপনাতে আপনি হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু এ কথাও জানি, আমার জগৎ সংসারের চারপাশে, আমি কোনো উদ্ভট খেলার স্বাধীনতা নিয়ে চলতে পারি না। সেখানে আমি দেশের মধ্যে এক।

কিন্তু রঞ্জিতা রিজ্‌ভি—আমি হয়তো ওর কথা একটু বুঝতে পারছি।

সুবন্ধু এখনো গম্ভীর থমথমে মুখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অস্বীকার করতে পারছি না, কিছুক্ষণ আগে দেখা, একটি অগ্নিশ্বরী মেয়ে, সহসা যেন আমার কোথায় একটা কী বিঁধিয়ে দিয়েছে। আমরা লোক বলতে যাদের বুঝি তাদের কাছে সেই বিঁধিয়ে দেওয়াটা কী। প্রেম? তর্কে যাবো না। কেবল বলতে ইচ্ছা করে পথ দেখাও, পথ দেখাও। আমার অনুভূতির এই একমাত্র কথা। শান্তি দাও আমাদের সবাইকে।

সুবন্ধু জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো, এত কী ভাবছেন?'

হেসে বললাম, 'ভাবছি, সেটা কোন্ দুষ্ট লগ্ন, যখন আপনি আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন।'

সুবন্ধু হাত জোড় করে বললো, 'আমাকে কেন স্যার দোষী করছেন। এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না। এখন বলুন তো, আপনার সম্পর্কে ওর কথাগুলো শুনে কী মনে হলো?'

বললাম, 'সে বিচার আমার নয়।'

সিঁড়ির কাছ থেকে দলীপের ডাক শোনা গেল, 'সাব খানা লগায়া।'

সুবন্ধু সেদিকে ফিরে, ঘাড় নেড়ে, আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।'

আমি সুবন্ধুর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভরসা দিচ্ছেন তো?'

'দিচ্ছি। চলুন খেতে যাই।'

সুবন্ধুর সঙ্গে নিচে নেমে গেলাম।

খাবার টেবিলের একদিকে অ্যান্টনি, আর একদিকে রঞ্জিতা বসে গিয়েছে। ঘরে ঢোকা মাত্র, রঞ্জিতার সঙ্গে আমার একবার চোখাচোখি হলো। দৃষ্টিতে যেন লজ্জা, ব্রীড়াময়ী মনে হচ্ছে ওকে। হাসিতেও লজ্জা, চোখ নামিয়ে নিল। কোথায় যেন একটু পরিবর্তন ঘটেছে। কপাল আর গালের এক পাশ ঢেকে, চুল গড়িয়ে পড়েছে কাঁধের কাছে। হঠাৎ আমার সেই অন্তর্বাস পোড়াবার ঘটনা মনে পড়ে গেল, আর বিপন্ন অসহায় পুরুষ দৃষ্টি অগ্নিশ্বরীর বুকে বিঁধে ছাই হয়ে গেল। কেন এই দৃষ্টি গেল। কেন ফেরানো গেল না। আমি সাধু নই, তা জানি। চোর তো নই। মানুষ বড় অসহায়, এই কথাটাই, মনে করা যাক। দোষ দেওয়া যাক প্রকৃতিকে। কিন্তু রঞ্জিতা রিজ্ভি মিথ্যা কথা বলে না, সেই প্রমাণটা জেগে আছে যেন একটা সর্বনাশের মতো ওর শরীরে।

সুজাতা আমাকে ডেকে রঞ্জিতার পাশের আসনে বসতে বললো। আমি সুজাতাকে একবার দেখলাম। সহজ হাসিটাই তার মুখে আছে। অ্যান্টনির পাশের আসন দেখিয়ে বললাম, 'এখানে বসলে অসুবিধা আছে কিছু?'

সুবন্ধু বললো, 'তবু গৃহকর্ত্রীর অনুরোধ।'

আমি অতএব, ঘুরে গিয়ে রঞ্জিতার পাশের আসনে বসলাম। রঞ্জিতা পাশ ফিরে, নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'অসুবিধা হলো?'

হেসে বললাম, 'কিছু মাত্র না।'

সুবন্ধু বসলো অ্যান্টনির পাশে। খাবার আয়োজনটা বেশ ছিমছাম, কিন্তু সুগন্ধে ভরা। বড় কাবাব, ভেড়ার মাংসের চাঁপ, স্যালাড, ডাল আর নিরিমিষ তরকারি। মিষ্টির আয়োজন আছে। ফলের মধ্যে আম। ভাত রুটি দুই-ই রয়েছে। সুজাতা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাত না রুটি?'

'রুটি।'

সে রুটি এবং অন্যান্য খাবার তুলে দিল আমার পাত্রে। অ্যান্টনি ভাত নিল। সুবন্ধুও। সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, 'রঞ্জিতা?'

রঞ্জিতা বললো, 'আমি নিজের হাতে নিচ্ছি, তুমি বসো।'

সুজাতা কোনো আপত্তি না করে টেবিলের এক মাথায় বসে পড়লো। খাবার নিল। কিন্তু রঞ্জিতা তখনো কোনো খাবার নিচ্ছে না দেখে সুবন্ধু

জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার? তোমায় এ রকম তো কোনো দিন দেখিনি, পুরুষদের সামনে খেতে লজ্জা পাও?'

রঞ্জিতা লজ্জিত অথচ রুষ্ট ধমকের সুরে ভুরু বাঁকিয়ে বললো, 'তা আবার-তুমি কখনু দেখলে। বাজে বকো না, খাচ্ছ খাও।'

বলে, একবার চোখের কোণে আমার দিকে দেখলো, আবার সুবন্ধুকে। তারপর হাত বাড়িয়ে রুটি নিল, চামচে করে কাবাব আর চাঁপ। এখন ওকে রীতিমতো লাল দেখাচ্ছে। ঠোঁটের এত অস্বাভাবিক রক্তাভা বড় দেখা যায় না। সোজা, নিচের দিকে ঈষৎ বক্র নাক, সিন্ধু দেশের মানুষের চেহারা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের এহেন্‌রূপ লজ্জা আর ব্রীড়া কেমন ভাবে ফুটে ওঠে, আমি আগে তা দেখিনি। স্বাভাবিক ভাবে, ঝলকানো রূপটাই চেনা। বুঝতে পারছি না, তার আগের রূপটা ভালো ছিল, না এখনকার। কোন্‌টা ওর সহজ ভাব, সেই না এই। অথবা ব্রীড়াময়ী লজ্জা পাওয়া মেয়েকে বোধ হয় পৃথিবীর সবখানে সব দেশে, এক রকমই লাগে। এখন যেন ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, এই মেয়ে একটু আগে, পাত্রের পর পাত্র সুরা গলাধঃকরণ করছিল।

অ্যান্টনি চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে, সকলেই তাই, কেবল রঞ্জিতা আর সুবন্ধুর মধ্যেই চোখে চোখে চাওয়া, একটু হাসি টেপাটিপি চলছে। মাঝে মাঝে সুবন্ধুর দৃষ্টি-ঝিলিক বিচ্ছুরিত আমার দিকেও। দেখে, কেঁদুলির মেলায় দেখা বাউল নবনী দাসের চোখ দুটি আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। গাইতে গাইতে, এমন ভাবে দৃষ্টি হানা, সেই বৃদ্ধকেই দেখেছিলাম।

সুবন্ধু হঠাৎ বললো, 'মাঝে মাঝে মানুষ দেখে আমার আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।'

রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করলো, 'হঠাৎ কথাটা মনে এলো কেন? দিল্লীতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন হয়েছে নাকি, রিপোর্ট কভার করতে হবে?'

সুবন্ধু হেসে উঠে বললো, 'না, সে রকম লোক তো রাজধানীতে রোজই আসছে। কথাটা হঠাৎ এলো কেন জানি না।'

রঞ্জিতা কথাগুলো শুনছিল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। আমি চোখ তুলতেই, ও দৃষ্টি নামিয়ে নিল। অ্যান্টনি বললো, 'মানুষ চিরদিনই বিস্ময়কর, বিশেষ করে সে যদি স্ত্রীলোক হয়।

রঞ্জিতা রক্ত বিম্বোষ্ঠ বাঁকিয়ে বললো, 'মার্কসিস্ট, তোমার মুখে কথাটা মানায় না। এ সব প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা বলো না, ত্রিবান্দ্রমে খবর চলে যাবে।'

জবাবে অ্যান্টনি বললো, 'তুমি মোটেই খাচ্ছো না।

রঞ্জিতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। অ্যান্টনি একটু হেসে, সকলের মুখের দিকে দেখলো। সুবন্ধু সুজাতা রঞ্জিতাকেই দেখছিল। রঞ্জিতার হাসিটা হঠাৎ থামলো না, কিন্তু আবার হঠাৎ-ই থামিয়ে বলে উঠলো, 'এক্সকিউজ মী। সুজাতা, তোমার অতিথিকে দেখছো না ?'

সুজাতা প্রায় চমকে উঠে আমার পাত্রের দিকে এবং আমার দিকে তাকালো। আমি হেসে বললাম, 'আমার জন্য ভাববেন না। যা তুলে দিয়েছেন, সেগুলো শেষ করতে দিন।'

রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে বললো, 'আপনি খুব কম খান দেখছি।'

হেসে জবাব দিলাম, 'নিজের মতো খাই।'

রঞ্জিতার ভুরু একটু বাঁক খেল, 'সবই নিজের মতো ?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ বিষয়ে বলুন ?'

রঞ্জিতা আমার চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করে বললো, 'জীবনের সব বিষয়েই ?'

বললাম, 'না, সে রকম কোনো স্বাধীনতা আমার নেই।'

'কোনো বিষয়ে কি আপনার স্বাধীনতা আছে ?'

'কোনো মানুষেরই আছে বলে জানি না।'

'কেন ?'

'তা জানি না।'

রঞ্জিতা হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলো। পাত্রের বুকে চাঁপের রসের গায়ে আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগলো। ওকে একটু গম্ভীর আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সুবন্ধু জিজ্ঞেস করলো, 'কী, খুব পরাধীন বোধ করছ নাকি ?'

রঞ্জিতা মুখ না তুলেই একটু হাসলো, বললো, মিনিংলেস্' বলেই, মুখে একটু খাবার পুরে দিল।

কোন্ কথাটা অর্থহীন, বুঝতে পারলাম না। আমার কথা ? ক্ষতি নেই, প্রতিবাদ নেই। আমি আমার বিশ্বাস মতোই কথাটা বলেছি। রঞ্জিতা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে, হেসে বললো, 'আপনাকে বলিনি।'

সুবন্ধু জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে ?'

রঞ্জিতা ঘাড় নেড়ে, বাঁ হাতের রক্তিম তর্জনী দিয়ে, বুকের কাছে দেখিয়ে বললো, 'আমাকে। মিনিংলেস, মিনিংলেস্, এভরিথিং ইজ মিনিংলেস্।'

বলেই আবার আমার দিকে তাকালো। আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে

নিলাম। আমার প্রতি যেন এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না আসে। কেন না, রঞ্জিতার এই কথাটির প্রতি আমার কোনো বিশ্বাস নেই। আমি জবাব দিতে বা তর্ক করতে ইচ্ছুক নই। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, খাওয়া শেষ করার দিকে মনোযোগ দিলাম।

অ্যান্টনি মোটা স্বরে বলে উঠলো, 'সত্যি মিনিংলেস্।'

অ্যান্টনিও তাই মনে করে নাকি। তার দিকে একবার দেখলাম। কিন্তু আমার দৃষ্টি টেনে নিল রঞ্জিতা। দেখলাম ও এক ভাবেই, ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! ওর রক্তিম হাসিটা তীব্র, যেন একটু বেঁকে উঠতে চাইছে। চোখের কটাক্ষের ঝিলিকেও যেন তীব্রতা। বললো 'কিছু বলবেন?'

'কোন্ বিষয়ে?'

'সব কিছু অর্থহীন।'

'সব কিছু বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?'

রঞ্জিতা হঠাৎ যেন আমার দিকে একটু ঝুঁকে এলো। আগুনের শিখা দুলে উঠলো। একটা হাল্‌কা সুগন্ধ নাকে এলো। যেন অনেকটা চুপি চুপি বলার মতো করে বললো, 'সব সব সবই, সমস্ত জীবনটাই।'

না হেসে পারলাম না। আমার কোনো উত্তেজনা নেই। কথা বলতে চাইনি, কিন্তু রঞ্জিতা বলাবার জন্যই কথাটা বলেছে। বললাম, 'আমি তা মনে করি না।'

রঞ্জিতা ওর মুখটা আরো এগিয়ে নিয়ে এলো। বললো, 'আপনার সৃষ্ট সেই অ্যাকোরিয়ামের রঙীন মাছগুলোর মতো?'

রঞ্জিতার কাজল লাগানো, ঈষৎ পিঙ্গল চোখের তারার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'রঙীন মাছ?'

সুবন্ধুর কাছে বলা ওর কথাটা আমার মনে আছে। রঞ্জিতা বললো, 'খারাপ অর্থে নয়, বহু আর বিচিত্রের অর্থে রঙীন মাছ বলেছি। আপনার সেই রঙীন মাছেরা যেমন করে জীবন অর্থময়, আপনি কি সেই রকম বলছেন?'

রঞ্জিতার গা এবং পোশাক থেকে হাল্‌কা একটা গন্ধ এবার আরো স্পষ্ট। ওর যেন নাসারন্ধ্র কাঁপছে। অগ্নিশ্বরীর গায়ে শিখা কাঁপছে। আমি শান্ত ভাবে হেসে বললাম, 'চরিত্রগুলো সমাজের, আমার সাহিত্যে তারা ভিড় করে। তাদের সঙ্গে আমার বিশ্বাসের মিল আছে।'

রঞ্জিতার শরীরটা যেন হঠাৎ একটা মোচড় খেয়ে দুলে উঠলো। ও পুরো-পুরি আমার দিকে ফিরে বসলো। ঘাড় বাঁকিয়ে, চুল সরালো গাল থেকে।

জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন, কেমন করে তারা বা আপনি তা বিশ্বাস করেন, জীবন অর্থময়। জীবন অর্থবহ ?'

আমি রঞ্জিতার চোখের দিকে দেখে, বাকীদের দিকে একবার দেখলাম। সকলেই এদিকে তাকিয়ে আছে। সুবন্ধুর ঠোঁটে হাসিটা বজায় আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বোঝেন না ?'

রঞ্জিতা একভাবেই চেয়ে থেকে বললো, 'না।'

আমি বললাম, 'এটা বোধ হয় বোঝানো যায় না। জীবনের অর্থ নিজেকে বুঝে নিতে হয়।'

'কেন ?'

'সকলের জীবনের অর্থ এক রকম হয় না।'

'এক এক জনের জীবনের অর্থ কি ভিন্ন ?'

'আমরা বিভিন্ন মন নিয়ে বাঁচি।'

'আমি বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না।'

রঞ্জিতার মুখের দিকে চেয়ে আমি হেসে উঠলাম। রঞ্জিতা চোখের তারা ঘুরিয়ে, বলে উঠলো, 'হুঁ হুঁ ? বলুন।'

বললাম, 'আপনার এ কথার জবাব আমি জানি না'।

রঞ্জিতা হঠাৎ কোনো কথা বললো না। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে এক ভাবেই তাকিয়ে রইলো। তারপরে বললো, 'জানি না বললে তো হবে না। আমি জবাব চেয়ে রাখলাম—বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে আমার মুখের দিকে দেখিয়ে, 'আপনার কাছে—আপনারই কাছে।' বলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো।

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'মিসেস রিজ্‌ভি আমাদের হাত শুকিয়ে গেল।'

রঞ্জিতা ফিরে বললো, 'ইয়েস মিস্টার চ্যাটার্জি, দয়া করে আপনারা হাত ধুয়ে নিন।'

সুজাতা বললো, 'কিন্তু রঞ্জিতা, তোমার খাবারটুকু শেষ করো।'

রঞ্জিতা বললো, 'করছি।'

সুবন্ধু আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো, 'ও খাবারে আজ কোন স্বাদ নেই।'

রঞ্জিতা চোখের কোণে একবার আমার দিকে দেখলো। আমার খাওয়া শেষ হয়েছিল। বললাম, 'উঠছি।'

'নিশ্চয়ই।'

অ্যান্টনি উঠে বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে নিল। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে রঞ্জিতার দিকে চেয়ে বললো, 'আমি ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডে টেলিফোন করছি।'

রঞ্জিতা ভুরু কুঁচকে বললো, 'আমি কি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি নাকি ?'

অ্যান্টনি আমাকে দেখিয়ে বললো, 'ওঁকে আর তোমাকে নামিয়ে দিয়ে, আমি চলে যাবো।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার জন্য আপনারা ভাববেন না। আমি আর একটা ট্যাকসি ডেকে নিয়ে চলে যাবো।'

সুবন্ধু আমার দিকে ফিরে বললো, 'রাত্রিবেলা তার কী দরকার। এক ট্যাকসিতেই যান।'

সুবন্ধু কি রাত্রের জন্য একসঙ্গে যেতে বলছে। কিন্তু আমার মনে অন্য কথা। আমি কিছু বলবার আগেই রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'অ্যান্টনি, আমি তোমার সঙ্গে আসিনি, তুমি আমার সঙ্গে এসেছ। কিন্তু আমি লাস্ট পারসন্, তোমার সঙ্গে এখন ট্যাকসিতে একলা যাবো না।'

আমি এবং আর সকলেই অ্যান্টনিকে একবার দেখে, রঞ্জিতার দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। অ্যান্টনি রঞ্জিতার দিকে তাকিয়ে আছে। রঞ্জিতা বললো, 'অন্য কোনো কারণে না। যেতে যেতে সারাটা পথ তুমি আমাকে জীবন সম্পর্কে উপদেশ দিতে দিতে যাবে, আমার ভালো মন্দ বোঝাতে থাকবে, অসহ্য, একদম অসহ্য।'

অ্যান্টনি নিঃশব্দে হাসলো। টেলিফোন রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বললো, 'আমি তোমাকে কিছুই বলবো না।'

রঞ্জিতা বললো, 'ওটা তোমার সদিচ্ছা বটে, কার্যকরী করতে পারবে না। আমি তোমাকে চিনি। মোটের ওপর তোমার সঙ্গে আমি একটা ট্যাকসিতে থাকবো না।'

অ্যান্টনি তখন স্ট্যাণ্ডকে সুবন্ধুর ঠিকানা বলছে। আমার সঙ্গে সুবন্ধুর একবার চোখাচোখি হলো। ও বাঙলায় বললো, 'অনেক সময় দেখছি নিয়তিকে মেনে নিতে হয়।'

আমি হাত ধুয়ে বললাম, 'আর যার নিয়তি যাকে যেখানে টেনে নিয়ে যায়, সেটা তারই দায়।'

কথা বলতে গিয়ে, চোখ পড়ে গেল রঞ্জিতার ওপরে। ও ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, আমার কথাই শুনছে। জিজ্ঞেস করে উঠলো, 'কেন, কোনো ভয় লাগে ?'

কতোখানি বাঙলা বুঝে, এইরকম বাঙলা বললো, বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম 'কিসের ভয়?'

রঞ্জিতা ঘাড় নাড়িয়ে নিজেকে দেখিয়ে বললো, 'আমাকে?'

বললাম, 'আপনাকে ভয় পাবো কেন।'

রঞ্জিতা হেসে, শেষ খাবারের টুকরো মুখে পুরে দিল। অ্যান্টনি রিসিভার নামিয়ে রাখলো। সুবন্ধু আমাকে সিগারেট দিয়ে নিজে ধরালো, আমাকে ধরিয়ে দিল। বললো, 'ভয় নেই, কোনো দায় আসবে না, আমি আছি।'

রঞ্জিতা শুনতে পাবে, সেই জন্য কিছু বললাম না। সুজাতা টেবিল ছেড়ে উঠতেই, দলীপ এলো টেবিল খালাস করতে। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ট্যাকসির হর্ন শোনা গেল। সুবন্ধু খোলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, 'এক মিনিট।'

কলকাতায় যেটা চিন্তাই করা যায় না। এই রাত্রি প্রায় পৌনে এগারোটায় ঘরে বসে টেলিফোন করলে, দরজার গোড়ায় ট্যাকসি চলে আসে। বিদায় নিলাম সুজাতার কাছে। সুবন্ধু নিচে নেমে এলো আমাদের সঙ্গে। রঞ্জিতা তখনো, সুজাতার হাত ধরে কিছু বলছিল। সুজাতা ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসছিল। সুবন্ধু নিচে নেমে এসে জানালো, আগামীকালও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে বিরক্ত কিছু করবে না। রঞ্জিতা নেমে এসে আগে গাড়িতে উঠলো, আমার নাম ধরে ডেকে বললো, 'আসুন।'

আমি অ্যান্টনিকে বললাম, 'চলুন।'

অ্যান্টনি বললো, 'আমি সামনে বসছি।'

বলেই সে উঠলো। সুবন্ধু আমার পিঠে হাত রেখে বললো, 'উঠে পড়ুন।'

আজ রাত্রের মতো, সুবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষবার চোখাচোখি হলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। রঞ্জিতা একটা রাস্তার নাম করে, একটি হোস্টেলের কথা ড্রাইভারকে বললো। ড্রাইভার 'জী' বলে শব্দ করতেই, অ্যান্টনি পিছন ফিরে তাকালো। বললো, 'তার মানে, এই ভদ্রলোককে তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে?'

রঞ্জিতা বললো, 'আমিও ভদ্রলোককে পৌঁছে দিতে পারি। সেজন্য ভেবো না।'

আমি বললাম, 'তা কেন, আপনাকেই আমি পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবো।'

রঞ্জিতা বললো, 'আমি রাত্রে একলা চলতে পারি, ভয় পাই না।'

বললাম, 'ভয়টাই সব কথা না।'

গাড়ির ভিতরের ছায়া ছায়া অন্ধকারে, রঞ্জিতা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো।

ওর চোখের ঝিলিক দেখতে পেলাম। বললো, 'অনুচিত? ভদ্রতা? কর্তব্য? ও সব আমি মানি না, আপনাকেও ভাবতে হবে না।'

হাসলাম, কিন্তু জবাব দিলাম না। মনে অস্বস্তি নিয়ে, চুপ করে রইলাম। বাতাসে রঞ্জিতার চুল উড়ছে। চোখে মুখে এসে পড়ছে। সরিয়ে দিচ্ছে না। হাল্কা মিষ্টি গন্ধটা বোধ হয় ওর চুলেরই। গন্ধটা ছড়াচ্ছে গাড়ির মধ্যে। দিল্লীর নির্জন আলোকিত রাজপথের ওপর দিয়ে গাড়ি বেশ জোরেই চলেছে। শহর দিনের মতো আলো হয়ে আছে। তাপমাত্রা এখন অনেক কম। জলের ফোয়ারা গুলো এখনো জল সিঞ্চন করছে।

কনট সার্কাসের কাছাকাছি এসে, একটা রাস্তায় ঢুকে গাড়ি দাঁড়ালো। সামনে গেট, গাছপালা ঘেরা বড় বাড়ি। অ্যান্টনি নামলো। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হাত মেলালাম। বললো, 'আশা করি পরে আবার দেখা হবে। শুভরাত্রি।'

রঞ্জিতার দিকে চেয়ে বললো, 'তুমিই আগে নেমে যেও। শুভরাত্রি!'

রঞ্জিতা শুধু উচ্চারণ করলো, 'শুভরাত্রি।'

গাড়ি চলতে শুরু করলো। বললাম, 'আপনার ঠিকানাটা আমি জানি না।'

রঞ্জিতা পাশ ফিরে, হেলান দিয়ে বসে বললো, 'আপনার ঠিকানাও আমি জানি না।'

আর এই ভাবনাটাই তখন থেকে আমাকে ভাবাচ্ছিল। আমার ঠিকানায় আমি একলাই যেতে চেয়েছিলাম।

বললাম, 'আমার ঠিকানা একটা হোটেল। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই।'

রঞ্জিতা বললো, 'সেটা আমিও চাই—আপনাকে।'

দেখলাম, ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। বললাম, 'আপনাকে পৌঁছে দিতে না পারলে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করবো।'

রঞ্জিতা বললো, 'জানি। কিন্তু তার যা কারণ, সেগুলো আপনাকে আমি আগেই বলেছি। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন—যদিও রাত্রের দিল্লী খুব নিরাপদ নয়, কিন্তু আমি ভয় পাই না। আমার অভ্যাস আছে।'

শিখ ড্রাইভার এতক্ষণ গাড়ি আস্তে চালাচ্ছিল। এবার জিজ্ঞেস করলো, 'হাঁ জী, অব্ কহাঁ যানা।'

রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'চলতে ছুয়ে গাড়ি, চলনে দো না জী।'

শেষের দিকে একটু গলা কাঁপিয়ে সুর করলো। আমার দিকে তাকালো।

সর্দারজী শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হেসে উঠলো। আমার যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হলো। চল্‌তি গাড়ি চলুক! চালকটিও হেসে বাজছে। এদিকে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। আমার সঙ্গিনী একজন, রূপসী যুবতী বললে কম হয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। মুঘল গিয়েছে, ইংরেজ গিয়েছে, এই ভারতীয় যুগে, আরাবল্লীর এপারে, গর্দানটা কি ভাবে যাবে, তাই ভাবছি। এমন তো মনে হয় না, সিদ্ধি নন্দিনীর নেশা এখনো আছে। আমি রঞ্জিতার দিকে ফিরে তাকালাম। সেই চোখ, সেই দৃষ্টি, সেই হাসি। বাতাসে চুল উড়ছে। দেখলাম, গাড়ি ইণ্ডিয়া গেটের সীমায়। একটিও লোকজন চোখে পড়ে না। দু-একজন দিল্লীওয়ালা সেপাই শুধু।

রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আপত্তি আছে?'

'কিসের বলুন তো?'

'খানিকটা ঘুরে বেড়ালে?'

'কোথায়?'

'যেখানে খুশি। আপনার কোথাও বিশেষ যাবার জায়গা আছে?'

'কোথাও নেই।'

আমি রঞ্জিতার দিকে তাকালাম। ভয় পাচ্ছি নাকি? যদি তাই, তবে কাকে? ওকে না নিজেকে? ওর রেশমী বেগুনি জামায়, চুস্ত পাজামায়, আবছায়ায় যেন আগুন লকলক করছে বেশি। আমি খুব নরম করে বললাম, 'মিসেস রিজ্‌ভি, দয়া করে ফিরে চলুন।'

রঞ্জিতা বললো, 'আমাকে রঞ্জিতা নামে ডাকবেন। আপনার হোটেলের ঠিকানা বলে দিন।'

নিরুপায়। আমি রাস্তার নামটা বললাম। গাড়ি আবার ঘুরলো। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি। মাঝখানটা ফাঁকা, রঞ্জিতার বড় ব্যাগটা সেখানে রয়েছে। আমি অনুভব করছি, ও আমার দিকে একভাবেই তাকিয়ে আছে। হঠাৎ রঞ্জিতার গলা শোনা গেল, 'আপনাকে সুবন্ধু কিছু বলেছে?'

আমি মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলাম। 'কোন্ ব্যাপারে বলুন তো?'

'আমার কোনো কথা?'

একটু যেন ভেবে বললাম, 'না তো।'

আমি জানি, রঞ্জিতা কোথায় কথার জের টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। ও

সেই মুহূর্তেই কিছু বললো না। একটু সময় চুপ করে রইলো। তারপরে শুনতে পেলাম, 'লেখক, লেখাটা বড় না জীবনটা বড় ?'

বললাম, 'জীবনকেই তো মনে হয়।'

'মানেন তো ?'

'মানি।'

'তবে শুনুন, সুবন্ধুকে আমি মিথ্যা কথা বলিনি।'

আমি এবার রঞ্জিতার দিকে ফিরে তাকালাম। ও চেয়ে আছে, কিন্তু তেমন ঝিলিক হানছে না। বললো, 'সত্যি, আমার সমস্ত পাপবোধ যেন ভেসে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, গভীর ঠাণ্ডাজলে আমি ডুব দেব।'

আমি মুখ ফিরিয়ে রেখে চুপ করে রইলাম। ও আবার বললো, 'জানি না, কেন এ রকম হলো, কিন্তু আমি তা-ই দেখেছি, দেখতে পেয়েছি—চোখে, আমি ভেসে যাচ্ছি। আপনি আর কতোদিন এখানে আছেন ?'

মিথ্যা এখন শক্তি। বললাম, 'বলতে পারি না। হয়তো আগামী কালই চলে যেতে পারি। আবার দু-একদিন থেকেও যেতে পারি।'

'খুব জরুরি কাজে এসেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

জানি না, সুবন্ধু রঞ্জিতাকে ইতিমধ্যেই কিছু বলেছে কী না। রঞ্জিতা চুপ করে রইলো। গাছপালায় ঘেরা রাস্তায় ঢুকতেই, রাস্তাটা আমি চিনতে পারলাম। আর এক মিনিটের মধ্যেই আমার আবাস এসে পড়বে। কিন্তু এই প্রায় মধ্য রাত্রে রঞ্জিতাকে এ ভাবে একলা ছেড়ে দিতে, সত্যি অস্বস্তি বোধ করছি।

আমার মনটা নিতান্ত বাঙালী। কলকাতায় যা পারি না, তা এখানেও পারছি না। আমি ওর দিকে ফিরে বললাম, 'আমি এখনো চাইছি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রঞ্জিতা বললো, 'তা না হলে, আপনার খুব অস্বস্তি হবে ?'

'খুবই।'

রঞ্জিতা ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বললো। আর বললো শুধু একটি বিশিষ্ট 'হাউসের' নাম। গাড়ি ঘুরে, এক মুহূর্তেই এলো আবার কনট্‌ সার্কাসে। ছুটালো অন্য রাস্তার দিকে। রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করলো, 'জরুরি কাজ শেষ করে, কয়েকদিন থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় ?'

বললাম, 'এ যাত্রায় না।'

'গৃহের অতিথি হিসাবে ?'

'থাকতে পারলে, গৃহ পান্থশালায় তফাত ছিল না।'

গাড়ি ঢুকলো গেট দিয়ে. পার্ক করলো গাড়িবারান্দায়। রঞ্জিতা বললো 'এখানে না। এগিয়ে যাও সর্দারজী, বাঁদিকে ঘাসের ওপরে গিয়ে দাঁড়াও।'

দেখলাম গাড়িবারান্দার সামনের ঘরে আলো জ্বলছে। বেয়ারার মতো একজন এসে, কাঁচের দরজা খুলে দাঁড়ালো। সর্দারজী গাড়ি এগিয়ে নিয়ে, বাঁদিকের ছায়া অন্ধকারে ঘাসের ওপর দাঁড়ালো। ওপাশের দরজা খোলার শব্দ হলো। আমিও দরজা খুলতে গেলাম। রঞ্জিতা বললো, 'থাক, আপনাকে আর নামতে হবে না।'

ও ওর ব্যাগটা টেনে নিয়ে নেমে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘুরে এসে দাঁড়ালো আমার দরজার কাছে। এক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। বললো, 'আপনার সাহচর্য কি একটু পাওয়া যেতে পারে না ?'

হেসে বললাম, 'এমন কিছু মূল্যবান সাহচর্য তো নয়। কেন পাবেন না ?'

'কবে ?'

'আজ এখনই বলতে পারলাম না।'

রঞ্জিতার ঘড়ি পরা ডান হাতটা এগিয়ে এলো। গাড়ির জানালায় আমার হাত ছিল। হঠাৎ স্পর্শ করলো, আল্‌গোছে। বললো, 'জানাটাই দুঃখ। হঠাৎ কোনো অপরাধ করলে ক্ষমা করবেন। আর—আর আপনার একটা নাম ঠিক করে রেখেছি মনে মনে। সুযোগ পেলে পরে বলবো।'

রঞ্জিতা সরে দাঁড়ালো। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। আমি বললাম, 'আপনি ঘরে যান !'

'আপনি যান, তারপরে যাবো।'

এই মুহূর্তে রঞ্জিতাকে ঝলকানো ঝিলিক হানা মনে হলো না। আবছায়া মাঠের অন্ধকারে একলা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কেমন মনে হলো। সুবন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল, 'দুঃখী।' কথাটা যেন এই মুহূর্তে বড় বেশি করে বাজলো। ও শুভরাত্রি জানালো না। শুধু চুপ করে চেয়ে রইল। এ ভাবে চলে যেতে খারাপ লাগছে। হাত তুলে বললাম, 'শুভরাত্রি।'

রঞ্জিতা বাঁ হাতটা একটু তুললো। গাড়ি ঘুরে গিয়ে, অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনের একটা ব্যাপার আছে। চোখের সামনে একটি মূর্তিকেই দেখতে পাচ্ছি। রঞ্জিতা রিজ্‌ভ। কতগুলো অচেনা অবোধ চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে আসতে চাইছে। কিন্তু কোনো চিন্তাগুলোরই সঠিক কোনো চেহারা

নেই। কেন না, আমি কিছুই জানি না। মন—তা সে এ দেহের মধ্যে, যে রকম একটি বস্তু হোক, সে একটি অপ্রতিরোধ্য বস্তু। সে অবিরত। তাকে থামিয়ে রাখা যায় না। সমস্ত মনটা বিষণ্ণতায় ভরে গিয়েছে একটি চরিত্রের আবছায়াকে ঘিরে।

হোটেলে এসে গাড়ি দাঁড়ালো।

রিসেপশন লাউঞ্জ ফাঁকা। দু-একজন এদিকে ওদিকে রয়েছে। কিন্তু চড়া স্বর—শুধু চড়া না, রীতিমতো ক্রুদ্ধ স্বর শুনতে পাচ্ছি, 'কম্‌বখত্, মারেগা এক ঝাপড়। মুঝ্‌সে দিল্লাগি পায়া?' ভুল ঠিক জানি না, মনে হচ্ছে, কারোকে ধমকানো হচ্ছে, গালি দেওয়া হচ্ছে। রিসেপশনের এক কেরানীকে দেখলাম, ভ্রূকুটি বিরক্ত চোখে, সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কী এই মধ্যরাত্রে? কাছে গিয়ে দেখলাম, সিঁড়ির ধারেই, লিফ্‌ট খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে আছে। কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটটা খোলা। সম্মুখে উগ্র মারমূর্তি, আমার মতোই এক কালা সাহেব। আর একটি বেয়ারা। বেয়ারা হাত তুলে সাহেবকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সাহেব তার থেকে অনেক বোঝদার, মানবেন কেন। তাঁর এক কথা, 'তুমি মুখের ওপর কথা বলছো? আমি জানি না, ইচ্ছে করেই রাত্রে এ রকম সময়ে লিফ্‌ট খারাপ করে রাখা হয়েছে, যাতে তোমার ওই বদমাইস বন্ধু লিফ্‌ট-বয় দিব্যি ঘুমোতে পায়?'

সাহেব অবিশ্যি সবই হিন্দীতে বলছিল। বেয়ারা বোঝাবার চেষ্টা করছে, এ ব্যাপারে সে দায়ী নয়, সাহেব কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারেন, কিন্তু তিনি খামোকা গালিগালাজ করবেন না। এ কথা শুনে, সাহেব আরো খাপ্পা। কী, গালিগালাজ। আলবৎ করবেন। শিক্ষা দিয়ে দেবেন এই সব বদমাইসদের। বেয়ারাটি একবার আমার দিকে দেখলো। দেখলাম ওর চোখ রাগে দপদপ করছে। দেখেশুনে আমি একটি অপরাধ করে বসলাম। আমি মোলায়েম করে সাহেবকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোন্ তলায় যাবেন?'

'চারতলায়।'

'তাহলে চলুন, রাত্রিবেলা আর কথা কাটাকাটি না করে, আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙা যাক।'

সাহেব তাতে টললেন না, 'কেন যাবো। এটা আমার অধিকার। আপনি এইসব উল্লু কম্‌বখ্‌তদের চেনেন না।'

বেয়ারা আবার বললো, 'আপনাকে বলছি, গালি দেবেন না।'

সাহেব ধমকে উঠলেন, 'চোপরাও বে-আদব।'

আমি তথাপি বললাম, 'চলুন। যা করবার কাল সকালে করবেন।'

কিন্তু সাহেবি মেজাজ, তার ওপরে চক্ষু আরক্ত, চরণযুগল টলোমলো। পেটে কিছু বস্তুও আছে, বোঝা যাচ্ছে। লিম্বু পানীর সে পাপ তো আমার পেটেও আছে। তার তো এত খোয়ারি নেই। সাহেবের চেঁচামেচির মধ্যে, এবার একজন আবাসিক কর্মচারি এলেন। পরিষ্কার বললেন, আশেপাশের ঘরে এখন লোকজন ঘুমোচ্ছে, মহাশয় এখন দয়া করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যান, অন্যথায় যা হোক করুন। এই মধ্যরাত্রে আর এটা চলতে দেওয়া যায় না। মনে রাখা উচিত এটা তথাকথিত হোটেল না। একটি বিশেষ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বিশ্ব-ভ্রমণকারীদের আবাস।

সব শুনে সাহেব কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন। জানালেন, তাঁর নিম্নঅঙ্গের কোথায় নাকি একটি বিস্ফোটক হয়েছে। তাই গালাগাল আর গজর গজর করতে করতেই সিঁড়ি ভাঙলেন, এবং আমাকে শোনাতে লাগলেন, এই সব লোক কতো খারাপ, বিশেষ করে দিল্লী আরো খারাপ। তারপরে চারতলায় এসে তাঁর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে পরিষ্কার বাঙলায় নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'শালাদের পোঁদিয়ে আটা ভাঙতে হয়।'

বাঙালী! আহ্ কর্ণকুহর, কী মধুই পেলে এই মধ্যরাত্রে। কিন্তু মধু না বিষ? আমি আর কোনো কথাটি না। একেবারে সোজা নিজের ঘরে। আলো জ্বালিয়ে, ঠাণ্ডা যন্ত্রটি চালিয়ে জামাকাপড় ছাড়লাম। আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মস্তিষ্কের কোথাও নিদ্রা আছে বলে মনে হলো না। সুবন্ধুর বাড়ির ছাদ পেরিয়ে, আবছায়া অন্ধকারে ঘাসের উপর একটি মূর্তি, এখনও জেগে আছে? হঠাৎ আপনা থেকেই, মনে মনে বলে উঠলাম, শান্ত হও, শান্ত হও। শান্তি পাও।....

সকালবেলা যথাপূর্বং স্নানাদি সেরে ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে নিলাম। গতকাল রাত্রের বাঙ্গালী সাহেবের দেখা পেলাম না। কিন্তু লিফ্‌ট ঠিক হয়ে গিয়েছে। জানি না, সত্যি কোনো গোলমাল ছিল কী না। তবে নির্বাসনে থেকেও চোখের একটা তৃষ্ণা বহন করে ফিরি। ডাইনিং হলে খেতে এসে নানা বর্ণের বিচিত্র পোশাকের নরনারীদের খাওয়া আর আচরণ দেখতে মন্দ লাগে না। আজ এই প্রথম দেখলাম এক গোরা জোয়ান হাফ প্যান্ট পরে একেবারে খালি গায়। কাঁধে একটা ব্যাগ। ঢুকলো একটি কালো মেয়ের হাত ধরে।

পরনে শাড়ি, কপালে লাল ফোঁটা। মানুষ চলছে। আজব কলে।

হলের বাইরে এসে লিফ্‌টের কাছে যাবার আগেই এক বেয়ারা ছুটে এসে জানালো, 'সাব, আপকো ম্যানেজার সাব সালাম দিয়া।'

ম্যানেজার সাব! কেন? জিজ্ঞেস করলাম, 'সাব কহাঁ হ্যায়?'

বেয়ারা আমাকে একদিকে নিয়ে গিয়ে একটি বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। দেখলাম, দরজায় লেখা রয়েছে 'ম্যানেজার'। আমি দরজাটা একটু ঠেলে, ঠুকঠুক শব্দ করলাম। ভিতরে প্রবেশের ডাক শুনে ভিতরে গেলাম। দেখলাম মস্ত বড় টেবিলের ধারে বিশাল চেয়ারে বিশালতর বপু, দৈর্ঘ্যেও বিরাট, প্রায় বৃদ্ধ গোরা সাহেব বসে আছেন। মুখখানি অমায়িক, কোমল আর ভাবুক, মাথায় টাকের পাশে শাদা ধবধবে চুল। তাঁর পিছনে ঢাকা পড়ে আছে ছোট টেবিলের পাশে ছোট একটি মানুষ, বোধ হয় টাইপিস্ট। 'সুপ্রভাত' এবং বসার পরে ম্যানেজার হাসি-জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'শুনলাম আপনি আমাকে ডেকেছেন।'

ম্যানেজার তাঁর টেবিলের ওপর থেকে একটি চিরকুট তুলে নিয়ে দেখলেন, তারপরে আমার দিকে ফিরে ঘরের নম্বর এবং নাম বলে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আমারই কী না। বললাম, 'হ্যাঁ, যথার্থ।'

ম্যানেজার মশায় ঘাড় নাড়লেন, গম্ভীর হলেন আবার একটু হাসলেনও। বললেন, 'গতকাল মাঝরাত্রে আপনি অত্যন্ত হুজ্জোত করেছেন।'

লোকে বলে পিলে চমকানো। একেই বোধ হয় বলে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি?'

ম্যানেজার নির্ভাঁজ মুখে বললেন, 'আপনি। আপনার নাম রুম নম্বর সবই আমাকে জানানো হয়েছে। আপনি রাত্রে ইনটক্সিকেটেড হয়ে—!'

'শুনুন—!'

'শোনবার কিছু নেই ইয়ংম্যান, বেয়ারা আপনার মুখে গন্ধ পেয়েছে।'

'তা হতে পারে—'

'হতে পারে না নয়, সে মিথ্যা কথা বলেনি। যাই হোক, আপনার বোঝা উচিত, আমাদের এটা একটা তথাকথিত হোটেল না। লিফ্‌টের পাশের রুমেই ষাট বছরের এক ব্রিটিশ মহিলার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তিনিও আমাকে কম্‌প্লেন করেছেন। আপনি এসেছেন কলকাতা থেকে একজন বাঙালী যুবক—।'

মাথা ঘুরছে বলবো না, কিন্তু অসহায় হয়ে কেঁদে ফেলবো কী না বুঝতে

পারছি না। সাহেব যে চটিতং হয়ে বলছেন, তা না। বেশ অমায়িকভাবে হেসে হেসে শিক্ষা আর উপদেশ দেবার মতো করে বলে চলেছেন, এবং অখণ্ড বিশ্বাসে যে, আমিই সেই বাঙালী। তবু চেষ্টা করলাম, 'একবার শুনুন—।'

তিনি বাহু ও মস্তক চালনা করে, শিশুকে সামাল দেবার মতো করে বললেন, 'আমায় শোনাবার কিছু নেই ইয়ংম্যান, মদ্যপানের অধিকার আপনার আছে, (ধরণী দ্বিধা হও!) কিন্তু আচরণের বিধিনিষেধ আপনাকে মেনে নিতে হবে। একজন বাঙালী শিক্ষিত ইয়ংম্যানের কাছ থেকে এটা আমি আশা করি না। বিশেষ করে গরীব অশিক্ষিত বেয়ারাদের সঙ্গে আপনারা যদি ও রকম আচরণ করেন, সেটা খুবই খারাপ। আশা করি, আর এ রকম ঘটবে না, কেমন ? আচ্ছা (খুব হেসে) এখন আসুন, আরামে শান্তিতে থাকুন।'

কী করে আসবো। আমি তো আসনে বিদ্ধ হয়ে রয়েছি। উনি থামবার পরে আমি করুণ অনুনয়ে বললাম, 'এবার কি আপনি আমার একটা কথা দয়া করে শুনবেন।'

'বলুন।'

'আপনি যা বললেন, সবই সত্যি, আচরণ বিধির উপদেশও অবিশ্যি গ্রাহ্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, গত রাত্রের ঘটনা আমি ঘটাইনি।'

ম্যানেজার যেন অনুতপ্ত পুত্রকে স্নেহের প্রবোধ দিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, একটু বেশি পান হয়ে গিয়েছিল, এখন আর তোমার মনে নেই। তা হোক, সেই জন্য আমি আর এখন কিছু মনে করছি না। যা সয়, তাই করো।'

ইংরেজিতে কি একেই বলে ফিক্‌সেশন ? ম্যানেজার অমায়িক হেসে একটি ফাইল টেনে নিলেন। আমি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চাই। যদিও আমার ভিতরে ক্ষোভ প্রতিবাদ বিদ্রোহ স্নায়ুগুলোকে অস্থির করে তুলছে। তবু শান্ত হওয়া ছাড়া কিছু করবার নেই। আমাকেও ক্ষমাশীল মুখে ওঁর মতোই হাসতে হবে, বিষ গলাধঃকরণ করতে হবে। তথাপি একবার না বলে পারলাম না, 'এমনও তো পারে, অন্য কোনো বাঙালীর সঙ্গে আমাকে গুছিয়ে ফেলা হচ্ছে।'

ম্যানেজার হেসে উঠলেন। বললেন, 'অকারণ যুক্তির থেকে অনুতাপ করাই ভালো। আমি কোনো ভুল খবর পাইনি।'

এমন বিড়ম্বিত, জীবনে আর কখনো হয়েছি কী না, মনে করতে পারি না। আর কোনো কথা বলতে গেলে নিজেকেই ছোট মনে হচ্ছে। তথাপি বলবো,

ম্যানেজার সাহেব বুড়োটিকে কেন যেন আমার ভালো লাগছে। একটি অমায়িক শিশু। উঠে পড়লাম। বেরিয়ে আসবার আগে বললেন, 'পরে আবার দেখা হবে।'

জানি না। কিন্তু এ মুহূর্তে মনটা বেশ অশান্ত। সেই বাঙালী সাহেবটি গেল কোথায়। এই মুহূর্তে লোকটাকে পেলে কী বলতাম জানি না। বোধ হয় নিজের জিহ্বাকে সামাল দিতে পারতাম না। লিফটে ঢুকে নিজেই বোতাম টিপে ওপরে উঠে গেলাম। একদল হিপি হিপিনি করিডরে ভিড় করে আছে। চেয়ে দেখলাম না। ঘর খুলে, দরজা বন্ধ করে, গুম্ হয়ে বসে রইলাম।

হায় আমার স্বেচ্ছা-নির্বাসনের খোয়ারি। কাটলো কী? এবার ডেরা ডাণ্ডা গোটালেই হয়। নগরে না সাগরেই যেতে হবে দেখছি। অন্যথায় অরণ্যে পর্বতে। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে দেখছি, আয়নায় আমার ঠোঁটের কোণে হাসি মিট মিট করছে। যেন নিজেকেই চিনতে পারছি না। সেখানে অন্য কথা শুনতে পাচ্ছি। এই সব জ্বালা যন্ত্রণা বিড়ম্বনা আছে ঠিকই। কিন্তু মানুষ কি বিচিত্র। বিচিত্রতর। সে কী না ঘটাতে পারে। এখন মনে হচ্ছে, এও একটা জীবনরঙ্গের ছোট একটি খেলা। খেলিনি, তবু খেলায় তো আছি। সেই ভালো।…

টেলিফোন বেজে উঠলো। আতঙ্কের ব্যাপার। কে হতে পারে। ঘড়িতে সময় সাড়ে দশ। একটি মুখই চোখের সামনে ভাসছে। রিসিভার তুলে নিলাম। রুম নাম্বার বলতেই ওপার থেকে ঠিক আন্দাজের গলাটাই ভেসে এল, 'কেমন আছেন?'

সত্যি, সুবন্ধুটার ওপরেই এখন রাগ করতে ইচ্ছা করছে। যতো আকর্ষণ, ততো বিকর্ষণ বোধ করছি। বললাম, 'আপনি যেমন রেখেছেন।'

ওর সেই হুঁহুঁ দুষ্টু হাসিটা শোনা গেল, 'না না স্যার, আমি কেন রাখবো। যাই হোক, গতকাল রাত্রে কোনো রকম অসুবিধে হয়নি তো?'

বললাম, 'তেমন কিছু না।'

'সেটাই রক্ষে। কেন না, আমি ভাবছিলাম, পাপবোধ ভেসে যাওয়ার ব্যাপারটা কতো দূরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমি তো আবার এ সব ঠিক বুঝি না। তবে আপনাকে একটা কথা বলতে পারি।'

'কী কথা?'

'দিল্লীতে, আমার চাকরি জীবনে অনেক মেয়েকেই দেখেছি। সত্যিকারের রঙ্গরঙ্গিনী সমাজের ওপর তলার ভোলাপচুয়াসদের। তার সঙ্গে আমি রঞ্জিতা রিজ্‌ভিকে মেলাতে পারি না। ওপরতলার সঙ্গে ওর মিশ খায় না, ওপরতলাও ওকে পাত্তা দেয় না। সে সব ও পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছে, কেন না ইতর চালাকিগুলো ওর ধাতে সয় না। ওকে যদি আপনি রঙ্গিনী হিসাবে বিচার করেন, তাহলে কিছু বলার নেই, তবে—।'

আমি বলে উঠলাম, 'আমি কোনো বিচারই করছি না।'

সুবন্ধু বললো, 'সেটা একটু নিষ্ঠুরতা হবে। যাই হোক, এই দিল্লীতে অনেক রঙ্গিনী আর স্বেচ্ছাচারিণীদের সঙ্গে ওকে একটু আলাদা করে দেখবেন।'

'আমি দিল্লীতে রঙ্গিনী দেখতে আসিনি।'

'জানি, তবু পরিচয়টা যখন হয়েই গেল, তা-ই বলছি। পরে সাক্ষাতে আপনাকে ওর বিষয়ে কিছু বলবো।'

'সুবন্ধু, তার কি কোনো দরকার আছে?'

'একটু আছে। আপনার বিষয়ে ওর কথা শোনবার পরে, একটু না বলে পারা যাবে না। অস্বীকার করছি না, আপনার বাংলার মাটি এ ক্ষেত্রে খুবই শক্ত, কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার মাটিকে একেবারে পাথর, মরুভূমি আর জঙ্গল মনে করবেন না।'

সুবন্ধুর গলার স্বর যেন একটু গম্ভীর। কিন্তু এত কথা বলবার দরকারই বা কী। যেটুকু আমার জানা বোঝা হয়েছে, সেখানেই সব থাক না। জবাব না পেয়ে, ওপার থেকে সুবন্ধুর গলা শোনা গেল, 'হ্যালো, কী হলো মশাই!'

'বলুন।'

'কথা বলছেন না কেন। বিরক্ত না তন্ময়?'

'শুনছি।'

'অবিশ্যি জানি, আপনাকে বেশি বলার কোনো মানে হয় না। যাই হোক, কাল কে কাকে পৌঁছলেন? আপনার ডেরাটা চেনা হয়নি তো।'

'তাই তো জানি। আগে অ্যান্টনি, তারপরে বেশ খানিকটা চক্র দিয়ে, প্রায় আমার আবাসেই আসা হচ্ছিল। পরে শ্রীমতী আমার কথা মেনে নিয়ে, তাঁকে পৌঁছে দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন।'

'তাহলে রঞ্জিতার আস্তানাটা আপনার দেখা হয়ে গেছে।'

'নিরুপায়।'

'আহা, ও রকম করে বলবেন না মশাই। আপনি নিরুপায়, সে তো আমি

ভালোই জানি। যদি ফাঁড়া মনে করেন, সে তো কাটিয়েই এসেছেন। এখন আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। মেয়েটিকে অনেক দিন ধরে চিনি। তবে গতকাল রাত্রের মতো অবস্থা ওর কোনোদিন দেখিনি। বিশেষ করে ও রকম লজ্জাবতী হয়ে উঠতে তো কোনো দিনই না। যেটা আবার সুজাতার ভালো লাগেনি। সুজাতা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি বোধ হয়। যাই হোক, সন্ধ্যেবেলা যোগাযোগ করছি। সারা দিন অজ্ঞাতবাস করুন। ছাড়লাম।'

বলেই লাইন ছেড়ে দিল। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলাম, সুবন্ধুর সন্ধ্যেবেলার যোগাযোগ বড় ভয়ের। একটি সন্ধ্যায় যা দেখেছি, দ্বিতীয় সন্ধ্যে আবার কী রূপ নিয়ে দেখা দেবে, কে জানে। তবে আজ ওর বাড়ি আমি যাচ্ছি না, এবং বুঝতে পারছি ওর বাড়িটা দিল্লীর বন্ধুদের প্রতি হাতছানি দিয়ে রেখেছে। কার কখন আবির্ভাব হবে, বলা যায় না। কিন্তু সুবন্ধুর সারা দিন অজ্ঞাতবাস করুন' কথাটাও যেন, বলা কেমন কেমন। ও কি আমার এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনটা ভাঙতে চায় নাকি।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো পাখির ডাকে চমকে উঠলাম। এই ঠাণ্ডা বন্ধ ঘরেও, শব্দটা যেন স্পষ্ট হয়ে বাজলো। পর্দা সরানো কাঁচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, এক ঝাঁক সবুজ টিয়া বটের ডালে এসে বসেছে। পাশে নিমের ঝোপেও মিশেও মিশে যায়নি। যেন হঠাৎ কোনো কাজিয়ার মিটমাট করতে সবাই ছুটে এসেছে এখানে, চিৎকার করছে একসঙ্গে। দুটি ঘুঘু এক ডালে, চুপচাপ বসে, টিয়াদের ব্যাপারটা দেখছে। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ধরতে পারি। কিন্তু কাঁচের জানালায় একটু শব্দ হলেই সবাই উড়ে পালাবে।

ওদের কি মনের কথা বলে কিছু আছে? যদি বুঝতে পারতাম! ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে, ময়দানবের যন্ত্রের সেই অদ্ভুত ঠং ঠং শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। এক সময়ে টিয়াগুলো উড়ে গেল একসঙ্গে। একটি ঘুঘু ডালে বুক চেপে বসলো। আর একটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ নীচের দিকে নেমে গেল।...

দ্বিপ্রহরের আহার মিটিয়ে, ওপরে উঠে লিফ্‌ট ছেড়ে দিয়ে, সবে করিডরে পা দিয়েছি। শ্রবণ যেন জ্বলে উঠলো, 'এই যে দাদা, খেয়ে এলেন?'

থমকে দাঁড়িয়ে দেখি, ইনি সেই গত মধ্যরাত্রির মত্ত সাহেব, কিন্তু আমাকে দেখে বাংলা কেন। গায়ে লেখা আছে নাকি। আমি মুখটা একটু শক্ত করলাম। মনে মনে বললাম, 'এই যে বারাব্বাস'। দস্যু, পাপী, তোমার জন্যই যীশু

ক্রুসবিদ্ধ হয়েছিল।' শক্ত হয়েই দাঁড়ালাম। দেশওয়ালি সাহেব তখন নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, পায়জামা পরা, খালি গা। মুখ টিপে হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ভাবছেন, কেমন করে জানলাম? ইচ্ছা থাকলেই জানা যায়। কিছুই না রেজিস্টারে একবার চোখটা বুলিয়ে নিলাম, অমনি ধরে ফেললাম, আপনিই তাহলে এ ফ্লোরের দ্বিতীয় বাঙালী।'

ধরে ফেললেন, বেশ করেছেন, এখন সকালবেলা আমার যে খোয়ারটা—। ভাববার অবকাশই পেলাম না। এক পা বেরিয়ে এসে বললেন, 'কাল রাত্রে ব্যাটাদের কী রকম দিলাম দেখলেন তো? দেখুন আজ সকালেই লিফ্‌ট ঠিক হয়ে গেছে। যাদের যে রকম, বুঝলেন না? এ সব মালের সঙ্গে, ও সব ভদ্রতা-টদ্রতা চলে না। আমার অনেক দেখা আছে।'

লোকটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। একে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, সকালবেলার খোয়ারির কথা। বোধ হয় উলটে আমাকে আরো কিছু জ্ঞান দিয়ে দেবে। নিজেকে আমার করুণা করতে ইচ্ছা করলো। ঠিক এমনিতরো বাঙালিটি হতে পারলাম না। এবার করুণ মুখ করে একটু হাসবার চেষ্টা করলাম। উনি বিস্ফারিত হেসে বললেন, 'অবে ফেটেছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফেটেছে?'

বাঙালী হেসে, একটু ঠ্যাঙ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, চোখের ইশারায় তাঁর নিম্নাঙ্গ দেখিয়ে বললেন, 'সেই সেটা, মানে ফোড়া ব্যাটা ফেটেছে। এ্যাই এ্যাত্ত বড় হয়েছিল।'

হাত দিয়ে একটি বড়-সড় ফলের মাপ দেখালেন। বিস্ফোটক বৃত্তান্ত। ভদ্রলোক তাহলে, এ ব্যাপারে সত্যি কথাই বলেছিলেন। থাক সকালবেলার কথা আর এঁকে বলতে চাই না। একটু হেসে পা বাড়ালাম। শুনতে পেলাম, 'দাদা কি কোনো কাজে এসেছেন?'

ঘাড় নেড়ে জানালাম, 'হ্যাঁ'। তবু কথা, 'চাকরি না ব্যবসা?'

'ব্যবসা।'

'আরে দাদা শুনুন না, আপনিও কলকাতার লোক, আমিও কলকাতার লোক। ক'দিন আছেন আর?'

বললাম, 'আজই চলে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি? আমিও আজ চলে যাচ্ছি। তবে আজ যাবো চণ্ডীগড়ে, তারপরে…।'

কী-সব কতগুলো বলে যেতে লাগলেন। আমি হেসে হেসে ঘাড় নাড়লাম,

মনে মনে বললাম, আপনি চিলি চীন চাত্‌রা. যেখানে খুশি যান। তবে আজ যাচ্ছেন, এটাই ভাগ্য। ঘাড় নেড়ে এগোলাম, শুনতে পেলাম, 'আচ্ছা দাদা, পৃথিবী গোল, আবার দেখা হবে।'

ভয় দেখাচ্ছেন নাকি। এত সহজ না, পৃথিবীটা গোল বলেই আবার দেখা হবে। ময়দানবের সেই ধাতব ঠং ঠং শব্দটা এখন আরো জোরে শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করতে, শব্দটা স্তিমিত হয়ে গেল। চোখ বুজে চেয়ারে বসে পড়লাম।

ভরসন্ধ্যে পর্যন্ত ডুবে রইলাম নিজের মধ্যেই। যখন মনে মনে একটু সন্দেহ হলো, সুবন্ধু তবে না-ও আসতে পারে, তবে নির্জন অফিস-পাড়া দিয়ে, একটু হেঁটে আসার ইচ্ছা হলো। আর সেই ইচ্ছার বিপরীতে তাল দিয়ে, দরজায় ঠুকঠুক করে বাজলো। বললাম, 'ভিতরে আসুন।' এলো না। সুবন্ধু নিশ্চয়ই। ও আবার দাঁড়িয়ে থাকে নাকি শব্দ করেই, দরজা খুলে ঢুকে পড়ার কথা। তাহলে সুবন্ধু না। কে হতে পারে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েও একটু ভাবলাম, খুলে দিলাম। ব্যাগ হাতে সুজাতা। ডাকলাম, 'আসুন। কর্তা কোথায়?'

সুজাতা ঘরে ঢুকে বললো, 'আসছেন। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। আমাকে এগোতে বললেন।'

সুজাতাকে বসতে বললাম। গায়ে একটা জামা চাপালাম। আবার ঠুকঠুক। কিন্তু দরজা খুললো না। সুবন্ধু নয় নাকি? দরজা খুলে দিলাম। হেনা, হাতে একটা বড় ব্যাগ। আমার এ-ঘরে আর-এক সন্ধ্যের ছবি ফুটছে। হেনাকে দেখাচ্ছে একটি নতুন ফোটা ফুলের মতোই। চোখে-মুখে লজ্জা পাওয়া হাসি। বললাম, 'এসো।'

হেনা ঘরে ঢুকে, সুজাতাকে দেখেই খুশি গলায় ইংরেজিতে বলে উঠলো, 'ওহ্‌ সুজাতা বউদি, তুমি কখন?'

সুজাতাও সমান ভাবেই, খুশিতে বেজে উঠলো, 'এসো হেনা। এই তো আসছি।'

হেনা জিজ্ঞেস করলো, 'সুবন্ধুদা কোথায়?'

সুজাতা বললো, 'আসছেন।'

হেনা বসবার জায়গা পাচ্ছে না। খাট দেখিয়ে বললাম, 'ওখানেই বসো; আর তো কিছু নেই।'

হেনা বললো, 'আপনি আগে বসুন।'

বসলাম। হেনাও বসলো। সুজাতা আর ও দৃষ্টি-বিনিময় করলো, এবং

শুধু শুধুই কী না জানি না, তুজনেই হাসলো। তারপরে হেনা আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমি কিন্তু বলেই রেখেছিলাম, আসবো।'

বললাম, 'আমি বোধ হয় বারণ করিনি।'

হেনা হাসলো সুজাতার দিকে চেয়ে। সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, 'এত বড় ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছ, য়ুনিভারসিটি থেকে এলে নাকি ?'

হেনা যেন হঠাৎ একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বললো, 'না না, বাড়ি থেকেই আসছি।'

সারা দিনের কাজে ক্লান্ত, উসকো-খুসকো সুজাতা বললো, 'তোমাকে দেখে অবিশ্যি তাই মনে হচ্ছে। মাসীমা কেমন আছেন ?'

ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলো। মাসীমা থেকে এসে গেল আরো অন্যান্যদের কথা। আমি অন্যমনস্ক ভাবে শুনছি। দিল্লীতে, আমার নির্বাসনের ঘরে, সন্ধ্যেবেলা তুটি মেয়ে কথা বলছে, হাসছে। এর থেকে আর ভালো আত্মগোপন কাকে বলে। কয়েক মিনিট পরেই, দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, সুবন্ধু ঢুকলো। প্রথমেই হেনার দিকে চেয়ে বললো, 'এসে গেছ ? গুড। এনেছো ?'

হেনা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় তুলিয়ে বললো, 'নিশ্চয়।'

আমি আর সুজাতা ভ্রূকুটি চোখে তাকালাম। সুবন্ধু বললো, 'ভেরি গুড।' আমার দিকে ফিরে বললো, 'সারা দিন আপনাকে কেউ জ্বালাতন করেনি তো ? কেউ করবে না, নিশ্চিন্ত থাকবেন, আমি আছি।' বলেই ওর হাতের ব্যাগ খুলে, একটি বোতল বের করলো। সোনালী পানীয়, নতুন বোতল। বোধ হয় এখন কিনে নিয়ে এলো। কিন্তু আমার এখানে। আবার বললো, 'সন্ধ্যেবেলাটা আমরা ঠিক যোগাযোগ রাখবো। আজ আমাদের বাড়িতে রাত্তের খাওয়া ক্যান্‌সেল, বাইরে থেকেই খেয়ে ফিরবো। সুজাতা আপনার বাথরুমেই একটু হাত-মুখ ধুয়ে নিক।'

সুজাতা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। আমি সুবন্ধুর খেই ধরতে পারছি না, বললাম, 'হ্যাঁ নিশ্চয়, পরিষ্কার তোয়ালে-টোয়ালে সবই আছে।'

সুজাতা বললো, 'আপনাকে ও সব ভাবতে হবে না।'

সুবন্ধু ততক্ষণে উঠে, দরজা খুলে বাইরে চলে গিয়েছে। কাকে যেন শব্দ করে ডাকলো। দেখলাম, বেয়ারা ছুটে এলো। তাকে বললো, আরো চারটে গেলাস এবং কয়েক বোতল সোডা, তু' বোতল কোকাকোলা আনতে।

বেয়ারাও দেখলাম ভালো খিদ্‌মদ্‌গার। 'জী সাব' বলে ছুটে চলে গেল। বলার কিছু নেই, দেখে যাওয়া ছাড়া, সুবন্ধু তো 'সন্ধ্যেবেলার যোগাযোগ' রাখছে। তা বই তো কিছু না।

সুবন্ধু এবার হেনাকে বললো 'বের করো।'

হেনা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। রহস্যময় ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না। সুজাতারও সেই অবস্থা।

হেনা ব্যাগ খুলে, সাবধানে তিনটি মুখ ঢাকা ষ্টিলের বড় বড় বাটি বের করলো। সুবন্ধ আগেই হাত বাড়িয়ে একটি বাটির মুখ খুললো। আকাশে যেমন চাঁদ, তেমনি দিল্লির এই আবাসে, ঝলকে উঠলো, বাটিতে বড় বড় চিংড়ি মাছ। সরষেবাটা মাখা তার গায়ে। হালকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ঘরে। সুবন্ধু বললো, 'আই এন এস মার্কেটেই পেলে তো? জানতাম পাবে। আর কী এনেছো?'

হেনা বললো, 'ইলিশ মাছ।'

ইতিপূর্বে দিল্লীতে দুটো মাছের একত্র সমাবেশ দেখিনি। খেয়েছি কি না, তা-ও মনে করতে পারছি না।

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'ফার্স্টক্লাস। সঙ্গে ভাত থাকলে আর দেখতে হতো না। যাক, সেটা আর একদিন হবে।'

এতক্ষণ সুবন্ধু আমার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছিল না। এবার তাকিয়ে, ঠোঁট টিপে হাসলে। আমি ওর চোখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। কোন্ দিক দিয়ে, কী খেলাটা খেলছে, ধরতে পারছি না। এ কি কোন কূটনৈতিক খেলা নাকি। সেটা আমার মতো নিরীহ মানুষের সঙ্গে কেন। ও কি আমাকে দিল্লী-ছাড়া করতে চাইছে। সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু এ সব ব্যাপারের যোগাযোগটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সুবন্ধু বুঝিয়ে দিলো, 'আমি অফিস থেকে পার্লামেণ্টে যাবো বলে উঠতে যাচ্ছি, হেনার টেলিফোন এল। ও তো দেবতার ধ্যানে (আমার দিকে একবার তাকিয়ে মগ্ন,) বললো—।'

হেনা বলে উঠলো, 'আহ্, সুবন্ধুদা!'

সুবন্ধু হাত তুলে বললে, 'ঠিক আছে। হেনা বললো, উনি এ রকম একটা জায়গায় আছেন, নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। বাড়িতেও যাবেন না। ও একটু সেবা করতে চায়। আমি বললাম, খুবই ভালো। তারপরেই মেনু ঠিক হয়ে গেল, অবিশ্যি যদি বাজারে পাওয়া যায়। ভাবলাম, আমি

হচ্ছি দেবতার বাহন। ওতে আমারও ভাগ আছে। সে কথাও হেনাকে জানিয়ে দিলাম। তারপরে তো দেখতেই পাচ্ছো, সারাদিন ধরে হেনা বাজার করে রেঁধে কী নিয়ে এসেছে।'

হেনার শ্যামলী মুখখানি তখন লজ্জার ছটায় চকচক করছে। একবার স্নজাতা আর আমার দিকে দেখে, নিচু গলায় বললো, 'কিছুই করিনি।'

দিল্লীর গোড়ো মেয়ে যে এ সব পারে, তা জানতাম না। যদিও আমার ভিতরে অস্বস্তির খচ্‌খচানি যাচ্ছে না। দেখছি, আমার পথ আমার জন্য না পথ তার নিজের বাঁকে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। সুবন্ধু বললো, 'আমি অবিশ্যি হেনাকে বলে দিয়েছি, ও যেন ওর মাকে আসল কথাটা না বলে।'

হেনা যেন খানিকটা খতোমতো খেয়ে বলে উঠলো, 'বলিনি।'

সুবন্ধু চোখ বুজে, হো হো করে হেসে উঠলো। সেই হাসির ঝাপটাতেই যেন হেনার আঁচল খসে পড়লো। তাড়াতাড়ি তুললো। সুবন্ধু বললো, 'সেটা তুমি পারোনি, আমি জানি। এত সব করার পরে, মাকে বলতেই হয়েছে, কেননা, চিংড়ি মাছটা মনে হচ্ছে, মাসীমারই হাতের রান্না। যাই হোক, আমি জানি, তিনি গোপন করেই রাখবেন, কিন্তু মনে মনে ছটফট করবেন, লেখকের তিনিও ভক্ত।'

দেখলাম, হেনা আর মুখ তুলতে পারছে না। শ্যাম মুখে এত রক্তাভাও ছটা দেয়। সুবন্ধুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো। সুবন্ধু বললো 'যাক গে, ওর জন্য ভাবতে হবে না, উনি কিছু মনে করবেন না। করবেন?'

আমাকে জিজ্ঞেস করছে সুবন্ধু, কিছু মনে করবো কী না। যেন মনে করবার কিছু রেখেছে। আমি হেনার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মনে করার কী আছে।'

হেনা আমার দিকে একবার দেখে, সুবন্ধুকে ভ্রূকুটি কটাক্ষ করে, ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'আপনি ভারি ইয়ে।'

সুবন্ধু সুজাতা দুজনেই হেসে উঠলো। এমন সময় বেয়ারা এলো ট্রের বুকে সোডা আর কোকাকোলা নিয়ে। সুজাতা ব্যাগ রেখে উঠে গেল বাথরুমে। বেয়ারা চলে যেতে সুবন্ধু দুটো গ্লাস টেনে নিয়ে পানীয়ের বোতল খুললো। সমস্ত ব্যাপারটা ওর আগে থেকেই ভাবা ছিল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। দুটো গেলাসে পানীয় ঢালতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে খাবে?'

'আপনি?'

'আমি না।'

'আগে থেকেই এ রকম মুখ থাবাড়ি দেবেন না। দিল্লীতে বসে, চিংড়ী আর ইলিশের অনাৱে একটুখানি।'

আমার সঙ্গে হেনার চোখাচোখি হলো। ও সুবন্ধুর দিকে চেয়ে বললো, 'আমি তা বলবো না। ওঁর যদি ইচ্ছে না হয়, থাক না।'

সুবন্ধু বললো, 'এ ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে না। নেবে কী না বলো।'

হেনা লজ্জা পেল না, স্পষ্টভাবে বললো, 'না।'

সুবন্ধু বললো, 'তোমার বন্ধুরা তো অনেকেই চালায়।'

হেনা বললো, 'আমার বন্ধুরা তো অনেক কিছুই চালায়। তা বলে আমাকেও চালাতে হবে?'

সুবন্ধু পানীয়তে সোডা মেশাতে মেশাতে বললো, 'তা বলছি না। তা তোমার দেবতাকে একদিন য়ুনিভারসিটি ক্যামপাসে নিয়ে যাও।'

দেবতা কথাটা এত কানে লাগে যে, হেনার দিকে আমার চোখ পড়ে গেল। হেনাও তাকিয়ে ছিল, হাসলো। প্রতিবাদ করলো না, বললো, 'ওঁকে বলেছিলাম। এর পরে যখন আসবেন, তখন যাবেন বলেছেন।'

'এর পরে যখন আসবেন?' সুবন্ধু একবার আমাকে দেখে, কোকাকোলা দুটো খুলে, দুই গেলাসে ঢাললো। বললো, 'দেখা যাক। তবে হ্যাঁ, তোমার বাবাকে যেন ওঁর কথা বলো না।'

সুবন্ধু ঠোঁট টিপে হাসলো। হেনা ঝামটা দিল, 'আহ্, সুবন্ধুদা।'

সুবন্ধু সিগারেট ধরিয়ে হাসলো। আবার কী নতুন রহস্য। হেনার দিকে একবার দেখলাম। ওর মুখে লজ্জার আভা। সুবন্ধু বললো, 'তাতে কী হয়েছে, যা সত্যি তা সত্যি। আমি আবার মিথ্যে বলতে পারি না, সহজ মানুষ।'

বড্ড স্ফটিকস্বচ্ছ জলের মতো। ও আমার দিকে ফিরে বললো, 'মনে করবেন না, সবাই আপনার লেখা পড়ে একেবারে মোহিত হয়ে যায়। মিস্টার ঘোষ, হেনার বাবা, আপনার লেখা পড়ে একদম পছন্দ করেন না।'

হেসে বললাম, 'সবাইকে মোহিত করতে পারবো, এমন ক্ষমতা নিয়ে আমি আসিনি।'

হেনা বললো, 'পছন্দ করেন না মানে কী, বাবা ক্রিটিক্যাল। কিন্তু ওঁর কথা বাবাকে বলবো না কেন। উনি যদি আমাদের বাড়ি যেতেন, তাহলে কি বাবাকে বলা হতো না?'

সুবন্ধু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, তা অবিশ্যি হতো।'

হেনা বললো, 'তবে? বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে,

তার সঙ্গে না বলাবলির কিছু নেই। তা ছাড়া, বাবা খুব ভালোই জানেন, ওঁর বিষয়ে আমি কী ভাবি। অনেক তর্কবিতর্কও হয়েছে। বাবা আমার আর মায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না।'

সুবন্ধু হেসে উঠে বললো, 'তারপরে দেখবো, তোমার বাবার অবস্থা চাঁদবেনের মতো। স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে এঁটে না উঠতে পেরে, মনসার পায়ে পুজো দিয়ে বসলেন।'

হেনা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। বললো, 'চাঁদ সওদাগর স্ত্রী-কন্যার কথায় মনসাকে পুজো করেননি। দায়ে পড়ে করেছিলেন।'

হেনা এটাও জানে। তবু মনে মনে একটু অবাক লাগে। সাহিত্য শিল্প ব্যাপারটাই এমন, মতভেদ থাকেই। তবু একই পরিবারে বিভিন্নতা, তাও দেখেছি। তথাপি চিন্তাটা যেন জটিল হয়ে উঠতে চায়। সুজাতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সুবন্ধু ওদের দুজনের হাতে কোকাকোলার গেলাস তুলে দিয়ে, আমার হাতে অন্য পানীয়ের গেলাস তুলে দিল। আমি এই মুহূর্তে একবার হেনার দিকে দেখলাম। সুবন্ধু বললো, 'চিয়ার্স ফর ফিউচার চিংড়ি অ্যাণ্ড হিল্‌সা।'

সকলেই হাসলো। কিন্তু দরজায় ঠুক্‌ঠুক্। এবার কে হতে পারে? আর তো কেউ আসার থাকতে পারে না। সুবন্ধুর 'সন্ধ্যের যোগাযোগ' তো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সুবন্ধু উঠে দাঁড়ালো। ওর চোখে সেই হাসি। একটি নামই আমার মনে পড়ছে, এবং ভয় পাচ্ছি। সুবন্ধু দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'ওহ্, আসুন আসুন।'

কাকে আপ্যায়ন করছে? দেখলাম সুবন্ধুর পিছনে পিছনে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। মধ্যবয়স্ক দীর্ঘদেহ, শার্ট ট্রাউজারভূষিত, শান্ত মুখ, উজ্জ্বল চোখ সুবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ইনি হৃদয়নাথ অধিকারী। মনে রাখবেন হৃদয়নাথ এবং অধিকারী—দুই-ই।'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। সকলেই হেসে উঠলো। নামটা যেন কেমন শোনা শোনা লাগছে। তা লাগুক, কিন্তু সুবন্ধু তাহলে একটা চক্রান্তই করেছে। হেনাকে দেখলাম, তাড়াতাড়ি উঠে, হৃদয়নাথকে সশ্রদ্ধভাবে বললো, 'আপনি বসুন।'

হৃদয়নাথ বললেন, 'তোমরা বোসো, আমি বসছি।'

বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। সুবন্ধু আমার পরিচয় দিল। উনি বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আপনাকে বোধ হয় ব্যস্ত করা হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'কিছুমাত্র না। আপনি বসুন।'

তেঁতুল পাতায় ন'জনের মতো, সুজন হয়ে আমরা বসলাম। সুবন্ধু আমার দিকে চেয়ে বললো, 'এঁর নাম আপনার নিশ্চয় জানা আছে। উনি আপনার বিষয়ে দিল্লীর ইংরেজি কাগজে লিখেছেন।'

হৃদয়নাথ বিনীত ভাবে বললেন, 'না না, সে কিছু না। ওঁর লেখা আমার ভালো লাগে, সেটাই আসল কথা।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'শুনলাম খুব জরুরি কাজে কয়েক দিনের জন্য এসেছেন, কারোর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছেন না। তবু শুনে আর না এসে পারলাম না। আপনার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছেটা অনেক দিনের।'

আমি সুবন্ধুর দিকে তাকালাম। সুবন্ধু স্পষ্টতই এক চোখ বুজে, কী একটা ইশারা যেন করলো। হেনা সেটা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফেরালো। হৃদয়নাথ সুজাতা আর হেনার সঙ্গে কথা বললেন। সকলেই ওঁর পরিচিত। সুবন্ধু গেলাসে সোডা আর পানীয় ঢেলে হৃদয়নাথকে দিল। হৃদয়নাথ ধন্যবাদ দিয়ে গেলাস নিলেন। সুজাতা বললে, 'আমি ভেবেছি, বুঝি রঞ্জিতা রিজ্‌ভি এল।'

হৃদয়নাথ যেন আঁতকে উঠে বললেন, 'হোয়াট ?'

হেনাও প্রায় একসঙ্গেই, ভুরু কুঁচকে বলে উঠলো, 'রঞ্জিতা রিজ্‌ভি এখানে ?'

সুবন্ধু প্রায় হৈ হৈ করে বলে উঠলো, 'আরে না না, সে এখানে কোথা থেকে আসবে। তার সঙ্গে তো লেখকের কোনো পরিচয়ই নেই। আজ একটু আগে তার সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল, সেইজন্য সুজাতার বোধ হয় হঠাৎ মনে হয়েছে রঞ্জিতা রিজ্‌ভি এসেছে। আমি তো তাকে লেখকের কথাই বলিনি।'

দেখলাম সুজাতা হাঁ করে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। তারপরে আমার দিকে তাকালো। আমি দেখলাম হেনার দিকে। হেনা সুবন্ধুর দিকে। ওর কালো টানা চোখে একটু সন্দেহের ছায়া। হৃদয়নাথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'বাঁচালেন মশাই। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছলাম।'

সুবন্ধু হাসতে হাসতেই বললো, 'কেন এত ভয়ের কী আছে মশাই, একটি রমণী তো মাত্র।'

হৃদয়নাথ বললেন, 'শুধু রমণী না, অতি রূপসী রমণী, মানি, কিন্তু তার সান্নিধ্য আমার সয় না। এমন কথা বলে, শোনা যায় না, যদিও অবিশ্যি সে নাকি বিদুষী।'

হেনা বলে উঠলো, 'সুবন্ধুদা যে কী করে মহিলাটিকে সহ্য করেন বুঝি না।'

সুবন্ধু বললো, 'জানি জানি, তুমি রঞ্জিতাকে একদম পছন্দ কর না।'

হেনা বললো, 'দিল্লীর কেউ করে কিনা সন্দেহ, আপনি ছাড়া।'

সুবন্ধু বললো, 'হ্যাঁ ভাই, আমার আবার মহিলাটির সম্পর্কে একটু দুর্বলতা আছে।'

হেনা হেসে উঠলো। সুজাতার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল, এবং হাসাহাসি। এবার খানিকটা রহস্য বোঝা গেল, সুবন্ধু কেন হই-হই করে উঠেছিল। ও জানতে দিতেই চায় না, রঞ্জিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

কিন্তু সুজাতা কি জানে না এসব। সুবন্ধুর মতো স্বামীর ঘর করেও? তবু, আমার ভিতরটা এখন এক ধরনের হাসিতে ভরে যাচ্ছে। মনে মনে, ভাবছি, এ সময় রঞ্জিতা রিজ্‌ভি এসে পড়ুক না। আমার তো ষোল কলা পূর্ণ হয়েছে। সুবন্ধুর হাঁড়িটা ভাঙুক। ও বড় ঘুঘু সাংবাদিক। হৃদয়নাথ ইলিশ আর চিংড়ি দেখে, এবং সব ঘটনা শুনে খুব খুশি। বললেন, 'হেনা লক্ষ্মী মেয়ে। আমার অবিশ্যি ভাগ বসবার কথা ছিল না।'

হেনা বললো, 'বা রে, তাতে কী।'

আমি সুবন্ধুকে বললাম, 'বেয়ারাকে কয়েকটা প্লেট দিতে বলি।'

সুবন্ধু বললো, 'কোনো দরকার নেই। তুলে তুলেই খাওয়া যাক না।'

হেনা বললো, 'রঞ্জিতা রিজ্‌ভি থাকলে আমি তুলে খেতাম না।

সুবন্ধু চকিতে একবার আমার দিকে দেখে বললো, 'মুসলমানের বিবি বলে?'

হেনা বললো, 'আমার অনেক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে আমি খাই। কিন্তু ওর মতো বাজে মেয়ের সঙ্গে এক পাত থেকে আমি খেতে পারবো না।'

হৃদয়নাথ হেনাকে সমর্থন করে, অন্তর্বাস পোড়ানোর ঘটনাটা বললেন। হেনার কালো চোখদুটো যেন ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। ও জানতো না বলে উঠলো, 'এটা ইতরতা আর নোংরামি ছাড়া কিছু না। ওর মতো মেয়ের পক্ষেই এটা সম্ভব।'

হেনা যেন রঞ্জিতার নামটাও সহ্য করতে পারে না, সুবন্ধু বললো, 'যাকগে' যে সামনে নেই, তাকে নিয়ে কথা বলে কী হবে।'

হেনা বললো, 'পাসোনালি না-ই বা থাকলো। সে তো যা করছে, সেটা পাবলিকলি। আমি ভেবে পাই না, এই সব মহিলারা কী চায়। এরা সমাজে

বাস করে কেন। বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকলেই পারে। তা না হলে, এদের জেলে পুরে রাখা উচিত।

সুবন্ধু হেসে বললো, 'এটা কি কবির মতো কথা হলো হেনা ?'

জবাব দিল হৃদয়নাথ, 'কেন, কবি হলে কি তাকে সব অনাচার মেনে নিতে হবে নাকি ?'

সুবন্ধু খানিকটা অসহায়ের ভঙ্গি করে, আমার দিকে চেয়ে বললো, 'ও মশাই, আমাকে একটু দেখুন না। একজন হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বিভাগের লোক, অথচ শিল্প সাহিত্য যোদ্ধা। আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্রী। পারবো কেন। একটু যোগ দিন না।'

হেসে বললাম, 'আমি কী করে যোগ দেব। আমি কি কিছু জানি।'

হেনা বললো, 'উনি তো আর আপনার গুণধরীকে চেনেন না।'

সুবন্ধু বললো, 'তবু, এই একজন সম্পর্কে যে এত বিরূপ ক্রুদ্ধ মন্তব্য, সে বিষয়ে একটা মতামত ?'

বললাম, 'দেখুন, সদাচার অনাচার, যা-ই বলুন, কার্যকারণগুলো তো সবই আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যেই নিহিত। দুর্ভাগ্য না থাকলে, কে আর অনাচার করবে।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'ব্রাভো।'

হেনা চকিতে একবার আমার দিকে দেখে বললে, রঞ্জিতা রিজ্‌ভির দুর্ভাগ্য তো বটেই, কিন্তু কলুষটাই তার বড়।'

হৃদয়নাথ যোগ করলেন, 'এবং রঞ্জিতা তার দুর্ভাগ্যের কথাও বোঝে না।'

সুবন্ধু আমার দিকে তাকালো। আমি হাসলাম. চোখের সামনে, ঘরের ওপরে আবছায়ায় দাঁড়ানো রঞ্জিতার চেহারাটা একবার ভেসে উঠলো। চুপ করে রইলাম।

চিংড়ি ইলিশ, সকলই অতি উপাদেয়। সুবন্ধু সবাই মিলে বাইরে খেতে যাবার কথা তুললো। আমি তো এখন স্রোতে ভাসছি। বলার কিছু নেই। আপত্তি করলো হেনা। ও বাড়িতে বলে আসেনি। সুবন্ধু কোনো কথা না বলে, টেলিফোনের রিসিভার তুললো। নম্বর চেয়ে, হেনাদের বাড়িতে টেলিফোন করে, ওর মাকে ডেকে জানিয়ে দিল, রাত্রের খাওয়ার পরে, ও আর সুজাতা হেনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। বোঝা গেল, ওদিক থেকে 'তথাস্তু' শোনা গিয়েছে। হেনা বললো, 'আহা, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, না ?'

সুবন্ধু বললো, 'সেটা আমি জানি।'

হেনা চোখ তুলে, আমাকে দেখে, মুখ ফিরিয়ে নিল। হৃদয়নাথ বাথরুমে গেলেন।

হেনা বললো, 'আমার ভালো লাগছে না।'

সুবন্ধু বললো, 'তাও জানি। আমরা সবাই মিলে তোমার সন্ধ্যেটা মাটি করেছি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি?'

সুবন্ধু বললো, 'সবাই মানে আপনি নন। ঠিক আছে, আরো তো বিকেল সন্ধ্যে পাওয়া যাবে। আগামীকাল তো আমাকে কানপুর যেতে হচ্ছে, অতএব সন্ধ্যেয় যোগাযোগ হচ্ছে না।'

আমার দিকে ফিরে বললো, 'হৃদয়নাথবাবুর জন্য কিছু মনে করেননি তো? কিছুতেই না বলতে পারলাম না মশাই। আপনাকে খুব -'

সুজাতা বলে উঠলো, 'এটা তুমি ঠিক করোনি। জানো, উনি এ সময়ে—।'

সুবন্ধু হাত তুলে চকিতে একবার বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে দেখে নিয়ে বললো, 'ওঁকে না ডাকলে, উনি আবার আসবেন না। আর মুখ ফুটে কারোকে বলবেনও না, বারণ করে দিয়েছি। বড় ভালো লোক মশাই।'

হেসে বললাম, 'সে তো নিশ্চয়ই। ওঁকে আমার বেশ ভালো লেগেছে।'

'তবু যেন আপনাকে একটু কেমন কেমন লাগছে। কালই কলকাতার টিকেট কাটবেন নাকি?'

বললাম, 'টিকিট কাটবো, তবে কলকাতা কিংবা কালিকটের, তা বলতে পারছি না।'

হেনা প্রায় অস্ফুট আর্তনাদের মত বলে উঠলো, 'সে কি!'

সুবন্ধু হাত জোড় করে বললো, 'দোহাই মশাই, ওটি করবেন না। আপনি থাকুন, আমরা আর আসবো না।'

ও কথায় আমার আর বিশ্বাস নেই। আমি যাই বা না যাই। কিন্তু ওর বলার ধরনটা দেখে, না হেসে উপায় নেই। আবার বললো, 'আপনি যদি বলেন, তবে সন্ধ্যেবেলায় একবার যোগাযোগ করবো।'

আবার সন্ধ্যেবেলার যোগাযোগ! আমি হাসলাম, কোনো জবাব দিলাম না। কিন্তু হেনার দিকে না তাকিয়ে পারা যাচ্ছে না। ও ওর কালো চোখ দুটো নিষ্পলক করে, এখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী?'

হেনা উচ্চারণ করলো, 'সত্যি নাকি?'

বললাম, 'গেলে তোমাকে জানাবো।'

'কিন্তু কেন যাবেন? আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে?'

হেসে উঠলাম, বললাম, 'আমাকে একবারও বিরক্ত হতে দেখেছো?'

ও বললো, 'হয়তো দেখা যাচ্ছে না।'

আবার হেসে বললাম, 'আমি একবারও বিরক্ত হইনি।'

হৃদয়নাথ বেরিয়ে এলেন। হেনা বাটিগুলো না ধুয়েই ওর ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললো। সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে, দরজা বন্ধ করে নিচে এলাম। হৃদয়নাথ তাঁর গাড়ী নিয়ে এসেছেন, নিজেই চালক। প্রশ্ন উঠলো, কোথায় খেতে যাওয়া হবে। সুবন্ধু জানালো, 'বড় জায়গায় কোথাও না, মতিমহলে যাবো। মতিমহলের ওপর এয়ারে বসে খাবো।'

হৃদয়নাথ আমাকে সামনে ডেকে বসাতে চাইলেন। সুবন্ধু বললো, 'না, উনি পিছনে বসবেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সুবন্ধু হেসে বললো, 'কারণ, আমার সামনে বসতে ইচ্ছে করছে।'

ওর হাসি দেখে মনে হল, এটা ওর ইচ্ছা হয়তো বটে, দুষ্টুমিটা তার থেকে বেশি। পিছনে দেখলাম, মাঝখানে বসেছে হেনা। এইজন্য নাকি? সুবন্ধু আমাকে হেনার পাশে বসাতে চায়? হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু না। আমি উঠে বসলাম। হৃদয়নাথের মাথায় পাকা চুল থাকলে কী হবে, শক্ত হাতে গাড়ী বেশ ভালো চালান। চালাতে চালাতেই আমাকে ডেকে বললেন, 'আজ আপনার সঙ্গে কোনো কথা হলো না। আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করবার আছে।'

সুবন্ধু সামনে থেকে ফিরে আমার দিকে তাকালো। হৃদয়নাথকে বললো, 'উনি যখন এর পরে আসবেন, তখন আলোচনা করবেন, এবার তো উনি বিশেষ ব্যস্ত।'

হৃদয়নাথ বললেন, 'বেশি না, একটি সন্ধ্যা পেলেই আমার হবে। আমি আপনার ওপরে আর একটি লেখা লিখতে চাই। বেশি বিরক্ত করবো না। আজকের পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতাই ধরুন এবং সাহিত্যিকদের চিন্তা ভাবনার বিষয়ে একটু কথা বলবো।'

যেন খুবই সাধারণ কথা হলো। আজকের পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা ব্যাপারটাই এত জটিল আর বড়, আলোচনা করি, তার সবটুকু সাধ্য আমার নেই। সাহিত্যিকদের চিন্তা ভাবনা? খুব একটা স্বচ্ছ বলে মনে হয় না।

আমার নিজেরও না। সুবন্ধু আবার আমার দিকে ফিরে দেখে হৃদয়নাথকে বললো, 'আপনাকে আমি সময়মতো বলবো।'

পাশ থেকে হেনা বলে উঠলো, 'আমাদের একটা ছোটখাটো ইংরেজি মাসিক পত্রিকা আছে। আমার খুব ইচ্ছে, আপনার একটা সাক্ষাৎকার ছাপি। কিন্তু আপনি তো আবার বলে দিয়েছেন, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলবে না।'

সুবন্ধু বলে উঠলো, 'তাহলে কাল সকালেই আমি কয়েকটি সংবাদপত্রকে জানিয়ে দিই অন্ততঃ দু তিনটি কাগজের লোক কালকেই ছুটে আসবে।'

হৃদয়নাথ বললেন, 'তার মানে, শেষ পর্যন্ত ডুবছি আমি।'

সুবন্ধু হেসে উঠলো। কিন্তু সকলের কথাবার্তা শুনে আমি ভয় পাচ্ছি। সুবন্ধু যে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে, বুঝতে পারছি না। ও বললো, 'না, এখন কোনো সাক্ষাৎকার-টাক্ষাৎকার হবে না। যা করছো, তাই করে যাও। করলে তো অনেক কিছুই করা যায়। এখন ওঁকে ব্যস্ত করা চলবে না।'

কথা শুনলে মনে হয়, সুবন্ধুই একমাত্র আমার অবস্থাটা বোঝে। অথচ আমার নিবাসনের ঘরে হানা দিয়ে, এ রকম পরিবৃত অবস্থায়, খানা খেতে যাবার অবস্থায় টেনে নিয়ে এসেছে। কলকাতা থেকে বেরোবার দিন, এ রকম একটা অবস্থার কথা চিন্তা করতেও পারিনি।

মতিমহল আমার অচেনা জায়গা না। আগেও এখানে খেয়ে গিয়েছি। খোলা জায়গায় ঢুকতে, কর্তৃপক্ষের একজন সুবন্ধুকে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন। আপ্যায়ন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা টেবিলে আমাদের বসালেন। হেনা আমার পাশে বসলো। হৃদয়নাথ গাড়ি পার্ক করে এলো, সুবন্ধু ওঁকে সুজাতার পাশে বসতে বললো। মতিমহলের তন্দুরি চিকেন বিখ্যাত, অতএব মেনুতে ওটা থাকবেই।

খাওয়ার ফাঁকে এক সময়ে হেনা স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এবার দিল্লীতে আপনার কাছে-পিঠে কোথাও বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম নেই?'

বললাম, 'না, কেন বল তো?'

হেনা হেসে, মাথা নিচু করে, ঘাড় নাড়লো। বললো, 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই, আবার জিজ্ঞেস করলো, 'বিকেল সন্ধ্যেয় কোথাও একটু বেড়াতে বেরোন না?'

'মাঝে মধ্যে, কাছে পিঠে একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি।'

হেনা চুপ করে রইলো আমি ওর দিকে দেখলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। মুখ নিচু করলো, আবার তুলে বললে, 'ইচ্ছে করে, আপনার সঙ্গে এদিকে ওদিকে কোথাও ঘুরে বেড়াই।'

সহসা এ কথার কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না! হেসে একটু ঠাট্টা করে বললাম, 'এ রকম ইচ্ছে করো না, তোমার বাবা বকবেন।'

হেনা ঘাড় বাঁকিয়ে বলে উঠলো, 'ইস্! কখনো না। পরমুহূর্তেই আবার বললো, 'বাবা বকলে কি মেয়েরা লুকিয়ে কিছু করতে পারে না?'

এর চেয়ে অকাট্য আর কিছু হয় না। আমি হেসে ফেললাম। সুবন্ধু টেবিলের ওপার থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'মজার মজার কথার ছিটেফোঁটা কি আমরা পেতে পারি না?'

হেনা বললো, 'একান্ত ব্যক্তিগত।'

সুবন্ধু চোখের ঝিলিক দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। হৃদয়নাথ বললেন, 'আমি হেনাকে বিরক্ত করবো না বলেই লেখকের সঙ্গে কোনো কথা বলছি না।'

হেনা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'না না, আপনি বলুন না।'

হৃদয়নাথ হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে, হাত তুলে হেনাকে নিরস্ত করলেন। হেনা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল। আমি বললাম. 'যদি কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে, তোমাকে জানাবো।'

হেনা খুশি হয়ে ঘাড় কাত করলো। বললো. 'আমি যদি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে পারি, তাহলে খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো।'

'যথা?'

'যথা—যথা ধরুন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে মেয়েদের ইনফ্লুয়েন্স কতোখানি। দেহের সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত।'

কথাটা বলতে গিয়ে গলার স্বর অনেকখানি নেমে গেল। আসলে লজ্জায় প্রায় ডুবে গেল। যথেষ্ট সপ্রতিভ থাকতে চেয়েও পারলো না। কিন্তু ঠিক এ প্রশ্নগুলোই ব্যক্তিগত ভাবে হেনা করতে চায় কেন। নিতান্ত ব্যক্তিগত কৌতূহল হলে, আলাদা কথা। এ সব বিষয়ে, আমার ব্যক্তিগত কথা জেনে পাঠকের কী লাভ, পড়তে বা জানতেই বা চাইবে কেন। তাছাড়া যদি কৌতূহল ব্যক্তিগতই হয়, হেনার সেটাই বা কেন। হেনা বললো, 'আরো আছে।'

'শুনি।'

'সেক্স কি লাভ মেসিন? আপনার ব্যক্তিগত মতামত। প্রেমে পড়েছেন

কখনো বা প্রেমে কি বিশ্বাস করেন, করলে একবারই? না একাধিকবার? হলে, তাকে কি প্রেম আখ্যা দেওয়া যায়—?'

যেন খানিকটা কথা খুঁজে না পেয়ে, চুপ করে গেল। আমি একটু অবাক হয়ে হেনার প্রশ্নগুলোর কথা ভাবছি। হয়তো, এ সব প্রশ্নেরই জবাব আছে। কিন্তু সাক্ষাৎকারে এ সব প্রকাশ করে কী লাভ। সাহিত্যিক তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে তার রচনাতে নানান রূপে প্রকাশ করে। আমার মনে হয়, লেখা আর সাহিত্যক বিচ্ছিন্ন না। সাহিত্য তো অন্বেষণ ছাড়া কিছু না। তার জবাবগুলো সেখানেই নানাভাবে ছড়িয়ে থাকে। বললাম, 'সাক্ষাৎকার না, সম্ভব হলে, তোমার ব্যক্তিগত কৌতূহল আমি চরিতার্থ করবো। কিন্তু আমি তো মনে করি, আমার লেখায় আমি আত্মগোপন করে নেই। সেখানে কি তোমার প্রশ্নের উত্তর নেই?' (এই মুহূর্তে রঞ্জিতার সেই রঙীন মাছের অ্যাকোরিয়ামের পিছনে লেখক-তুলনাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।)

হেনা একটু চুপ করে থেকে, একবার আমার দিকে দেখলো। তারপরে বললো, 'হয়তো আছে। কিন্তু আমি—আমি আপনার কথা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।'

আমি হেনার দিকে তাকালাম। হেনা আমার দিকে দেখলো, মুখ নামিয়ে বললো 'আপনাকে জানতে চাই।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলো, 'কেন।' জিজ্ঞেস করলাম না। কেবল বললাম 'তোমার কথার জবাব দেবার চেষ্টা করবো।'

সুবন্ধু আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের দু'প্রস্থ খাবারই শেষ। আপনাদের প্রথম প্রস্থই এখনো পড়ে আছে।'

আমি সুবন্ধুর দিকে একবার দেখে খাওয়ায় মন দিলাম। সব শেষে, মতিমহলের কুলপি বরফ পরম উপাদেয়। সন্ধ্যে থেকেই আজ গুরুভোজন। চমৎকার আমার স্বেচ্ছানির্বাসন। যদিও দেখেছি, নির্বাসনে থাকতে চাইলেও রসনার স্বাদ গ্রহণে কোন উনিশ বিশ হয়নি। খাওয়া শেষে বাইরে এসে সকলেরই পান চিবোবার ইচ্ছা হলো। তখনই হেনা বলে উঠলো, 'মনে রাখবেন সুবন্ধুদা, আপনার রঞ্জিতা রিঞ্জ্‌ভিকে কখনো এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না।'

সুবন্ধু আমি সুজাতা, তিনজনেই চোখে চোখে তাকিয়ে হাসলাম। সুবন্ধু বললো, 'মাথা খারাপ, অমন ডাকিনীর সঙ্গে ওঁকে কখনো আলাপ করিয়ে দিতে পারি?'

হেনা বললো, 'ডাকিনী বাঘিনী জানি না। একবার যখন নামটা উঠেছে লক্ষণটা ভালো না।'

হৃদয়নাথ ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'হুঁ, আমিও তাই ভাবছি। আর কিছুই না, ভদ্রলোককে টিঁকতে দেবেন না।'

হেনা যোগ করলো, 'আর গোটা দিল্লীময় কুৎসায় কান পাতা যাবে না।'

রঞ্জিতা রিজ্‌ভি দেখছি বিভীষিকা। আমি সুবন্ধুর দিকে চেয়ে হাসলাম। কানা—মনে মনে জানা। তা জানি, এবং বিভীষিকা কী না, তাও জানি না। তবে আমার সঙ্গে তার দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। হৃদয়নাথ আমাকেই আগে হোটেলে নামিয়ে দিলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে, হেনা শুধু বললো, 'কাল।'

গাড়ি বেড়িয়ে গেল। রিসেপশনে আসতেই ছোকরা কেরানীটি আমার হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললো, 'আপনাকে একজন মহিলা খোঁজ করতে এসেছিলেন।'

মহিলা! আঁতকে উঠে বললাম, 'নাম বলেছেন?'

'না। আপনি নেই শুনে চলে গেলেন।'

বুকের মধ্যে এমন দুরু দুরু করছে, কেরানীকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'মহিলাটি দেখতে কেমন বলতে পারেন?'

'পারি। ইয়ং লেডি, ফরসা নন, চশমা চোখে ছিল।'

একেবারেই চিনতে পারলাম না। যে চেহারাটা চকিতে ভেসে উঠেছিল, সে নয় বোঝা গেল। কিন্তু এ কে হতে পারে? কোনো রকমেই অনুমান করতে পারছি না। সুবন্ধু কি তলে তলে আরো মাটি খুঁড়েছে। একমাত্র ও-ই জানে।

[এর পর পঞ্চম খণ্ডে]